পেরুতে সূর্য লাল

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
২২শে শ্রাবণ—১৩৬৬

প্রচ্ছদ : দেবদত্ত নন্দী

অলংকরণ : ব্রজমাধব ভট্টাচার্য

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

হাইরাম বিংহাম্, মাচু পিচুর আবিষ্কর্তা
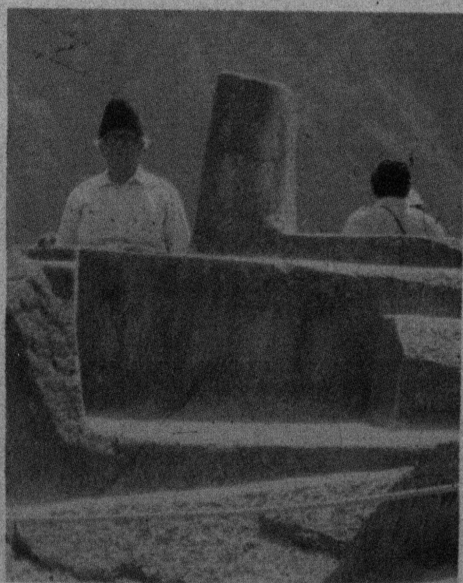
মাচু পিচু শিখরে-সূর্য সিদ্ধান্তের স্তম্ভে দাঁড়িয়ে লেখক

মাচু পিচুর শালীন পাড়া
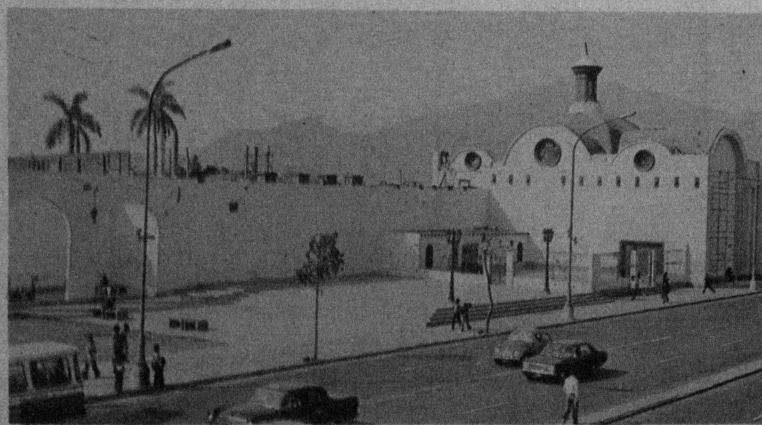
সান্তা রোজা আশ্রম

পেরু

মেক্সিকোর নেশা কী করে ধরেছিল আগে বলেছি। অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই প্রেস্কট্-এর "Conquest"—বই দু'খানাই পড়তে হল। পেরু তার অন্যতম।

বার বার ক্যারাবিয়ানে যাই। ১৯৭৮ থেকে '৮২-র মধ্যে চারবার গেলাম। অথচ পেরু যাই না। মনটা খচ্ খচ্ করে। সঙ্গতি ও সঙ্গ—এই দুই-এর তালাশ।

১৯৮৩-তে সুযোগ পাওয়া গেল। বন্ধু তিলক চাঁদকে ধরলুম। "—যথেষ্ট শিক্ষকতা তো করলে, এবার ছাত্রগুলোকে একটু রেহাই দাও।"

—"ওদের যে পরীক্ষার মুখ … … …"।

আরও কি বলতে যাচ্ছিল তিলকচাঁদ।

বলা হল না। থামিয়ে দিয়ে বললুম,—"বোঝ না কেন যে, ছাত্রদের তুমি যত না পড়াবে ততই বেশী তারা জ্ঞান সঞ্চয় করবে। সে হ'বে তাদের পাকা জ্ঞান। 'পরীক্ষার পাশ যে শিক্ষকের ওপর নির্ভর করে না' সেই পুরোনো তত্ত্বটা এই একচল্লিশ বছরের শিক্ষকতার পরে আমায় আর নতুন করে শিখিও না। চল। আমিও এই একচল্লিশ বছর ধরে এই ভাওতা ভেজেই গতরে পুষ্ট হয়েছি।"

"—কিন্তু ছুটি?"

"ঐ আবার এক গ্যাঁড়াকল,—ছুটি! আরে বাপু, ছুটির স্ববাদে চাকরীর বারোটা বেজেছে, এমন কোন নজীর কোথাও দেখাতে পার? চল,—চল।"

তিলক তো কাচু-মাচু।

"……ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমার প্রিন্সিপ্যাল তো কেলভিন্? বেশ, কেলভিনকে একটা ডিনারে ডাকছি। মাষ্টারদের ভ্রমণ তো ছাত্রদের রোগে বিশল্যকরণী।…না হয়, বলো তো, নাকুথবাটকেই গিয়ে বলি। সে-ই তো এখন তোমাদের ত্রিনিদাদ মন্ত্রীসভার শিক্ষণমন্ত্রী নয়? সে তো চব্বিশ ঘণ্টাই ছুটিতে ছুটিতে। জীবন-ভোরই ছুটল যে, তার আর শিকড় গজায়, না বীজ জমে?"

"—কিন্তু স্যর, আমার যে মস্তবড়ো চিকেন-ফার্ম। কেষ্টোর জীবগুলো না খেয়ে যে মারা যাবে।"

"...এবং তা'তে ঐ চিকেন খেয়ে আমাদের তাগৎ বাড়ানোয় বাধা পড়বে।—এইতো ? বেশ, সরোজকে বলিগে যাই। তা'র মঞ্জুরীতেই তো তোমার মন-জুড়ি ?—"

"তা' যদি পারেন স্যর,—আমার পেরু দেখাটা হয়। বিশেষ তো আপনার সঙ্গে। সে লোভ কি কম ?"

সরোজ তো হেসে খুন ? "ও আবার কবে পালক ঢাকা চিকেন দেখে ? যে সব 'চিক্' দেখে, তারা সব স্মার্ট ড্রেস পরে/বব্ করে/ওকে ছাড়াই ঘুরতে জানে। নিয়ে যান—নিয়ে যান। আপনি আসছেন শুনে অবধি পেরু—পেরু করছে। এখন সরোজ আর চিকেন—যত্তো আদিখ্যেতা ! যাও, ভাল ভাল চিকেন দেখে এস। পরে গপ্প বলবে। আমি সঙ্গে গেলে চিকেনরা সব উড্‌কাটার হয়ে উড়ে পালিয়ে যাবে।"

কখনও 'সঙ্গী' বোলে সঙ্গী সাথে নিয়ে দেশ ভ্রমণের কথা মনে হয়নি। অথচ পেরুর বেলায় হলো। যেমন "মানস-সরোবর" বলতেই সঙ্গী-সাথীর কথা মনে হয়।

কারণ, পেরুতে যাওয়াটা, ঠিক পেরুতে যাওয়া নয়। এ-যাওয়া শহর লীমা, বন্দর ক্যালাও বা কোণ্ডোর পাখির বাসা দেখতে যাওয়া নয়। জ্যান্তো অজায়েব ঘরে ল্লামার গাড়ি চড়া নয়। 'আহা মরি' ক'রে একটা আলপাকার স্টোল বা অখাদ্য পোঞ্চো কেনা নয়।

আসল কারণ ওই পাহাড় এ্যাণ্ডীজ। হিমালয় দুর্ধর্ষ হলেও সে যেন আসলে আমাদের চলতি-ফিরতি, জানা-শোনা 'শিবের শ্বশুর' হিমালয়।

কিন্তু এ এ্যাণ্ডিজ পাহাড় সত্যই দুর্ধর্ষ এক পাহাড়। ওকে ডিঙ্গুনোর কথা তো ওঠেই না,—ওর ওপরে ইন্‌কা সভ্যতার তা-বড় তা-বড় আখাড়া রয়েছে, সেখানে পৌঁছুতেও "জান্" বেরিয়ে যাবে।

ইন্‌কাদের যেন মাথার দিব্যি দেওয়া ছিল, ওরা আমাদের হিমালয়ান আর্যদের মতো পাহাড়ের টোঙ্গ ছাড়া তীর্থ বা নগরী করতে জানত না। ওদের পাহাড়ী বাতাস, পাহাড়ী জল, পাহাড়ী আবহাওয়ার প্রতি নিদারুণ আকর্ষণ ছিল।—(ওদের সৈকত বা বেলাভূমি বলতে যা', তা' হলো এক দুর্ধর্ষ মরুভূমি।)

ওদের রাজধানী কুজকো শহরটার কথাই বলি। কুজকো ছিল বিস্তীর্ণ ইন্‌কা সাম্রাজ্যের রাজধানী, ১১,৩০৮ ফুটেরও ওপরে। কিন্তু ১১,৩০৮ ফুটের মাথায় এই শহরে পৌঁছুবার পথটি অতীব দুরধিগম্য। ট্রেন আছে, কিন্তু শুধু গ্রামবাসীরাই চড়ে। তা'ছাড়া পেরুর আবহাওয়া সম্বন্ধে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁ'রা জানেন যে এখানকার বাতাসে অক্সিজেন কম। এ দেশে দিন হয় বটে, কিন্তু লীমা শহর কেন, পশ্চিম দিকটার তটভাগে সূর্যের

দেখা পাওয়াই যায় না। এমনই চির দোদুল্যমান কুয়াশা। আর লীমা শহরে বা দীর্ঘ তটভাগেই কখনও বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। যে অনিবার্যতা লণ্ডন, আমস্টার্ডম বা প্যারী শহরে ছাতাকে পোষাকের এক বিশিষ্ট অঙ্গ করে রেখেছে ; সেই ছাতার ব্যবহারই এদেশে নেই। বর্ষাতি কোটের কথাই তো ওঠে না।

এই নিরবচ্ছিন্ন কুয়াশা আর বর্ষাহীনতার একটা কারণ আছে বৈকি !

দক্ষিণ আমেরিকা ছুঁচলো হয়ে দক্ষিণ মেরুর দিকে নেমে গিয়েছে প্রায় ৬০ অক্ষরেখার কাছাকাছি এবং ড্রেক প্রণালী পেরিয়ে শেটল্যাণ্ড, গ্রাহামল্যাণ্ড—এ সব জায়গা তো দক্ষিণ মেরু ভূখণ্ডেরই অংশ। সেই ভূখণ্ড পার ক'রে ভাসমান বরফের সমুদ্র কেপ হর্ণ, ফকল্যাণ্ড দ্বীপ পর্যন্তই তো আসে। এ বরফের শীত গ্রীষ্ম নেই। জমছে আর গলছে, গলছে আর জমছে—সেই গলিত মৃত্যু-শীতল জলধারা হাম্‌বোল্ট্ জলধারা নাম নিয়ে বয়ে যাচ্ছে চিলি এবং পেরুর সমুদ্রের কিনারা বেয়ে।

[নব্যমত অন্য কথা বলছে—এই হিমশীতল জলপ্রবাহ সমুদ্রেরই গভীরতা থেকে দক্ষিণ আমেরিকারই তটপ্রান্ত থেকে উৎসারিত এক নৈসর্গিক ধারা।]

গাল্‌ফ্ স্ট্রীম যেমন মেক্সিকো উপসাগর থেকে বেরিয়ে সমগ্র অতলান্তিক মহাসাগর পার হয়ে গিয়ে পড়ে য়োরোপের পশ্চিম তীর ধুয়ে, এবং তার প্রবল উত্তাপে য়োরোপের তীরস্থিত দেশগুলোকে সবুজে ভরিয়ে দেয়, বন্দরগুলোকে করে রাখে বরফমুক্ত—এই মৃত্যু-নিথর হাম্‌বোল্ট স্ট্রীম তেমনি দক্ষিণ আমেরিকার চিলি এবং পেরুর উপকূলভাগকে ঊষর, বন্ধ্যা, নির্মম করে রেখেছে। ধীর মন্থর এর গতি ওপরের বাতাসকে হিমেল করে রাখে। ওপরের গরম সূর্যতাপ সেই হিমবাহী বাতাসকে উত্তপ্ত করে তুলতে পারে না। ফলে, প্রথমতঃ, সেই দুর্নিবার চিরন্তন কুজ্ঝটিকার আস্তরণ চন্দ্রাতপের মতো পেরুকে ঢেকে রেখেছে। দ্বিতীয়তঃ, পেরুর তীরভূমি পৃথিবীর সব কটা মরুভূমি সত্ত্বেও অতি নিকৃষ্ট, অতি ভয়ঙ্কর এক প্রেতভূমি ; ঊষর, বন্ধ্যা, চির তৃষ্ণার্ত এবং জীবহীন।

পেরুভিয়ানরা বলে—এই মরুভূমির ওপর দিয়ে পাখি পর্যন্ত ওড়ে না।···কিন্তু ওড়ে। আমি দেখেছি।

কিন্তু কোনো মৃত্যুই যেমন অমৃতকে জয় করতে পারে না, কোনো বিমর্ষতাই প্রসন্নতাকে অতিক্রম করতে পারে না,—তেমনি প্রকৃতির অন্তহীন দাক্ষিণ্য এই মৃত্যুহিম জল-স্রোতই পেরুর অর্থনীতিতে দান করেছে পুরো এক থাবা আশীর্বাদ। কথাটা বলি।

পেরু-প্রবাহ বা হাম্‌বোল্ট্ প্রবাহের চালটা খুব ঢিলে। গাল্‌ফ স্ট্রীমের মতো তড়ি-ঘড়ি ব্যাপার নয়। ফলে, জলের গভীর থেকে, বলতে গেলে ধরণীর বুক থেকে, উৎসারিত উষ্ণ জলধারা এর সাথে মিশে মাটির গায়ের বহু পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাণ এর মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছে ; দক্ষিণ-পূর্ব দিশার যে বাণিজ্যিক বাতাস এর ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তার প্রখরতার ফলে, এবং গভীর জলের উষ্ণতার ফলে, শীতলতা সত্ত্বেও পেরুর জলের মধ্যে প্লাঙ্কটন জাতীয় কোটী কোটী টন জৈব খাদ্য আরও অনেক কোটী টন ছোট মাছের খাদ্যের সুরাহা করে

দেয়। ফলে, চুনো খয়রা জাতীয় সার্ডিন বা হেরিং মাছের অফুরন্ত ভাণ্ডার এই জলে। পৃথিবীর বৃহত্তম মাছের চাষের জন্য পেরু প্রসিদ্ধ। মাছের কারবার পেরুর সবার বড় কারবার। তা'র প্রধান কারণ জলের তাপমানের এই বৈচিত্র্য ; জলে প্লাঙ্কটনের উপস্থিতি।

এ কারবারের অনুষঙ্গ হিসাবে আরও দু'টি কারবার পেরুকে সমৃদ্ধি দিয়েছে।

যেখানে ছোট মাছ, সেখানেই বড় মাছ। কারণ, তা'রা ছোট মাছ খায়। বড় বড় তুনামাছের আড়ৎ পেরু। আর ঐ ছোট মাছের দৌলতে পেরুতে মাছের গুঁড় দিয়ে সার তৈরীর কারখানা এক ক্যালাও বন্দরেই গোটা সাতেক।

সারের বাণিজ্য করে আজও পেরু তা'র বহির্বাণিজ্যের ভাণ্ডারে সব চেয়ে বেশী অর্থ তোলে এবং এই সারের বেশীর ভাগই দান করে এক পাখি। সে কথাও বলি।

এতো সার্ডিন, মলেট্, হেরিং পেরুর সমুদ্রে যে এক অতিকায় পাখির দলকে দল পেরুর তটভূমিতে চিরকালের বাসা বেঁধে আছে।

গুয়ানো বা কণ্ডোর খুব বড় পাখি। জাতিতে চিল, ঈগল। কিন্তু এত বড় পাখি পাখি-সাম্রাজ্যে নেই। ময়ূর বা উটপাখি গুয়ানোর চেয়ে বড় পাখি হ'তে পারে। কিন্তু ঈগলের মতো, বাজের মতো, এ্যালবাট্রস্ বা গাল্-এর মতো, এমন কি পেলিকানের মতো উড়তে যা'রা ওস্তাদ, গুয়ানো তা'দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

আর কী খেতেই পারে কণ্ডোররা! দিন রাত জলে ঝাঁপ খাচ্ছে ;—আর খাচ্ছে, খাচ্ছে, খাচ্ছে! কী বা ঐ মাছ, কী বা ভাসমান ঐ প্লাঙ্কটনগুলো! খেয়েই চলেছে!

ফলে, সেই পরিমাণ বিষ্ঠাত্যাগও তো করছে। পেরুর তীরে পাহাড়ী চূড়ায়, পেরুর তীরভূমি সংলগ্ন দ্বীপগুলোয় গুয়ানো-বিষ্ঠার পাহাড়। রীতিমত ট্রাকটর দিয়ে কাটিয়ে জাহাজে প্যাকেট করে ভরে দেবার বড় বড় ফ্যাক্টরি আছে। পৃথিবীময় এই সারের নাম, দাম, বাণিজ্য। এই গুয়ানো পাখির কাছে পেরু এতো ঋণী যে, গুয়ানো পাখির ছবি দিয়ে ডাক টিকিটও ছাপা হয়েছে।

'গুয়ানো' এই সারের নাম। পাখির নাম কণ্ডোর।

কথা বলতে বলতে অনেক দূর এসে পড়েছি। এবার ফেরা যাক। কী লীমা, কী কুজ্‌কো, কী পেরু,—এ্যণ্ডীজ পর্বতমালার পশ্চিমে পেরুর আকাশ বিষণ্ণ, প্রভাহীন। এই কারণেই অক্সিজেনের অভাব। (মেক্সিকোয়ও সে অভাব ছিল! কিন্তু তা'র কারণ মেক্সিকো শহরটাই ৮০০০ ফুটের মাথায়। লীমা তো সমুদ্র তীরের শহর)!

আমার গন্তব্যস্থান এ্যণ্ডীজ পর্বতমালার শিয়রে ঐতিহাসিক শহর আয়াকুচো, পিউনা, এবং তিতিকাকা হ্রদ—সর্বোপরি আমাজান নদীর উৎস। এ ছাড়া লোভ রয়েছে—বরাবর রয়েছে ইন্কাদের বিস্তৃত নগরী, মমী-নগরী মাচ্‌চু-পিচু।

সভ্যতার সাতটি আশ্চর্য যে বলেছিল, সে মাচ্‌চু পিচ্চু শহর দেখেনি, দেখেনি ইল্লোরা

বা দ্বারসমুদ্রমের মন্দির। কিন্তু যদি সভ্যতায় একটি মাত্র আশ্চর্যের কথা বলতে হয়, বলবো মাচ্-চু-পিচ্চু।

সভ্যতার এক বিস্ময় আর্যেরা, অন্য বিস্ময় মিশরীয়রা। সত্য কথা। এদের প্রতিভা বিস্ময়কর বটে। কিন্তু সভ্যজাতির ইতিহাসে—না, আর্য নয়, মিশরী নয়, চীনও নয়,—বিস্ময়ের চরম হলো, পেরুর ইন্‌কারা। আর ইন্‌কাদের শ্রেষ্ঠ চমৎকার মাচ্-চু-পিচ্চু। অন্ততঃ এখনও অবধি শ্রেষ্ঠ।

মাচ্-চু-পিচ্চু আবিষ্কৃত হয় ১৯১১ খৃস্টাব্দে। লেখক তখন এক বছরের শিশু। হাইরাম বিংগহাম (Hiram Bingham) ছিলেন হনলুলুর এক আমেরিকান মিশনারীর ছেলে। জন্ম থেকেই তাঁর মনে প্রশ্ন,—'যে সব শ্বেতকায়েরা এসে অশ্বেতদের ওপর আধিপত্য করছে, সত্যে ও ধর্মে তা'দের সে অধিকার সাব্যস্ত হল বা হয় কী ক'রে ?'

এই তালাশের ফলশ্রুতি, বিংগহামের জীবনে প্রাচীন, বিশেষতঃ দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাস পঠন, অবশেষে পাঠন। হনলুলুর পাহাড়ে পাহাড়ে তা'র সুবিস্তৃত চন্দন বনের মধ্যে ঘুরতেন, আর ভাবতেন—এমন শান্তিময় সমাজে, পরিবেশে কী করে পোর্ট আর্থারের মতো অশান্তির উপাদান রচিত হয় !

তখন ইন্কা সাম্রাজ্যের কথা, মেকসিক জাতির কথা মনে এলো। চলে এলেন পেরুতে। নানা উপকথা, কিম্বদন্তীর মাধ্যমে বুঝলেন, লীমা নামক নগরীটি একটা ঠুনকো সভ্যতার লুঠেরারা সৃষ্টি করেছে। এখানে, এই শহরে পেরু নেই। অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে। অবশেষে পেলেন পাহাড়ী-নগর কুজকোর সন্ধান।

বিখ্যাত বিপ্লবী সাইমন বোলিভার ভেনেজুয়েলা থেকে যে পথে দুর্ধর্ষ অনধিগম্য এণ্ডীজ ডিঙ্গিয়ে পেরু জয় করেছিলেন—মাত্র অকুতোভয় দুঃসাহসের তকমা আঁটার সাধেই বিংহাম সেই পথ স্কাউটিং করেছিলেন।

সেই আরম্ভ হল এণ্ডীজের সঙ্গে বোঝাপড়া। পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে বিস্মৃত ঘুমন্ত গ্রামগুলির মধ্যে ঘুরে ঘুরে তিনি আবিষ্কার করলেন এক আশ্চর্য নগরীর কথা, যেখানে শুধু মেয়েরাই থাকত, সূর্য দেবতাকে উৎসর্গ করা সূর্য কন্যারা,—সারা পেরুর মানস নৈবেদ্যের পরমারাধ্যা প্রকৃতির দল।

···এবং দুঃস্বপ্নের মতো শ্বেতকায়েরা যে দিন তাদের লোভ এবং কামের দুই চাকা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিল একটা শান্ত সুষ্ঠু সভ্যতাকে, সে দিন তা'দেরও জানতে দেওয়া হলোনা সেই পুণ্যশ্লোক নগরীর অস্তিত্বের কথা। ফলে, শেষ ইন্‌কা সম্রাটকে প্রজারা লুকিয়ে রেখে দিল এই গুপ্ত এবং দুর্গম নগরে। এ নগরকে কেন্দ্র করে স্পেনের বোম্বেটেদের 'তৈরী' সম্রাট মাঙ্কোও পরিণামে ফিরিঙ্গী ডাকাতদের সহ্য করতে না পেরে তাঁর বিদ্রোহের পতাকা মেলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ শহরেই থাকতেন আর এক অমর নাম—কুপাক আমারু, শেষ সম্রাট,—যিনি নিজেকে ধরা দিয়েও এ নগরীকে অজ্ঞাতের অন্ধকার থেকে বাইরে আনতে দেননি। তাঁর পুণ্যকথা আমরা যথাকালে শুনবো।

কিম্বদন্তীর বিচিত্র এই নগরীকে বহুযুগের কবর থেকে বাইরে টেনে আনলেন হাইরাম

বিংগহ্যাম* ১৯১১ তে। মাচ্‌চু-পিচ্ছুর কথা পরে বলা যাবে। সে কথাও এক বিস্ময়কর জ্যান্তো আরব্য উপন্যাস।

এ হেন এ্যণ্ডীজের ওপরে কুজকো, পিউনা, মাচ্‌চু-পিচ্ছু। আমায় বেশীর ভাগই থাকতে হবে ৮০০০ থেকে ১১০০০ ফুটের মাথায়। ভয় ছিল। আমার ফুসফুস বরাবরই বেশ ফস্‌ফুসে। তদুপরি সামান্য কারণেও যখন তখন এলার্জিক হাঁপানি। সে'বার আবার শ্রীমান ডাক্তার দেখেশুনে বাণী শোনালেন—রক্তের চাপ নাকি অবশেষে চাপালোই। (ডাক্তার পরে মত বদলেছেন)। মনের আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। কিন্তু মন যা'র চাঙ্গা, তা'র কর্মনীতিতেই চরৈবেতি।

যেতে আমাকে হ'বেই। যাবই। হোক বয়স ৭২+, বা চাপের চিৎকার। কাজেই সঙ্গীর দরকার। 'বেগের' সঙ্গী-তেও দামালপনা করতে গিয়েছিলুম সে'বার গ্রীস বেড়াবার সময়। মনে মনে সঙ্কল্প যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়ার পাহাড়ী পথ বেয়ে পশ্চিম জার্মানী যাওয়া। এই মানুষ-জন্মে বাহেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় থাকা সত্ত্বেও যে অস্ট্রিয়ান এ্যাল্‌প্‌স্‌ না দেখলো তা'কেই বলতে হয় "লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি"।

…কিন্তু পথে এলো জ্বর। তারপর সোজা জ্ঞানই লোপ। জ্ঞান ক্ষণেকের তরে হলো, তখন ফ্রাঙ্কফোর্টের হাসপাতালে। তারপর হিটলার আমলের সুপ্রসিদ্ধ নার্স মিসেস্ লিব্‌গার্ট (ব্যানার্জীর) তত্ত্বাবধানে তাঁ'র বাড়িতে থেকে দীর্ঘ একপক্ষকাল যমদ্বারে বাস থেকেও ফিরে আসতে হলো।……এই অন্ততঃ নার্স লিবগার্ডের ভাষ্য। আমার অবস্থা তখন ভাষ্যাভাষ্যের বাইরে।

সে'টা হলো ১৯৭৯-এর ব্যাপার,—হালফিল। সুতরাং ১৯৮৩ তে এ ভয় তো স্বাভাবিক।

কিন্তু তিলক রাজী হয়ে যা'বার পর আমরা রওনা হ'লাম। প্রথম 'স্টাপ্' ভেনেজুয়েলা,—কারাকাস্।

কারাকাস

—কারাকাস আমার পরিচিত স্থান হলেও তিলকের পক্ষে নতুন। ক্যারাবিয়ান

* [আশ্চর্য লাগে, যখন ভাবি ইম্পীরিয়লিজিমের বিষাক্ত নিঃশ্বাসের অপ্রতিরোধ্য—না দুষ্প্রতিরোধ্য—শক্তি! ঐ বিংগহ্যাম সাহেব পরে হোলেন যুক্তরাষ্ট্রের কোন এক এস্টেটের গভর্ণর; তারপর সেনেটর; ট্রুম্যানের খয়ের-খাঁ, সাক্ষাৎ এবং ভিয়েৎনামের স্বর্গে আগুন জেলে ভূতুনাচের হাতে-হাত, কাঁধে-কাঁধ মেলানো সঙ্গী!!

হায়! অর্থ, প্রতিপত্তি, আরামের লোভ!

পোষ শুধু কুকুরই মানে না। মানুষ নামক জীবও মানে!!]

অঞ্চলের ওপর তিনখণ্ডে আমার লেখা[১] আছে। তা'তে ভেনেজুয়েলা সম্পর্কে বিশদভাবে বলা আছে। এদেশে প্রথম আমি গিয়েছিলাম সে এক বিষণ্ণ উৎসবে।··· ··· ··· ···

এখন খুব স্পষ্ট মনে পড়ছে না; তবে মনে হয় সে'টা ১৯৭৭ সাল। বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of West Indies) ক্লাস নিচ্ছি। বিষয়টি যেমন গুরুগম্ভীর, ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীরাও সেই অনুপাতে মগ্ন। The Progress of Indian Thinking, শেষ হয়ে গেলেও অনেক প্রশ্ন থাকে। হাতে সময় থাকলে সে সময়টা একটু সেমিনারের স্বাদে ঘন হয়ে বসে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। আলোচনা করি। সুখ ও আনন্দ পাই। শিক্ষকতার জীবনে এ'টিই ছিলো আমার অমৃত মুহূর্ত।

সেদিনও সেই রসে ডুবে ছিলাম। হলের দরজা পার করে একটি 'সৌম্যবয়ান চকিত নয়ান' যুবক তার দীর্ঘ চেহারা নিয়ে দাঁড়াতেই ইঙ্গিতে তাঁকে দোরের কাছের এক আসনে বসার ইঙ্গিত করলাম।

আলোচনা শেষ হলো। কাছে এসেই বাংলায় তাঁকে প্রশ্ন করি—"পোর্ট ওর্দাজ থেকে আসছ? নাম কি? নবীন রায়? (মিথ্যে নাম)।"

শুনে নবীন তো অবাক। বাঙ্গালী রীতিতে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। বল্‌লাম—"বাড়ি চলো।"

গাড়িতে যেতে যেতে সে প্রশ্ন করলো—"আমি যে বাঙ্গালী, জানলেন কি করে? আর পোর্ট ওদাজের খবরই বা পেলেন কি করে?"

কী জবাব দিয়েছিলাম মনে নেই; কিন্তু ঘটনাটা মনে আছে।···

—ক'দিন আগেই আমার এক স্পানিশ ছাত্রী টেলিফোনে এক বিপত্তির খবর জানায়, —একই সঙ্গে সে মজেছে তুই পুরুষের প্রেমে। নম্বর এক—এক শুদ্ধ অবিমিশ্র বাঙ্গালী কৃতী অফিসার, যা'র মেডেল সোনার, চরিত্র সোনার, মেজাজ সোনার হয়েও কাজটি লোহার। তা'র স্বভাব-মুগ্ধ করেছে সেই কন্যার প্রণয়বোধকে। অন্য পুরুষটিও ধনী, জাঁদরেল ইয়াংকী। প্রাক্‌বিবাহের তরুণী কন্যার/সন্তান একটি আছে। কিন্তু স্ত্রী মৃতা। তা'র আর্থিক, পেশিক, দাপটিক আকর্ষণ বেশ উচ্ছল, মাদক।

প্রশ্ন, কা'কে সে কন্যা আংটী পরাতে দেবে? ···আমার কথার ওপর কন্যার ভরসা ১০০%। বলেছিলাম, বাঙ্গালীটির কথা কিন্তু এও বলেছিলাম যে, ইয়াংকী তালেবরটির পিপাসুবৃত্তির প্রতি যদি অনুমাত্র অনুকম্পা মনকে স্যাঁতস্যেঁতে করে দেয়, তৎক্ষণাৎ আমার নির্বাচনটির গলা যেন টিপে দেওয়া হয়। "নৈলে তোমাদের তু'জনার মধ্যে কেউ কারুর গলা টিপবে।···"

এর পরে যদি সেই সন্ধ্যায় সেই উত্তীয়-কে চাক্ষুষ করেই (চেহারার মোটামুটি বর্ণনা জানা ছিলই) জড়িয়ে নিয়ে থাকি, তা'তে সে যুবকটি ভেবে অবাক হলেও, আমি শার্লক হোমস্ হ'তে নারাজ।

১। "ক্যারাবিয়ানের সূর্য"—অরুণা প্রকাশনী।
তৃতীয় খণ্ড মুদ্রণ কবলে।

দু'দিনের মধ্যেই তা'র বিয়ের সজ্জা, মায় আংটী, গহনা, সিল্কের পাঞ্জাবী, পাম্প শূ, চাদর, ধুতি · সব · গুছিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। (বিদেশে বাঙ্গালীক পাঞ্জাবী সেলাই করানোর ব্যাপার কলকাতার পাতাল-রেল গড়ার মতো এক বিশাল ব্যাপার।)

এক সপ্তাহ পরে গিয়ে বিয়ে 'দিয়ে' এলাম, বাঙ্গালী হুলুধ্বনি এবং বরণডালা সমেত স্ত্রী-আচারসহ। সে এক অভিজ্ঞতা। মায় 'জল সওয়া'ও হলো। নদী 'কারণী'র কলধ্বনির সঙ্গে শঙ্খধ্বনির মিলন, সেই জলের বুকে বঙ্গবালার অরুণরাগ রঞ্জিত নখ-সনাথ অঙ্গুলী চালন, সেই প্রথম। তীরে দাঁড়িয়ে স্পানিশ বধূরা ভাবছে, এ কোন ভূতুড়ে দেশের ভূতুড়ে ঝাড়-ফুঁক! অতগুলি বঙ্গবালা অতো সাজ-সজ্জায় সেজে একত্রে অতো সব দীপ, কুলো, শাঁখ আর হুলুর ধুয়া তুলেছে, সে এক অপরূপ পরিস্থিতি! এরা থেকে থেকে আফ্রিকান 'উলু-উলু' শব্দ তোলে কেন?

এই সূত্রে মনে পড়ছে জল্-জলে একটি বাঙ্গালী দম্পতীর আতিথেয়তা। তা'রা ছিল যেন 'হর-গৌরী'। তা'দের নামেরও অমনি একটা মিল ছিল। সে নাম বলতে পারি না ছাপার অক্ষরে। সে'টা চাপাই রইল। কিন্তু কী মিষ্টি, কী সুষ্ঠু সে নির্মল অভিজ্ঞতা!

সবই সুন্দর অভিজ্ঞতা। কিন্তু সেই ইয়াংকীর উৎপাতে সে বিয়ে ভেঙ্গেছে বছর না ঘুরতেই, এবং মেয়েটা ভেঙ্গেছে ইয়াংকীর বিষময়তার উৎকট পরিচয় পেয়ে।

এখনও সে ঘুরছে। পি. এচ্-ডি হয়েছে। কাঁদছে। মাঝে-মাঝে ছুটে আসছে আমার কাছে। সে তা'র সেই ভুলটি ভুলতে পারছে না। ভুলকে ভোলা যায় না। ভুলের স্মৃতি যে পাথরের লিখন—এ কে জানত?

বাঙ্গালীটি অবশ্য আবার বিয়ে করেছেন কোনো বাঙ্গালীনিকেই। সুখী হোন তাঁরা।

সেই আমার প্রথম ভেনেজুয়েলায় যাওয়া।

ভারতীয়দের পক্ষে ভারতের বাইরে গিয়ে দেশভ্রমণের ভিসা সংগ্রহে প্রবল বাধা। 'হ্যাংলা দেশের ক্যাংলা' বলেই যা' 'হ্যাক্ থুঃ'? সেটা কিন্তু সব নয়। আসল কথাটি বহুদেশ বহুকাল ধরে ঘুরে যা' দেখলাম, সেই সংবিদে বলতে পারি।

ব্যাপারটার সংকেত নিহিত, ভারতীয়দের প্রচণ্ড ও দুর্বার আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নিষ্ঠার মধ্যে। দেশের মধ্যে এ নিষ্ঠার অভাব যতই প্রত্যক্ষ করা যাক, দেশের বাইরে কোথাও না কোথাও বসত পাকড়ে এরা ফুচ্কার দোকান থেকে রেষ্টুর্যান্ট গড়ে ফেলবে। পকৌড়া, রুটী থেকে হোটেল। তামিল, অন্ধ্র, গুজরাতী, সিন্ধী, পাঞ্জাবী,—এরা যেন কেঁচো বা আলোকলতা। যত টুকরো, ততোই জীবন। পাড়া-কে-পাড়া দখল করে, অল্প লাভে বিক্রী করে, যে দেশে যা'বে সে দেশের অর্থনৈতিক জীবনে সামাজিক ছন্দে বিপ্লব এনে দেবে। পূব বাংলার বাঙ্গালীরা ছাড়া, আসাম, ওড়িয়া, বাঙ্গালী, বিহারীকে এদের এই বিবর্ধমান বাণিজ্য প্রসারের মধ্যে পাইনি। পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাতি, তামিল?—হ্যাঁ, প্রচুর। তারা তো বাঙ্গালীবাবু নয়। এককালে চীনারা

এমন ছড়াতো। এখন জাপান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারত ছড়াচ্ছে। ভীসা হয়ে পড়েছে দুর্লভ।

আরও লক্ষ্য করেছি, ভারতীয় বলে ভারতীয় পরিব্রাজকদের আমল কেউ বড়ো না দিলেও বিদেশে যা'রাই বাংলা-ভাষী তারাই এক গোত্রের, 'বাঙ্গালী'। সেটা তাদের প্রথম, প্রধান ও প্রকৃত পরিচয়। ডঃ সহিদুল্লা বলতেন, 'ভাষাটাই সবাইকে বাঙালী করেছে'। তখন কোথায় পশ্চিম বাংলা, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, অসমীয়া বা ওড়িয়া!

ও-সব দেশে গিয়ে আমরা পরগাছার মতো অযত্নেও বেড়ে উঠি। অক্টোপাসের মতো টেন্‌ট্যাকল্ (শুঁড়?) বাড়িয়ে সম্ভব-অসম্ভব, গোত্র-অগোত্রকে ট্যাকল্ করে চুষে শুষে ফেলি। এদেশে থাকতে কিন্তু কেবল লড়াই করে মরি। এ ধরনের রাজনীতির কলকাঠিও যে বিদেশী চাল—একথা ভাবতে কষ্ট হয় না, বা পারি না। এ যেন 'জেনে-শুনে বিষ করেছি পান'।

সন্দেহ হয়, ভারতের রাজনীতিতে দেশীয় টাকা বেশী খাটছে, না বিদেশী? ধর্ম সমাজের মা, না সৎমা? ধর্ম জোড়ে, না কাটে?

এই অর্থনীতির সঙ্কট ছাড়াও অন্য কথা আছে। কোন একজন ভারতীয় যেই স্থিত হয়ে গেল, ব্যস, তা'র টেন্‌ট্যাকল্ শুঁড়ি সুড় সুড় করে বাড়বে আর বাড়বে। ছেয়ে ফেলবে দেশ।

এই ভয় 'এশিয়াটিক'দের প্রতি অন্যান্য দেশবাসীদের, বিশেষতঃ থার্ডওয়ার্লডের বাইরের দেশেদের। ভীসা যদি বা ভারতে থাকতে থাকতে পাওয়া যায়, বিদেশ থেকে ভারতীয়ের পক্ষে দেশান্তরের ভীসা,—ও—নো! নৈব চ।

অথচ আমার বাসই প্রায় বিদেশে। এবং দেশ দেখা বা ঘোরার প্লানও বিদেশে থেকেই করতে হয়। ভারতীয় দূতাবাস সর্বদাই সাহায্য করতে প্রস্তুত (যদিচ, আজ হ'বে না, কাল আসুন, লেগেই আছে। তা, হোক না কেন দু'শো কিঃ মিটর দূরত্ব ঠেঙ্গিয়ে।) কিন্তু প্রস্তুত হ'লে কী হয়, অন্যদেশের 'ভীসা' অন্যদেশের মর্জির ওপরেই নির্ভর।

ভেনেজুয়েলার ভীসা পেলাম না। দেখা করলাম স্বয়ং কন্‌সালের সঙ্গে। মহিলা বিদুষী হিস্টোরিয়ান, গম্ভীর মূর্তি, যেন সিক্রি ফোর্টের ছাল। বল্‌লেন—"হবে না ডক্টর বাতাশারিয়া। সরি।"

আমি হাসলাম। বল্‌লাম,—"ভেবেছিলাম এমনিতেই হয়ে যা'বে। যাক্‌ সন্ধ্যের মধ্যে পেলেই হল। কাল সকালে প্লেন।"

কনসাল বিস্ময় কাটিয়ে ওঠার আগেই আমি বা'র হয়ে গেছি। যেতে হল পোর্ট-অফ্-স্পেনের হোয়াইট হাউস-এ অর্থাৎ, প্রধান মন্ত্রী ডঃ উইলিয়মসের কাছে। (ত্রিনিদাদের প্রখ্যাত পণ্ডিত, ঐতিহাসিক প্রাইম মিনিষ্টার।) তিনি আমার বন্ধু স্থানীয়। সঙ্গে সঙ্গে ফরেন অফিসের সেক্রেটারীকে বলে দিলেন আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে।

তাঁর সঙ্গে গেলাম। সেবার কফি পান করতে দিয়ে, কনসুল্ ভীসাও দিলেন। আমি হাসলাম। তাঁ'র ফুলোগাল রাঙা হয়ে দ্বিতীয় চিবুক পর্যন্ত রাঙিয়ে দিল।

ঐ তুলনায় পেরুর ভীসা কিন্তু পেয়েছিলাম হাতে-হাতে। কেন যে কোন কোন

'মহামূল্য' দেশের চোখে আমরা ভারতীয়রা তু'-কান কাটা ফকির হয়ে আছি, তা'র হদিস আমাদের করেন অফিস নিলেও নিতে পারেন। এর একটা বিহিত হওয়া দরকার। ক্যুরাসাও থেকে পানামার ভীসা না পেয়ে পথ বদলাতে হয়েছিল (অবশ্য হয়েছিল বলেই ক্যু-বা যাওয়া হয়েছিল। সে কথা অন্যত্র বলা হয়েছে]।

ভেনেজুয়েলা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলার কথা নিয়ে বসিনি। কিন্তু এই যাত্রায় ভেনেজুয়েলীয় নামা-ওঠা অপরিহার্য। তাই—পেরু যাবার পথে কারাকাসে প্লেন বদল করতে হল। সে এক ফ্যাসাদে পড়ার ব্যাপার। যাত্রীদের ওয়াকেবহাল করার জন্য বিষয়টি লিপিবদ্ধ করে রাখি।

কারাকাস ইণ্টারন্যাশনাল বিশাল বন্দর। সুবিশাল। এখানে সব মুদ্রাই বিমান ঘাঁটির এক্সচেঞ্জে বদল হয়, এমন কি সফ্‌ট্‌ কারেন্সি পাল্‌টে হার্ড কারেন্সিও। একটু 'বাট্টা' বেশী লাগে। কিন্তু কাজ হয়ে যায় ভালোই। (তা'বলে টাকার কারবার নেই।)

আমরা পৌঁছালাম বেলা নয়টায় এবং বোলিভিয়ার প্লেন বেলা তিনটায়। বসে অবশ্য এয়ার পোর্টেই থাকতে পারা যেতো; কিন্তু বসে থাকে কে? স্বভাবতঃই শহরে ঘোরাফেরার ইচ্ছা চাপল। বিপদ ঘনাল বাক্স তু'টো নিয়ে। অত বড়ো বিশাল বিমান বন্দরে জিনিষ রেখে যা'বার কোন ব্যবস্থাই নেই। নো ক্লোক রুম; নো লেফ্‌ট লাগেজ্‌।

বহুকষ্টে বিমান ঘাঁটীর লাউঞ্জের একটি ইলেকট্রনিক ও ক্যামেরার দোকানে (নিজেদের জিম্মায়ই) বাক্স তু'টি রেখে ট্যাক্সী নিলাম। বাসও আছে, কিন্তু ট্যাক্সীকে বল্‌লাম, সরাসরি বোলিভার স্কয়ারে নিয়ে যেতে।

এতকাল এই স্কয়ারটাই ছিল কারাকাসের প্রাণকেন্দ্র। চারধারে সেরা দোকান তো বটেই, খেল-খেল্‌নার ফড়েদের সার। আমাদের দেশের মতো হৈ-চৈ এলোপাতাড়ি নয়; নাকে কাপড় দিয়ে ডিঙ্গিয়ে লাফিয়েও যেতে হয় না। বেশ গোছ-গোছালো,—কী পথ, কী পথচারী, কী ফড়ে। কী দোকানী, কী খরিদ্দার।

ওরই মধ্যে ভবিষ্যৎ গণনা চল্‌ছে, ফটো তোলানো চল্‌ছে, পকৌড়া বা সরুচাকলি ভাজা চলছে, চলছে লটারীর টিকিট, হর-বোলার কারামাৎ, ম্যাজিক—আবার টাউট—'সুন্দরী জেনানা চাই?' (আমি না বুঝলেও ছাত্র বন্ধু তিলক বুঝছে এবং আমায় বলছেও। বলাটা ওর সিধে কর্তব্য বলে ও ধরে রেখেছে। ও-যে এখানে আমার দো-ভাষী।)

তবু মাঝখানে সুদৃশ্য স্বর্ণ-মণ্ডিত গম্বুজে শোভায়মান চমৎকার সুষমা স্নিগ্ধ একটি ধবধবে শাদা ইমারত। সে শাদাকে শাদাতর করে তোলার জন্য ভিতরে, বাহিরে, চারিধারে সবুজের তুফান। এই ইমারতে আছে সমগ্র লাতিন আমেরিকার প্রাণ-পুরুষ সাইমন বলিভারের স্মৃতিপূত বহু ছবি, লাইব্রেরী ভরা বই, ইতিহাস গবেষণার কেন্দ্র। সরকারী জলসা, নাচঘর, মিটিংয়ে ব্যবহৃত ঘর। তিনতালা বাড়ির কোন অংশই বৃথা যায়নি।

একটু ঘুরে দেখলে বাইরেই দেখা যায় ভেনেজুয়েলার মন্ত্রীসভা, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারী,

হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্ট—সব যেন থাকে থাকে সাজান। সাজান গীর্জা, গীর্জার সন্তঃ প্রধানের অট্টালিকা।

এ ব্লকটা পেরিয়ে কোণের দিকের পথ ধরে অন্য স্কয়ারটায় (চৌক-এ) ঢুকলেই বোলিভার স্কয়ার টুপী হাতে বোলিভারের অশ্বারোহী দীপ্ত মূর্তি। প্রচুর পায়রা; বড় বড় চারটি ফোয়ারা, প্রচুর বাঁধান অবকাশ আর ট্রপিকাল বন-বনালী, গাছ-গাছালীর ধূম।

আমার পায়ে নেশা। আমি বলি,—"মধু, (তিলকচাঁদকে আমি মধু বলেই ডাকি। ভারী মিষ্টি স্বভাব ওর)। চট করে কিছু খাও। তা'রপর হেঁটে চলি, চল বোলিভারের স্মৃতিপূত সমাধি মন্দিরে। যে-সে সমাধি মন্দির নয়। ঢের কাঠ-খড় পুড়িয়ে এ মন্দির।

যে রেস্তরাঁটা একান্তে অথচ বনিয়াদী রুচিমণ্ডিত সেটি দেখেই মনে হল যে এটির আয়ুষ্কাল খুব বেশী নয়। তখন চারিদিকে চেয়ে দেখে মোটামুটি বুঝলাম, সাইমন বোলিভারের দুইশততম জন্মোৎসবের ঘটা লেগেছে। পথটা ভেঙ্গে যা' গড়া হচ্ছে তা'তে সেই বোলিভার-স্কয়ার থেকে বোলিভারের সমাধি অবধি (মাউসোলিয়ম) বরাবর টালিতে বাঁধান হচ্ছে। দু'ধারে সুসজ্জিত বিপণি। এ পথে ছেলে-বুড়ো-শিশু মেলায় আনন্দে মেতে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি, ছোটাছুটি করতে পারবে। কোনরকম যান-বাহনের উপদ্রব নেই।

খাওয়া সামান্য হলেও প্রলেতারিয়েৎ নয়। খাবার বেলায় আমি দু-পয়সা খরচ করতে ভালোবাসি, কেন না বিদেশে ওষুধ ডাক্তারের খরচের প্যাচে পড়া কোন কাজের কথা নয়।

স্যালাড্, রোষ্টেড্ চিকেন আর আইস্ক্রীম খেতে খেতে মধু জিগ্যেস করলো,—"অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এই স্মৃতি-সৌধ—কেন বল্লেন স্যর?"

"শুনবে? শোনো। বহুবার বলেছি। আবার বোলব। ১৮৩০, ১০ই ডিসেম্বর, বেলা ১টা: বোলিভার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন তিনি বিরক্ত হয়ে স্বেচ্ছা নির্বাসন মেনে নিয়েছেন। অবশ্য পেরু নিমন্ত্রণ করেছিল তাঁকে প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচিত করে। তেমন আমন্ত্রণ এসেছিল কোলোম্বিয়া থেকেও। সকলেই চায় বোলিভার প্রেসিডেন্ট হোন। বোলিভার তাঁদের নিজের হয়ে তাঁদের দেশে এসে বাস করুন।...

"কিন্তু না। বিশাল গ্রাণ-কোলোম্বিয়ার যুক্তরাষ্ট্র রচনার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। পর পর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে, মাত্র পদ-মাহাত্ম্যের আকর্ষণের লোলুপতায়ই তাঁর অতি বিশ্বস্ত সংগ্রামীদেরও পদস্খলন দেখে তাঁর যক্ষ্মা-ক্লিষ্ট মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য দেশের রাষ্ট্রপতিত্বও তাঁকে লুব্ধ করেনি।"

"এখন শুধু নীরবে মরতে চাই। আর নয়।" বলেছিলেন তিনি।

"এতো হতাশা কেন?"

"পুত্রের মতো পরম স্নেহে যে মহান বীরকে তিনি ধীরে ধীরে দেশের বরেণ্য মহাবীর সেনানী করে তুলেছিলেন, সংবাদ এল, সেই জেনারেল আবেল সুক্রে-কে হত্যা করা হয়েছে।"

"কেন তবে অপেক্ষা? গেলেই পারতেন লীমায়। তবে কি মনে মনে আশা ছিল প্রেয়সী গরীয়সী মানুএলা হয়তো শেষ অবধি যোগ দিতে পারে?"

"তখন বোলিভারের কাছে এক কপর্দকও নেই। ছেঁড়া এক জামা প'রে বিছানায় ধুঁকছেন। শোবার খাটটাও একজন দয়া করে ধার দিয়েছে। বাড়িটা এক বন্ধুর। হয়তো স্বাধীনতার পর তাঁ'র পৈত্রিক জমী-জমা আত্মীয়েরা গিয়ে দখল করেছে। তা'রা কি কিছু এই দুর্দিনে তাঁ'কে পাঠাবে না?"

"এর মধ্যে কার্তাজেনায় বিদ্রোহ। খবর এল, তা'রাও বোলিভারকে চায়।"

"যক্ষ্মার শিরায় রক্ত অল্প হলেও তাতে উত্তেজনা দাউ-দাউ করে। মন নেচে ওঠে। আবার পরতে পারবেন য়ুনীফর্ম। আবার চড়বেন তিনি ঘোড়ায়। আবার যুদ্ধের ময়দান। জীবনে বিশ বছর (১৮১১—১৮৩০) ধরে ক্রমাগত লড়াই করেছেন বোলিভার। সম্রাট হ'বার জন্য নয়; মুক্তি দেবার জন্য। সমাজের নিকৃষ্টতম দস্যু, গোচো আদিবাসীদের সংগঠন করে ফৌজ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এই মহানায়ক।"

"কিন্তু শরীর বাদ সাধে। একটিই কাজ এখন তিনি পারেন। নিঃশব্দে মরতে পারেন।"

"কিন্তু আসবে কি মানুএলা? পাবে সে সময়? সে যে বহুদূরে—দরখাস্ত করেছে বোলিভারেরই প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছে; বোলিভারেরই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির কাছে—যদি বলিভারকে, এবং আর্মি কর্নেল হিসাবে মানুএলাকেও, সরকার কোনো পেন্সন দেন।—যদি কিছু পাওয়া যায়।"

"শেষ দিন। ডাক্তার জ্বর দেখছেন। ফরাসী ডাক্তার রেভেরাঁন্দ। হঠাৎ বোলিভার জিজ্ঞাসা করলেন,—ডাক্তার ফ্রান্স ছেড়ে তুমি এলে কেন?"

—"স্বাধীনতার যজ্ঞে সমিধ যোগাতে। আর কেন?"

—"পেলে সে স্বাধীনতা? পেলে কি?"

—"নিশ্চয়ই। আপনি তো আনলেন সে স্বাধীনতা।"

—"অহো, কী ভাগ্যবান তুমি ডাক্তার। তুমি পেয়েছো সে অমৃত-স্বাদ। আমি কিন্তু পেলাম না।…জানো ডাক্তার, স্বাধীনতা বড়ো দামী, মহৎ, ভালো জিনিষ। কিন্তু এতো ভালো, এতো বড়ো নয় যে, জীবনের সবকিছু মোহনীয়কে বিসর্জন দিয়েও এটাকে পেতেই হ'বে। তেমনি পাওয়া কোনো পাওয়া নয়।"…

মৃত্যুর হিম ততক্ষণ হাড় থেকে সোজা বুকে থাবা পেতেছে।

শেষ কলমে লিখে গেছেন—"এতোকাল আমরা যা'রা স্বাধীনতার তালাশ করে বেড়ালাম, কেবল মহাসমুদ্রের বুকে লাঙ্গল চষেই বেড়ালাম।"

"সেই দশ তারিখ ডিসেম্বরে মৃত্যুর পর যখন দেখা গেল 'বোলিভারকে শেষ সজ্জায় সাজিয়ে দেবার মতো বক্রী একটা শার্টও নেই, তাঁর ডাক্তারটি, ডাঃ মুর, তাঁরই নিজের ব্যবহৃত একটি শার্ট গা থেকে খুলে দিলেন। রাষ্ট্রপতির লজ্জা ঢাকা হোল।"

(বাঙ্গালীর কি মনে পড়ে—মাইকেলকে? শিশির কুমার ভাদুড়ীকে? বিলাতে

প্রিন্স দ্বারকানাথ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও রাজা রামমোহনকে ব্রিষ্টলে নিঃস্ব হয়ে মরতে হয়েছিল ?)

সমাহিত হলেন সেই অমর শহীদ। সেটা ১৮৩০ সাল। কিন্তু তারপর একশো বছরের বেশী কেটে গেলো, তাঁর স্বদেশ ভেনেজুয়েলা, তাঁর বাল্যের তারুণ্যের নগর কারাকাস তাঁকে কবর দেবার মতো জমী দিতেও রাজী হয়নি। কত ইলেকশন এলো-গেলো। কত দেশ স্বাধীন হলো তারপর। তারপর দু'-দু'টো মহাযুদ্ধ হয়ে গেলো। এই সে'দিন (১৯৫৬) ভেনেজুয়েলান সরকার সান্তা মার্তার অখ্যাত উপকূল থেকে সেই শবাধার তুলে এনে এই স্মৃতি-সৌধে সসম্মানে স্থাপিত করলেন।

আর এখন পালন হচ্ছে তাঁর দ্বিশততম জন্ম-বার্ষিকী। সারা লাতিন দুনিয়ায়, সারা পৃথিবীতে কী ধূমধাম !

আমাদের কবি বলে গেছেন, মধু,—

"Oh thou History, Old Dame, shut up
thy big mouth !"

(অয়ি ইতিবৃত্তি কথা / স্তব্ধ করো মুখর ভাষণ ওগো মিথ্যাময়ী।)

আমরা মাউসোলিয়মে পৌঁছে গেছি। দূর থেকে তিনটি গম্বুজ দেখা যাচ্ছে লম্বা মীনারের মাথায়। মাঝেরটি পাশের দু'টোকে ছাড়িয়ে অনেকটা উঠে গেছে। পিছনে সবুজে ছাওয়া পাহাড়। সুনীল আকাশে কুমুলাসের ছড়াছড়ি। পথটা দূর নয়, রোদের আঁচের ঠেলায় বেশ দূর লাগছে।

বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠতে গিয়ে দেখি বাইরে এধার ওধার নানা মূর্তি দাঁড়িয়ে। সব পাথরের। এঁরা সবাই কালো পাথরের। এঁরা সবাই বোলিভারের দিকপাল সহচর। দুঃখে-সুখে, পতনে-উত্থানে সংগ্রামের শরীক। জেনারেল পায়েজ, জেনারেল সুক্রে, জেনারেল উদানেতা, জেনারেল রুক, জেনারেল কার্ডোবা, জেনারেল ও'লীরী—সেই জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে এরাই দেশ-বিদেশ থেকে এসে বিপ্লবী বোলিভারের পাশে দাঁড়িয়েছিল সর্বস্ব পণ করে।

"ও কার মূর্তি ? নিগ্রো মনে হোচ্ছে", বললো মধু।

চেয়ে দেখি। বিপ্লবের আড়ালে দেব চরিত্রের এই হেতিয়ান পুরুষটির নাম—আলেকজান্দার পেতিয়ঁ। হেইতীর প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দার পেতিয়ঁ বিপ্লবী বোলিভারের দুর্দিনে বহু অর্থ, জাহাজ, গোলা-বারুদ দিয়ে বোলিভিয়ান বিপ্লবীকে পুষ্ট করেছিলেন। এই সুযোগ, সুবিধা, সাহায্য সত্ত্বেও বোলিভারকে মেনে নিতে হয়েছিল সামরিক পরাজয়। পালাতে হয়েছিল দেশ ছেড়ে। এবং প্রেসিডেন্ট পেতিয়ঁ আবারও সাহায্য করেছিলেন সেই বিপ্লবকে। (যুক্তরাষ্ট্রও সেদিন সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেনি। সে যে হোত বিপ্লবীকে আস্কারা যোগানো ! যুক্তরাষ্ট্র কি এমন বৈমনস্য প্রশ্রয় দিতে পারে ?) পেতিয়ঁ মানুষ চিনতেন। সেই সাহায্যের বলেই সাধন হল এতো বড়ো বিপ্লব। ষোল মিলিয়ন লোক

কেবল একটি মাত্র মানুষের জিদের বলে মুক্তি লাভ করল। বিপ্লবের সাধনভূমে একজন ভৈরবই চক্রকে মাতিয়ে রাখেন। সেই একই এক। বহুও এক হয় তাঁর প্রতাপে।

"ষোল মিলিয়ন! দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশ। সে ক'টা রাজ্য, কতো বড়ো দেশ?"—জিজ্ঞাসা করে মধু।

"লিষ্ট-টা খুব বড়ো। নামগুলো সাধারণ শিক্ষিত মানুষের, 'পুরোনো' দুনিয়ার মানুষের, হয়তো অজানা।"

—"তবু শুনি।"

"শুনবে? শোনো। মেক্সিকো, গুয়াতেমালা, হন্দুরাস, সান্ সালভাদর, নাইকারাগুয়া, কষ্টারীকা, কোলোম্বিয়া, পানামা, ভেনেজুয়েলা, একোয়াদর, পেরু, বোলিভিয়া, চিলি, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়াঙ্গ, ব্রাজিল, হেইতী, সান্তো দোমিঙ্গো এবং ক্যুবো। সব মিলিয়ে গোটা য়োরোপের মাপ। বরং বেশীই বলতে পারা যায়। বিপুল স্পেনের বিপুল শক্তির ডানার প্রতিটি পালক ছিঁড়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেনেওয়ালা এই একটি মানুষ, এই একটি জিদ্।

"চল, ভেতরে যাওয়া যাক।···দেখবে এর দেওয়ালে, ছাদে যুদ্ধের বড় বড় ছবি। গেরিলাদের এই সর্দার সামনাসামনি লড়াইতেও ছিলেন দুর্ধর্ষ। নেপোলিয়নও এমন অবাক করা সেনাপতি ছিলেন না। নেপোলিয়ন ডিঙ্গিয়ে ছিলেন এ্যাল্‌প্‌স্, আর বোলিভার ডিঙ্গিয়ে ছিলেন এ্যাল্‌প্‌সের দশগুণ বীভৎস, দুর্ধর্ষ, সাংঘাতিক বুনো নৃশংস মৃত্যু-তুহিনে ঢাকা এ্যণ্ডীজের করালগ্রাস।"

—"আপনি বোলিভারকে ভালোবাসেন?"

—"না মধু, আমি বিপ্লবকে, যোদ্ধাকে, জিদকে ভালোবাসি। পরিপূর্ণ ত্যাগের দ্বারা যে রিক্ত, তেমন মহান সংশপ্তকের ত্যাগ ছাড়া বিপ্লবকে সার্থক করে তোলার অন্য কোন উপায় নেই।"

বিরাট হল-ঘরের দেওয়ালে, ছাদে, যুদ্ধের চিত্র। এমন চিত্র বোলিভার স্কয়ারের সেই প্রাসাদেও দেখে এলাম। একটি একটি করে দেখি। মধুকেও বোঝাই। বোয়াকা, কারাবোবো, পিচিঞ্চা, জুনীন, আয়াকুচো। যখন যেখানে মোহড়া নিয়েছেন, যুদ্ধ জিতেছেন! বোয়াকায় নিশ্চিত পরাজয় বাঁধা ছিল। মাত্র ব্যক্তিগত মনস্বিতা আর সাহসের জোরে হারা যুদ্ধই তিনি জিতলেন। জুনীনে অদ্ভুত কৌশল দেখিয়ে স্কটিশ ব্যাটালিয়ানের মন জিতে নিলেন। আর, আয়াকুচো,—সে বিজয়ের তুলনা নেই। যাব পিউনা শহরে। তিতিকাকা হ্রদের ধারে। পৃথিবীর উচ্চতম (১২,৬২৭ ফুট) মিষ্ট জলের হ্রদ, দেখতে সমুদ্রের মতো। সেই হ্রদের জলে নানা আদিবাসী আজও খড়ের আঁটির নৌকা গড়ে মাছ শিকার করে।—যাব, সেখানেও যাব। আয়াকুচোর মাটি তিলক করে কপালে পরবে।

মধু উল্লসিত হয়ে ওঠে।

"ঢের হোল, ঠিক সময়ে বিমান ঘাঁটীতে পৌছন চাই। মনে আছে, দোকান বন্ধ হ'লেই বাক্স দু'টো পাওয়া যাবে না? আর যাবার পথে সিটী-সেণ্টার ঘুরে যাব।"

সে'জন্য একটা ট্যাক্সী নিতে হল। সিটী-সেণ্টার খুব সাজানো। বড় বড় ফোয়ারা দিয়ে সাজানো তো বটেই। বিশাল চকের চার-চারটে বড় পথ যেমন পার্কের চারদিক ঘিরে আছে, তেমনি এ পথ থেকে ও পথে যাবার ব্যবস্থাও আছে—কিছু বা তলা দিয়ে, কিছু বা ওপরে পুল দিয়ে; তালায় তালায় থরে থরে সাজিয়ে পথের সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকের দোকানের সার ছেড়ে ওপর দিয়ে পৌছে দেওয়া। পাহাড়ের গা-টাকে কেমন শিল্প-মণ্ডিত করে সাজিয়ে পথ-ঘাট করা। কারাকাসের এঞ্জীনীয়াররা খুব গর্ব করে কারাকাস নিয়ে। সে গর্ব এরা করতে পারে।

পথে বিপুল ট্রাফিক। সে জন্য বড় বড় লম্বা-লম্বা ফ্লাইওভারের জঙ্গল যেন জিলিপীর প্যাঁচ খেলিয়ে ছড়িয়ে আছে। এমন একটা জটা নয়; কয়েকটাই কুণ্ডলী। আর সেই পথে 'ওপরে উঠলে নীচে যা' দেখা যা'বে তা' ফোয়ারা, বাগান, সাজানো পথ, নিরাপদ বেড়াবার জায়গা।

বিমান-ঘাঁটীতে পৌছে বাক্স দু'টি হস্তগত করা গেল। তারপর টাকা ভাঙ্গিয়ে কলম্বিয়ার মুদ্রা সংগ্রহ করে নিলাম। তবে শুনলাম, ভেনেজুয়েলান "বোলিভার" নামক মুদ্রা এই খণ্ডে মোটামুটি সর্বত্র চলে। এক ডলার-এ তখন ২৩।২৭ বোলিভার। খুবই সাংঘাতিক ইনফ্লেশন।

বড় গাছের তলায় ছোট গাছ বাঁচে না। জগদ্দল ঢাউস স্কাই-স্ক্রেপারের তলায় বাতাসের বিক্রম যেন ঝড়। মানুষকে-মানুষ উড়িয়ে নিয়ে যাবার নজীর আছে এই বাতাসের।

খুব বড়ো হুম্‌দো জাঁদরেল দেশের কাছাকাছি চুনো-পুঁটী দেশদের বাঁচতে গেলে 'করদ', 'বশম্বদ', বা আজকালকার পরিভাষায় 'মিত্র' হয়ে থাকতে হ'বেই। নৈলে গ্যাছ; যা'বে।

এশিয়ার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে এ সত্য 'দাঁত-কপাটি' মেরে জাহির হয়ে পড়ে আছে। ভিয়েৎনাম, কাম্পুচিয়া, লাওস্ থেকে—কী বা ফিলিপাইন, কী বা বাংলাদেশ, কী বা কোরিয়া, কী বা পাকিস্তান। পশ্চিম এশিয়ার কুরুক্ষেত্র কতোকাল ধরে চলছে? আমরা যখন ছেলেমানুষ—সেই ১৯০৮ থেকে—'ইস্রায়েল' নামটাকে কেন্দ্র করে যে ধোঁয়াটা আরব আকাশে ছড়িয়ে দেওয়া হলো ১৯৪৮ হ'তে না হ'তে বৈজ্ঞানিক চাইম্ ওয়াইজ-ম্যানকে কৃতার্থ করে দেবার অজুহাতে সেই মেঘ—ধোঁয়া-ধোঁয়া-মেঘই ডেকে আনলো। সর্বনাশ আরবে আজ ঘরে ঘরে সর্বনাশ। দু'-দু'টো বিশ্বযুদ্ধতে যত না মানুষ মরেছে, মানুষের সর্বনাশ হয়েছে, শুধু বড় দৈত্যের ছায়ায় ছোটো মানুষের থাকার নীতি অনুযায়ী,—তার ঢের বেশী লোকক্ষয়, ধনক্ষয় হয়েছে, হয়ে চলেছে এই সব ছোট দেশে। অথচ এ বছরগুলোতে নাকি বিশ্বযুদ্ধ নেই। শান্তিঘট নাকি ঠেসে ধরে বসানো আছে হাড্‌সন্ নদীর কিনারে, নিউইয়র্কে।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরের খণ্ডটা স্পানিয়ার্ডরা নিউ গ্রানাদা-ই বলতো; এখন তা' ভাগ হয়ে গেছে ঐ বড়োর ধারে ছোটোর থাকার দায় পোয়াবার ফলে। পানামা, ভেনেজুয়েলা,

একোয়াদর, বোলিভিয়া, কোলাম্বিয়া—সবটা মিলিয়ে ছিলো নিউ গ্রানাদা। নিউ গ্রানাদা ছিলো বিপ্লবী বোলিভারের স্বর্ণ প্রতিশ্রুতি—মানস সন্তান, দক্ষিণের যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যমণি। বোলিভারের নির্বাসন ও মৃত্যুর পর এই নিউ গ্রেনেদা ধীরে ধীরে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলো মাৎস্যন্যায়ের মাৎ-করা ফেরে। টুকরোকে গিলে ফেলা সহজ।

এতো কথা বলছি কেন? অনেকে প্রশ্ন করেন.—'হ্যাঁ মশায়, বাপকে পয়সা-ভী-নয়, নিতান্ত আপ্‌না পয়সায় কোথায় লণ্ডন, ওয়াশিংটন, প্যারী, সানফ্রান্সিস্‌কো, রায়োডিজেনেরো, টোকিও ঘুরবেন,—না যত্তো সব হ্যাট-টাই বর্জিত দেশগুলোয় ঘোরেন—কী পান?'

প্রশ্নের জবাবে বলতে ইচ্ছে হয়,—'ভাইগ্যের ভাইগ্য চক্ষু রত্ন বাইচ্যা গেছে!' ভাগ্যে আমার যাত্রাগুলি ফুলব্রাইট, পুলিংজার, কলম্বোপ্লান, কালচারাল মৈশনিক গ্রাণ্ট-গ্রন্থীবদ্ধ হতে পারেনি, তা'ই নিগ্রন্থীদের মতো ভাগ্যবন্ত হয়ে সর্বত্র অবাধ ঘুরেছি। এখনও ঘুরি।

এ তল্লাটে ঘোরার প্রবল বাসনা এল ত্রিনিদাদ বাসকালে। ১৯৫৭ থেকে বাস ১৯৮৮ পর্যন্ত এক নাগাড়ে। সেই সময় পড়লাম বোলিভারের জীবন। যেন মত্ত হয়ে গেলাম। এই সর্বস্বপণ করা মহাজীবনটি কিসের প্রেরণায় মুখের 'সোনার-চামচ'—শুধু ফেলে দিয়ে নয়,—বিক্রী করে সমগ্র স্পেনকে প্রতিপক্ষ করে বিশাল মহাদেশ দক্ষিণ আমেরিকাতে স্বায়ত্বশাসনের মুক্তি এনে দিলেন; ভাবি—আর মনে মনে ইচ্ছার মুকুলগুলি পুষ্পিত ইসারায় কেবল বলে, 'বেরিয়ে পড়ো তীর্থ-ভ্রমণে। মাথায় তিলক পরো আয়াকুচো, বোয়াকা, জুনিন-এর মাটি।' কিন্তু এ'গুলি তো সবই নিউ গ্রানাদায়, পেরুতে।

সেই যে বোগোতাকে মুক্তি দেবার জন্য বোলিভার এ্যণ্ডীজের বিশ হাজারী গিরিশৃঙ্গগুলোকে চ্যালেঞ্জ দিলেন,—বিশাল দু'টী নদী মাগদানীলা আর কারণীর ধারা ধরে চল্‌লেন,—জয় করলেন বোগোতা,—এ সব ভাবতেও আমি নাড়া পাই। মনে পড়ে সেই যুগান্তকারী বোয়াকার যুদ্ধ; মাগদালীনা নদীর জলা; কারণী নদীর বীভৎস প্রপাতগুলো; এই নামগুলো যেন আমায় টানতো।

ভাবতাম বোগোতায় যেতেই হ'বে।

বোগোতা

—প্লেন থেকে দেখছি, কেবল জঙ্গল। এদেশের ৮০ভাগই আজও অরণ্য-গ্রাম-জলা। এদেশের জনসংখ্যার ৮০ভাগই অ-শ্বেত (ক্রিওল=শাদা+উপনিবেশিক শাদা, বা শাদা+নিগ্রো; মেস্তিজো=দেশীয়+নিগ্রো, বা শাদা+নিগ্রো।) এ সব অশ্বেতদের মধ্যে দেশীয় ভাষার প্রচলন অবাধ। ৮।১০টি ভাষা বলে, কৌম হিসাবে। কলম্বিয়ার স্পানিশের তথা কাথলিক ধর্মের 'নাম' আছে। এ স্পানিশ নাকি আস্ত কাথলিক থেকেও আস্ত! মাঝে মাঝেই নদী; নদীর জাল। কোনটাই ছোটো নয়। সন্ধ্যা হ'তে তখনও আড়াই ঘণ্টা। সবই জল-জলে পরিষ্কার। হঠাৎ বড় একটা নদী, কারণী। তা'রপরে, কয়েক

নদীর বালিতে সোনার খোঁজ

ব্যাঙ্কিং: অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
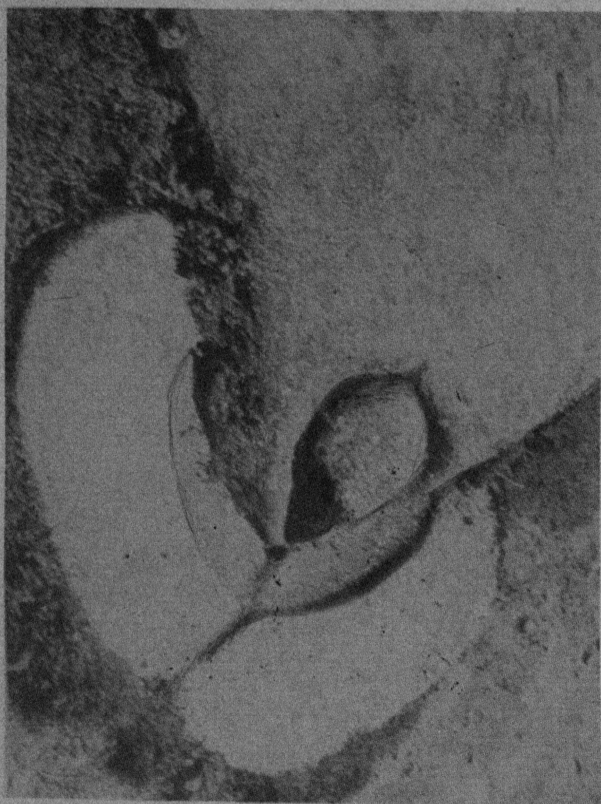
য়াচু পিচুর 'শক্তিপীঠ', (যোনিমুদ্রার স্পষ্ট প্রতীক বলির রক্তে ধোয়া হতো এই পীঠ যোনি বর্ণিকা ধৌত করে রক্ত নীচের মণ্ডলে পড়ত)

'সান্তামারা' নৌকায় কালাণ্ডো-র মাঝি রামিরোজ

মিনিট পরে বেতারে স্পীকার বার্তা বিঘোষণ: "মাগদালীনা নদী পার হয়ে এখন পশ্চিম কার্দিলেরা শ্রেণী পার হ'চ্ছে। এ্যাণ্ডীজ গিরিশ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে দুরতিক্রম্য অংশ। দিগন্ত পর্যন্ত বরফ ঢাকা। এই বরফ পার করে বোলিভার চার হাজার সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন দিনে-রাতে পাঁচ দিনে!" শুনছি! গা শিউরে উঠছে। রক্ত কণিকাগুলো লাফাচ্ছে। হঠাৎ ঘোষণা—'বেল্ট-টা বাঁধুন। বোগোতা এসে গেলো! বল্‌লো না 'বোয়াকা' এসে গেল।

বোগোতোর বাজার দেখলে কেউ বলবে না 'বোয়াকা এসে গেলো।' সকলে ভুলে গেছে বোয়াকা। কলম্বিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধে বোয়াকার যুদ্ধই চূড়ান্ত যুদ্ধ। সে-দিনের সেই সংগ্রামী যৌবন ফুরিয়ে গেছে।

গাছের তেজস্বিতা কমে গেলে ধরে ফাঙ্গাস; দেহের তেজস্বিতায় ঘাটতি পড়লে ধরে ক্ষয়। জাতির তেজস্বিতা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ধরে নেশা; —মদের, জুয়ার, আলস্যের, বিলাসিতার। এই নেশার পথ বেয়ে আসে অনুকরণের, স্তাবকতার প্রবৃত্তি।

মাৎস্যন্যায়ে ছোটো মাছকে বড়োয় খায়। এবং যে দেশই (জাতি—ইচ্ছে করেই বলবো না) ঔপনিবেশিকতার কুষ্ঠে ক্লিষ্ট, সে সু-মনা হয়ে সেঁদুলেও রোগ না ছড়িয়ে পারে না।

এই ছড়ানোটা সহজ হয়ে আসে বেসাতি করে, বাণিজ্য করে। দেশের ফল তুলে নিয়ে গিয়ে পরিবর্তে দেশান্তরের ফলের ছোবড়ার ফেরী করা।

কলকাতার গরিমা চাপা পড়ে গেলো আবর্জনার স্তূপে: বস্তুর আবর্জনায়, বর্জিত-পরিত্যক্ত জীবনের আবর্জনায়, বাস্তু-হীনের বিস্তৃতির আবর্জনায়। এটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। ঔপনিবেশিক আবর্জনার মূলসূত্র সখের বিবৃদ্ধি সঞ্চারিত করার আবর্জনা; অনুকরণ জাত আবর্জনা, অপ্রয়োজনের পাহাড়ের আবডালে প্রয়োজনের সঞ্চয়কে সরিয়ে ফেলা; বাণিজ্যের বিনিময়ে দেশের মূলধনকে সরিয়ে বিদেশের শিল্পিত জঞ্জালকে স্তূপ করে তোলা।

বোগোতার বাজার ভর্তি সমৃদ্ধি। এপার-ওপার সমৃদ্ধি যা'কে বলে। কিন্তু এর কিছুই বোগোতোর নয়। বোগোতোর বাজারময় পা-ছড়িয়ে বসে হাট করছে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ক্যানাডা। থার্ড ওয়ার্লড্ দূরে থাক, দক্ষিণ আমেরিকার লাতিন কৃষ্টিতে জাত-পণ্যও বড়ো দেখা যায় না। 'কলম্বিয়া-মেড্' বস্তু নেই তা নয়; আছে। যেমন,—চামড়ার বস্তু, ঘোড়ার জীন ও জীন সংক্রান্ত ব্যাপার, টুপী, বেতস-শিল্প, কিছু কিছু চিত্র-বিচিত্র ট্যুরিষ্টদের মন ভোলানো বস্তু। বাকী সবই বিদেশী পণ্য। উল, পশম, আলপাকা কুটীর-শিল্প বলে যা বিকুচ্ছে; যা বিকুচ্ছে সোনা, রূপা, পান্না বলে—তা'র সিংহ ভাগই ঐ মূলধনে ধনী রাষ্ট্রের কবলে। এখন আবার কবলেরও বড়ো কবল এসে জুটেছে—জাপান।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরতে না বেরুতে একজন ধরেছে। হোটেল। বিদেশে

বাজে হোটেলে পদে পদে বিরক্তি, বাধা। জিনিষ-পত্রের সাবধানীত্ব সম্বন্ধেও চিন্তা থেকে যায়।

এই বাবদে হোটেল 'স্যাভয়' ভাল। নাম দিয়েই বোঝা যায়, এরা ইংরিজী বলবে। ঘরে বাক্স দু'টি কোন রকমে রেখেই সোজা বাইরে। বেশ গরম। মধুকে বলি, "আগে খেয়ে নিই ভাল একটা রেস্তরাঁ দেখে। এ হোটেলে খেতে বসলে পেরু পৌছানো আর হ'বে না।"

—"কিন্তু গরম লাগছে যে স্যার। বেশ গরম।"

—"তবু আছ সাড়ে আট-হাজার ফুটের মাথায়। এটা কার্দিলেরার পশ্চিম দিক। একটু খাস্তা মুচমুচে লাগলেও, কার্দিলেরার পূর্ব কিন্তু স্যাঁতস্যেঁতে। চল, খেয়ে নেওয়া যাক। পরে শোবার আগে স্নান করা যাবে। ঘুম হ'বে ভাল।"

ঝলমল করছে পথ। আরও ঝলমল লাগছে, কারণ শহরের বড় বড় পথগুলো (এ্যাভেন্যু বোলিভার, এ্যাভেন্যু সান্তেন্দের আর প্লাজা দ লা কনস্তিত্যুসিয়ঁ) নদীর ওপর সেতু দিয়ে বয়ে গেছে। নদীর নাম ফুম্‌জা। মনে করিয়ে দেয় প্যারীর সাইন, মস্কোর মস্কোভী। কিন্তু সে তুলনায় ফুম্‌জা ছোটো নদী, যেন আমস্টার্ডামের খাল। দু'টো পাহাড়ের সারের মাঝে এই উপত্যকা, সমুদ্র থেকে ৮৫০০ ফুট উঁচু। প্রায় মেক্সিকো সিটীর উচ্চতা। কিন্তু পাহাড়ের গা বেয়ে বহু জলধারা নেমেছে। বড়োটি ফুম্‌জা। সব নদী এক হয়ে সান-ফ্রান্সিস্কো নদীতে মিলেছে। মেলার আগে হঠাৎ ঝাঁপ দিয়েছে ৪৭৫ফুট। সুন্দর এই জলপ্রপাতটির নাম তেকোয়েন্দেমা। চমৎকার সাজান এই জলপ্রপাতটির চার-ধার। দেখবার মতো। (মনে পড়ছে 'জোগ,' 'তেন্‌কাসী', 'টাণ্ডা' জলপ্রপাত। আমরা এ বাবদে কেন এত উদাসীন? কেন সাজাতে জানি না? জীবন চপল-হ'তে পারে। কিন্তু চাপল্যকেও তো সুন্দরম্ সত্যম্ করা যায়? জাতি, দেশ সম্বন্ধে অভিমান থাকার একটা গুণময় দিক অবশ্য আছে)।

এছাড়াও পাহাড়, অধিত্যকা, উপত্যকা মিলিয়ে কয়েকটি স্বাভাবিক হ্রদও আছে বোগোতা শহরের আশেপাশে। পিকনিকে যাওয়া এ দেশবাসীর একটা সহজ বিলাস।

আমরা চলেছি কনস্তিত্যুশিয়ঁ প্লাজার পথ ধরে। পথের ওপরেই স্যাভয়, একটু গলির মধ্যে। একটু চলতে না চলতে বিজলীবাতির প্রভায় উদ্‌ভাসিত দেশের মহামান্য ক্যাপিটল, স্পানিশ গ্রাস থেকে মুক্তি যাঁরা দিয়েছিলেন, তাঁ'দের অমর স্মৃতি ধরে আছে। আর আছে বিখ্যাত ক্যাথীড্রাল।

—"দেখছেন স্যার, ক্যাথীড্রালের মহিমা? রাজবাড়ীকেও হার মানায়। এটা কিন্তু স্পানিশ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।"

হঠাৎ চুপ করে থাকায় মধু শংকিত হল। ভাবল, যথারীতি তার স্যর 'খচিত' হয়েছেন।

না, অতোটা না হলেও হয়েছিলাম।

—"মধু, রাতের ভীড় ঠেলে নতুন জায়গায় সব-সে সেরা স্কয়ারে ঘুরছি। পাদ্রীদের

দু'চার জনকে দেখতে পাচ্ছো। পোষাকে মালুম। কিন্তু সাধারণতঃ পাদ্রীরা, অন্ততঃ পোষাক পরে রাতে তাঁ'দের আশ্রম ছেড়ে বা'র হ'বেন না—এই-ই রীতি। অথচ বা'র হয়েছেন—হচ্ছেন। এসো, বেঞ্চে না বসে ক্যাথীড্রালের সিঁড়ির ধাপে উঁচুতে বসি। বেশী দেখা যা'বে।"

বেশী দেখা গেলোও। না দেখলেই পারতাম। দেখেছে মধুও। ওদের যা' চাঞ্চল্য, যা লাস্য যা ঝিকিমিকি চাল ও চলনের মদিরতা,—না দেখি, সাধ্য কী!

বল্লাম—"চেনো ওঁদের?"

—"ওঁদের? না স্যর। ওঁদের চিনবো কী করে?"

—"কেন? যৌবন দিয়ে। আমার যা নেই।...ওঁরাই সক্রেটিক আমলের হায়েত্রা, ইন্দ্রের আমলের অপ্সরা, মৌর্য আমলের বারাঙ্গনারা। এঁরা এ সভ্যদেশের ভগবানের পাদপীঠে কিলবিল করছে সমাজের নৈতিক তরণীর কর্ণধারিণী হয়ে।"

"সমাজেব নীতির অভিভাবিকা এরা? কী যে বলেন স্যর!"

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মধু।

"এরা মনে করে তা'ই। সংস্কৃতে বলি গণিকা, টাকা গুণে নিয়ে দেহ পণ্য করে। অথচ চার্চ-মন্দির-মঠাধীশরা মনে করে এরা নরকের দ্বার। তবুও দেখ পৃথিবীর সভ্যতায় সেই ইন্দ্র-সভা এবং সলোমন-সভা থেকে নিয়ে বাবিলন, নিনেভা, মিশর, ক্রীট, ভারতের সব প্রসিদ্ধ মন্দির-সভ্যতা, মন্দির সংস্কৃতির মধ্যে দেবতার প্রসাদ আর মানুষের ভোগ এই একটি ক্ষেত্রে মিলে মিশেই আছে। যত্র দেবালয়, তত্র এই বারাঙ্গনারা।"

—"আপনি বলছেন?"

—"নাই বা বল্লাম। কতো সজ্জনই তো চুপ করে থাকেন, চোখ বুঁজে থাকেন, কানে আঙুল দেন। তুমিও অমনি কিছু কর।...নয় তো এগিয়ে যাও। ওরা সঙ্গ নেবে, সঙ্গ দেবে। এই জন্যই ঘুরছে।"

—"কী করে বুঝলেন স্যর, ওরা তা'রা?"

"মোপাসাঁ পড়োনি? পড়োনি ফ্লবেয়ার, জোলা, বালজাক? এই সে' দিনের ষ্টেইনবেক? মোরাভিয়া? তা'তে এই সব জেনানাদের ঘোরাফেরির, পোষাক-আশাক চাল-চলনের বর্ণনা আছে। লেখকদের তো প্রতি রোমকূপেই চৈতন্য প্রবাহ।...কিন্তু সে কথা বলছিলাম না।"

—"কী বলছিলেন?"

"কাল সকালে এ চার্চে আসব। যাচ্ছি পেরু। বহু চার্চ দেখব। ভেনেজুয়েলায়ও তা'ই। সর্বত্র দেখবে এইসব ক্যাথীড্রালের এক 'অবসেশন' (মোহাচ্ছন্নতা) নারী, অন্য অবসেশন সোনা, অর্থ, দ্রব্য। বেদের যজ্ঞেও দু'টি অবসেশন্ পাবে। সুরা আর সোম। মিলিটারি, গভর্নরের হাউসের মতো এই ক্যাথীড্রালগুলো গড়া। ইম্পিরিয়লিজ্‌মের একটি ধাম। ইম্পীরিয়ল ডমরুর দু'টি দিক: সরকার আর বিশপ।—কখনও ভুলো না।

কতো যে সোনা, জওহারাৎ এই সব দেবতার দেউলে ঢালা, ক্যাথলিকদের আখ্ড়ায় না ঢুকলে বোঝা যায় না।"

"হ্যাঁ, দেখেছিলাম মেক্সিকোয়।"

"তাও তো দেখনি স্পেনে, রোমে। মাদীরা দ্বীপের শ্রেষ্ঠ ক্যাথীড্রালে গিয়ে আমি 'হাঁ' হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার 'মা' ছি-ছি ক'রে বেরিয়ে এসেছিলেন। অতো ঘটা, সাজ, জড়োয়া, সোনা—ও তো 'কলি', দেবতা কোথায় ?"

উঠে বাজারের দিকে এগুলাম। ক্লান্তি বোধ করছি। সারাদিন ভেনেজুয়েলার কারাকাসে ঘুরে এখন বোগোতা। প্লেনে চড়ার এক ক্লান্তি এবং অবসাদ আছে। লোকে বলে 'প্লেন—ল্যাগ'। কী বলে বুঝি না। এটা বুঝি যে, প্লেন যখন আমাদের পেটে ভরে নিয়ে বিপুল বেগে ছুট দেয়, তখন প্লেনের গতিবেগ ও আমাদের দেহের গতির বেগ একই ভাবে ছুট লাগায়। যদিও আমি দেখছি, আমি স্থিতিতেই আছি, চেয়ারে উপবিষ্ট ; কিন্তু এ স্থিতিটাই যে গতিকে আশ্রয় কোরে।···প্রকৃতিই শরীরের অণু-পরমাণু স্নায়ুতন্ত্রী-গুলোকে একটা ছন্দে বেঁধে দিয়েছে ; সে'টাই দেহের সমষ্টিগত বাঁধনের সুর। এই লৌহ-গরুড়ের পেটের মধ্যে সেই 'অবস্থিত-গতি' বাধিয়ে দেয় স্থিতি আর গতির মধ্যে সংঘাত। যখন সেই গরুড়ের পেট থেকে পরিচিতা পৃথিবীর কোলে ফিরে আসি, পরিচিতা প্রকৃতির সহচর হই, তখন—সেই সংঘাতের ক্লেশ বিষণ্ণ করে দেয়। বিষাদ আনে সেই ক্লান্তি।

একটা ভালো রেস্তরাঁ দেখে ঢুকে পড়লাম। পনীর আর মাছের একটা বেক্—এ মাছ এদের সেরা মাছ। কী নাম যেন বল্লো! পাহাড়ী ঝর্ণার মাছ। মনে হোল ট্রাউট খাচ্ছি।

মাছই খাই বিদেশে। বেশীর ভাগই মাছ। পাখির মাংস বলতেই ; কিছুদিন পরে বড়ই একঘেয়ে লাগে। দেশে হলেও লাগত। কিন্তু দেশে তো রান্নার নানা বিধি, নানা মশলা, নানা ফৈজত। যেমন,—কাবাব, নয়তো টিক্কা, নয়তো মুসল্লম্। 'রোগন জোষ' বলছি না, সে রান্নার তরীবৎ ঢের। কিন্তু মশলা থাকলেই কিছু ব্যবহার করা যায় না। মশলাদের হাব-ভাব-চরিত্র মেল-মিলাপ খুব গভীর পর্যন্ত জানা না থাকলে টিক্কা, শাহী কাবাব, শিক্কাবাবের বৈচিত্র্য রাখা দায়। ওদের দেশের রোষ্ট বা বেক বা ফ্রাই প্রায় একই রকম। 'মশলা' বলতে আমরা যা বুঝি ওরা তা বোঝে না। অথচ মোটামুটি ভালো স্বাদও আনে। তবে কিছুদিনেই যেন সব একঘেয়ে হয়ে যায়। সেই একঘেয়েমি দূর করে ছু'টি বা আড়াইটি প্রথায়। এক, প্রতি ডিস তো বটেই, বিভিন্ন মাছ বা মাংসের নাম গোত্র হিসাবেই বিভিন্ন তারের মদ্য পান করার বিধি। (ও বিষয়ে আমাদের প্রবেশও নেই।) দুই, বিভিন্ন 'সস্' বা আনুষঙ্গিক কাঁচা তরিতরকাররি সংযোজন। আর তা'রপরে বৈচিত্র্য এনে দেয় টেবিলটি সাজানোর পদ্ধতি। এগুলি পশ্চিমী দিয়েই খানাঘরের রসনার ও রসের আভিজাত্য।

মাছের ঝাল সর্ষেবাটা কাঁচালংকায় সহবাসে কখনও ক্লান্তিকর বোধ হয় না। কেবল

নুন-হলুদে মেখে ডুবো সর্ষের তেলে ছাঁকা রুই মাছ ভাজায় অবসাদ কে কবে পেয়েছে? চিংড়ির বা পাবদার পাতুড়ি, ইলিশের দম-সেদ্ধ, চেতলের পেটির তেল-ঝাল, ভেটকির দৈ-মাছ;—তা'র কী তুলনা আছে? এ যেন নামেই ট্রাউট। ভাজাটা যদিও মুচমুচে। কিন্তু ক্লান্তিকর সেই জলপাই তেলের স্বাদহীনতা, এবং মাছ যে মাছ, সেই অনিবার্য (নিশ্চয়ই নিবার্য, কিন্তু নিবারণ করছে কে?) গন্ধটি রয়ে গেছে। পরাশরও সহ্য করতে না পেরে মৎস্যগন্ধাকে পদ্মগন্ধায় বদলে দিয়েছিলেন। (কী ভাবে কোন্ মশলায় করেছিলেন, তা' মহাভারতে লেখেনি।) কিন্তু বিদেশে খাদ্য নির্বাচনে বহু সময়ে পক্ষী বা মেষের জায়গায় এই মাছই বেশী সহজ বলে মনে হয়েছে। আমি গাঙ্গেয় সমতটবাসী ব'লেই কি?

এই দেশের ইন্‌কা বা আদিবাসীদের ব-দৌলত এরা রান্নায় মশলা না দিলেও নানা মশলা দিয়ে মাছ (মাংসও) মেখে চাপা দিয়ে রাখে। অনেক লেবু, অনেক রকমের লেবু (লেবুর সংস্কৃত কি? ফলটা তো বলতে গেলে বীজহীন—মানে বীজ থেকে গাছ কখনও হ'লেও ফল হয় না-ই বলতে গেলে।) এই সব লেবুর নানা গন্ধ, নানা রং (!)। নওরঙ্গী, নবরঙ্গী, নারেঙ্গীও তো লেবু। এই রস দিয়ে ওরা মাছ ধোয়, যেমন নুন-হলুদ দিয়ে মেখে তেমন তেমন মাছ আমরা ধুই। ফলে, একটা অন্য গন্ধ আসে।

তবু মশলা এবং মৎস্য-মাংস সংস্কারের ধারা আছে তা'ই 'দেশজ' প্রথায় রান্নার স্বাদটি বেশ লাগে। এরা যত্ন করে দিল সবুজ কোন শাকের ক্বাথে রান্না ঐ ট্রাউট, আর মিষ্টি ভুট্টার দানা বেটে তা'র সঙ্গে নানা মশলা দিয়ে রুটি, নাম তর্ত্তুলা। নরম তুল্‌তুলে এবং মিষ্টি স্বাদের। গমের রুটির চেয়ে ভাল স্বাদের। (পাকা ভুট্টার দানা তা' বোলে নয়)। এরা আগের দিনে কাঁচা সতেজ রসালো দানা ভিজিয়ে রেখে পরের দিনে খুব মিহি ক'রে বেটে নিয়ে রুটির আকারে তাওয়ায় সেঁকে নেয়। এদের শিল-নোড়া খুব মজার। পাতা-শিল; দ্রাবিড় চৌকো পাথরের গর্তে ঢোকানো নোড়া নয়। তবে শিলটার মাথায় একটু ঘোমটা টানা, আর পেটটা যেন নৌকোর মতো মাঝ দাবানো। খুব বড়। নোড়া চ্যাপটা ও ভারী। খাড়া ক'রে ধরতে হয়।

হোটেলে ফিরলাম আরও আধা ঘণ্টা বাজার ঘুরে। খুব ভীড়। খুব ব্যস্ততা। নাচঘরের সামনে বা সিনেমার সামনে যথারীতি ভীড়। ভীড়াভ্যস্ত ভারতীয় দৃষ্টিতে সেটা উল্লেখযোগ্য নয়। ভীড় চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম বাসের আড্‌ডায়। ঐ ভীড় দেখতে ভালো লাগে। কতো লোক উঠছে, নামছে; কেউ ঘাগ ঘুরণ-নবীশ, কারুর রোজনামচার ওঠা-নামা; বাসের নম্বর থেকে ওঠা-নামার নাড়ী-নক্ষত্র জানে। নামছে, উঠছে, ঠেলছে—যেন ও সব চক্রভেদের কুলুজী করতলগত /……কিন্তু কেউ আবার ভীরু, শংকিত। 'পদে পদে গুপ্ত সর্প ক্রূরফণার' ভয়। কারুর ভয় যে, সে হারিয়ে যাবে। কারুর ভয় ছোট মেয়েটা আর ছেলেটাকে নিয়ে; যদি হারিয়ে যায়—ছাড়াছাড়ি হয়। একটু এগোয়, দু'বার পেছোয়। মজা লাগে 'দিশী' গেঁয়ো মানুষটি, আর তার তিন-চারতলা ঘাগড়া আঁটা ফেল্‌টের

টুপী ঢাকা দেওয়া, ছোট্ট মাপের গিন্নীটিকে দেখে। গিন্নীকে সে যতো তুলে দিতে চায়, গিন্নী ততো পিছনের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে, বর কি তাকে এই ঘোর বয়সে বাতিল করে দেবার তালে আছে?—বেশ লাগছে দেখতে। 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। মানুষ, সর্বত্রই তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্।

সামনেই বিরাট আলো জ্বালিয়ে আসর মাৎ করছে এক আইস-ক্রীমের দোকান। দাঁড়ালাম গিয়ে দোকানে। লম্বা কাউণ্টারের মধ্যে টেবিলে গেঁথে রাখা ষ্টেন্‌লেস্ ষ্টীলের ঢাউস ঢাউস নাদাপেটা জাগ। নানা রঙ্গের আইস-ক্রীম ওর মধ্যে। কে, কী বস্তু জানতে চাও—নিতে চাও সামনে দেয়ালের দিকে চাও। কেউ আনারস, কেউ পেস্তা-আখরোট, কেউ চকোলেট, কেউ ভ্যানিলা বা রাস্‌প্‌ বেরী, কেউ বা কলা, কেউ আবার নারকেল। দামও লেখা।

আরও মজা লাগে—আমি তো নির্লজ্জ বুদ্ধুর মতো চেয়ে দেখি নানা বয়সের স্ত্রীলিঙ্গের আইস-ক্রীম খাওয়া। "ওদের দেখি? তা দেখি ছাই। দেখি 'ওদের জিভের রং। দেখতে খুব 'ইন্‌টারেস্টিং' (ইণ্টারেষ্টিং-এর বাংলা কি?) লাগে। জিভের রং, নানা আভার (টোন্)। গোলাপী বা লাল কমই, ফালসা রঙ্‌ই বেশী, স্রেফ লিভার-কাটা কালো রংও আছে, আবার যকৃতের রঙ্‌ও আছে। বোধহয় তামাকু (পাইপে), সিগারেট, মদ খাওয়ার তারতম্য ছাড়া, যকৃতের দোষও এই রং-দার তামাশার খেল্ দেখায়।

আবার আইস্ক্রীমের 'কোন্'-টা হাতে পেয়ে কে কেমনভাবে খাচ্ছে, সেটাও পরম লক্ষণীয় বিষয়। কেউ কামড়ায়, কেউ চাটে, কেউ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দুর্গ আক্রমণ করার ভঙ্গীতে হঠাৎ বিদ্যুতের মতো হামলে পড়ে, কেউ দার্শনিক অবসন্নতার সৌকর্যে ধীরে--দেখে, পর্যবেক্ষণ যাকে বলে;—আঁচ করে চাটে; কেউ বা হঠাৎ কোনো বাহানায় অন্যের ভাগে হামলা করছে।

আমরা দু'টি কাপ নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি। অনেকের মতো চামচ দিয়ে খেতে খেতে পথ চল্‌তে চল্‌তে একটা গলিতে ঢুকি।

একটু চলার পর বুঝি ভুল গলিতে [এখানে বলে "কাল্লে" (calle), বোধকরি "গলি" বা "গল্লি"র পূর্বপুরুষ] ঢুকে পড়েছি। তা' আমাদের আর 'ভুল' কি? যেখানেই যাই ঘোরা—আর ঘোরা; ঘুরতেই তো আসা।

কাপ শেষ হয়েছে। একটি সুন্দরী মা, মেয়ের হাত ধরে আমাদের যা' জিগ্যেস করল ভাষাটা না জানলেও বুঝলাম যে, জানতে চাইছে, "হোটেল মারিল্লো" কোথায়?

গম্ভীরভাবে ইশারা করলাম, সঙ্গে এস। আমরাও যাচ্ছি। বলেই, মেয়েটিকে টুপ্ করে কোলে তুলে নিলাম। মেয়েটা অবাক। সে বিস্ময় তা'র কাটতে না কাটতে পকেট থেকে একটুকরো চকলেট বার করে দিলাম তাকে। ওঃ! "হাজার লোকের কণ্ঠধ্বনি সবার উপরে'—সে হাসি।

এই হাসিই বার-বার জীবনে দেখতে চেয়েছি। পেতে চেয়েছি। এরাই বিধাতার আশীর্বাদ। 'নন্দনের এনেছে সংবাদ'।

মা চলছে সঙ্গে সঙ্গে। একটু বিব্রত। বুঝতে পেরেছে আমরা পরদেশী, পরভাষী। কিন্তু 'ভদ্র' বলেই মেনে নিয়েছে, বোধকরি।

গুম হয়ে গেছে মধু।

ওদের পৌঁছে দিলাম যথাস্থানে, যেন বোগোতা শহরটা আমার হাত-পায়ের তিল। সব জানি।

মধু শুয়ে শুয়ে 'জিগায়'—"স্যর, আপনি তো নিজেরই পথ ভুললেন, ওকে বল্লেন কি করে যে, 'জানি' ?"

"শুনলি তো, কি করে বল্লাম। শুনিসনি ? 'না-বলার-ভাষা' তো সবাই শুনতে পায় রে। পথ যে ভোলেনি, পথের খবরও সে দিতে পারে না। জ্ঞাতকে জানার বড় কথা—অজ্ঞাতকে আবিষ্কার। সেই জন্যই 'কতো যে মরু, কতো যে নদীতীরে'—এই চলা।"

"তবু ?"

"তবু আর কি, এ হোটেল থেকে বেরুবার মুখে এধার-ওধার সব দেখে নিচ্ছিলাম। হোটেল মোরিল্লোর নিওন লিখন নানা ভঙ্গীতে রং ছড়াচ্ছিল। কাজেই ও 'মোরিল্লো' বলতেই নিশ্চিত জানতাম, চিনিয়ে দেব।"—

"তা'—দিন। কাল আবার এসে ঘাড়ে না চাপে।"

হাসলাম। মেয়ে আছে সঙ্গে। এদেশেরই মেয়ে। রাতটা কাটিয়েই কাল মফঃস্বলে চলে যাবে। শহরের কিছু জানে না।

—"আপনি তো ওর সব জানেন দেখছি।"

—"জানতে হয়। নৈলে বোগোতায় দেখবে কি ?—কেবল প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাস ?"

"কিন্তু বোগোতাকে জানতে যে চাই। স্কুলে আমাদের পাঠ্য ছিলো—দক্ষিণ আমেরিকা, আন্দিস্ পাহাড়। কিন্তু এখন তো দেখছি, কিছুই জানি না এ দেশের। এ দেশবাসী কা'রা ? তারা কোথায় ? এ যা'দের দেখছি, এরা কে ?"

"স্কুলের পড়া, যে-দেশেই যা'রাই পড়ায় সবই directed পড়ানো। কে ডাইরেক্ট করে ? ডিরেকশনে ব্যক্তি বড়, না নীতি ? সত্য ও যথার্থের পথে জ্ঞান, না রাজনীতির পথে ? ব্যাপার কি হয়েছে জানো, মধু—আমরা যাদের লেখা ইতিহাস পড়ি, তাদের মগজে কেবল দুই শ্রেণীর লোকের বাস—এক, কর্মণ্য ; অন্য—অকর্মণ্য। এরই নানা রকমফের। সভ্য, শীলিত, ভদ্র, এ্যাড্ভান্স্ড্—যা' বলো। এটা এক দল। অন্য—অসভ্য, অশালীন, অভদ্র, প্রাচীন-ছাতায় ধরা। এই হোল জ্ঞান বিভাজনের মাপকাঠি—এক 'আপ্সে'-গড়া মাপকাঠি।"

"আপ্সে-গড়া মাপকাঠি ?"

"হ্যাঁ, এ মান-দণ্ডের মান ওরাই নির্ধারিত করে দেয়, দণ্ডও ওরাই চালায়। বুঝিয়ে বলি। খুব চমৎকার ভাষ্য। ওদের মানদণ্ড বলে—যে জেতে, সে-ই সাধু,—সে-ই যোগ্য। যে জিতলো না, সে অযোগ্য। প্রকৃতির কাতোয়ার। সমাজের ডিমের খোসা।"

—"তাই না কি ?"—সসঙ্কোচে ছাড়ে মধু।

"যদি হোতো হার-জিতের কথা, হয়ত হোত; হয়ত মানতাম। কিন্তু মধু, এই হোটেলে এখন যদি ম্যানেজার দু'-জন লোক এনে হঠাৎ আমায় গুলি করে, তোমার বৌ ছিনিয়ে নেয়—সেই কীর্তির ভরসায়ই কি এই নির্মম ধর্মহীন আততায়ীগুলো হবে স্পেনের সম্রাট, ব্রিতানিয়ার দারুণ দারুণ সভ্য মাল, সুসংস্কৃত জীব ? ইয়াংকি সফেদ সভ্যতা ?"

হাসে মধু। "এই ইতিহাস সত্য ?"

"সত্য কিছু নয়। তুমি নও, আমি নই, এ ঘর নয়। সব অলীক, মায়া। শোন মধু, এই যে দেশে পা রেখেছ, এ দেশের প্রকৃত মালিক কে ? কেন তা'রা আজ বিস্মৃত, বিধ্বস্ত, নিজ-বাস-গৃহে পরবাসী ? কা'রা তারা ?"

"কা'রা তারা ! কারা—দেখলাম তো এরা যা'দের 'ইণ্ডিয়ান' বলে—"

"কিছু দেখনি। পরে দেখবে। দেখাবো—তাদের দৈন্য দুর্দশা, দেখে তুমি হয়ত কাঁদবে না ; কিন্তু নতুন ইতিহাস পড়বে, দেখবে,—আফ্রিকা, মেক্সিকো, পেরু, ঈষ্ট ইণ্ডীজ, ওয়েষ্ট ঈণ্ডীজ, সর্বত্র মানুষ যাদের 'অতিথি' বলে বিনা সন্দেহে ঘরে ডেকে এনেছে, হঠাৎ তাদেরই খুন করে, লুঠে, তারপর দেশে গিয়ে বুক ঠুকে প্রচার করেছে—সভ্যতা, শালীনতা, মানব-প্রগতির স্বার্থে কতকগুলো অসভ্য বর্বর পশু বধ করে ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে তারা।······এ ইতিহাস লেখা হয়। এ ইতিহাস পড়ে আমরা পি. এইচ. ডি. হই !"

একটু দম নিয়ে গোমরাই, "আজ কিন্তু তারা যা' করে সে'টা খুন করে না ;—করে ভিয়েৎনাম, করে চিলি, গ্রানাদা। এখনকার লুঠেরারা করে বাণিজ্য, গড়ে অর্থভিত্তিক উপনিবেশ। মাথা কাটে না; জাতির সমাজের জাগুলার ভে-ন্-এর (কণ্ঠ.ধমনীর) ওপর দাঁত বসিয়ে রক্ত চোষে। এটা নতুন ইতিহাস। এ ইতিহাস পাঠ্য হ'তে হলে এ ভোজ চলবে না।—মধু, এ দেশের বাসিন্দারা ইন্‌কা নয়। ইন্‌কা একটি সংস্কৃতি। এ দেশের বাসিন্দারা ছিল; আজও আছে। মহানগরীর আনাচে-কানাচে, ছোট ছোট অখ্যাত গ্রামে আছে। ওরা আজও আছে।"

—"কা'রা ? কা'রা তারা স্যর ?"

—"চিংচা, কারা, কুইম্বায়া, তাইরোনা, শাইরিস, পালকো, লোজা, তুমাকো।—এরাই নৃতত্ত্ববিদ্‌দের অভিধানে এক ব্যাপক নামে চিহ্নিত।"

—"কী নাম ?"

"আন্দিয়ান্, অর্থাৎ আন্দিজ পাহাড়ে যারা বুনো। এমনি এক ব্যাপক নাম আমাজোনিয়ান্। আমাজোন নদীর অববাহিকার জংলী মানুষ। অথচ এই আমাজোন অববাহিকাটি সমগ্র পশ্চিম য়োরোপের দেড়গুণ বড়। তামাম সেই কৌম-কৌমান্তরের, দেশ-দেশান্তরের, কাল-কালান্তরের বৃহৎ গোষ্ঠীর নামে ঢ্যাঁড়া পড়ে গেলো এক ছাপে—আন্দীদ্। অথচ এই খণ্ডে নৃতত্ত্ববিদ্ এবং পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের জানা-শোনার মধ্যেই বাস করে একশোর মতো কৌম ; তাদের ভাষাই হবে প্রধানতঃ ত্রিশ বা চল্লিশ, এবং দেখবে এরা কত ভদ্র, শান্ত, ভয়চকিতা।"

—"তবে যে পড়ি, তা' বড়ো তা' বড়ো পিস্তলে-বীর, সমশের-জঙ্গ, ডাকাত, সবাই এই গোচো, ক্রিয়ল, ইণ্ডিয়ান বুনো।"

"পড়ো আরও অনেক, মধু। যেমন, তোমার বাপ কুলী, আমার বাপ ভিখারী, চীনেরা বোম্বেটে, মোঙ্গোল-তাতার-হুন-রা রাক্ষস, আরবরা-মুস্লিমরা নৃশংস অত্যাচারী। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, রুশ বাদ দিলে, সব 'সভ্য'রা দল-কে দল জোট পাকিয়ে শুধু বাস করছে সেই এথেন্স থেকে নিয়ে লন্দোনিয়মের মধ্যের ভূ-খণ্ডে। তার বাইরে সব বুনো। এই বার্তাই বার্তা। এই ইতিহাসই ইতিহাস। কর্তারা লেখেন; নফররা পড়েন। পড়ে 'স্যর' হন। নোবেল প্রাইজ পান। এ ইতিহাসের এই ধারা। এ ইতিহাস শেখায় 'আন্দীজ্' একটা বুনো জাত, বুনো, অসভ্য। সভ্য পিজারো এলো তাই। শুধু যে এদের সভ্য করে তুল্লো তা'ই নয়,—স্বর্গের দরজা খুলে দিলো এদের জন্য। এই ইতিহাস কথাকেই মেনে নিতে হ'বে। নৈলে পাশ করবে না। তক্‌মা হাসিল্ করবে না। দুধে-ভাতে খেতে পাবে না। ও. বি. ই, স্যর, ডক্‌টর হ'তে পারবে না। প্রেস্‌কটের কাবা এই তত্ত্বের মুর্গ্ মুসল্লম্'।"

মধু খুব ধীরে ধীরে নম্র গলায় বলল,—"এতকাল শুধু 'ভুল-ভুলৈঁয়া'য় ঘুরলাম স্যর। সব ভুল?"

'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা', মধু। ('Life's inmost treasures never go in waste') আমাদের মহাকবির বাণী। শয়তানের বুদ্ধির তল্লাশ, হদিস স্বয়ং ঈশ্বরকেও নিতে হয়েছে। মোকাবিলা করতে গেলে মন্ত্রগুপ্তি এবং গুপ্ত-মন্ত্র দু'টোই চাই।

"শোন মধু, সাইমন বোলিভারকে যখন স্পেনের রাজকুমার কলোনিয়ল 'ক্রিওল' (ভারতবর্ষীয় ভাষায় 'এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান', বা 'ট্যাঁশ') বলে জব্দ করার চেষ্টা করল, বুঝল কেন এবং কিসের বিপক্ষে নেপোলিয়ন খড়্গ তুলেছিলেন। ক্যাস্ট্রোর কৈশোরে একদিন সে প্রত্যক্ষ করেছিল পাক্কা ইয়াঙ্কী বিলাসীর সমাজে, পাক্কা ফিরিঙ্গী সমাজে তা'র মায়ের অপমান। এই ভেদাভেদটার ভিত্তি ধর্ম নয়, বর্ণ নয়, শিক্ষা নয়, রক্তও নয়। আমাদের বা ওদের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা বল্লেও নয়। এই ভিত্তি কেবল অর্থভিত্তিক। যার অর্থ, তা'র প্রতিপত্তি, সমাজ, প্রতিষ্ঠা।

"তা'ই বোলিভার চোট হানলেন প্রত্যক্ষ সেই অপোগণ্ড রাজ-কুমারের মাথায় এবং তা'রই পরে এই অত্যন্ত স্পর্দ্ধিত কলোনিয়ল সাম্রাজ্য বিস্তারের বুকে বেঁধালেন কিরীচ।

"আর সেই বিপ্লবে তিনি শুধু জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেই সংগ্রহ করেছিলেন সৈন্য, ঘোড়া, বল, রসদ এই বুনোদের মধ্য থেকেই। বুনো সর্দার গোচো পায়েজ-কে না পেলে বা পরম নির্ভর জেনারাল স্ক্রেকে না পেলে বোলিভারের বিপ্লব দিবা-স্বপ্নের সূত্রহীন, ভিত্তিহীন এক নরক-অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হোত।

"আমার ভারতবর্ষের ইতিহাসেও তাই। জাতির কর্ণধারেরা যদি ধনাঢ্য সমাজকে পরিহার করে বর্ণেতর সমাজ, দরিদ্র জনতা, বাস্তু ভিটেহারা জনতার বলে বলীয়ান হয়ে মুঠো

উচিয়ে চলতেন তা' হলে ভারতবর্ষ টুকরো হোতো না ; টুকরো হ'বার কথা চিন্তাও করত না। বলীয়ানের ক্ষমা, উদারতা ; দুর্বলের আপোষ মেরুদণ্ডকে শিথিল করে দেয়।

"যাক অনেক শোনা হোলো তো ইতিহাস, এখন শুয়ে পড়ো। জানা আছে তো, কাল আধা বেলার মধ্যে সব সেরে নিতে হ'বে। প্লেন সন্ধ্যা পাঁচটায়। বোগোতা দেখার পক্ষে ঢের সময়।...তবে, শুধুই দেখা।"

—"উঠবেন ক'টায় স্যর ? সেই চারটেয় ?"

"তা' নৈলে ভোরের হাত-ধরে হাওয়া খেতে বেরুনো হ'বে না। অসুন্দরকে পোষাকে-আশাকে ঢাকা দিয়ে দেখবে। সুন্দরকে দেখবে তা'র স্বাভাবিক নগ্নতায়। সমাজের নগ্ন সুন্দর রূপ দেখবে ভোরবেলায়। ব্যক্তির অসুন্দরে ঢাকা সজ্জিত রূপ দেখবে সন্ধ্যায়। রাতের গভীরে দেখবে তা'র উন্মাদ, অপ্রকৃতিস্থ ছিন্ন-ভিন্ন রূপের কুৎসিত কদর্যতা। চারটেয় উঠি না দিল্লীতে, কিন্তু পর্যটন করার সময়ে চারটেই ওঠার সময়। স্নান সেরে নেবে উষাকালে।"

"কিন্তু রাত ক'টা এখন জানেন ? বারোটা।"

আমি মধুকে ডাকিনি। একা একা ক্যাথীড্রাল স্কয়ারে গিয়ে বসেছি। ক্যাথীড্রালের সিঁড়ির আনাচে-কানাচে গুড়ি-শুঁড়ি মেরে অনেকে তখনও শুয়ে। মাঝে মাঝে ঘোড়ার পিঠে পুলিশ। দু'টি পুলিশ ও একটি মেয়ে (!) ব্যাঙ্কো নোভা কোলোম্বিয়ার ইমারতের মোটা চৌকো থামের মাথার খিলান পেরিয়ে জানালার রকে বসে আছে। সব পুলিশই সব পুলিশের অপুলিশী সয়ে যাচ্ছে। একটি পাগল কিশোর ছেলে চিত হয়ে শুয়ে পিচকিরি দিয়ে প্রস্রাব করছে, জলটা ওর আদুড় গায়ে পড়ছে ; ও হাসছে। দু'টি শাদা পাখি শব্দ করতে করতে উড়ে গেলো সমুদ্রের দিকে।...মানুষ বোধ হয়, এই ধরনের ভাব-ভাবনায় ঠাসা মুহূর্তে সিগারেট ধরায়। আমি সে-মানুষ নই। স্কয়ার ভর্তি পায়রার পাল খুব ব্যস্ত।

১৪৯৯—১৫০০ সাল ছিলো য়োরোপে চমকের সময়। ফ্লরেন্সের আম্রিগো ভেস্‌পুচ্চী পর্তুগালের হয়ে জাহাজে চড়লো। প্রথমে সেই পদক্ষেপ য়োরোপের মানুষের দক্ষিণ আমেরিকায়। আজ নাম ভেনেজুয়েলা এই ভেস্‌পুচ্চীই তা'র চিঠি-পত্রে জানিয়ে দিলেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস্‌ যে মহাদেশ আবিষ্কার করেছেন তা' এশিয়া বা ভারতবর্ষ নয় ; করেছেন এক সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশ আবিষ্কার। এ মহাদেশের বিস্তার গোটা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ।

ওদিকে জার্মানীতে বসে প্রসিদ্ধ মানচিত্র শিল্পী মার্টিন ওয়াল্‌ড্‌সী-ম্যুলার এই নতুন দেশের মানচিত্রও এঁকে ফেল্‌লেন। অমর করে দিয়ে গেলেন আম্রিগো ভেসপুচ্চীর নাম। নতুন দেশের নাম দিলেন আম্রিগা, আমেরিগা, আমেরিকা।

একটু একটু করে আলো ছড়াচ্ছে। ঘাসের ওপরে শুয়ে পড়েছি পা ছড়িয়ে দিয়ে। অবিনিশ্বর অচিহ্নিত অক্ষত আকাশের গায়ে রংয়ের খেলা দেখছি। অদ্ভুত লাগছে।

সাদা মেঘ থাকলে রংয়ের খেলা দেখা যেতো জমাট, এমন চান-ঘরের পোষাক পরা আকাশের গায়ে সে সব রত্ন-মাণিক্যের ছটা মালুম হয় না। তবু রং বদলায়। যেন ইলেকট্রনিক্স্-এর রং-খেলা।

মনে পড়েছে বুড়ো কলম্বসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো ফ্রাঁসিস পিজারো আর তা'র ভায়েরা; বেরিয়ে পড়লো আলমেগ্রো ও তা'র ভাই। মনে পড়ছে পানামা নিকারাগুয়া বয়ে সেই জাহাজের বহর। তা'রা সাহস করে থামতে জানেনি মরুভূমি ছাওয়া রাক্ষসী তটভূমিতে।

অথচ শুনেছে সোনা-রূপোর খোলা ক্ষেত দক্ষিণে। ওরা চলে গেলো জলপথে দক্ষিণে। মনে পড়ছে ওরা নেমেছিলো আজকের লীমা, তখনকার রীমা-নদীর মুখে। ঐ নাম ছিল নদীটার, যা'র মুখে ছিল নগণ্য মেছো-ডাঙ্গা।

তবু সবটা নগণ্য নয়। কাছেই ছিল ইন্‌কাদের প্রাচীন দুর্গ, শহর, সূর্য-মন্দির—নাম পাচাকামাক্।

কিন্তু এ সবতো পেরুতে। কোলোম্বিয়া? না, কোলোম্বিয়া, বোলিভিয়া, একোয়াদোর-ঐ পেরু আর ভেনেজুয়েলা ভেঙ্গে শাসনব্যবস্থার জন্য পরে গড়ে তোলা। সে গড়া গড়েছিলেন সাইমন বোলিভার। পেরুতে স্বাধীনতা যখন এল, তখন বড় দেশটাকে কেটে শাসনকে সুশৃঙ্খল করার ফলশ্রুতি ঐসব টুকরো দেশ। পরে বোলিভারের মৃত্যুর পর তাঁ'র নাম অমর করে রাখার প্রয়াসে দেশের নাম হোলো বোলিভিয়া—বোলিভারের গড়া দেশ। আগে সবটা জড়িয়ে নাম ছিলো নিউ-গ্রানাদা, তা'র মধ্যে ভেনেজুয়েলাও জড়িয়ে ধরা হোত।

এখনও এদেশ সোনা। কোলোম্বিয়া বোধহয় সোনার ক্ষেত; রূপোর ক্ষেত। ভেনেজুয়েলায় দেখেছি লোহার পাহাড়, লোহার ক্ষেত। ওপর থেকে কেটে লোহা পাচ্ছে মানুষ। এখানে রূপো, সোনা, মাটিতে, পাহাড়ে, জলে।

এই লোভ স্বর্ণ-পিপাসু নিঃস্ব য়োরোপকে মাতাল করবেই। উত্তরে গথ্স্, ভাইকিংস্—দক্ষিণে রোম্যান্স্, ফিনিশিয়ান্স্। বরাবর লুঠ, হত্যা, মারামারি, অত্যাচার, জবর এই সবই তো এদের রক্তে। স্বভাব যার নাম, তা কি পোষাক পরলেই যায়? এদেরই আবিষ্কার গ্লাডিয়েটরিয়াল এরীনা এবং আজও এদের দেশে বুল-ফাইট নাকি স্পোর্টস্। রক্ত, হত্যা এদের স্পোর্ট, ব্যবসা, উন্নতির উপায়। সে কি উন্নতি?

কিন্তু সভ্যতার 'অহং'-কে খাঁচায় পোরা বাঘের মতো যা'দের পুষতে হয়, তা'দের বীরত্বও তো খাঁচায় বন্দী হয়ে গেল। তারা নানান ফন্দী ফিকির, মিথ্যা অভিনয়ের মুখোশ পরে বীরত্ব দেখাবে, দেখায়ও।

এই শ্বেত হার্মাদ ডাকাতগুলো কি কবুল দেবে না-কি যে, সোনার লোভে ডাকাতি করেছি? ওরা পাদ্রী এনেছে। এনেছে যীশু, এনেছে ক্রশ, এবং তাদের সামনে রেখে লুঠ করেছে, খুন করেছে, কাতারে কাতারে মানুষ মেরেছে। শুধু, নিছক কারণে, অকারণে মাতাল হয়ে মেরেছে। দশ বছরে আড়াই কোটি দেশজ-দের মেরে এরা দশ হাজারে

নামিয়েছে। বাকীগুলোদের যে উৎখাত করেনি, সে তাদের কাজে লাগাবার আশায়।······ বসন্ত দিয়েছে,প্লেগ দিয়েছে—দিয়েছে কলেরা, উপদংশ, গণোরিয়া,—সব রাজা-গজা সভ্য-রোগ উজাড় করে দিয়েছে এই সরল জীবনের ধারকদের। তারপরেও যারা বনে-জঙ্গলে পালালো, ক্ষেতে-খামারে, বাড়িতে, চাকরীতে শ্রমিক জোগাড় করার জন্য তাদেরও পশুর মতো ধরে এনেছে। আর্যেরাও বলতে গেলে, এই······ ভারতে, বলতে গেলে, এই একই কর্ম করেছিলেন। বোলিভারের সময় পর্যন্ত এই ছিল 'সভ্য' ধারা।······কাজেই বোলিভার এদের সেরা-সে-সেরা দেবতা······।

আড়াই কোটি থেকে দশ হাজার !! তবু বলতে হ'বে এরা 'হত্যা' করেনি। এরা নাদির, তৈমুর, চেঙ্গীস্, হালাকু নয়। এরা সভ্য হিটলার, ট্রুম্যানদের পূর্বপুরুষ।

ভাবনার কি আর শেষ আছে ?

ভাবনা থামলো সেই পুলিশ-পিয়াসিনী মেয়েটির উপস্থিতিতে।

সারা রাত মদ খেয়েছে এ মেয়েটা। জীর্ণ হয়ে গেছে দেহ, অত্যন্ত অসংবৃত বাস। কিন্তু বোঝা যায় এককালে এ বাসটির খোলতাই ছিলো; আছেও। শুধু মলিন চোখে আভা বলতে কিছু নেই। চুলের কালো রং যেন হারিয়ে ফেলেছে তার জ্যোতির ঝলক। তবু ওই রূপেই পাশে বসে রসিয়ে কি বল্‌লো, বুঝলাম না।

'ওমা ! ইংরিজী বলে যে !

জিগ্যেস করলে, আমি চীনা না-কি জাপানী ?

দেখেছি ও উঠে এসেছে, সেই জানালাটা ছেড়ে। এবং সেই বিরহী পুলিসটা ওকে দেখছেও। দেখছে তো দেখছে। বয়ে গেল। আমি শান্ত। আমার কাছটিতে বসল, কিছু বলল। "বেনো" কিছু। আমি বলি, সুপ্রভাত। ('বেনো' অর্থে যে 'শুভ', 'সু' কিছু একটা, তা জানতাম।)

ও কিন্তু কথা বলতে এসেছে। নতুন মানুষটা কোথাকার জানার ঔৎসুক্য হয়েছে। সেই গায়ে পড়া মেয়েটার কাছেই শুনলাম, এ শহরের নামটি বোগোতা কেন ? অহঙ্কার করে বল্‌লো যে ওর পূর্বপুরুষেরা ফুমুজা নদীর কিনারে পাহাড়ে থাকত, তেকোয়েন্দামার সুন্দর জলপ্রপাতের নীচে। তখন এ শহরের দিশী নাম ছিল বাকাতা। ১৫৩৮ এর শহর। গোঞ্জালো হিমানেজ-দি-কোয়েসাদা এ শহরের পত্তন করেন। এটা ছিল নোভা গ্রাণাদার প্রধানা নগরী।

—"কিন্তু নীনা, তুমি এসব জানলে কোথা থেকে ? ইংরিজী শিখলে কোথায় ?"

খিল্ খিল করে হেসে ওঠে। মদের গন্ধ হাওয়ায় ভাসছে। চোখ দু'টির দৃষ্টি ভাসা ভাসা। পাখা মেলে দিয়েছে নীল আকাশে একট এগ্রেট্। পরণের পোষাকে পুরুষের ঘামের গন্ধ।

—"নীনা ?—ও !" বলেই নিজের কব্জীটা চেপে ধরেই আবার ছেড়ে দেয়। "মা তখন পয়সা খরচ করে লিখিয়েছিলেন। নীনা ! খুকী ! আদরের নাম !"

—"মা কোথায় ?"

—"জিগ্যেস করো না। যাবে মায়ের কাছে ? মায়ের কাছে যেতে পয়সা লাগে ; বেশ কম পয়সায় অনেকটা সময় পাবে।"

হাঃ হাঃ করে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

চুপ করে বসে থাকি। আস্কারা দেবার সাহস নেই। আকাশটা বড় দূর।

পুলিশটা এসে দাঁড়িয়েছে। অফিসিয়াল ডিউটি।

খুব লেগে গেল মেয়েটার সঙ্গে কিচির-মিচির। লোক জড়ো হচ্ছে। আমি উঠছি।

খপ্ করে নোংরা মেয়েটা আমার হাত ধরল। বলল—"চল। এরা অসভ্য, চল যাই হোটেলে।"

……এমনি পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ দেবার চেষ্টায় ১৯৫৭-র পারী-তে আমি একটি মেয়েকে নিয়ে রেস্তরাঁয় ঢুকে পড়েছিলাম। এখানেও তাই করি।

—"চল" ওঠা যাক। বন্ধু বসে আছে হোটেল স্যাভয়ে।…"

—"চলো, চলো ; আমিও কফি খাইনি, নীনার সপ্রতিভ উক্তি।

নীনার হাত ধরে স্যাভয়ের খানা ঘরে বসলাম। ভালো কথা, নীনা সিগারেট খায় না। কিন্তু কোকার পাতা মুখে রাখে। আমার টেলিফোন পেয়ে মধু নেমে এসে টেবিলে মেয়ে দেখে বারবার আমার দিকে চেয়ে দেখে।

"এ নীনা ; আর ও আমার ছেলে,—মধু।"

—"মোডু ? মোডু মানে কি ?"—নীনা প্রশ্ন রাখে।

—"মিষ্টি ! হানি !"

খুব হাসলো নীনা।

ওর গা থেকে সেই রাত্রির তপস্যার গন্ধ কিছুতেই ছাড়ছে না। পরিবেশটায় বিছানার গন্ধ।—সিগারেট হ'লে এ সময় কাজে দিতো।

কিন্তু কী খিদেই পেয়েছিলো মেয়েটার ! খুব খেলো।

খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটা কথা জেনে নিলাম : নীনা অবরে-সবরে গাইডের কাজও করে। কিন্তু যাই-ই করুক মদে সব খোয়ায়। তারপর দেহ আছে। তার বিনিময়েও কিছু পায়। ও বোগোতো তো দেখাবেই। ওর গাঁ-টাও দেখাবে। আর দেখাবে, সেই জলপ্রপাত, তেকোয়েন্দামা।

১৫৩৮-এ গোঞ্জালো হিমানেজ যখন সান্তা-ফে নগরীর পত্তন করেন, তখন একটা গ্রাম হ'লেও ফুমজা গ্রামটি 'চিরচা' কৌমের একটা নাম করা কেন্দ্র ছিল। দু'টি পাহাড়, গোয়েদালুপে আর মানসেরাৎ। তার মাঝে এই অধিত্যকাটি কাৎ হয়ে আছে। কাজেই দু' পাহাড়ের জল তর তর করে যেমন বয়ে চলেছে, তেমনি ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ছে ৪৭৫ ফুট নীচে। ফুমজার জলপ্রপাতটির নাম হচ্ছে তেকোয়েন্দামা। গ্রামটির নামও তেকোয়েন্দামা। এটা এখানকার সবচেয়ে সুসজ্জিত পার্ক। এ বিষয়ে নীনা শতমুখী।

হবে না কেন। কলোম্বিয়ায় প্রাচীন কীর্তি বলতে কিছুই নেই। যা' ছিলো সবই ভেঙ্গে-গুঁড়িয়ে শেষ। শহরে দেখবার মধ্যে বড় বড় প্লাজা বা স্কয়ারগুলো। বোলিভার প্লাজা, সান্তান্দের প্লাজা আর কন্‌স্তিত্যুসিয়ঁ প্লাজা। আর আছে বড় বড় পথ, নদীর এপার ওপার, সেতুর বাহারের ওপর দিয়েও পথ গেছে। আর আছে খালে আর পথে মিলে-জুলে। চলেছে বাজার। নৈলে ক্যাপিটোল দেখো। ক্যাথীড্রাল দেখো। বড় বাড়ি নেই। সবই প্রায় একতালা। কারণ স্পষ্ট। বোগোতায় ভূমিকম্প লেগে আছে। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকান দৌলত আর ব্যাঙ্কের কৃপায় এতো-বাণিজ্যিক শিল্পের উদ্‌গার বেড়েছে যে, বোগোতায় লোক লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে, তাই বাড়িগুলোও লাফিয়ে লাফিয়ে বড় হ'বার চেষ্টা করছে। ১৯৪০ এ আড়াই লক্ষ লোক ছিল বোগোতায়। এখন ২৫ লক্ষের বেশী। গাঁ উজাড় হয়েছে। পশুপালন, উলের কাজ মাথায় উঠেছে। শুধু আছে খনি। বোলিভিয়ার রূপোর খনিতে কাজ লাগাতার আটশো বছর ধরে চলছে। খনিতে জন্মে খনিতেই মরে মানুষ।

(কথিত আছে, পেরুর···বা, লা-প্লাতা খনির বাসিন্দাদের খবর শুনে কেঁদে ফেলেছিলেন বোলিভার। পেরু বিজয়ের পর তাঁ'র প্রথম কাজ হোল, কুখ্যাত পাসকোর খনিতে গিয়ে অভিশপ্ত শ্রমিকদের মুক্তি দিয়ে আলোর পৃথিবীতে বসতি ক'রে দেওয়া। কতজনের পায়ের বেড়ি নিজ হাতে খুলে দিয়েছিলেন। তার মধ্যে বহু শ্বেতকায় ছিলো, যা'রা খাস স্পেন থেকে নির্বাসিত হয়ে এসেছিল।)

কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সেই তীর্থে যাওয়া যাবে না। সময় অল্প।

ওঃ! কী দ্রুত, কী অবলীলাক্রমে কথার বন্যা ছোটাতে পারে নীনা। ভাড়া খাটা গাইড যদি মেয়ে হয়, বারে বারের অভিজ্ঞতায় বলছি,—তারা বেশী মন দিয়ে বেশী পুংখানুপুংখ বলতে ভালবাসে। এ বিষয়ে কুইন অব্‌ হার্টস্‌ ছিলেন ১৯৮৭র প্যারিস ভ্রমণে যুলি প্রাদোঁ।

কিন্তু আমায় কর্তব্য করতে হবে। আমি জাত মাষ্টার!

বল্‌লাম—"নীনা, সবে দাঁত তুলিয়েই বেরিয়েছি। দাঁতের ক্ষতের ওপরেই প্লেট বসানো। আমার খেতে খুব দেরী হবে। তুমি বরং ওপরে যাও মধুর সঙ্গে। বাথরুমটা ব্যবহার করে নিজেকে গুছিয়ে নাও। আমি বুড়ো হলেও আমার সঙ্গে ইয়ংম্যান আছে। দেখছো তো। অন্ততঃ ওর খাতিরে।

পকেট থেকে আমার ছোট চিরুণীটা দিতে যাই। ও নম্র হয়ে হেসে হাতের জঘন্য থলেটা দেখিয়ে বলে, 'এতে কিছু কিছু সাধন বস্তু আছে।'

(ও-ওতো সাধিকাই বটে! ভুলেই যাচ্ছিলাম।)

মধুর দুই চোখ বিস্ফারিত।

"আমি যাবো ঐ মেয়ের সঙ্গে?"—(বলতে কিন্তু হচ্ছে ওকে ওর কলা-পোড়া খাওয়া হিন্দীতে।)

—"হ্যাঁ! যাবে। ঘরে থাকবে। নৈলে বাক্স-পেঁটরায় কিছু থাকবে না।—জরুর! ঔর ইন্তজার করোগে। বর্ণা যো কুছ লায়ে হো সব সাফ্‌ হো কর রহেগা।"

—"কিন্তু স্যর, বাক্সের বাইরে আমি। আমিই যদি লুট হয়ে যাই।"

—'ছিঃ মধু! মেয়েটার রুচি বোলে এখনও কিছু বাকী আছে। আর যদি তোমার মতো এক পকেট কাটা কন্দর্পকে জড়িয়ে ধরেই, কী আর হবে? বড়জোর আরও একটা শকুন্তলা বা ব্যাস।"

পালাতে পথ পায় না মধু।

ওরা যখন নেমে এল, তখন মধু একটু সপ্রতিভ। নীনাও একেবারে নতুন মানুষ। পরা জামাটাই ও হোটেলের পরিচারিকাকে ডেকে আয়রণ করিয়ে নিয়েছিল। আর ব্যাগে ছিল পাৎলা নাইলনের সবুজ কালোয় শিল্পিত একটা রুমাল। সেটা মাথায় বাঁধা।—লক্ষ্য করলাম গালে-ঠোঁটে রং, চোখের কালোও গভীরতর।

ওকে বল্‌লাম—"এখন তোমায় দেখাচ্ছে যেন, চার্চে রাখা ডেইজী।"

নীনা চমকে উঠে হেসে ফেল্‌ল।

আরম্ভ হোল যাত্রা।

নীনা সারাদিনের জন্য একখানা ট্যাক্সি নিল স্যাভয়ের ব্লকটা পার করে। বেশ দর কষাকষি করতে জানে দেখলাম।

দেশে দেশে ঘুরি। 'আইটেম' বেঁধে দেখি কয়েকটা জিনিস:—(১) ম্যুজিয়মগুলো,—প্রাত্নিক, প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক; (২) শিল্পের গ্যালারি; (৩) কোন একটা সাংস্কৃত দৃশ্য-কাব্য,—তা হোক না কেন সে নাচ, অর্কেস্ট্রা, অপেরা। এগুলো দেখার পর দেখি, বাজার,—পসরা-মেলা, বেসাতদারদের ঝলমলে বাজারের চেয়ে ফুটপাথের বাজার বা হাটবারের বাজার, এবং সব্‌জী, মাছ ইত্যাদির কাঁচা বাজার,—খুচরো গেরস্তীরটাও, আবার পাইকিরিটাও। এরপরে অবশ্য দেখি বইয়ের দোকান। বসি রেস্তরাঁ বলতে নিষিদ্ধগুলোতে যেখানে মদে আর খাবারে গলাগলি। সময় পেলে যাই নাপিতের দোকানে, আর 'লালবাতি' পাড়ায়। তবে, পাড়ায়ই। ঘরে নয়।

এগুলোর মধ্যেই ঢুকে আছে একটা নাগরিক শরীরের খানা-তল্লাসীর ঘোঁৎ-ঘাঁৎ। গায়ের গন্ধে যেমন, মানুষের সংস্কৃতির পরিচয়; সংস্কৃতির গন্ধ পেতে গেলে তেমনি এসব তল্লাট ঘুরতে হবে। নিরাসক্ত মন না হোলে ব্রহ্ম-বিদ্যা, মধু-বিদ্যার মতো পরিব্রজন-বিদ্যারও হদিস পাওয়া যাবে না।

রোমে সস্ত্রীক হাটে গিয়ে জেনেছিলাম, যে সেই হাট অগস্টস্-সীজারেরও আগেকার হাট; এবং এলারিকের বিধ্বংসী প্রলয়ের পরে (সে-নয় হোলো পেগান, বর্বর, ভিসিগথ) সম্রাট পঞ্চম চার্লসের (ইনি সভ্য, খৃস্টান, ভদ্র) নির্মম লুঠ ও ধ্বংস সত্ত্বেও এ হাট বজায় ছিল। ভাবতে শিহরণ হয়েছিল যে, এই যে মেয়েটা আমার স্ত্রীকে মাছ কেটে দিচ্ছে, হাসছে, বিনি পয়সায় পাঁচ-ছ'টা মুড়ো দিয়ে দিল, তা'র বৃদ্ধ প্রপিতামহীর বৃদ্ধ প্রপিতামহী রাজ রাজ চোলের সময়ে আমার দেশের অন্য কোন গৃহিণীকে মাছ বেচেছেন। রোম তলিয়ে গেল, হারিয়ে গেল ভগ্নস্তূপের তলায়। শহরের বুকে চাষ হ'তে থাকল। তখন এই হাটটিকেই চিহ্নসঙ্কেত ধরে বিদ্বজ্জনেরা অগস্টন রোমের পুনরুদ্ধার করেন। এই

হাটটিই ; এবং এই ধরনের আরও দু'-তিনটি হাট। মার্সেলাস সার্কাসের হাটটি তা'র অন্যতম।

এমনি হাট-বারের হাটে বাজার করেছি পারীসে, ভিয়েনায়, মাদ্রিদে। এসব হাটের ধারা একেবারেই দেশজ ধারা। সুরিনামের বাজারে দেখি যে, হাটবারে চীনা, ভারতীয়, জাভানীজ, মালায়ার পাশে ডাচ, ডেনিশ, ফরাসীও ঘুরছে, বেচছে, কিনছে। নিগ্রোরা যে এখানে স্বতন্ত্র বসতি করে, নিজেদের ভাষা বলে তা-ও এই সব বাজারে এসেই টের পাই।

কিন্তু সেরা লাভ এদের 'মুড' লক্ষ্য করা, পোষাক, ঝগড়া, গা'লাগাল, রস-রসিকতা, নোংরামী, বেনেলী,—এইগুলো লক্ষ্য করা। সব্জী বাজার আর হাটের মতো জ্যান্ত ডাইরেক্টরী পরিব্রাজকদের কাছে আর কিছুই নেই।

ম্যুজিয়ম দেখাও তেমনি, দেশের অতীতের পর্দা তুলে দেখা। যে সভ্যতার ঐতিহ্য নেই, সে সভ্যতার ভবিষ্যৎও নেই। ম্যুজিয়ম দেখেছি ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম, মাদ্রীদ, ভিয়েনা, পারিসে লুভ, মেক্সিকো, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, এথেন্স, টোকিও। কারণ, মানুষগুলোকে জানতে চেয়েছি। হাতে সময় অল্প থাকলে ম্যুজিয়ম, হাসপাতাল আর চার্চ (মন্দির / মসজিদ)-গুলো দেখা উচিত। তবে, এ-ও ঠিক বড্ড সময় লাগে। আবার কোন কোন ম্যুজিয়ম দেখে শেষই করা যায় না ; যথা—ল্যুভ, ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম।

প্রথমেই ন্যাশনাল ম্যুজিয়মে যাব। কিন্তু হাসে নীনা।—"যাবে, চল ; কিন্তু আমার তো মনে হয়, এদেশের ম্যুজিয়মে সেরা দ্রষ্টব্য—যাঁরা ম্যুজিয়ম দেখতে আসেন তাঁদের আদিখ্যেতা—লোকে হাসে, ভাবে এ'লোকটার কোনো কাজ নেই। যা' জানে না, বোঝে না তা'ই দেখছে। কী দেখে এত ?—আমিও তা'ই ভাবি।"

সত্যিই তা'ই। ম্যুজিয়মের দু'টি পরিচ্ছেদ। এক, আদিবাসীদের আলেখ্য—দেখানো হ'চ্ছে তা'রা কতো নিম্ন মানের কৃষ্টির ধারক ; কী বিপুল 'উব্গার' এই সব রাঙামুখো বিদেশীরা করেছে এদের 'খতম' করে দিয়ে, অবশিষ্ট ১০% কে বনে-জঙ্গলে খেদড়ে দিয়ে।

—"আচ্ছা নীনা, তোমাদের দেশে আদিবাসীদের দাস-বাজারে বিক্রী করা হোত না ?"

চক্চকে চোখে চায় নীনা।

—"হোতো ; মানে হবার মুখে মুখে থেমে গিয়েছিল। কিন্তু এখনও হয়। দাস-ব্যবসায় বলে না, বলে সীজনাল লেবর ; ফার্ম রিক্রুট্স্।"

আশ্চর্য হয়ে যাই।

—"তা'ই নাকি ! এ কেন ?"

কারণ বলতে গিয়ে নীনার চোখে-মুখে যেন ঝাল লংকা খাবার আঁচ লাগে।

"দলকে দল এ্যণ্ডীজ ডিঙ্গিয়ে কর্ডিলেরার পূবের দিকে আমাজোন অববাহিকায়, ল্লানেরোদের (বুনো 'গোচো') জলার মধ্যে সেঁদিয়ে যায়। সে সব দেশের সোনার খবর এখনও ঢাকা আছে রোগে, সাপে, বাঘে, খাদ্যাভাবে। ওদের দেশের রাজা আর পাদ্রীরাও

নাকি মানুষ কেনা-বেচাকে মনুষ্যত্বের অপহনন বলে মনে করত। আইনতঃ বন্ধ হোল। তা'ই আইনটা ঘুরিয়ে বাঁধল। বন্ধ আর হল কৈ?"

ওঃ! কী আচমকা হাসি নীনার! দু'একজন দর্শক চেয়ে দেখল মেয়েটাকে। নীনার তা'তে বয়েই গেল।

—"আইনতঃ বন্ধ হলো। কিন্তু এদেশজদের জমি, ক্ষেত, খামার সব চলে গেলো। নতুন জমিদার, রায়ত, ভাগচাষী, কোর এলো। য়োরোপ তো উঠে-পড়ে আমাদের সভ্য করতে লেগে গেলো। ঋণের জ্বালায়, মারের জ্বালায় আমরা সত্যিই সাদা চামড়াকে 'দেবতা' ভাবতে লাগলাম। ভাবলাম, ওদের সৃষ্টিকর্তা আলাদা।"

গম্ভীর হয়ে যায় নীনা।

—"জানো, আমি নয় খারাপ। রাতের রোজগার করি। নচ্ছার মেয়ে; কিন্তু এদেশে মেয়েদের দেহ সেই গাউন-পরা পাদ্রী, বা য়ুনীফর্ম পরা পুলিশই বলো, সিপাহীই বলো—কেউই পরিক্রমা করতে ছাড়ে না। দেহ সম্বন্ধে নাক-উঁচু পবিত্রতা এদেশের কোনো মা-মেয়ের নেইও। নেই, অথচ নিন্দা আছে। যুগ যুগ ধরে যে পার্কে লোকে আবর্জনা ঢালে সেটি কি আর পার্ক থাকে? অথচ আমাজোন যাও—পুরুষ-মেয়ে ন্যাংটা। তবু দম্পতীর জোড় অটুট। যৌন পরিভাষাটাই আদিবাসীদের কাছে এক নয় লীলার আমোদ; আর নয় তো পয়দা করার তাগাদা। যেমন পশু-পাখির জীবন। প্রাকৃতিক।"

ম্যুজিয়মে সাজানো আদিবাসীদের দিকটা আর দেখলাম না।

ম্যুজিয়মটার অন্য পরিচ্ছেদে আছে, কলম্বিয়ান যুগ থেকে অদ্যাবধি স্পেনের সম্পদের কৃষ্টির নিশানা।

ভাল লাগল রেভল্যুশানারী পরিচ্ছেদটি।

এ'টির সঙ্গে যেন আমার জানা-চেনা।

আমি স্থির নয়নে প্রায় সমাহিত হয়ে দেখছি একটি তলোয়ার। যেদিন বোলিভারকে তাঁ'র বিছানায় ষড়যন্ত্র করে হত্যা করার কথা, সেই চরম মুহূর্তে আততায়ীরা যখন সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, বোলিভার রাত্রির শোয়ার পোষাকেই এই তলোয়ার-খানা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।... তা'ছাড়া দেখি জেনারাল সুক্রের পরিচ্ছদ; দেখি খুব লক্ষ্য করে গোচো পায়াজের হাতের সেই গোটা শালগাছের লগির বল্লম। আস্ত গাছটা, আট দশ ফুট লম্বা, মুখটা দারুণ ছুঁচোলো। মনে পড়ে যায় বোয়াকার লড়াইয়ে মোক্ষম আঘাত হেনেছিলেন এই বিশাল গেছো বল্লমধারী শত শত ঘোড় সওয়ার। বুনো গোচো তা'রা। ঘোড়ায় চড়ত। না-জীন, না-রেকাব। গায়ে থাকত না পোষাক। যে বল্লমের ভার বওয়া, শুধু বওয়াটাই সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য, সেই অতিকায় (গুঁড়ির মুখ ছুঁচালো করা) বল্লমগুলোকে বগলের তলায় চেপে আর অন্য ধারটা হাতের তেলোয় ব্যালান্স করে রেখে ছুটিয়ে দিতো বিপুল বেগে ঘোড়া। সে ঘোড়া ছোটাবারও বিশেষ পদ্ধতিটি মনে পড়ে যায়। লেজের গোড়ায় কষে বেঁধে দিত চামড়ার পোঙ্কোখানা। ঘোড়া দৌড়ুতে গেলেই পেঙ্কোটা দু'-পায়ের মাঝে সৃষ্টি করত বাধা; রগড়ে যেত পেছনের পায়ের মাঝে ঝোলা মুষ্কটি।

তখন পাগলের মত ছুটত ঘোড়াগুলো। সেই বেগবান দুর্মদ ঝঞ্ঝার পিঠে চেপে যারা ছুটত সেই বল্লম পেল্লায় বাগিয়ে, শত্রুপক্ষ তাদের বলত 'সেন্টর্' (আমাদের পুরাণের কিন্নর)— আধা-ঘোড়া, আর আধা-মানুষ। এমন একাঙ্গ হয়ে যেত তারা, যে ঘোড়ার বেগেই বল্লমে বেগ আসত। এক ঝাপটে যখন চার-পাঁচ শো ঘোড়া ছুটত, সেই বল্লমের মুখে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যেত উর্দীপরা, ঝকঝকে, কুচের ডিসিপ্লিনে-পালিশ করা রিসালা, রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট। এক একটা বল্লমে একসঙ্গে দু'-তিন জন গাঁথা হয়ে যেত।—সে এক বীভৎস পরিস্থিতি! মানুষ, ঘোড়া কারুর অব্যাহতি থাকত না।

ভাবছি, দেখছি। 'প্রতিভাত' হচ্ছে সেই দৃশ্যগুলো। কাঠখানায় হাত দিচ্ছি। সাংঘাতিক অস্ত্র।

তাই বলি ম্যুজিয়ম দেখা বিলাস হতে পারে, আবার হতেও পারে তীব্র আকর্ষণ, জ্ঞানের ভাণ্ডার, ইতিহাসের কষ্টি-পাথর।

পায়ে হাঁটার মধ্যেই আছে ম্যুজিয়ম ওরো। 'ওরো', মানে সোনা! সোনা এবং মূল্যবান জওহারাৎ-এর ভাণ্ডার এই কোলোম্বিয়া। পাহাড়ে পাহাড়ে নানা আকর, খনি। সর্বনাশ ডেকে আনে এই সমৃদ্ধি। সবই লুঠ হয়ে গেছে। বহু বাসন-পত্র, এমনকি গহনা অবধি—খেঁৎলে, ভেঙ্গে, গলিয়ে পাচার করা হয়েছে য়ুরোপে। মেক্সিকো দেখার পর এ সব সংগ্রহ তেমন ভাল লাগল না।

কিন্তু ম্যুজিয়মের সংলগ্ন একটি উপবন,—কেবল মেহগনি এবং শাদা সীডার,—বেড়াতে ভাল লেগেছিল। বন, বিশেষ করে বিরাট গাছ দেখতে খুবই ভাল লাগে। পুরোনো গাছের বাকলের রেখার মধ্যে যেন কোন রহস্যঘন পরিচয় লিপির ছাপ দেখতে পাই। মন আবিষ্ট হয়ে পড়ে।

বোগোতার বাজারে হঠাৎ মনে হয়, শুধু মাংস। এমনি কাঁচা মাংস তো আছেই। বড় বড় জানোয়ারও। ও। সে সব গরীব-গুরবোদের। ছোট ছোটরা বড়লোকেদের পাতে পড়ে,—খরগোশ, কাপিবারা, সজারু, ফেজাণ্ট।

আর আছে চর্বিতে তেল-তেলে, আধা-সেদ্ধ, আধা-ভাজা মাংসের স্তূপ—যেন, আমাদের দিল্লীর 'ছোলে-ভটুরে,' য়ু-পীর দালপুরী, বাঙ্গালীর লুচি-ছোলার ডাল। শুধু মাংসের স্তূপ। জুতোর সুখতলার মত, বা মশকের (ভিস্তি) চামড়ার মত, (আমসত্ত্বের মতো) পাৎলা করে কাটা মাংস, এক স্তরের পর অন্য স্তরে উঁচু করে সাজানো, যেন পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের বাজারে খাজা সাজিয়ে রাখা। মানুষজন মাংসটি কেনার আগে চেখে দেখছে।

গ্রাম্য শিল্প 'প্রদর্শনী' ব'লে এক কায়েমী বাজারে পশম, তুলোর রং-বে-রঙ্গের কাজের মধ্যে মেঝের বিছানোর জিনিষ, বিছানায় বিছোবার জিনিষ, দেয়ালে টাঙানোর মতো রংদার শিল্প।—তুলোর, পশমের, লামার লোমের। বেশী বিক্রী হয় রঙ্গীন সুতোয় বোনা সৌখীন হ্যামাক, টুপী অর্থাৎ ওম্‌বেরো; আর গাদি গাদি চামড়ার শিল্প। চামড়া, বিশেষ করে গো-চর্ম বলতে যা বুঝি তা'র পোঞ্চো, টুপী, জামা, হাঁটু অবধি লম্বা-জুতো, পিস্তলের

খাপ, বেল্টের তো কথাই নেই—সব থরে থরে। কিন্তু এদের অহঙ্কার ঘোড়ার সাজ, জীন, লাগাম, চাবুক।

আশ্চর্য হয়ে যাই এদের ঘোড়া-প্রীতি দেখে।

পৃথিবীময় ঘোড়ার আদর—মোঙ্গোলিয়ায়, আরবে, রুশে এবং অষ্ট্রিয়ায়। কিন্তু সে পরে। আগে ঐ মোঙ্গোলিয়ায়, আরবে। আর্যদের পূজনীয় মাংস ছিল অশ্ব, কি-না হর্শ, কি-না হর্স্-Horse; নামটাই আর্য, সাংস্কৃতিক, বৈদিক।

এখনও ঘোড়ার মহা কদর অষ্ট্রিয়ায়, স্পেনে, এবং স্পেনের সংস্কৃতির ধারায় পুষ্ট এই লাতিন আমেরিকায়। চিলি, আর্জেন্টীনা, ভারতেরই মতো খেলা-জগতের দ্রুততম খেলার অর্থাৎ পোলো-খেলার রুস্তম।

মাদ্রিদে বিখ্যাত ঘোড়-সওয়ার ট্রেনিং কলেজ সারা স্পেনের গর্ব। কিন্তু পৃথিবীর আভিজাত্যের শিরোপা পেয়েছে ভিয়েনার ঘোড়-সওয়ার ট্রেনিং সেন্টার। সেখানে দেখেছি পোষাক আশাক থেকে ঘোড়ার রং পর্যন্ত সবই একেবারে য়ুনীফর্ম্ড্। মাদ্রিদের আভিজাত্য চেষ্টনাট আর কালো রং; কিন্তু ভিয়েনার শাদা।

আসলে সেই যে আতিলার সময়ে, হালাকুর সময়ে রোমক পদাতিক বাহিনী ডাহা মার খেল দুর্মদ হূন অশ্বারোহীদের কাছে, তারপর থেকেই য়োরোপে রাজশাহীপনার (ইম্পিরিয়ালিজ্‌মের) শানদার প্রতীক হয়ে দাঁড়াল ঘোড়-সওয়ার। শুধু ঘোড়-সওয়ারই নয়, রীতিমত রেকাব-লাগাম লাগান ঘোড়-সওয়ার। নাইটদের যুগে ঘোড়া তো মা-বাপেরও ওপরে স্থান পেত। আরব আর স্পেনের সাহিত্যে মোটা একটা অংশই ঘোড়ার স্তব-স্তুতি, রূপ-বর্ণনায় মত্ত। ফিরদৌসী তো রুস্তম এবং কৈকায়ুস-কন্যার প্রণয় বর্ণন করতে গিয়ে কৈ-শ্বশুর ঘোটকী এবং রুস্তমের ঘোড়া নিয়েই মেতে গেলেন—প্রায় একুশ পাতা।

কাশ্মীর, লাদ্দাকে দশহাজার ফুটের মাথা অবধি যে (আর্যবংশাবতংস) যাযাবর এবং বেদেদের আজও পরিক্রমণ করতে দেখেছি, তাদের জন্ম-মৃত্যু, আনন্দ-শোক সবই তো ঐ ঘোড়ারই পিঠে। কোন বিশেষ কারণে বা বিশেষ নিয়ম লঙ্ঘনের মহৎ সাজা "ঘোড়া কেড়ে নেওয়া।" এই সব যাযাবর সম্প্রদায়ের মধ্যে যা মৃত্যুর অধিক বলে বিবেচিত হয়, তা হোল ঘোড়াটি কেড়ে নিয়ে দলের বাইরে করে দেওয়া।—"বৌ নাও; ঘোড়া কিন্তু নিও না,"—এই ওদের প্রবাদ।

যে কোনো দিকেই যাই, বড় বড় ইমারৎ। বুঝে নিলাম এখানকার ইমারতের তিন ধারা। চার্চগুলো যেমন হয়, স্পেনের আওতায় সেই বোরোক আর রোকোকোর ধুম। দেখতে অবাক লাগলেও আমার মনে হয় এর ঢংটা সর্বত্র এক। ব্যতিক্রম দেখলাম, বোলিভার স্কয়ারের ওপর দুই চূড়া মণ্ডিত ক্যাথীড্রালটিতে। সিঁড়ি বেয়ে গেটে না ঢুকে এর প্রবেশ পথটি ঢাকা খিলেন লাগানো মোটা চৌকো থামের সারের ওপর বারান্দা পার ক'রে।

মন খুসী হয়ে যায় একটা ব্যাপারে।

এ শহরের যেখানেই দাঁড়ান যাক শহরটিকে যেন আগলে রেখেছে দু'টি জাগ্রত প্রহরী। পাহাড় দু'টি : মনসেরাৎ আর গোয়াদাল্যুপে। দু'টির গায়েই সবুজের—ঘন সবুজের বনাতের ওপর নানা বর্ণের ফুলের ছোপ। প্রচুর ফুল। শিমুল, পোঙ্গ, চিনার আর সেই অগ্নিবরণ ফুলটি, শান্তিনিকেতনে এনে মহাকবি যা'র নামকরণ করেছিলেন 'অগ্নিকন্যা' বা 'অগ্নিশিখা' (ঠিক মনে পড়ছে না)। এছাড়া আছে কাসিয়া-নোডোসা, শিমুল, বরাস। বড় বড় গাছ। গাছ ভর্তি ফুল। পোঙ্গ বলতে হলদে, সোনা, নীল মেশানো বেগুনে, একেবারে শাদা। আমাদের দেশী ফুল কাঞ্চন, করবী, জবা। সে সবই পাহাড়তলিতে। দু'টি পাহাড়ের ওপরেই এক একটি সুন্দর নয়নাভিরাম চার্চ। একটাতে ওঠার জন্য, নাকি, টুরিষ্টদের 'হজামত' করার জন্য, আছে কেবল্ কার মাত্র ১৮০০ ফুট ওঠার দায়ে। অমনি দেখেছি, রাজগীর পাহাড়ে।

বাঁচোয়া যে আমাদের পরেশনাথ, আবু, নীলকণ্ঠ এখনও এ লৌহ অজগর গলায় পরেনি।

এই লৌহ-বন্ধন এবং ঐ বনানীর প্রকল্প যেন কোথায় অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। নৈলে টুরিষ্টদের কাছে পয়সা বাগানোর জন্যে চামুণ্ডার পাহাড়ে, গয়ার পাহাড়ে, গোয়ালিয়র দুর্গে যাত্রীদের ওঠার জন্য এ ব্যবস্থা তো চালু হতেই পারে। অনেক সময়ে মনে হয়, আমরা প্রগ্রেসিভ নই, এ বেশ ভালো। কাশীতে, হরিদ্বারে মোটর বোট হলে কাশ্মীরের দাল লেকের মত তারাও জবেহ্ হয়ে যেতো।

বাণিজ্যিক স্বার্থের যূপে হিমালয়ের (ভারতের) পরম সম্পদ অরণ্যানি (ঋগ্বেদের ঋষিরা যা'র সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত গাথা গেয়ে গেছেন) আমরা আকাতরে বলি দিয়েছি। নাগরিক স্বার্থে আমরা গঙ্গাকে ধ্বংস করছি। শিল্প প্রগতির স্বার্থে দমটিপে মারছি 'তাজমহল'কে। It's a question of time…বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বাণিজ্যিক স্বার্থে পাহাড়ের অপার শোভাকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারি কেব্‌ল্-কার রচনা করে।

কিন্তু আবার কেব্‌ল্-কার মানায়ও। তেমন জায়গাও আছে। নিউইয়র্কের ম্যানহাটান ব্রিজের তলাদিয়ে ব্রিজেরই গায়ে গা ঠেকিয়ে যখন কেব্‌লে ঝোলা খাঁচা ভরতি মানুষ ষ্টাটেন আইল্যাণ্ডস্, নিউ জার্সিতে যাতায়াত করে, তলায় ষ্টীমারের ডেক থেকে দেখতে দেখতে মনে হয়, মানুষের সভ্যতার পদক্ষেপ ক্রমশঃ মানুষকে মুক্তির আলো-বাতাস থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে স্বরচিত খাঁচা থেকে খাঁচান্তরে 'তেড়িয়ে' নিয়ে বেড়াচ্ছে। তবু সেখানে এ খাঁচা মানিয়ে গেছে।

না, এর সঙ্গে বিজ্ঞান, শিল্প বা নগর-সভ্যতার উৎকর্ষের কোন সংঘর্ষ নেই। অগ্রগতির পথে বিজ্ঞান ও শিল্পের চাহিদাকে স্বীকৃতিই নয় শুধু, গৌরবময় স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু সংস্কৃতির শোভা, প্রকৃতির বিন্যাস, জীবনের মাধুরীকে বলি দিয়ে নয়। বলি দিয়ে তো নয়ই, বানচাল করেও নয়। যে কোন বাহানাই দেওয়া যাক্ শহরের নিঃশ্বাস রোধ (কলকাতা, লণ্ডন) নগর-কান্তারের শ্যামলতা হরণ (সিমলা, নৈনিতাল, কিরিবুরু, মেঘাতাবুরু), নদী, হ্রদের নির্মলতায় পঙ্কিল বিষময় আবর্জনা ঢালা (ক্লাইড্, গঙ্গা, দাল, ওন্টারিও),—এগুলো সমর্থন করা যায় না।

যায় না, এই কারণে যে—এখনও পৃথিবীতে বহু সমৃদ্ধিশালী দেশ আছে, বাণিজ্যে-শিল্পে যাদের অগ্রগতি অক্ষুণ্ণ তা'রা আইন করে নিসর্গের ওপর বলাৎকারকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। জাপান তা'র এক অন্যতম নন্দনীয় উদাহরণ। ক্যানাডায় হ্যামিলটন শহরে আকাশ দেখতে পাইনি, দেখেছি গৈরিক গ্যাসের চন্দ্রাতপ ; অথচ পশ্চিম জার্মানীর রুর্ প্রদেশে দেখেছি ব্ল্যাক ফরেষ্টের ধারে ধারে পরিচ্ছন্ন আকাশ, গরিমামণ্ডিত বনরাজি। অথচ রুর্ প্রান্তের মতো অতি-ফ্যাক্টরিত তল্লাট ক'টাই বা পাওয়া যায় ?

তা'ই বলছিলাম, অবশ্যই এর প্রতিকার, প্রতিষেধ আছে। আর আছে যখন, তখন সেই প্রতিকার না করা নিশ্চয় একটা নিছক নাগরিক হত্যা, নৈসর্গিক পাপ।

এই পাপই সাপের মতো বেঁধেছে চমৎকার এই মন্সিরাৎ পাহাড়ের অপার সৌন্দর্যকে। এ এণ্ড্রোমীডাকে কোন পার্সিয়ুস মুক্তি দেবে ?—কবে ?

সব পথগুলোই যেন ধুয়ে-মুছে তক্-তকে করে রাখা। যত্ন করে সাজানো। আর সেই পথ ভর্তি গাড়ি, গাদা-গাদা গাড়ি, নানান্ দেশের, নানান্ ছাঁদের, নানান্ দামের। কোনোটাই কিন্তু স্বদেশী নয়।

এতো গাড়ি আসে কোত্থেকে ? সোনা, রুপা, পান্না, নীলম, পোখরাজের আড়ৎ, কফির সদর কাছারি,—মানলাম। কিন্তু দেশের সত্তর শতাংশ তো গরীবই বটে প্রায় সহায়হীনই বলা যায়।

ওঃ, কী গরীবী ! কী-গরীবী ! ! আমি ভারতবাসী হয়েও একথা বলছি।

অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নীনা।

—"জানেন, আমাদের দেশে কতগুলো বিদেশী ব্যাঙ্ক কাজ করছে ! ত্রিশ থেকে চল্লিশ। বিদেশী ব্যাঙ্ক থাকবে, আর ধার-লগ্নী থাকবে না—হয় কখনও ? ও সব কথা ভাববেন না। দেখতে এসেছেন, দেখে যান।"

—"আমরা ভারতীয়, তৃতীয় নয়নে বিশ্বাস করি ; নীনা। এচোখ দু'টো তো বন্ধই রাখি, রাখতে চাই। —সে চোখটা জলেও যেমন, জ্বালায়ও তেমনি। তা'র স্বভাবেই আগুন। কিন্তু মানতেই হ'বে, শহরটি তোমাদের পরিপাটি।"

—"তা'ই না-কি ? থ্যাঙ্কস্। নিউ দিল্লীর প্রশংসাও তো শুনতে পাই। এখানে এ প্রসাধন হোল মত্রে ক'বছর আগে। ১৯৬৯-এ সেই পোপ ষষ্ঠ পল এলেন। মনে পড়ে, ধুম-ধাড়াক্কা লেগে গেল শহর সাজাবার। গরীবদের রাজা-রাজাদেরও গরীব করে ছাড়লো।"

দেখলাম লক্ষ্য করে। বিশাল বিশাল গাছ দিয়ে সাজানো পথটি পাহাড় থেকে ঢল বেয়ে পশ্চিমে গেছে। তা'রই সমান্তরালে আরও সাত-আটটি পথকে উত্তর-দক্ষিণে কাট-কুট করে বহু পথ। শহরে পথ নয় তো, যেন চৌকো জালি। বড় পথগুলোকে বলে "কাল্লো" ছোটোগুলোকে বলে "কারিয়েরা-স্।" বেশীর ভাগ পথের নামই জাতির নায়ক কোন ঐতিহাসিক পুরুষের, বা ঐতিহাসিক দিনের নামে।

অথচ এই যে উত্তর-দক্ষিণের পথ, এদেরেই সীমন্তে আছে কুলীন পাড়া ; শহরগুলির শানদার স্ববার্ব্‌স্‌।

কিন্তু নিউদিল্লী-পুরোনো দিল্লীর মতো; সল্‌ট্‌ লেক, যোধপুর পার্ক, নিউ আলিপুর সত্ত্বেও, কলকাতার মতো, পুরোনো বোগোতাই যেন ইতিহাসের প্রাণ। সেটাকে এরা ঐতিহাসিক কারণে বদলায়নি। প্রতিটি পথ, ইমারত, চার্চ যেন ইতিহাসের স্বাক্ষর নিয়ে বেঁচে আছে।

দিল্লীতে যেমন, পথে চলতে চলতে যদি কেউ ইতিহাস দেখাতে থাকে, তা হ'লে দিল্লী দেখতে পুরো একমাস লাগবেই। কোন প্রাচীনই এখানে প্রাচীন নয়, প্রাচীনতরও আছে। কোন ভগ্নস্তূপই, স্তূপ নয়, চেয়ে আছে ইতিহাস। পুরোনো বোগোতা এবং বোগোতার কেন্দ্র-মহাল তেমনি ইতিহাস সমৃদ্ধ। (অবশ্য ইতিহাস আর ক'দিনের? বড় জোর ৫০০ বছরের তকরীর)।

কলোম্বিয়া আজই কলোম্বিয়া। ১৬শ-১৭শ শতকে বিশাল একটি দেশকে বলা হোত 'নোভা গ্রানাডা।' স্পেনের আন্দুলেশিয়া প্রদেশের গ্রানাদা শহরটি ছিল মূরদের সর্বপ্রধান এবং দুর্ভেদ্য শহর। মূররাই ঐ নাম দিয়েছিল। সেখানে প্রচুর ডালিম হোত; তা'ই মূররা নামকরণ করেছিল 'কার্ণাত্তা'।

কিন্তু সে-তো স্পেনে ভূ-মধ্য সাগরের তীরে ফলে-ফুলে সমৃদ্ধ একটি নগরী।

এই অতি রমণীয় প্রদেশটির কথা মনে করেই ফিরিঙ্গীরা নাম দিলো 'নিউ গ্রাণাদা' (নোভা গ্রাণাদা)।

কার্ণাত্তাকে চট্‌কে দিয়ে হোলো গ্রাণাদা। অমনি চট্‌কানো ওদের স্বভাব। তক্ষশীলা হোলো ট্যাক্‌সিলা; করুষ হোলো সাইরাস্‌। বোলিভার এই বিশাল ভূভাগকে স্পেনের নিগড় থেকে মুক্ত করার পর বুঝলেন, দেশটিকে ভাগ করে না নিলে শাসন যন্ত্র বিকল হয়ে পড়বে। ভাগ হোল। ভেনেজুয়েলা, পানামা, বোলিভিয়া, একোয়াদোর, কলম্বিয়া। নৈলে প্রাচীনকালে এসব ছিল ইন্‌কা সাম্রাজ্যের অংশ।

এর মধ্যে বোগোতা শহরটির সঙ্গে মাগদালিনা নদীর অববাহিকার কোনই যোগাযোগ ছিল না। দুর্ভেদ্য, মানুষের অগম্য, আন্দিয়ান পর্বতমালা বোগোতাকে স্থল-পথে আলাদাই নয়, অজ্ঞাত করে রেখেছিল। সমুদ্র-পিয়াসী ফিরিঙ্গীরা যোগাযোগ রাখতো জলপথেই। বোলিভারই প্রথম (এবং শেষও) এই পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বোগোতা দখল করেন। পৃথিবীকে অবাক করেন। ইতিহাসকে গরিমায় সমৃদ্ধ করেন। অসম্ভবকে সম্ভব করে স্পেনের কারামাং চিরকালের জন্য গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দেন।

নৈলে মাগদালিনা নদীর মতো বিশ্রী জলা একমাত্র আমাজোনে আছে। সুন্দর বনের বাদা জলা এর কাছে যেন লণ্ডনের কাছে ডানকুনি। এই নদীর মোহানায়ই আছে কোলোম্বিয়ার সম্পদ,—তেল। এখানেই আছে বন্দর। তাই কোলোম্বিয়ার রেলপথের প্রথম এবং বড় অংশ ঐ তেলের ক্ষেত আর বন্দরের যোগাযোগ রক্ষায় তৈরী হয়েছিল—"বোগোতা-সান্টামার্টা-কার্টাজিনা" রেলওয়ে। নৈলে মানুষের, প্রজার উবগারের কথা কেউ ভাবে না। সে'জন্য আছে মার্কিনী ও জাপানী বাস।

আজও কলোম্বিয়ার চলাচল ততটা রেলপথে নয়, যতটা মোটর পথে। এক আছে সেই সারা দক্ষিণ আমেরিকা ব্যাপী (উত্তর-দক্ষিণ-সমুদ্রতীরবাহী) আমেরিকান হাইওয়ে; আর আছে কোলোম্বিয়ার গর্ব, সাইমন-বোলিভার হাইওয়ে।

মধ্য বোগোতার ঘর বাড়ি ইমারতি ছন্দটি কলোনিয়ল যুগের। সেই ঢাউস এবং বোরোক ছন্দ ঘিরে চারপাশে এককালে ছিল শহরতলির বস্তি, স্লাম। যত সব গরীব দিন-খাটিয়েদের বাস। ওরা না থাকলে, এরা থাকত না। মড়া না থাকলে শকুন থাকত না।

সেই বরবাদীকুলের আবাদিটা কেউ আর নাড়েনি। কেবল সরকার থেকে বড় বড় "পাড়া" করে দিয়েছে। বলে, হাসিয়েন্দা। (আসলে "হাসিয়েন্দা" মানে "ছোট জমিদারী," জোৎদারী / নিজে না খেটে বেগার চালিয়ে ফুটানী)। সরকার বাড়ি করিয়ে গরীবদেরই বসত করিয়েছে। কিছু কিছু পাঁচ-ছ তালা বাড়িতে বাক্সের মধ্যে মুর্গীর মতো গরীবরা বাস করে। ওরা যে গরীব। একদায় ছোটলোকদের অধুনার বড়লোক করে দেবার র'মেটিরিয়াল। ওদের যা' হয়েছে তাই ঢের।

তাই তার বাইরে নতুন শহরের পত্তন, পুরোনোকে ঘিরে। উত্তরে সান্তা বারবারা। এ তল্লাটটাই হোল ব্যবসা-বাণিজ্যের তল্লাট। 'কমার্শিয়াল কোয়ার্টার'। বাণিজ্যিক অফিস, ব্যাঙ্ক, হোটেল। আর খুব সাজান ঝলমলে শপিং-সেণ্টার। গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। সিনেমা হাউসের অন্ত নেই। অত্যন্ত সুসজ্জিত জনতা। অশালীন কেউ নয়। প্রচুর রেস্তরাঁ। ...লক্ষ্য করার একটি জিনিষ—মদের দোকান খুব কম। প্রচুর ফল খায় এরা। ফলগুলি রূপে-রংয়ে-রসে, স্বাস্থ্যে, জৌলুসে, চিত্ত চমৎকার, মনোহারি।

—"তাতো হোল, কিন্তু নতুন সমাজের বোয়াল-পূজারী উঠতি রুই-কাৎলারা থাকে কোথায়?"

নীনা বলে, এই "গোলার্ধে নয়: দক্ষিণে। সেখানে সবই 'রেসিডেন্‌সিয়াল' বাড়ি। যেমন তার বাগান, তেমনি তারই মধ্যে নবীনতম স্থপতি—শিল্পের নানা নিদর্শন। এরা স্কাই স্ক্রেপারকে এখনও পরিহার করে আছে। ফলে—বাগান, গাছ, রোদ, পাখি, ফুলের সমারোহ।"

বোগোতার আবহাওয়াই মানুষের মনে ছড়িয়ে দিয়েছে এই নৈসর্গিক ঐশ্বর্য। ৫৬°-৫৮°-৬০° এরই মধ্যে তাপমান। বৃষ্টি খুব কম, ঠিক যেন যতটা দরকার তার বেশী নয়। আর ঝকঝকে আকাশ চুয়ে রোদের বন্যা। ঝকঝকানিটা নীলমের, হাল্কা নীলমের সুনীল বিস্তারে।

এ দেশে বুক ভরা ফুল আর আকাশ-ভরা পাখি হবে না—হ'বে কোথায়?

তিনটে বাজে। এখনও যদি কিছু না খাই, খাওয়াব কখন? বল্‌লাম "রেস্তরাঁয় নয়। চল, কোনো বড় হোটেলে। নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও 'বুফে' আছে।"

নীনা খবরের কাগজ দেখতে লাগল।

বোগোতা কন্টিনেণ্টালে বুফের নোটিশ পেয়েছে নীনা। দেখলাম ও ফ্রুট-লাঞ্চ নিল। আর নিল লিভার ভাজা। আমি বেক্‌ড্ মাছ, এবং ফল আর দৈ। মধু সোজাসুজি চিকেন আর সেদ্ধ মটর।

দেখি, নীনা হঠাৎ আমার দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে আছে।

—"কী? কী ভাবছ?"—হেসে ফেলি। "ফোগলার খাওয়া দেখছ?"

—"ভাবছি না। ফোগলার খাওয়াও দেখছি না। দেখছি আর কিছু।"

—"কী পেলে দেখবার?"

—"যা' চোখে দেখা যায় না।"

—"অর্থাৎ!"

—"কতো বয়স হয়ে গেছে আপনার! অথচ, আশ্চর্য রকমের উৎসাহের ফোয়ারা, হৃদয় ভরা মানুষ, মানুষ ভরা দরদ। ঠিক যেন ডন্. কি. হোতে—? তা'ই না?"

"যে বয়সে যা' মানায় না তাই?"

হাসে নীনা। "ক্ষতি কি? ডন. কি. হোতের হৃদয় ক'জন পেয়েছে, পায়? আপনি মানবেন কি না, জানি না। রোমান্টিক ভাবনার ধারা যেন সমুদ্রে চন্দ্রের ছায়া। শান্ত অবস্থায় অপরূপ; বাড়াবাড়ি হ'লে সর্বনাশ মানি। কিন্তু রোমান্সহীন পৃথিবী? রোমান্সহীন জীবন? কী জানি সে কেমন?"

—"ঐ রোমান্স বাবদে আমারও অখ্যাতি আছে, ঐ ডন্-কি-হোতেরই গোত্রের। আমিও সার্ভেন্তেসের চোখে এক ডন-কি-হোতে ছাড়া আর কিছুই নয়। এই আমার 'স্যাঙ্কো পাঞ্জা'।—নাম আজ মধু, কাল ছিল বুড়ি। যখন যে।

"রোমান্স-প্রীতির একটা গল্প বলি।"

"মিনিয়াপোলিসে আছি তখন। মাসটা অক্টোবর। ও জায়গাটা তো হ্রদে হ্রদে ছয়লাপ। বয়ে চলেছে মন্থরগমনা মিসিসিপি ঢাউস ঢাউস বার্জ বুকে করে। আর নির্জন উঁচু পাড়ের ওপর জঙ্গলগুলোয় হেমন্তের রং লেগেছে। মেপ্‌ল্ গাছের পাতাগুলো সোনায় —আগুনে, তামায় চকোলটে এক অবর্ণনীয় বর্ণাভায় দপ্‌দপ্ করছে। মনে হোলো এ সময়টা নগরের নয়, সভ্যতার নয়, বন্ধুর নয়। এ সময় একার, বিজনের, অরণ্যের, উদাসীনের, এ হোল অশালীনা, নগ্ন-ব্রতাতুরার বসন-মোচনের সন্ধি-লগ্ন। স্বৈরিণী প্রকৃতির আহ্বানে মুখর বনস্থলীর আসঙ্গের কাল।

"একখানা গাড়ি। চালক রোমিও, সঙ্গিনী দু'টি তরুণী—চাঁদ আর ডায়েন্—শেষ-মেশ এসে চাপলেন ডঃ অগ্নিহোত্রী। ভাগ্যিস গাড়িখানা ছিল একখানা—যাকে বলে, মিনি বাস। শেষেরও শেষে লাফিয়ে উঠে বসলো আরও দু'টি কিশোরী, ডঃ উধ্বর্ধের মেয়ে। নির্বোধ নাগরিকতায় মশগুল অত্যাধুনিকার খোশবয় ছাড়ছে। এই স্বচ্ছল সময়ের দুর্বহভারে খিন্ন শহুরে পোকারা।

"ওরা জানে না কোথায় যাচ্ছি। যাচ্ছি যে সারা দিনমানের জন্যই। পাহাড়ী পথ ধরে পৌঁছালাম বনানীকীর্ণ আনানন্দেল নদীর অববাহিকায়। নদীটা একধারে মিশেছে মিসিসিপিতে, এবং অন্য ধার আরম্ভ হয়েছে ইডেন-ভ্যালিতে। বিশাল হ্রদের ধার ঘিরে কতোই লগ্-হাউস! কতো মোটর-বোট! কতো ব্যসন মেশানো বাবুয়ানির উপকরণ-পীড়িত প্রচার।

"সারাদিন ওরা সবাই হৈ-হৈ করল। স্নানের হুলাহুলিতে আছড়ে পড়ল। ছবি তুলতেও বাধ্য করল, যেন মুহূর্তগুলির সুধা চিরকালের দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবে। তারপর সন্ধ্যার আগটায় ফিরছি।

"দীর্ঘ, সুদীর্ঘ সঙ্গীহীন বিরহ-বিধুর পথ। দু'ধারে অজস্র অবিবাহিতা কুমারী ক্ষেত্র। সুবিস্তৃত তার অনন্ত আকুল আহ্বান। পূবে পশ্চিমে আকাশ সাগ্রহে ঝুঁকে পড়েছে সেই অনাবৃতা ধরণীর বুকে। আর মাঝে মাঝেই হ্রদ, জলের চত্বর, আকাশের আলোর ফলন সেই জলের বুকে।

"তখন দেখলাম আমাদের পরিচিত তপন দেবকে। সোনার রথে নেমে আসছেন ধরণীর কপোল দেশ স্পর্শ করার লোভে। অপূর্ব সে দৃশ্য! যেন দৃশ্যের দৃশ্য। অমনটি দেখিনি; দেখা যায় না। যেন এতো আয়োজন করে এই নিভৃতে প্রবেশের বিদেহী পুরস্কার দু-হাত উজাড় করে প্রকৃতি ঢেলে দিলেন। ইন্দ্রকে দিয়েছিলেন যেমন অহল্যা।

"আমি গেয়ে উঠলাম :—

"এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যো বিশ্বমনু প্রভূতঃ
একৈবোষাঃ সর্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বিবভূব সর্বম্।"—

ডঃ অগ্নিহোত্রী উৎফুল্ল হয়ে প্রশ্ন করলেন—"বুঝলে অর্থ?"—

"The fire is one ; yet it takes a thousand forms. The sun is one, yet it engulfs the universe with its colourful effulgence. The Dawn has many forms although She is one. Thus the One manifests itself in a variety of forms."

"আমি ক্যামেরা নিয়ে নেমে পড়লাম। সেই জ্যোতিরূপের বিভিন্ন ছবি নিলাম, যাবৎ না সেই জ্যোতিপুরুষ পর্দা টেনে দিয়ে অন্ধকারে এক হয়ে গেলেন ধরণীর গর্ভ-গৃহে।

এ দেখা, এই অনুভব, এই বলাকে যদি বলো রোম্যান্টিক,—যুগে-যুগে, জন্মে-জন্মে আমি রোম্যান্টিক। রোমাঞ্চের উল্লাসই প্রাণের বাসর-তীর্থ।"

হঠাৎ যেন কোথা থেকে সেই নীনা ফিরে এল। বলল—"সময় অল্প। চলুন, দু'টো জিনিষ দেখিয়ে একেবারে প্লেনে তুলে দিয়ে আসি।"

—"কোন দু'টো?"

"তোকোয়ানামা ফল্‌স্। ফল্‌স্ বলতে এমন কিছু নয়। কিন্তু পথে যেতে যেতে বহু হ্রদ, বহু বাগান—সুন্দর। খুব সুন্দর।"

প্লাজা সাস্তান্দের থেকে গাড়ি নিলো নীনা। খুব বেছে নিলো। গাড়িতে উঠেই

ভূমিকম্পের কথা তুললো নীনা। বললো—"বোগোতার অভিশাপ ভূমিকম্প। বোলিভারের সময় এক সর্বনেশে ভূমিকম্প হয়েছিল। তবে তাতে সুবিধেই হয়ে গিয়েছিল। বোলিভার নতুন করে বোগোতা সাজিয়ে গরীবদের জীবনে আনন্দ বিতরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন—'মাচো'র মতন 'মাচো'। মেয়েদের অমন সম্মান কেউ দেয়নি। —আর তারপর এই সে-দিন হলো প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প। সমস্ত বোগোতাই যেন গুঁড়ো হয়ে গেল। তাই তো এতো বাগানওলা একতালা বাড়ি। বড় বাড়ি করার রীতিই নেই। ভয়,—ভূমিকম্প। বাড়ি হ'বে খোলা-মেলা, ফুল-বাগিচার মাঝে, সামনে পেছনে বারান্দা, মাঝে 'পাতিও' (বাড়ির মাঝে চৌকো উঠোন)।"

গাড়ি চলছে। আমি ছোট ছোট প্রশ্ন করে জেনে নিলাম কোলোম্বিয়া সম্বন্ধে কয়েকটা কথা। পৃথিবীর মধ্যে কফির আবাদীতে কোলোম্বিয়া দ্বিতীয়। সোনা-রূপার খনি—; বলা হয় 'অফুরন্ত'। তাছাড়া আছে প্লাটিনাম, পেট্রল, নুনের পাহাড়।

কিন্তু...... !

কিন্তু...... !

"এসব ব্যবসার সিংহভাগই মার্কিনী। সেই দৌলতের বিনিময়ে দেশের 'আমদানি' পণ্যের অর্ধেকটাই আসে মার্কিন মুলুক থেকে। দু'টোয় যোগফল কি দাঁড়ায় ?—'লুট।' ইন্সোরেন্স কোম্পানির মধ্যে ২০।২৫ টি-ই বাইরের কোম্পানী।

"চিলিতে সালভাদোর আলেন্দী এই লুট বন্ধ করতে চেয়ে বেশ কিছু ব্যবসা 'ন্যাশনালাইজ্‌ড্‌' করলেন। ফল কি হোল ? সি. আই-এর গুলি ! তক্তে বসলো সামরিক শাসন।

"পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পান্না-পাথর (এমারেল্‌ড্‌) পাওয়া যায় কোলোম্বিয়ায়। বিরাট বন-সম্পদ এবং সমুদ্র-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এখনও সে সম্পদে হাত পড়েনি ; যখন পড়বে ; তখন কা'র হাত যে পড়বে—সেটা নিয়েই রাজনীতির বোঝা-পড়া। আমাজোন এবং ল্লানোদের (ঘোড সওয়ার বন্য উপজাতি) এলাকায় আজও হাত পড়েনি। যখন পড়বে, কা'র যে পড়বে জানা যায় না। প্রেসিডেন্টই সর্বে-সর্বা, সৈন্য-বিভাগের সর্বাধিনায়ক, তবে ১৩ জনের উপদেষ্টামণ্ডলীর পরামর্শেই চলেন। চলতে হয়। বাধ্য। এ ছাড়া মার্কিনী 'বন্ধু'রাও তখন উপদেশ শুনতে বাধ্যই করেন—'বন্ধু' হিসেবেই অবশ্য। ওঁরা তো আবার দেমক্রাটিক।—তাই না ? ফ্রী ওয়ার্ল্‌ডের ফ্রীডম্‌ আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে রাখতেই ব্যস্ত।"

আমি এক ফাঁকে বলেছি, "নীনা, মার্কিনদের ওপর তোমার এতো রাগ কেন ?" উস্কে দিতে ভালো লাগল।

"রাগ বলছো ? অনুরাগ বলো। আমার মতো বোগোতার শত শত নায়িকার সতীত্ব রক্ষা ওদেরই কারামাৎ। ওদের টাকা নৈলে আমাদের প্যান্টীও কেনা যায় না। ওদের জন্যে রাতগুলো 'হাঁ'-করে চেয়ে থাকে, দিনগুলো চোখ-বুঁজে নেয়। —ওদের ওপর রাগ ? কখন বলবে, আমি কম্যুনিষ্ট ! যেমন কুবাকে বলো। তোমরাই হ'লে পেতী-বোর্জোয়া : ভেজা বেড়াল।"

সোজা হয়ে বসলাম।

—"ক্যুবা? ক্যুবা কি কম্যুনিষ্ট নয়—বলতে চাও?"—আমি খোঁচাই।

—"নিশ্চয়ই। এক পয়সার মার্কিনী জিনিষ কেনে না; মার্কিন উপদেষ্টা রাখে না, মার্কিনদের মেয়ে জোগানো বন্ধ করেছে। নিজের পায়ে দাঁড়াবার স্পর্ধাটি তো কম নয়! আরে আরে গ্রাণাদায় দেখলে না? নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়েছিল। পা কাটতে গিয়ে মাথাটাই কেটে ফেলল। তা' অমন ভুল—প্রেমে আর রণে হয়েই পড়ে। কি বলো? আমি কিন্তু মার্কিন ভালোবাসি। গত চার বছর ধরে বুকে জড়িয়ে রেখেছি।"

ও বলছে বটে, ওর গলা ভারী। চোখে জল আর আগুন একত্রে।

—"তোমার বয়স কতো হোল, নীনা? মাপ করো, মেয়েদের বয়স বোঝা দায়।"

—"ছাড়, ছাড় ঐসব ন্যাকামী বুলি। মেয়েদের কি বয়েস হতে দাও নাকি তোমরা? কাঁচায় খাও আচার করে, পাকায় করো জ্যাম। (**They are pickles when green ; jam when matured**)।

"তা'র মধ্যে নেংড়াবার মৌকা পেলে নেংড়াও। বয়েস! বয়েস দিয়ে করবে কি? মেয়েদের বয়েস লেখাই থাকে বুকে, পায়ের গোছে আর চোখের তারায়।—তা বোলে মুখে নয়। মুখ সাজানো। মার্কিনী পয়সার সার, আর তাডশের রস পেয়ে যা সব বাড়ার চট্‌পট্ বেড়ে উঠেছে, ঈডেন থেকে তাড়িয়ে দেবার আগেই।"

বাণীর এমন খরধারের মুখে পড়ে মধুর মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়,—"হায়, ভগবান!"

কট্‌মট্ করে চাইলো মধুর দিকে। বলা যেতে পারতো 'মধুর করে'। কিন্তু জল আর আগুন কি এক সঙ্গে থাকে? মধুর হয়?

সে চাওয়া যেন জলে-আগুনে এক কুরুক্ষেত্র সংঘর্ষ। সেই দৃষ্টি মেলে দিয়ে নীনা বলল—'হে যুবক! এই সভ্যতারই এক মহান লেখকের ভাষার-দৌলতের প্রশংসায় মার্কিন প্রেস শত-মুখ। অথচ তা'র লেখার বিষয় বস্তু কি ছিল? মনে পড়ে? একটি মাত্র কাঁচা কিশোরীর দেহ তচ্‌নচ্ করা, তা'ও সেই কিশোরী 'ললিতা'র মাকে বিছানায় ফুসলে নিয়ে গিয়ে সেই বাগে মেয়েটাকে চিবুনোই উদ্দেশ্য। এমন লেখককেও নোবেল প্রাইজ দেবার কথা উঠেছিল, কেন? সে নাকি, মুন্সি লিখিয়ে! সে নাকি, খলিফা ভাষাশিল্পী! যতো সব ভণ্ডামী।...আমার বয়স আমি মাপি—কটা পুরুষ পার করেছি, তাই দিয়ে। তুমি মাপতে চাও? তুমিও এস। নিমন্ত্রণ রইল।"

মধু মিচকি হেসে জিগ্যেস করে—"ক'পুরুষ?"

আমি ধমকাই—"থামো মধু। এই যে বুড়ো-রক্ত, এ-ও খলবল করে, দাউ দাউ করে জলে ওঠে। বলো বেটি, বলো, কী বলছিলে।"

—"আমি আর কি বলবো?—যাচ্ছেন তো পেরুতে। সেখানে গিয়ে দেখবেন, সুসজ্জিত লীমা, প্রত্নশহর কুজ্‌কো, আর বিংশতাব্দীর আশ্চর্য আবিষ্কার বিস্মৃত শহরের কঙ্কাল মাচ্চু পিচ্চু। দেখুন যদি ইচ্ছে যায়। কিন্তু যদি ভাগ্যে জুটে যায় এমনি এক ফাল্‌তু নীনা, তা'র কোলে চড়ে দেখবেন আসল পীরু, জীবন্ত পেরু—যে পেরু পাঁচশো বছর

আগে তা'র হাসি হারিয়েছে :—হারিয়েছে তা'র সত্তা। পেরুর উন্নতি-অবনতির বাইরে তাদের অন্য এক ষ্টাটিস্‌টিক্‌স্‌।···দেখবেন, সেখানে প্রতিটি পাহাড় ধোঁয়াচ্ছে। দেখবেন, হাজার হাজার বর্গগজ জমি জবর-দখল করে নিচ্ছে নতুন সমাজ। দেখবেন, গেরিলা কাকে বলে। দেখবেন, নিজেদের পুড়িয়ে ভবিষ্যতের সমাজ গড়ার সেই প্রচেষ্টা।······ফালতু টুরিষ্টরা কী দেখে, জানেন? কৃষ্টির লালবাতি-পাড়া। দেখিয়ে, চোখের ফাঁদে ফেলে, রূপ বেচার সে এক তোফা কায়দা।······যান পেরু! গিয়ে দেখুন। দেখুন, আজ যতো আগুন ধোঁয়াচ্ছে ভেতরে, ততোই ছিঁড়ে বা'র হয়ে ছড়াবে বাইরে।"

হাঁপাচ্ছিল মেয়েটা।

চেয়ে চেয়ে দেখি ওর পাংশু জ্বলন্ত মুখখানা। অত্যাচার, অনাচার আর ব্যভিচার সত্ত্বেও দুরন্ত স্বাস্থ্য, প্রখর তেজ। বাঘিনীর মতো পিচ্ছল, চিক্‌কণ অথচ বাঘিনীর মতোই ভাবনায় হিংস্র। ওর স্মৃতির বনে রুদ্রাণীর চণ্ডতা। কী যেন এক জিঘাংসা প্রবৃত্তি ওর রমণীয়তার আড়ালে ও পুষছে। ধোঁয়াচ্ছে, ধুঁকছে—শ্যামলের চিহ্ন বিহীন আগ্নেয়-গিরির মতো।

চেয়ে চেয়ে দেখি কালো মিশমিশে চোখ, কালো চুল, নিটোল দীঘল কণ্ঠ, জামার কাটটা নেমে গেছে যৌবন-মহিমার পাদদেশে। কতো সুন্দর, সুঠাম, কোমল; কিন্তু কোন এক দাবানল জ্বলছে ওর নাড়িতে নাড়িতে। 'বহ্নি বন্যা-তরঙ্গের রোল,'—একেই বলে।

তাই একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বলি,—"জানো নীনা. আমার দেশের এক বিখ্যাত কবি তোমার দেশের না হলেও তোমাদের ভাষার এক বিখ্যাত কবির বন্ধু হয়েছিলেন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নাম শুনেছো?"

—"নাম? তার কবিতার আসরে বসে সেই অনবদ্য কণ্ঠ শুনেছি; আর পাবলো নেরুদার। তোমরা কবিতা পড়ো? তোমাদের কবি কি বলেন? শোনাতে পারো তাঁর বাণী? আমরা ক্রিওল স্পানিশভাষীরা কবিতা শুনতে খুব ভালবাসি। আকাশ-কুসুমের কবিতা নয়। কবিতা আমার, তোমার, প্রাণের, দেহের, ক্ষুধার, সংগ্রামের, নিত্য-দিনের, প্রত্যহের, প্রতিজনের, প্রতিমর্মের।—শোনাও, শোনাও।"—

আমি বলে যাই,

'দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহা জনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।

সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।'

ইংরাজীতে তর্জমাটা দেবার পর ও হঠাৎ গলা তুলে বললো,—"আগে বলোনি কেন? কী লাভ তোমার ক্যাথীড্রাল, মিউজিয়াম, আর পথের সমারোহ দেখে? কী লাভ? কী লাভ যেয়ো একটা মেয়ের ওপরের সাজ দেখে? নিয়ে যেতেম তোমায় যেখানে তুমি আছো, আমি আছি,—প্রবৃত্তি হয়ে নয়, বৃত্তি হয়ে নয়, প্রশ্ন হয়ে, বিরাট প্রশ্ন হয়ে,—বিরাট এক প্রশ্নের বিরাট উত্তর হয়ে।"

—"উত্তর পেয়েছো?"

—"পাওয়া যখন যায়, তখন তুমি এলে লাভ কি? খুঁজছি যখন, তখনই তো বন্ধুর দরকার।"

আবার চেয়ে দেখি মেয়েটাকে।

—"পড়াশুনো করেছো কতোটা?"

—"কেন বলতো? হঠাৎ? পাকা-পাকা কথা বলছি, তাই? মনে রেখো কোলোম্বিয়া—একোয়েদোর এর সংস্কৃতিতেই দাগা আছে এক বিরাট অহঙ্কার, তাদের শিক্ষা বাবদে। এতো বেশী, এতো পুরোনো, এতো মেকী শিক্ষণ-ব্যবস্থা পৃথিবীতে কোথাও নেই। আমরা বিদ্যেধরী হ'তে পারি, কিন্তু বিদ্যেটা বাজারু করেছেন ঐ চার্চ-ভজা পাদ্রীগুলো। কোনো বিদ্যে শেখাতেই ওরা পেছ-পা নয়। আমার সব বিদ্যের সেরা বিদ্যের হাটটি ওরাই প্রথম খুলে দিয়েছিল। ফলে আমরা বেশীর ভাগই সেল্‌ফ্‌ এম্‌প্লয়েড্‌। ওদেরই শিক্ষাতে তো! উব্‌গার কি কম করেছে? বিদ্যেতে ঘেন্না, ধর্মে ঘেন্না। নীতি, সেবা, দান, উৎসর্গ—সব-সব-সব একটা উন্মাদ অট্টহাস। ভাঙ্‌-ভাঙ্‌-ভাঙ্‌—সব ভাঙ্‌। ভাঙতে হ'বে।"

—"হবে? কবে হবে, নীনা?"

—"দেখবে দেশে ফিরতে না ফিরতে বিনা কম্পে ভূমিকম্প, বিনা আগুনে আগ্নেয়গিরির লাভা। বিনা শব্দে বজ্রপাত—দেখবে। দেখবে, শুনবে। একোয়াদোর, বলিভিয়া, পেরু, চিলি সব—সব-সব ধোঁয়াচ্ছে।"

—"সে তো বলিভারের সময়েও হয়েছিল।"

—"ঠিক বলেছ। সাইমন বোলিভার। সে পারত। পেরেছিল।"

—"পারল না কেন?"

হিসহিসিয়ে বলল—"বোলিভার মরেছেন। তাঁর মৃত্যুর তারিখ আছে। কিন্তু ওরা, ঐ বিষাক্ত নাগগুলো, হাঙ্গরগুলো, ড্রাগনগুলো,—ওরা,—ওরা যে মরেনি। ওরা যে অমর।"

ফ্যাকাশে চোখে তাকাল বটে; কিন্তু কতো ভাবেই সে-চোখ জ্বলে উঠল, কতো রঙে।

মনকে বলি, 'মন! এমন-টাই কি তুমি চেয়েছিলে? এরই সন্ধান, কি তোমার সন্ধান? দেশ দেখো মন; কী দেখো? মানুষ দেখো? কী দেখো? টোকিও শহরের গিঞ্জা পাড়ার নিচিগেকী মিউজিক হলে দেখেছিলে মুঠো মুঠো সুন্দরীর নগ্ন-নৃত্য; সে নগ্নতা দেখেছিলে পারীর মল্যা-রুজে, লণ্ডনে, ন্যুইয়র্কে। কী দেখেছিলে মন? দেহের নগ্নতায়

কী ছিল? এ যে মনের নগ্নতা, বুভুক্ষার নগ্নতা, অত্যাচার নৃশংসতার নগ্নতা। এ নীনাও তো নগ্নিকা হয়েই দাঁড়িয়েছে তোমার মনে, চৈতন্যে। এই-তো তোমার দুরন্ত তালাশ। এ নগ্নতাই তো জ্বলে উঠেছে ধ্বক্ ধ্বক্ করে নীনার চোখে। হায়, বারবনিতা নীনা! এ দেশের আত্মা তুমি। তুমি নির্যাতন। তুমি ধর্ষণ, তুমি পাপের জননী নিঋতি। শ্যামা তামসিনীর বেদবিধৃতা জনয়িত্রী।

—"পারলো না কেন? সাইমন বোলিভার পারলো না কেন? মনে রেখ প্রফেসর,—বিপ্লবের সার্থকতা এক; বিপ্লবান্তর শাসন-ব্যবস্থার সার্থকতা আর। বিপ্লব কি মার্কস্ বলতে চাননি; বিপ্লব কেন—এটাই তাঁর বিরাট ধাক্কা; মগজে ধাক্কা। সেই ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠলেন লেনিন। তিনিও বিপ্লবান্তর এই শাসন-ব্যবস্থার বেলায় বলেছেন,—এর সমাধান দুরূহ। তার মতে বিপ্লব, ধ্বংস এবং সমাজ নির্মাণের মাঝের সেতুটি বাঁধতে হবে একটি ব্যক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীনে সর্বাত্মিক ক্ষমতা দিয়ে।...এখানেই সমূহ বিপদ। এই সর্বাত্মিক ক্ষমতায় চড়া এক কথা; কিন্তু নামা—সে এক অন্য কথা। চড়তে হ'বেই। নামতেও হবে। এই চড়া-নামার মাঝে যে গঠনশিল্প, যে স্থায়ী স্থাপত্য—সে-টার নির্মাণ যেমন দুরূহ, তেমনি নির্মম, নৃশংস, রক্তাক্ত। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক হতে হবে এই নায়কত্বকে।

"হুয়ারেথ্‌কে জানো? ক্যাস্ট্রোকে? মাও-কে? যদি খুব উদার, দার্শনিক, নিরাসক্ত, অথচ দৃঢ়, না হও,—মধ্যবিত্ত পেজোমী, মধ্যবিত্ত নীচতা, কৃপণতা, ষড়যন্ত্র তোমার নামে ধুয়া তুলবে, তুমি একেশ্বর, ডিক্‌টেটর। সেই পাপের ভারে বহ্নিগর্ভ সংগ্রামী জয়যাত্রাও হয়ে যাবে বিষাক্ত সাম্রাজ্যবাদ; যথা নেপলিয়ঁ;—হয়ে যাবে, পচা ফ্যাসীবাদ, যথা মুসোলিনী, হিটলার। কিন্তু সহস্র বাধা, বিপত্তি, উপহাস, বিদ্রূপ,—এমন কি কাউণ্টার রেভল্যুশনের চোয়ালও চিবিয়ে ধরে জন্মগত পাঁড় অসুরকে (unholy), অবিচল একেশ্বরকে। একেশ্বরতার ফেরে পড়ে দফায় দফায় বহু সংগ্রামী শেষ হয়ে গেছে। বদনাম কিনেছে তারা একেশ্বর, ডিক্টেটর, ফ্যাসী। অথচ কিছুকালের জন্যে এই একেশ্বরতার দরকার। বিপ্লবকে স্থিরতা, দৃঢ়তা, পোখ্‌তো করতে হবে।"

আমি যোগ দিই;—"এই চেষ্টা পেয়েছিলেন গ্যারিবল্‌ডী—নির্বাসিত হলেন। চেষ্টা পেলেন সাইমন বোলিভার—নির্বাসিত হলেন, অর্থাৎ স্বেচ্ছায় নির্বাসন বেছে নিলেন। নেপোলিয়ন হওয়া ছিল তাঁর পক্ষে উন্মাদ ব্যর্থতা। হিটলার হওয়া তার পক্ষে ছিলো অসম্ভব।"

নীনা আগুন-ঝরা কণ্ঠে বল্‌লো,—"তিনি হ'তে চেয়েছিলেন ক্যাস্ট্রো, পেতিয়ঁ, পাওলি, মাও। বিশেষ ক'রে। কিন্তু সে যুগে মাও, ক্যাস্ট্রো, হো-শী-মীন দূরে থাক,—গ্যারিবল্‌ডী বা লেনিনকেও তো ইতিহাস জানতো না।"

হঠাৎ নীনা মলিন বিমনা হয়ে গেল। দূর আকাশের দিকে নয়, নিজের হাতের নখের দিকে চেয়ে চুপ হয়ে গেল।

আমি ধীরে ধীরে বলি—"চুপ করে কি ভাবছ?"

ও আতপ্ত কণ্ঠে জবাব দেয়—"ডিকৃটেটরশিপের দায়ে বোলিভারকে অভিযুক্ত করেন রিএ্যাকশনারীর দল। ফলে. তাঁরই সৈন্যদলে ফাটল হতে পারে বুঝে, তিনি স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ালেন। চেয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার এক ফেডারেশন; ইতিহাসের প্রথম ইণ্টার-ন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট স্টেট, যেখানে জমি হ'বে চাষীর। পার্লামেণ্ট হবে জনতার, জনতা হ'বে তাই; যা' সংখ্যালঘুকে সম্মান করবে, ধারণ করবে। যে শাসনে সংখ্যালঘুরা বিপন্ন, সেটা সোশ্যালিষ্ট দেমক্রাসি নয়।—হতে পারে না।"

আমি হঠাৎ বলি,—"দেমক্র্যাসির বিষই এই যে, দেমক্র্যাসির "নির্বাচন" নামক গ্যাঁড়াকলে গণের সংখ্যার চাপে লঘুসংখ্যকদের পাত্তা মেলে না। লঘু সংখ্যকরা হয়ে পড়ে বেইমানের বাজী-তে ছকের ঘুঁটি।"

নীনা বাধা দিয়ে বলে,—"কিন্তু বোলিভার তো ছিলেন, ইতিহাসের নাটকে যবনিকা তুলেই সোজা তৃতীয় অঙ্কের নায়ক; প্রথম-দ্বিতীয় অঙ্ক হ'বার আগেই যদি তৃতীয় অঙ্কটা হতে থাকে, সে নাটকের ট্র্যাজেডী রুখবে কে? সময়ের আগের কাল-পুরুষ। ম্যান বর্ন্ বিফোর হিজ্ টাইম্। তারা একটু ধূমকেতু গোত্রের। তাড়াতাড়ি মরে।

"প্রমাণ চান? প্রমাণ তাঁর কনষ্টিট্যুশন, তার অজস্র চিঠি পত্র। তাঁর লেখা 'জ্যামায়কার পত্র'। প্রমাণ তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসন। ভেনেজুয়েলার কনষ্টিট্যুশ্যান ভেঙ্গে যাবার পর পেরু তাঁকে জীবনভোরের প্রেসিডেণ্ট করে দেয়। একোয়াদোর, গ্রাণ কলম্বিয়া থেকে সরে এসেও; পেরুতে এসে শাসন করতেও তো পারতেন। নিজের 'একেশ্বরতা' ফলাতেও পারতেন। পেরুতে তো তখন তাঁর ছেলের মতো প্রিয় জেনারাল স্থক্রে প্রেসিডেণ্ট। না; তিনি তা করেননি। স্থক্রে ডাকা সত্ত্বেও করেননি। নিজের জন্মভূমিতে অবিশ্বাসী কৃতঘ্নের বদনাম কিনে, পরদেশে প্রেসিডেণ্ট হতেও চাননি। যুদ্ধ তাতে বাড়তো। হায়, বিধাতা! এই মানুষকে বলেছে একেশ্বরতার লোভী। মনে আছে আপনার? যখন সিনেটে সেই তথা-কথিত 'কৃতঘ্নে'র বিচার হয়, তখন সিনেটই তাঁ'কে 'নির্দোষ' বলে রায় দিল। তবুও তো তিনি নির্বাসনেই গেলেন। দেশ তাঁকে বাঁচার মতো পেন্সনও দিল না। তাঁর ব্যক্তিগত কয়েকটা বাক্সভর্তি জামা, বাসন, বই, দলিল—সে সবও সরকারী নির্দেশে বাজেয়াপ্ত হ'ল। পেরুর প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তাঁ'র প্রাপ্য মাসিক বৃত্তি ছিল, তা'ও তিনি নেননি। তাঁর সৌভাগ্য যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মারা গেলেন। তেমন সৌভাগ্যবতী হননি তাঁর প্রিয় বান্ধবী বিপ্লবিনী মানুএলা।"

আমি বলি,—"ফল কি হোল? একশো-চার বছরে ভেনেজুয়েলায় সাতাশ জন প্রেসিডেণ্ট। তার মধ্যে কোন কোন প্রেসিডেণ্ট তো মাত্র সাত মাস, চার মাস মেয়াদেও খতম হয়ে গেছে। প্রেসিডেণ্ট হত্যা আর সিভিল ওয়ারের এমন নজীর আজ অবধি পৃথিবীতে নেই। এই সিভিল ওয়ারের সর্বনাশ সম্বন্ধে বোলিভার বার বার সাবধান বাণী করে গেছেন। কেউ তো শোনেই নি; বরং তাঁকে বদনাম দিয়েছে 'ডিক্টেটর' বোলে।"

—"সান্তান্দেরে'র নাম শুনেছেন?"—নীনা বলতে লাগলো, "আইনজ্ঞ সেই শিক্ষিত

অতিশিক্ষিত কনষ্টিট্যুশানালিষ্ট কেবল গদ্দীতে বসে কলমই পিষেছেন। স্ক্রে, পায়েজ, বোলিভার, উর্দানেতার মতো জীবন-ভোর লড়ায়ের ময়দানে ঘোড়ার পিঠে কাটান নি। তিনি ও তাঁর সাকরেদেরা শুধু কাগজী লড়ায়েই প্রমাণ করলেন বোলিভার 'সংশপ্তক' নয়, ডিক্টেটর। সম্রাট হতে চায়। কংগ্রেসের হলে দাঁড়িয়ে বোলিভার এই অভিযোগ অনায়াসে খণ্ডন করতে পারতেন। ভোট সবই তো তাঁর পক্ষে যেত। কিন্তু একতাকে খণ্ডিত হয়ে যেতে তিনি দিতে চাইলেন না। সরে গেলেন।

"বিপ্লবের মাথায় ঘরের শত্রু চিরকাল এই ভাবে কুঠার হেনেছে। কিন্তু কি জানেন? বিপ্লব মরে না।"

কুণ্ঠাভরা জিজ্ঞাসায় প্রশ্ন করলাম—'ঠিক বলছো, নীনা? মরে না?'

—"না। সময় তো দিলেন না। নিয়ে যেতাম চাকুয়েতো, হুইলা, মেতা এই সব কলোম্বিয়ান বর্ডার পাহাড়ী অঞ্চলে। শত শত গেরিলারা এ্যন্দীজ পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে সেঁদিয়ে আদিবাসীদের জ্বালিয়ে তুলছে। বিরাট আয়োজন চলছে। যাচ্ছেন লীমায়। একটু সুযোগ পেলেই যাবেন আয়াকুচো, কুজ্‌কো, পীউনা অঞ্চলে। এ্যন্দীজের পূবের ঢলে। জঙ্গলে। আমাজোনে। না, এ বিপ্লব থামবার নয়। থামবে না। বোলিভার মরেনি। বোলিভাররা মরে না। এসব অঞ্চলে আগুন লাগিয়ে গেছেন শে গুয়েভারা।—বিপ্লব মরে না।"······

একটু থেমে গুনগুনিয়ে আবার বলে—"না, মরে না। ভুল বলেছিলাম। সরি। মরে না। মরলে, আমরা যারা বাঁচতে চাই, তাদের বুকের এ কথাগুলো শুনবে কে?···

"দেখুন, দেখুন,—এ দেশের শোভা দেখুন। এই পথ বোলিভার গড়ে দিয়েছিলেন। এখন যে তোকোয়ান্দেমায় যাচ্ছি, বোলিভার বলতেন যে, সে তল্লাটে একটা দিন থাকলে একশো দিনের পরমায়ু বাড়ে।······বোলিভার তো প্রায় চির জীবনই যক্ষ্মার রোগী ছিলেন। পরিষ্কার হাল্‌কা বাতাস ছিল তাঁ'র টনিক। অথচ চিরজীবন কাটালেন জলায়, অরণ্যে, তুষারে, ঘোড়ার পিঠে, যুদ্ধের ময়দানে। শুধু এইখানে, এই বোগোতায় তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ একুশটি দিন কাটিয়েছিলেন, তাঁ'র প্রেয়সীর তত্ত্বাবধানে। 'মাচো' বলতে 'মাচো।'

তখনই আলগোছে জিজ্ঞাস করি,—"তবে, এসব দেশে, দেশের ইতিহাসে ম্যানুএলার নাম নেই কেন?—বিদেশে দূতাবাসে দূত মশাইদের জিজ্ঞাসা করেছি। ম্যানুয়েলার নাম-ও জানে না। মনে করিয়ে দিতে নাক সিটকে, বলেছে—'ওর নাম আবার কেন?'

"ম্যানুয়েলা যে বিবাহ-পূত শয্যায় লাথি মেরে ঝাঁপিয়ে ছিলেন আগুনে। সে যে খান্‌কী! স্বামীত্যাগিনী! তা জানেন না? জানেন এ যুগটাই বেজম্মার যুগ। মানুষগুলো সব কুত্তিয়ার বাচ্চা। ম্যানুয়েলার শেষ জীবন যেন হোমারের লেখা। ইলিয়ড। বিশ্ববিদ্যালয়-গুলো নেকড়ের আড্‌ডা। পলিটিক্স্‌ নিছক বেশ্যাবৃত্তি। হ্যাঁ, বলছি। এস্কাইলাসের লেখা—'ইলেক্‌ট্রা।' পড়া যায় না। ভাবা যায় না।

"—আমি জানি না ম্যানুয়েলার চেয়ে বড়ো সতী বোগোতা—লীমার ইতিহাসে আর কে আছে।"

আমি কিছু বলার আগেই আগ বাড়িয়ে নীনা বলে,—"বুঝেছি, আপনি গির্জার ভক্ত ন'ন কিন্তু এই গির্জাটার মধ্যে কয়েকটা ভালো ছবি আছে। চলুন, আপনার প্রিয় ছবি। ভালো লাগবে। আশ্চর্য সুন্দর সে সব ছবি। যদিও আপনাদের বহু প্রচারিত মিকেলেঞ্জেলো নয়, রাফাএল নয়, নয় ডেভিড, রুবেন্স, ভালাৎকোয়েৎ, নয় তিন্তোরেত্তো, বুশার, কারভাগজিও, দেগাস্। তবু সুন্দর!......

(অবাক হয়ে নীনার ছড়ানো নামগুলো শুনি। গাইড বটে!)

"...কারণ এ ছবি ধরে রেখেছে ব্রীজের তলায় পলাতক বোলিভারকে ঘিরে তাঁ'র দেহরক্ষী বিখ্যাত ভার্গাস-ব্যাটালিয়নটিকে। বোলিভার পরে আছেন ছেঁড়া শার্ট। প্যান্টে বেল্ট নেই, বাঁ-হাতে ধরা পড়ন্ত প্যান্ট। হাঁটুর কাছে তা'ও ছেঁড়া। তবু বন্ধুদের দেখে চোখে একটা বিজয় দর্প।......আর কা'কে যেন খোঁজা!

"না, আর্টিস্ট তাঁকে আঁকেনি। লিবারেতরের চোখে তৃষ্ণা; কিন্তু লিবারেতরের সেই লিবারেত্রেস্‌কে ভেনেজুয়েলান কোন ঐতিহাসিক চিত্রিত করেনি। ভেনেজুয়েলান কোন নাগরিক তাঁ'র স্মরণের জন্য একখানা পাথর ও লিখে রাখেনি। কোনো পথ, কোন মূর্তি,—না। চিহ্নও নেই।"—

বুঝতে পারলো না মধু।

—"কি হোলো স্যর? এ কার কথা? কে? কিসের ছবি? কা'র ছবি নেই? কেন নেই?"

মধুর কথার তখনই জবাব না দিয়ে তাকাই নীনার দিকে।

—"নিয়ে যেতে পারো আমায় সে-বাড়িখানায় নীনা? সেই শোবার ঘরে? বারান্দাটায়? আছে, আছে সেই, ব্রীজটা? সেই নালাটা সেই অসতী ম্যানুয়েলার সতী তীর্থে?"

হাসে নীনা।—"সত্যিই ভালবাসেন বিপ্লবীকে? চলুন। সব আছে। সব দেখাব। কেউ কিন্তু দেখতে চায় না। অথচ আমি তো অসতী। আমায় কতো জনে দেখতে চায়।"......বলে, আর খট্ খট্ করে হাসে।

..."শহরের বড় চৌক সেটা, আজও। বলে, রিপাব্‌লিক স্কয়ার, ক্যাথীড্রাল স্কয়ার।...

"কি হয়েছিলো স্যর?"—আবার শুধায় মধু।

"...কিন্তু এটা এখন গর্ভনরের বাসস্থান। গার্ডরা ঢুকতে দেবে না।"

হঠাৎ নীনার বাথরুম যাবার দরকার হোল। ও গার্ডের 'অনুমত্যানুসারে' ভিতরে গেল। আমরা বাইরেই দাঁড়িয়ে।

কিন্তু ও ফিরল জাঁদরেল একজন চার-তারার লাল-ফিতা পরা অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে। প্রবেশ তখন রোখে কে?

কিন্তু সে শয়নগৃহে হয়েছে অফিস; এবং সেই বারান্দার রেলিংয়ে পড়েছে শিকের ঘোমটা। ঐখানে রেলিংয়ের পাশের কার্নিশে বসে বলি সেই কাহিনী। ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮২৮, রাত এগারোটার পর।—বৈরিণী মানুএলার কাহিনী।

সে রাত ছিল জ্যোৎস্নায় ধোয়া। আর সেই জ্যোৎস্নার তরঙ্গে স্নান করছেন বোলিভার, প্রেয়সী মানুএলার হাত ধরে, বাগানে পায়চারী করতে করতে।

একজন দীন দাঁড়িয়ে বাগানের পথের পাশে। দেখে, বোলিভার দাঁড়ান। টুপী হাতে মানুষটা শুধু ডাকলো—'পেভি-ডন্'। চমকে ওঠেন বোলিভার ছেলেবেলার সেই ডাকে। পেরেজ্ ইম্মানুয়েল? আঙ্কল্ ইম্মানুয়েল!····

—"তুমি এখানে? কবে থেকে?"

—"তোমার শরীর অসুস্থ শুনলাম। তাই দিদি পাঠিয়ে দিল। বাগান 'দেখি' এখানে।"

—"তাই বল; তাইতো যখন পেঁয়াজ খাই, লেটুশ খাই, গাজর, টম্যাটো খাই কেবল মনে পড়ে কারাকাস, সেই ছেলেবেলার সান্ মাতিও-গাঁ।······তুমি এসেছ, জানতাম না-তো চাচা।"—

জড়িয়ে ধরলেন বোলিভার।

ম্যানুয়েলার দিকে চেয়ে বল্লেন—"ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছ আমায়। আর শিখিয়েছ একটা বিদ্যে,—ষ্টালিয়ন কেন মেয়ারের পিঠে চাপতে যায়!"—

বিরাট হাসির মধ্যে পেরেজ বলে—"কি ভালোই বাসতে ঘোড়া, তা বলো। বিশেষ করে সেই কালো ঘুড়ী-টা? মনে আছে?"

একটু থেমে ম্যানুয়েলার হাত ধরে চলে যেতে যেতে বলেন—"কালো না হলেও এখনও ঘুড়ীই আমার প্রিয়। কিন্তু সময় কৈ?"

সেই রঙ্গরসের মধ্যেই ঘরে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। শরীর তখন বেশ খারাপ। বিশ্রামই পথ্য। এবং ওষুধ।

বিশ্বস্ত ভার্গাস বাটালিয়নের তত্ত্বাবধানে শোবার পোষাকও আলগা করে বোলিভার গায়ে তেল-মালিশ করাচ্ছিলেন। ম্যানুয়েলাই সেই একান্ত সেবাটি করছিল।

হঠাৎ বন্দুকের শব্দ, পিস্তলের শব্দ। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। কে বাধা দিতে গেল। সোজা গুলি। বেচারী ফার্গুসনকে গুলি করেছে কারুজো। তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী ফার্গুসন্।

বোলিভার, আধা-ন্যাংটা অবস্থাতেই তলোয়ারখানা নিয়ে বাইরে ছুটে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়েছিলেন সেই প্রখরা সাহসিনী মানুএলা।

"—বটেই তো! আধা ন্যাংটা হাড়গিলে একটা মানুষ তলোয়ার ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে না ছুটলে এ-রঙ্গ-নাটকের শেষ অঙ্ক মানায়? ঐ দেখো, খোলা জানলা। বারান্দা পার করেই গির্জা। গির্জার ছায়ার অন্ধকার ধরে দৌড়ে পালাও, যেখানে হয়। আমি সামলাচ্ছি এদিক। পালাও; পালাও। বীরত্ব দেখাবার সময় এ নয়।"

কোনো রকমে একটা শার্ট আর প্যান্ট গলিয়ে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ম্যানুএলা উন্মাদ সেই বিপ্লবীকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে যান সিঁড়ির দিকে। হাতে গিঁঠ দিচ্ছেন শুতে যাবার সেমিজের ওপরে চড়ানো শাদা মসলিনের ক্লোকটার বেল্ট্-এ।

এসে দাঁড়ালেন ফার্গুসনের দেহের ধারে। বেচারী ফার্গুসন, তরুণ কারুজো সঙ্গের

খুনেদের নিয়ে ছুটে গেছে কাউন্সিল হাউসের দিকে। কিন্তু বাধা দিয়েছে ভার্গাস ব্যাটালিয়ন। ততক্ষণে ব্যারাক-কে ব্যারাক জেগেছে। এসে পড়েছেন জেনারাল উর্দানেতা।

কিন্তু বোলিভার? কোথায় তিনি?

পথ আলোয় আলো। গলিটার মধ্যে দিয়ে যেখানে এসে পড়েছেন বোলিভার সেদিকের কিছুই চেনেন না। উন্মুক্ত পথ একা নিঃশব্দে পড়ে আছে। এই পথে—এই চাঁদের আলোয় কেউ একবার নিশানা করলেই সদ্য মৃত্যু।

বোলিভার ছুটতে ছুটতে এসে পড়লেন একটা নালায়। শহরের ময়লা বয়ে আনা নালা। ওপর দিয়ে সেতু। পথ গেছে এপার-ওপার। নালার পাড় ধরে নামলেন বোলিভার। সেতুর তলায় ময়লায় আধা ডোবা অবস্থায় চুপ করে সময় কাটাচ্ছেন।

বেশ কিছু পরে, জেঃ উর্দানেতা আর কিছু সৈন্য আওয়াজ তুলে ডাকছেন—"লিবারেতর! জেনারেল! আপনি কোথায়? সাড়া দিন। আমরা বন্ধু! সাড়া দিন।"

ছেঁড়া পোষাক। রক্ত ঝরছে। দুর্গন্ধে ভর্তি। জেনারেল বোলিভার উঠে এলেন—শহরের নোংরা বওয়া নিশ্চিত আশ্রয় থেকে।

শেষ রাত্রের আকাশ ছিঁড়ে গেল শব্দে—"জয়তু বোলিভার! জয়তু বোলিভার! জয়তু লিবারেতর!"

সেই মুহূর্তে আরও কিছু সৈন্যসহ স্বয়ং মানুএলা সেই নৈশ পোষাকেই এসে দাঁড়িয়েছেন। শাদা মসলিন তখন রক্তে লাল!

দৌড়ে মানুএলাকে জড়িয়ে ধরে বোলিভার তোলেন ধ্বনি,—"জয়তু লিবারেতরের লিবারেত্রেস্ (মুক্তিদাতার মুক্তিদাত্রী)।"

ভোরের আকাশে একটি ধ্বনি—"জয়তু লিবারেত্রেস্!"

আবেগের প্রচণ্ড চাপে ভেঙ্গে পড়েন মানুএলা।... ...

—"এই সেই গির্জা, সেই গভর্ণরের বাড়ি। আর ওই সেই কালভার্ট।"

—"চলো সেই কালভার্টটাও দেখে আসি। আছে তাহলে সেই কালভার্ট?"

"আছে।"—বল্‌লো নীনা। কিন্তু পথও চওড়া হয়েছে। আর নালাটাও আর ময়লা বয়না। বয় বৃষ্টির জল।"

কিছু পরে হাত বোলাচ্ছি সেই কালভার্টের গায়ে।

নীনা আবার বলে,—"সত্যিই ভালোবাসেন বোলিভারকে!"

"না নীনা। বোলিভার আমার কে? ভালোবাসি মুক্তি। যে মুক্তির ভ্রূণের নাম বিপ্লব।'

"বিপ্লব নৈলে মুক্তি হয় না?" প্রশ্ন রাখে নীনা।

—"হয়, হবে,—যেদিন রক্ত আর বেদনা ছাড়াই জন্ম নেবে নতুন জীবন। আকাশে একটা নতুন তারা দেখা দেবে বিনা বহ্নিজ্বালায়। যতই কেন নীরব মনে হোক—আকাশের নতুন তারাই বলো, আর মাটিতে নতুন কুঁড়ির ফোটাই বলো—কত যে বেদনা,

জ্বালা, অশ্রুপাত, রক্তক্ষরণের মধ্য দিয়ে সে সাধন এগিয়ে যায় মানুষের মুক্তির শতাব্দী-গুলোকে অনবরত পিছনে ফেলে, তা বুঝতে শেখো।......

"...জ্বলন্ত ভ্রূণে জীবনের দুর্নিবার সংগ্রামই প্রকৃত শান্তির আধার। —শান্তির নাভি আবর্তের অন্তস্তল।"

গাড়ি চলছে শ্রেফ শহরের অন্তে মফঃস্বল তল্লাটের একতালা রহিসী-পাড়ার তীর দিয়ে। পথের ধারে এবার নাম পড়তে পাই "তোকোয়েন্দামা"।

সত্যিই সাজিয়ে রেখেছে এই ফল্‌স্‌ এলাকা। রাজ্যের ট্রপিকাল ফুলের সজ্জায় নিখুঁত করে সাজিয়েছে। এসব সাজ-সজ্জা দেখলে রুচির কথা এসে পড়ে অনিবার্যভাবে। এবং নিউ গ্রানাডার আমলে ক্লাবে, ক্যাবারেতে, ভোজসভায়, সান্ধ্য-আড্ডায় বোগোতার রুচি ছিল এক কিম্বদন্তী। সারা দক্ষিণ আমেরিকার বোগোতার শান-ও-শৌকৎ ছিল ভারতীয় মজেস সোহবতের দুনিয়ায় লক্ষ্ণৌ, হায়দ্রাবাদ, দিল্লীর শান-ও-শৌকতের মতো।

বোঝা যায়, কৃষ্টির গোড়ায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা থাকার কথা বোগোতায় সেই শিক্ষার গরিমা ছিলো। এখনও কোলোম্বিয়ার জনসাধারণ, বিশেষ বোগোতাবাসীরা অহঙ্কার করে বলে, 'ইংরেজের অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ ইংল্যাণ্ডেই পাওয়া যায়; কিন্তু স্পেনের অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ আছে কোলোম্বিয়ায়, এক এই বোগোতায়ই। স্পেনে নয়। কথাটা সত্য। আজও বোগোতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উচ্চমান য়োরোপ-আমেরিকায় স্বীকৃত। স্পেনের ভাষার বিশেষ সংস্কৃতি ও শালীনতার জন্য বোগোতাবাসীদের কথ্য এবং লেখ্যভাষা আজও স্প্যানিশ ভাষার আদর্শ। ঠিক যেমন আরবী ভাষা ও বিদ্যার 'মক্‌কা' শহর-মক্কা নয়, কায়রোর অল্‌-হজার-বিশ্ববিদ্যালয়। (অনুরূপ পরিপ্রেক্ষিতে আজ সংস্কৃত চর্চার মদিনাও হয়ে পড়েছে বোধ হয় হাইডেলবার্গ বা মস্কো)।

শিক্ষার মান, উৎকর্ষ, সৌষ্ঠব অতি উচ্চ-গ্রামের না হ'লে এমন রুচির পরিচয় পাওয়া যায় না দেশ সাজানোয়, দেহ সাজানোয়, পরিবার সাজানোয়, রুচি সাজানোয়। কোথাও নাগর-দোলা নেই, নেই 'কনি-আইল্যাণ্ড' নামক বিপর্যয়। (মেক্সিকোর চাপুল তেপেক পার্কের ধার-লাগাও সেই দৈত্যাকার কিশোর-বালক-তরুণ-যুবকদের পরিতোষ ব্যবস্থার আসুরিক সংস্করণ। মনে করলেও মনে হিম লাগে।)

আছে বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে সাজান কিওস্‌ক্‌। তার সামনেটা বাঁধানো রোয়াক। এমনটিও দেখেছি, পারীর পার্ক কাস্ত্যজালে, আর কারাকাসের বিখ্যাত 'ভেনেজুয়েলা প্লাজা'য়। কিন্তু এ সাজান-গোছান যেন সবাইকে টেক্‌কা দিয়েছে।

আমাদের দেশ তো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নন্দন-কানন। সারা হিমালয়-ব্যাপী কত উষ্ণ প্রস্রবণ, কত জল-প্রপাত, কত উচ্ছল নদী—কত কাশ্মীর, কত কুলু, কত রাণীক্ষেত। কেরলের পাহাড়ের অতুলনীয় সৌন্দর্য। কিন্তু সব বলি হয়ে গেছে ধর্ম, মন্দির, দেব-দেবীর তীর্থঙ্করতায়।

না, ভুল বোঝা চলবে না। 'তীর্থ'-এর বিরুদ্ধে কিছু বলা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তীর্থে-তো

আপত্তি নেই। তবে আপত্তি কোথায়? তীর্থের দোরে আমাদের যাত্রা যেন পাপের ভার নামানোরই যাত্রা; উত্তর জন্মের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সুন্দরের আরাধনায় ঋষিদের নির্বাচিত স্থানগুলি পাপের গন্ধে ভারাক্রান্ত, স্বার্থ-সিদ্ধির ফিকিরেদের ভীড়ে নোংরা।

যদি কোনো যীশুখৃষ্ট এই সব ধর্ম-ব্যবসায়ীদের তাড়া দিয়ে এমন সব বাছা-বাছা রমণীয় স্থান থেকে সরিয়ে দিতে পারত, তবে আন্তরিক এবং গভীর অর্থে এই স্থানগুলি সত্যিই তীর্থ হয়ে উঠত। তীর্থ অর্থাৎ যেখানকার সৌন্দর্যে স্নান করলে দেহ-মন পবিত্র হয়ে যায়। বাস্তবের কলুষ থেকে যা 'উত্তীর্ণ' করে দেয় আদর্শের নন্দনভূমিতে। জীবনকেই যারা করে তুলেছে রোগ তেমন যাত্রীদের মুমূর্ষু মনের ছায়া-ছবি যুগ-যুগ ধরে ধারণ করার ফলে সেই অপার সৌন্দর্যও যেন মুমূর্ষু। বৃদ্ধা জরতী আমার দেশ যেন যৌবনের দিনের অলঙ্কার সজ্জাগুলো আর বহন করতে পারছে না। যেন তার জরা-জীর্ণ দেহে ঐ সব মূল্যবান, গুরুভার অলঙ্করণ শিথিল। যা ছিল রূপসীর বিলাস। তা'ই হয়েছে যেন মগুনের পরিহাস। ভারতের ঋষি কবিরা, রূপ-সন্ধানী নাগরিকেরা যে-সব স্বর্গীয় সুষমায় মোড়া স্থানগুলিকে খুঁজে পেতে বার করে অমর করে দিতে চেয়েছিলেন, সে-গুলোকে বাজারের ভীড়ের মধ্যে এনে পাণ্ডাদের আওতার বশে নিয়ে এসে এখন আমরা পস্তাই। যা ছিল তীর্থ, তা হয়েছে নরক; যা ছিল সুষমা, সৌন্দর্যের আকর, তা হয়েছে কদর্যতা, ব্যবসায়িকতা, দালালি, ঠগাই; এবং তার ফলে পেয়ে থাকি অশান্তি, আর কুরূপতার বিবমিষা।

ক্ষোভ হয়। পঞ্চাশ বছর আগেও যাঁরা বৈষ্ণোদেবী, অমরনাথ, দাল-লেক, কন্যাকুমারী, বদ্রীনাথ, গোমুখী দেখেছেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য যে রুচির অপঘাত হয়ে গেলে সুন্দরকে আর বাঁচিয়ে রাখা যায় না কোনমতেই। যা ছিল মানস-লোকের তীর্থ, তা হয়ে গেছে ইহলোকে পাণ্ডাতলার বাজার।

১৯৩৩-এ তিরুপতিতে আড়াই লক্ষ যাত্রী যেত। ১৯৮৩-তে যাচ্ছে দশ কোটী আশি লক্ষ! ১৯৩৩-এর দশ কোটীর যায়গায় এখন ব্যাঙ্কে এই দেবস্থানের নগদ লগ্নি খাটছে ৫৪ কোটী টাকা। বাৎসরিক দক্ষিণা সাড়ে বারো লক্ষ থেকে বেড়ে এখন হয়েছে ৩৮ কোটী টাকা। তিরুপতির মতো ধনী দেবতা আছেন, নাথদ্বারা, জগন্নাথ, আজমীঢ় দর্গা, দিলওয়ারা, সলীম চিস্তির দরগা। তবু ভারতের জনগণ পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ বলে পরিগণিত। সেই দারিদ্র্য-চিহ্ন এক কলঙ্কের মালা পরিয়ে দিচ্ছে এই অন্তঃসার-শূন্য সমাজ-বাদী দেশে। তীর্থগুলো ভাল সাজান দূরে থাক, প্রাথমিক জৈবিক জীবনের আবশ্যিক সুবিধাগুলোরও ব্যবস্থা সেখানে করা হয় না। হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথ পর্যন্ত এই বিবমিষা ছেটানো আছে। অথচ কী সুন্দর ছিল এই মহাপ্রস্থানের পথ এককালে!

এ সব দৃশ্য দেখি, আর স্বভাবতঃই মনে পড়ে আমাদের প্রিয়ের প্রিয়, প্রাণের প্রাণ ভারতকে। মনে পড়েছে গুয়ার্ণাভাকৃকায় গিয়ে, দান্যুবের উৎসে গিয়ে, জেনেভা হ্রদে গিয়ে,

রকীর শিখর পথে গিয়ে, আয়াকুচো, মিসিসিপি, বৃটিশ কোলোম্বিয়ার দ্বীপগুলোতে গিয়ে ভারতকে মনে পড়েছে, আর মন কেঁদেছে।

দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলি। ভ্রাম্যমান জীবনে একদিন অস্ট্রিয়ান আল্‌প্‌সের পথ বেয়ে গডার্ড গিরিবর্ত্মের সর্বোচ্চ অংশে দাঁড়িয়ে তুষারাবৃত আল্‌পসের মহিমা দেখছি। হঠাৎ চোখে পড়ল খুব উঁচুতে লাল একটি সুইস-ফ্ল্যাগ নীল আকাশে উড়ছে।

আর্মি-ফ্ল্যাগ হোলে রেজিমেন্টাল কলর্সটাও ঐ সঙ্গে থাকত। তা নয়! তবে কি? একে আল্‌পস্‌, তায় উঁচু গিরিশৃঙ্গটি। চড়ার লোভ সামলান গেল না। উঠে গেলাম তরতর্‌ করে। দেখি সুন্দর একটি 'চটি' (যাত্রীনিবাস) দোকান। টুকিটাকি নানা জিনিষ। ভাল দেখে এক 'বার' শ্রেষ্ঠ-মার্কা কুলীন চকোলেট নিলাম। দাম মিটিয়ে দেবার পর আর একটা 'বার' চকোলেট দিয়ে দোকানের মহিলাটি (সুইস) বিশুদ্ধ উর্দু-জুবানে বল্‌লেন—'য়হ তোফা মেরী তরফ্‌সে রহা।'

অবাক হয়ে চাইতেই একটি চকচকে (ভারতীয়) যুবক এক টুকরো কাগজ হাতে দিয়ে বললেন, 'জুম্মা মসজিদে কূচা ফকিরীতে গিয়ে আমার মা, ভাইকে বলবেন—আমি ভাল আছি।''

প্যাকেটটা নিতে নিতে বলি—"তুমিই তো বলতে পারতে? চিঠি দাও না বুঝি?"

—"দিই। কিন্তু মা চকোলেট ভালোবাসেন। এই বাক্সটা পৌঁছে দেবেন।''

সেই ভারতীয় মানুষটি গডার্ড গিরিবর্ত্মে যে সুপরিচ্ছন্ন দোকানটি করেছে, হরিদ্বার-বদ্রীনাথের পথে এমন পরিচ্ছন্ন দোকান সেই ভারতীয়েরাই করে না কেন?

প্রাচীনা ভারতবর্ষ বহু প্রসবিনী জরতীর মতো জীবন-রসের স্বাদ নিতে নিতে 'এলে' গেছে। স্বপ্ন-বাসবদত্তা ভটাই-বুড়ী হয়ে গিয়ে দাঁতে মিশি দিয়ে কাশছে। বেদ হয়ে গেছে বৌদ্ধ অনীহা, বেদান্তের 'কৌপীনবন্ত ভাগ্যবন্ত'।

অন্য অভিজ্ঞতা—জার্মানীর। অস্ট্রিয়ার সীমায় দান্যুবের উৎসমুখে। নদীর উৎস। নীরব, নির্জন, যেন ঝিলমের উৎস ভের নাগ। কিন্তু কী যে ব্যবস্থা, শোভা! মানুষের মনের রুচি, হাতের শিল্প, সামাজিক চিন্তা সব কিছু জড়িয়ে দর্শনীয় স্থানে দর্শকের আত্ম-বিলোকনকে কত মর্যাদা দিয়েছে ব্যবস্থার পারিপাট্য।

আমাদের পৌঁছে দেবে নীনা এয়ারপোর্টে। সঙ্গে দিয়ে দিল দুটো ঠিকানা। এক-একটি হোটেলের নাম, এয়ারপোর্টের ধারেই—মোটেল। আর দ্বিতীয় একটা ট্যাক্সীর। এয়ার পোর্ট থেকেই ফোন করে ব্যবস্থা করে দেওয়ায় খুব সুবিধা হোল।

ও বলল—"আপনারা তো রাতটা কাটিয়ে সকালটাই শুধু ঘুরবেন এবং সন্ধ্যা সাতটায় আবার প্লেনে চাপবেন? কী দরকার ডাউন-টাউনের হোটেলে? কুইরিলো বেশ অনেকদিন ডেট্রয়েটে ছিল। ইংরিজী না জানলেও ইয়াঙ্কী বুলি কপ্‌চায় আর মোটেলের পরিচারিকা বুড়ী আনা থস্‌থসী হ'লে কি হবে—খুব রসিকা।……ভারতবাসী শুনে আমায় কি বললে

জানেন,—বোলো, মোটেল হলে কি হবে, শুধু মোটেলের মালকাজনের মাপই পাঁচতারার ইমারতের মত, বিছানাগুলোও আমার মতই দুজনার মাপের! পুরো হারেম নিয়ে শোয়া যায়।"

নীনাকে আমরা পয়সা দিয়ে খুশী করেছিলাম। ওর প্রাপ্য গাইড হিসাবে সত্তর পেসো। আমরা দিলাম পুরো একশো পেসো এবং একটা ভালো চিরুণী। কিনে দিলাম।—সেটা পেয়ে ও খুবই খুশী।

একোয়াদর

রাতে একোয়াদরে দেখার কিছু ছিল না। আনা তখন কুইয়িলোকে না পেয়ে নিজেই ভক্স্ ওয়াগানখানা নিয়ে 'সেছিল। খুব কষ্টেই স্নান হোল, কিন্তু হোল। আগাগোড়া পথ আনা নাম্নী সেই থল্থলে জালাটি একা একাই বক্বক্ করতে করতে গেল—যেন কত দিনের আলাপ। ভরার সময়ে এ কলসী কি করে জানি না; খালি হ'বার সময়ে দেখলাম খুবই বক্বক্ করে।

মোটেলের নাম 'থ্রী-চিয়ার্স'। আনা বলল—"দেখ বাপু, আমার নামও আনা নয়। এ হোটেলেও দু'টি চিয়ার্স্—তুমি আর আমি। বাকী সব 'গ্রাম্'। আমার নাম পিচিঙ্কা গোন্সালেস্। আমার মা ছিলেন পাক্কা পাহাড়ী আদিবাসী। আমার বাবাও নিশ্চয়ই কেউ-না-কেউ ছিলেন। কিন্তু আমার মা-ই যখন সে নাম নিয়ে কোন পরোয়াই করেননি—আমার কী দায়? আমি, দেখতেই পাচ্ছো—খাঁটী-অখাঁটী, নিখাদ-ভেজাল। কাজেই আমেরিকান দুয়েই আমার পয়সা, এই মোটেল থেকেই। আর মনে হয়, চার্চে কবরের যে ভাড়া দেওয়া আছে—সেটাও ইয়াঙ্কীদেরই বদৌলত। শুধু কবর জমি নয়, জমি ছাড়াও অনেক কিছু কিনে ব্যবস্থা পাক্কা করে রেখেছি। পাথর কিনে, মার এপিটাফ্ লিখিয়ে সাজিয়ে রেখেছি। এখন শুধু গিয়ে ঢুকলেই হোল।...... গতরখানি তো কম নয়! বলো তো, কতো কুইন্টাল?"

আমি হাসলাম। বলি—"দু'শো কুইন্টাল।" সবাই আমরা হেসে উঠি।

হাসি থামলে আনা বলল—'হাসির কথা নয়। দু-চার জন মানুষ যা বইতে পারে না, তা দু' কুইন্টাল থেকে দু'শো কুইন্টাল হোক্ না। সেই একই কথা। সে সময় ট্রাক আনতেই হবে।... এদিকে গায়ে-গতরে ঢাউস তো! ক'দিন আর। তেমনি দশাসই জমিও কিনে রেখেছি।" ... ...হেসে বলে,—"এপিটাফটা লিখে রেখেছি—মাতৃভাষায়, স্পানিশে, ইংরিজীতে—তোমরা এসেছো, এবার লিখিয়ে নেবো হিন্দীতে।..."

…"আর সংস্কৃতে, আর বাংলায়"—আমি যোগান দিই।

—"ওগুলো কি? কোন ভাষা বুঝি?"

—"হ্যাঁ, ভারতবর্ষ যখন ভারতবর্ষ ছিল, তখন ভাষা ছিল সংস্কৃত। তারপর যখন ক্রমশঃ সভ্য হোল—যতো সভ্য হোতে থাকল, ততো ভাগ হয়ে ক্ষয়ে যেতে লাগলো। যেন একটা বিস্কুট ভেঙে অনেক টুকরো, কমে যায়। কিন্তু একটা আরশী ভেঙে অনেক টুকরোয় অনেক চাঁদ। প্রত্যেকটায় একটা করে আকাশ—তাই না? অনেক ভাষার দেশ আমাদের। টুকরো হোক, একই আকাশ।"

—"বুঝেছি—বুঝেছি। আমার স্বামী বলে যে গুণ্ডাটা এসে জুটেছিল, আমার যৌবনের টেবিলের ধারে বসে ল্যাজ নাড়ত, সে বলত—সভ্যতার একটা লক্ষণই নাকি জীনাস্ ভেঙে স্পীসীস্ আলাদা করার সূত্র খুঁজে পাওয়া। (বর্গ থেকে প্রজাতির সূত্র বার করা।)"

"ত' হ'লে তো আমরা সভ্য হয়েই চলেছি"—আমি বললাম।

"মরুক-গে যাক। হও বা না হও, আমার এপিটাফ্‌টা তুমি হিন্দী, বাংলা, সংস্কৃতে লিখে দিও। আমি আরবী, ফার্সী, ফরাসী ছাড়াও গ্রীকে, ল্যাতিনে লিখিয়ে রেখেছি। শুনবে এপিটাফ্ কী?"

—"শোনাও, দেখি যদি বুঝি।"

—"দেখাচ্ছি। পড়ে নাও। সুবিধা হবে।"

ঘরের ভেতর থেকে আনা মোটা একখানা এ্যালবামের শেষ পাতায় লেখা অনেক ভাষার মধ্যে ইংরাজীটা একটু পড়লাম—"একটু দাঁড়াও।

যে মানুষটি সারা জীবন অন্যের খিদমৎ করে
অন্যের দায় ঘাড়ে বয়ে নিজের আনন্দ খুইয়েছে,—
এই শেষ দিনটিতে সে নিজে অন্যের ঘাড়ে চেপে
অন্যকে তার খিদমৎ করতে বাধ্য করছে।
এই তার চরম সুখ।
যাকে তারা পয়সা গুণে দিয়েছে বলেই
বেশ্যা বলেছে,
সেই আজ পয়সা গুণে দিয়ে দুনিয়াকেই বেশ্যা বানিয়ে চলে গেল।"—

আমি চোখ তুলে বল্‌লাম—"এ এপিটাফ, পাদ্রী চার্চ ইয়ার্ডে লাগাতে রাজী হবে?"

—"হবে। না হলে চার্চের বহু টাকার ক্ষতি হবে যে-গো! চার্চের ইঁদুর রোগা হতে পারে, কিন্তু সেই ইঁদুরের স্বাস্থ্যহানির কারণ ঐ পাদ্রী। সে আমার চেয়েও মোটা। আমায় অনেক ধকল সইতে হয়েছে ঐ শয়তানটার খিদে মেটাতে।…পাদ্রী! কী আমার ইয়ে ……চাটা পাদ্রীরে!…হাঃ—হাঃ—হাঃ।"

কী হাসি আমার!…মুখে তার কিছুই বাধে না!

"থ্রী-চিয়ার্স," এন্নার পোর্ট থেকে মাইল দুয়ের মধ্যেই। কুইতো শহর আরো তিন

মাইল দূরে। ডিনার খেয়ে শুয়ে থাকার কথা। কিন্তু আবহাওয়া যাকে বলে একেবারে শারদীয়। চমৎকার! চাঁদ উঠেছে। একটা খালে জল বইছে সবেগে। শব্দ আসছে। বাইরেটা ঘুরছি।

একখানা গাড়ি এল। কী সব টুকি-টাকি আর, রুটী-ডিম দিয়ে গেল। গাড়িটার কাছে গিয়ে ভাষা না জানার মূকতা ঘষেই একটু চকমকি বার করি। বলি, "কুইতো সেন্ত্রো?"—বলে মুদ্রা দেখাই,—"আমাদের নিয়ে যাবে, সেণ্ট্রাল কুইতোয়?"

হেসে ইঙ্গিত করার সঙ্গে সঙ্গেই দু'জনে লাফিয়ে উঠে পড়ি। আধা ঘণ্টাও লাগলো না, আমাদের তারা পৌছে দিল এক ঝলমলে পাড়ায়। বহু আলো, বহু সজ্জা, বহু সুসজ্জিত পুরুষ ও নারী; কিন্তু যে যার চলেছে আলাদা আলাদা। লক্ষ্য করলাম, জুড়ি বেঁধে কেউ নেই। গোটা-দুই সিনেমা-হল। বহু জুয়ার ডেরা, মদের ভাঁটী—সবই সাজানো। ......সাজানো হলেও কেমন যেন একটা অসংস্কৃতির, বা বলা ভাল, বি-সংস্কৃতির ছাপ।

একটু অন্ধকার যেখানে, সেখানেই সিগারেটের আদান-প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে ফিস্-ফিসিয়ে কথা-বার্তা চলছে, চকিতে, কাটাকাটা ভাবে। বন্ধু নয়, আত্মীয় নয়। সে ধরনের চলন্ত, জীবন্ত কথাই নয়। মেয়েগুলি খুবই সজ্জিতা পুরুষগুলো বেজায় 'মাচো', 'ফিটিং বাবু' যাকে বলে। কুইতো শহর ফিট্‌ফাট্।

মাঝে মাঝেই বেটনধারী সুদৃশ্য পোষাক পরা পুলিশ ঘোরাফেরা করছে। সিগারেট-পায়ীরা তক্ষুণি আলাদা হয়ে যাচ্ছে। কেউ মুখ ঘুরিয়ে মদের ভাঁটি অথবা জুয়ার দোকানে ঢুকেও পড়ছে।

বোঝা গেল, অতো রাতের সৌখীন যাত্রীদের, পরিব্রাজকদের, রুটীর ভ্যানটি সোজা উর্বশীদের পাড়ায়ই এনে ফেলেছে। ভেবেছে, রাতে আমার আর কি প্রয়োজন? কাজেই ওর মতে ঠিক জায়গায় এনেছে।

মধুকে বলি, "মধু, চল এ স্বর্গ থেকে সরে পড়ি। এখানে খরিদ্দার না হলেই কিন্তু পুলিশের হাতে পড়তে হবে। নিদেন পকেটমারের। মারবেই।"

"কেন স্যর?"—মধু অবাক।

—"এ ব্যূহে যে ঢুকবে সে এক নয় সওগাত, নয় দালাল। তৃতীয়টি ক্রেতা না হলেই ঐ দুই চোয়ালের মধ্যে পড়বেই পড়বে। এস, এই গলিটা নিয়ে ঝট্‌পট্ সড়ে পড়ি।"

গলিটার গায়ে নিওনের বহু সাইন বোর্ডের মধ্যে কয়েকটা ঝট্‌পট্ পড়ে নিলাম। বুক্‌স্, বিবলিও, স্টুডিও। ভাবলাম, এটা হয়তো ছাত্র-পণ্ডিতের পাড়া। একটা বইয়ের দোকানে ঢুকলামও। দেখলাম সবই স্প্যানিশ ভাষায় লেখা বই। 'নো আংলেইস'—দোকানের গায়ে যে সব পোষ্টার দেখলাম, তার ফলে তাড়াতাড়ি গলি পেরুতে লাগলাম। "ও মধু, এ গলিটা এখনও এডুলেসেণ্ট ষ্টেজে। পালাও। নয়তো দরকোচো মেরে যাবে।"

গলির মোড়ে একটি পরিণত বয়সের মহিলা একটি আট-দশ বছর বয়সের মেয়ের

হাত ধরে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। দু'জনের হাতেই বয়স ও সাধ্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য দেখিয়ে কয়েকটি বোঝা। বাজার করতে এসে গ্রাম্য-বধূ পথ হারিয়েছে।

আমাদের স্পানিশে জিগ্যেস করলেন, আমরা বাস-স্টপ জানি কিনা!

আমার কেমন যেন মনে হল, আমি জানি। তা'ছাড়া, অদূরে গলির মাথায় বড় বড় বাস চলেছে দেখতেও পাচ্ছি। বিশুদ্ধ বাংলায় বলি, "এসো, এসো আমাদের সঙ্গে।"

ছোটো মেয়েটির হাত থেকে বোঝা নিয়ে, যখন চলতে আরম্ভ করলাম, দেখাদেখি মধুও মহিলাটির হাত থেকে একটা বোঝা হাতে নিল।

কিন্তু কোথায় বাস-স্টপ! ও হরি!

পুলিশের সাহায্য নিলাম। বুঝলাম, ভদ্রমহিলা এ শহরের ন'ন। মফঃস্বলের। বাস-স্টপ এই ব্লকের দু'টো ব্লক পরে যে স্কোয়ারটি আসবে, তার উত্তর দিকে। আমরা এসে হাজির একেবারে উল্টো দিকে।

অগত্যা এগুতে লাগলাম সেই দিকেই। স্কয়ারটা অবধি না পৌঁছুতেই, দুই ধার থেকে দু'জন ঘোড়সওয়ার আমাদের ঘিরে ফেলে খুব বকুনি লাগাল। পুরোটা বকুনিই সেই অতি গোবেচারি মহিলাটিকে।

বুঝলাম বিপদ! ঘনা বিপদ!

কাঁদ কাঁদ হয়ে মহিলা সব প্যাকেট খোলেন এবং কেনাকাটার ক্যাশ-মেমোগুলো দেখান।

একজন ঘোড়-সওয়ারের ইংরিজীর তরঙ্গ পার করে বুঝলাম যে, আমরা দু'টো অখদ্যে এশিয়ান মেয়েটাকে ফোসলাচ্ছি, বা ওকে ভজং দিয়ে ওর পোঁটলায় কিছু তুর্কী কোকেন নিয়ে চলেছি।—ওর কোলের মেয়েটাকে নিয়ে যদি ভাগি, কী অঘটনে পড়বে সে?

কিছু পয়সা-কড়ি দিলেই যে, "ব্যাপারটা মিটে যায়" এটা দু'-একজন সমব্যথী দরদী বোঝালেন; কিন্তু মহিলাটির কাছে কিছু ছিল না, এবং আমরা দেব না। চ্যাটাং-সে বলে দিলাম—"কুইতোয় ভারতীয় এ্যাম্বাসাডরকে খবর দাও। দমবাজি চলবে না। আমরাও থার্ড-ওয়ার্লডের অথর, জার্নালিষ্ট, দেক্কে লিব! লাগাও ফোন!!"

একটা টেলিফোন ধরে বহু ধস্তাধবস্তির পর যখন ঘোড়সওয়ার আমার হাতে টেলিফোন দিলেন—দেখলাম, কোন পাঞ্জাবী শিখ। বাঙালী জেনেই বললেন—"দাদা, এদেশে সাহায্য কেউ কারুকে করে না। যোদের দেশেই বা কে করে! করলেই মনে মনে ভাবে, কোই মতলব হ্যায়্……আপনি যখন চিলির চক্রবর্তীর মামা তখন, কোই গল্ নেহী হ্যায় জী।…ওঁকে ফোন দিন। আর কক্ষনো রাতের বেলায় আওরাৎকে মদদ দেবার ফাঁড়ায় পড়বেন না। এটা থার্ড ওয়ার্লড। একেনে 'মদদ'—মানেই ঘুষ।"

কী বললো যে যুধবীর সিং (সত্য নাম নয়) সেই ঘোড় সওয়ারকে, তা জানি না। লোকটা আমার পাশ-পোর্ট ফেরত দিয়ে "পারদোঁ"—পারদোঁ বলতে লাগল। আমিও হাত মেলালাম। (গোঁফ নেই যে চোমড়াব।)

ওমা! এরপরেও সে ঐ মহিলাকে ছাড়বে না। মহিলা ঘন ঘন চোখ মুছছেন,

আর আমার দিকে চাইছেন। আমি ততক্ষণ স্ব-মূর্তিতে। যুধবীর সিং-এর পরিচয়ের একটা জোর পেয়েছি তখন। হাত-পা নেড়ে ভারতীয় বিধান-সভার মুখ উজ্জ্বল করার মতো জ্বালাময়ী তকরীর খিস্তি-খেউড়ে বিভূষিত করে অকৃত্রিম বিশুদ্ধ আদি বাংলা ভাষাতেই ঝেড়ে দিলাম। (পথে তখন ভীড়, হাসি, হুল্লোড়)।

বহুবারের প্রয়োগ এখন বলতে পারি যে আমার বাংলা ভাষা আমার স্বদেশীয় পাঠকদের বুঝতে যতই কষ্ট হোক, বিদেশীরা যেন চট্-জলদি বুঝে নেয়। এখানেও বাংলা ভাষাটি ওরা মাতৃভাষার মতোই বুঝে ফেলে 'হাঁ' হয়ে 'রয়ে' গেল। কী করবে ভেবে পায় না। ততক্ষণে আমাদের ঘিরে বিশ-পঁচিশজন লোক। ইতিমধ্যে কোথা থেকে এক ব্যাণ্ড পার্টি এসে ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে। সে এক ধুন্ধুমারের যজ্ঞ।

হঠাৎ ভীড় ঠেলে শ্মশানের এক ভুলে যাওয়া মড়া দাঁড়ি-গোঁফ এবং এক মাথা ঝাঁকড়া চুল সহ এসে দাঁড়াল। তা'র পোষাক (?) দেখে কাশীর কমুনিষ্ট এজিটেটর ধন্দুকুল গাঙ্গুলীকে মনে পড়ে গেল।

সে-কী দাপট সেই সিন্ধবাদের। হৈ-হৈ, রৈ-রৈ ব্যাপার! ব্যাণ্ড বাজছে। সঙ্গে ব্যাগ-পাইপ, এবং সে পলকমাত্র অপেক্ষা না করে আমার হাত এক হাতে, মহিলাটির হাত অন্য হাতে ধরে ভীড় ঠেলে উধাও। আর বলে—'কাম্ উইথ্ মী। সন্ অব্ এ বিচ্।'......

"আরে! বলে কি!! গাল দেয় যে!!!"

মধু ফিস্ ফিসিয়ে বলে—"বলছে ঐ পুলিশগুলোকে। আপনি রী-একৃট্ করবেন না যেন। আপনার মা স্বর্গে। যে শী লিভ্ ইন্ পীস্।"

—"তবে সন্‌স্ অব বিচেজ্—বলছে না কেন? ওদের বললে সে-টা প্লুরাল হবে না?"

শুনে সিন্ধবাদ থেমে গেছে। হেসে আকুলি-বিকুলি। ইংরাজীতে বললে—"রোমের একটা বীচ্ সারা রোম জাতিকে জন্ম দিয়ে গিয়েছিল। তাদের সন্তানরা আইবেরিয়ান পেনিন্‌সুলা থেকে এখানে আড্ডা গেড়েছে। ......সব—সব সন অব্ এ বিচ্। জাষ্ট ওয়ান্ সিংগ্‌ল্ বিচ্—য়োরোপা। ইউ ডাউট্?"

"বলো কি! য়োরোপাকে তো আমরা ষাঁড়ে চড়িয়ে এশিয়ায় নিয়ে গিয়েছিলাম।—দি গ্রেট ইলোপমেণ্ট।"

এবার সেই সিন্ধবাদ আমায় জড়িয়ে ধরল,—"বার্ডস্ অব দ্য সেম্ ফেদার।—ব্রাদার ইন্ ল',—ব্রাদার আউট্ ল'। মীট ফেলিপ্ পিউনো।"

আমি বলি—"বাতাশারিয়া,—মোধু মাই সন্।"

এবার বাস-স্টপ। মেয়েটি আর তার মাকে বাসে তুলে দেব। ওরা বার বার আমায় দেখছে। উঠে গেল বাসে। বেশ ভীড় জমছে ধীরে ধীরে। পাহাড়ী পথে যাবে বিশ মাইল দূরের গ্রামে। হঠাৎ মেয়েটি নেমে এলেন,—সোজা আমার দিকে চাইলেন। আমি কিছু বোঝার আগেই আমায় দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গালে নয়, ঠোঁটে একটি চুমো দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন।

আমার বলার কিছু রইলো না। অতি কষ্টে 'রিফলেক্‌স্‌' সংযম করে ঠোঁট থেকে চুমোটা মুছে ফেলার মতো অসৌজন্য এড়িয়ে গেলাম।

এদেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ঠোঁটের ঐ স্পর্শ। মহার্ঘ স্পর্শ। তবে কেন্দ্রে নয়, পাশে,—অর্থাৎ গালে। কেন্দ্র নাকি প্রিয়জনের জন্য ঘনতম সংবর্ধনা।

মা-মেয়েকে বাসে তুলে দিয়ে দেখি সিন্ধবাদের ঘাড়ে আমরা দু'জনে সওয়ার। একটা খানাঘরে ঢুকে পড়লাম।

মানুষটা পাগলই বটে, তবে ঐ এক ধরনের পাগল। এদের দেখা জীবনে বার বারই পেয়েছি। জ্যামায়কায় সেই রাস্‌তাফারিয়ন,* হেইতীতে তাস্তীর বোন-পো. আরও একজন,—হেইতীরই সেই অবিনশ্বর পাগল পাদ্রী সন্ন্যাসী-দেবতা, নাম তার মার্তিন,—এদের আমি জীইয়ে রাখি। একটু একটু করে ভোগ করি, যেন আর্ট পেপারে ছাপা প্রাইজ ফটোগ্রাফের সংগ্রহ।

খাবার ভান করে আমরা বসি, কিন্তু খেলো সেই পাগল পিউনোই। পরপর তিন গ্লাস চিচ্‌া খেলো। আমাদের যেমন ধেনো, 'হাঁড়িয়া' ওদের ঐ জবর ক্রাচিচ্‌া, ভুট্টা থেকে চোলাই।

তারই মধ্যে আমি প্রশ্ন করেছি, কুইতো শহরের স্কয়ারে ক্যাথীড্রালের ধারে তোরেস-তাগ্‌লের বাড়ি, আর প্রখ্যাত লারিয়া-হাউস—এ দু'টো, রাত হলেও দেখব!

পা রাখব সেই বাঁধানো পাথুরে পথে, যেখানে বোয়াকার যুদ্ধের বিজয়ী বীর তার শাদা ঘোড়া পাস্তরের পিঠে চড়ে অপেক্ষা করে ছিলেন নগরীর অল্‌ডারম্যানের। হাতে ছোঁবো সেই পথের ধারের বারান্দার রেলিং, যেখান থেকে শুভ্রবাস পরিহিতা সুন্দরী শ্রেষ্ঠা মানুএলা সায়েঞ্জ বোলিভারের কপালে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন একটি, মাত্র একটি ডাঁটী-শুদ্ধ গোলাপ। আর বোলিভার সেটি ধরে মেয়েটির দিকে চেয়েছিলেন।

—পিউনো বাঁকা চোখে চেয়ে হাসল। "বেশী দূরে নয়। এখান থেকে তোমার 'খী-চিরার্স যাবার পথেই পড়বে। কিন্তু এত জানো এই হতভাগা দেশটার সম্বন্ধে; অথচ জানো না সেই ১৮১৯-এর আগষ্ট মাস থেকে আজ অবধি এ দেশটা স্বাধীন হোল না? হোতে পেল না?"

—"বাধা কি?"

—"বোলিভারের অভিশাপ।"

—'বোলিভার? তিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন? এ তো নতুন কথা শুনছি!"

—"মানুষটার স্বপ্ন ছিল লাতিন যুক্তরাষ্ট্র সংগঠন। সেই সংগঠন ব্রতের ঋত্বিক পদে তিনি মাত্র পাঁচটি বছরের জন্য সর্বময়তা, সর্বাধিকার চাইলেন। হাঃ! না চাইলেও পারতেন। রুখতো কে তাঁকে? কিন্তু নিজের রচিত সংবিধানের খেলাফ তিনি নিজেই করতে চাননি। তাঁরই গড়া কংগ্রেসের কাছে চেয়ে এ অধিকার না পেয়ে বরং বদলে

* গ্রন্থকারের "ক্যারাবিয়ানের সূর্য", দ্বিতীয় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

নির্যাতন পেয়ে সবছেড়ে কোডে দুঃখে তিনি চলে যান। তাঁর আত্মার দীর্ঘশ্বাস সেই যুক্তরাষ্ট্রকে খণ্ডখণ্ড করে দিল। এক যুক্তরাষ্ট্র হয়ে গেল চার-পাঁচটা রাজ্য। ......অথচ, কুইতো—প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে প্রথমা প্রধানা নগরী। কুইতোর জীবন-ধারা সমগ্র লাতিন আমেরিকার গৌরব ছিল। সম্ভ্রমে মানুষ মাথা নোয়াতো কুইতোর সৌন্দর্যের পায়ে। এখন এটা খান্‌কী। জীউসের মেয়ে আফ্রোদিতে. খান্‌কী। এটা অভিশপ্তা প্রসার্পিন।"

ঝক্‌ঝকে চাঁদের আলোয় গলির পর গলি পার হচ্ছি। বাড়িগুলো নিঃঝুম। তবু জানছি ভেতরে ওরা জেগে আনন্দ করছে।

এখানে স্কুল-কলেজ, আফিস আদালত সব কিছু সকাল আটটা থেকে বেলা দেড়টা পর্যন্ত। তরপর দু'টো থেকে ছ'টা—এরা জীবন-রসে গা ডুবিয়ে ভাসে।—রাত দশটা, এগারোটায় পথ-ঘাট, ক্যাবারে, ডান্স হল, রেস্তরাঁ, থিয়েটার সব গম-গম করছে। হুড়-হুড় করে বিক্রী হচ্ছে মাংস ভাজা, মুর্গীর-ঠ্যাং, আইসক্রীম।

তবু চাঁদের আলো। সবুজ পাঁউরুটির মতো ঢালু পিঠ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত পাহাড় পানেসিলো। ঐ পাহাড়ের ওপরের গিরিশ্রেণী অতিক্রম করেই অগষ্টের মাঝামাঝি ঝাঁপিয়ে নেমে এসেছিল সবুজ কোর্তাপরা গেরিলা বাহিনী—যার সর্বাধিনায়ক ছিলেন সাইমন বোলিভার।

ঐ পাহাড়ের ওপরে মিউজিয়াম, অবসার্‌ভেটরী, তোপখানা। ঐ পাহাড় থেকেই বোলিভারকে অভিনন্দন জানাতে ত্রিশটা তোপ দাগা হয়েছিল।

প্রতিটি পাথর যেন কথা কয়। দু'ধারের পাইন আর দেবদারু ঝুম্‌ঝুম্‌ করে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা দোলায়, কাঁপে। মন হয়ে যায় কালের সঙ্গী; কালো ঘোড়ার সওয়ার হয়ে চলে যায় দুশো বছর আগে।

পিউনোর চলায় একটা ভঙ্গী আছে—অনেকটা ব্যাঙের মতো লাফিয়ে, আবার গোরিলার মতো পুষ্ট কাঁধের গুলি দু'টো ঝুঁকিয়ে হেলে দুলে। ওর স্নান-বিহীন চামড়া, চুল, দাড়ি থেকে একটা পরুষ গন্ধ বাতাসকে ভারী করছে। লম্বা হাত, বুকের ছাতি, ঘাড়—যতটুকু দেখা যায়, রোমশ।

—"যাবে তো তোমরা লীমা। লীমা একটা বেশ্যা, খানকী। ওর সারা গায়ে ঘা। ছোঁবে না। লীমাকে লাথি মেরে চলে যাবে নন্দন-কাননের মতো ঐ কুজ্‌কোতে। সেটাই হোল তোমাদের দেশের দিল্লী। না, দিল্লীর আগেও ছিল কি যেন—?"

—"ইন্দ্রপ্রস্থ!"

—"হ্যাঁ, ইন্দ্রপথ। ওখানেও তো সূর্যমন্দির ছিল। সূর্য মন্দির ছিল কুজকোতেও। ইন্‌কা সম্রাটের রাজধানী। আর কী বিশাল সে সাম্রাজ্য। চিলি, আর্জেন্টিনা থেকে নিয়ে পানামা, নিকারাগুয়া, হন্দুরাস পর্যন্ত। এত বড় সাম্রাজ্য রোমেরও ছিল না, চীনেরও নয়।"—

—"গেল কেন?"

নিস্তব্ধ। একটি নালা পাশ দিয়ে চলেছে। তারই শব্দ। দু'টো মাতাল তাড়া করছে আর দু'টো মাতালকে।

—"আতাহুয়াল্লাপা বড় উদার এবং অত্যন্ত শালীন সভ্য সম্রাট ছিলেন তাই। এরা ছিল লোভী, তস্কর, লুঠেরা। চুরি, লুঠ এবং বিশেষ করে কটার বিশ্বাসে আঘাত হানা, নিমক-হারাম হওয়া, এসব ভদ্র, মনস্বী, উদার সম্রাট আতাহুয়াল্লাপা কেন, পেরুর সাধারণ সামান্য নাগরিকরাও জানতেন না। এ যেন অচিন ভাষা। সেই ভাষা পড়তে গিয়ে ভুল হয়ে গেলো। ···কিন্তু তার ফল হল কি? সে লোভের তৃপ্তি কি য়োরোপ পেয়েছে? পানেসিল্লের বুকে যখন ঝড় ওঠে,—আমরা বলি কি জানো? —আতাহুয়াল্লাপা হাসছে। —বোলিভার দাপাদাপি করছে। আতাহুয়াল্লাপা, পিজ্জারো, বোলিভার—তারপর? তারপর কে? —এসেছিল, শেগুয়েভারা। তাকেও আমরা শেষ করে দিলাম।"

—"আমরা?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমরা!! আমরা নয়তো কে? অদ্ভুত ছিলেন তিনি। কতবার মরেছেন, তার লেখা-জোখা নেই। কর্ডিলেরা পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন। সারা আন্দীজে আগুন জ্বালিয়েছেন। কিন্তু সোশ্যালিজমের শত্রু যে পেতিবোর্জোয়াজী তারা ছাড়বে কেন? —কাক, শকুন, ক্রিমী, সাপের মতো বোর্জোয়া মনোবৃত্তি, স্বার্থ, লোভ—এ' তো আন্তর্জাতিক।"

অন্যদিকে কথা যাচ্ছে। আমি বলি—"না ছাড়ুক। স্বেচ্ছায় ছাড়া তো কোন কাজের কথা নয়। জিততে হবে, হারিয়ে দিয়ে; নইলে জিত জিত নয়।"

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে পিউনো। —"বল তো, আবার বলো। একথা পেলে কোথায়?"

—"বলছি, জিততে হবে হারিয়ে দিয়ে। আমরা হারিয়ে দেবার আগেই জেতার চেষ্টা করে ভ্রূণ হত্যা করেছি। কেঁচো কাটলে, কেঁচো হয়। সাপ কাটলে, সাপ মরে। ক্যাক্‌টাসের টুকরো থেকে ক্যাক্টাস হয়। বীজ না পাকলে ধান, গম হয় না। বীজহীন ভারত স্বাধীনতা! সে স্বাধীনতায় কেউ স্বাধীন নয়। —আজও নয়। কিন্তু তুমি কে, পিউনো? তুমি কি পিউনো? তুমি কি বাউণ্ডুলে হিপ্‌পীই বটে?"

চমকায় পিউনো। "হিপ্‌পী? আমি হিপ্‌পী? এঃ! বড় অপমান করলে হে ভারতীয় শোরের বাচ্চা। আমি রিএ্যাকশনারী? দালাল? পাঙ্ক্? ছিঃ! ঐ সব কৃমিগুলো নর্থ আমেরিকার বমি।"

—"কে তুমি?।"

—"আমি আলেন্দী! সালভাদোর আলেন্দী? ১৯৭৩ এর কথা। আজ তুমি তিরাশীর বুকে পা রেখে আমায় চিনতে চাও?"

—"আলেন্দী তো নিজের বুকে নিজে গুলি মেরেছিল!"

—"হাঃ! আমি তবে কে? আমি হেঁটে এসেছি ১৯৭৩ এর সান্তিয়াগো থেকে পা ফেলে ফেলে এই একোয়াদোরের চির বসন্তে স্নান করার জন্যে। কুইতোর মেয়েদের রমণীয়তার প্রশংসা আজও আছে। কুইতো, তার মেয়ে, তার সোনা, তার এয়ারেপ্‌ড্।"

—"হ্যাঁ, বোলিভারের প্রণয়িনী ছিলো কুইতোর মানুএলা সায়েঞ্জ। জানি তাঁর কথা। —জানি বলেইতো একোয়াদোরে আসা। —আমার মনে কুইতো এক স্বপ্ন-নগরী। মানুএলার প্রাণের কুইতো।"

—"রমণীতম রমণী। ঐ ওদেরই বলি, গেরিলা। বর্জোয়াজী লিখবে সে ছিলো পল্-কাটা হীরের খান্‌কী। যাতে করে, বীর বোলিভার খাটো হয়ে যায়। ...আমরা জানি বোলিভারকে দেখার ঢের আগে আর্জেন্টাইনার বিপ্লবে বন্দুক ধরে সে আদায় করে নিয়েছিল 'সান-ক্রস্'—এ তল্লাটের শ্রেষ্ঠ মিলিটারি সম্মান। লাতিন বিক্টোরিয়া ক্রশ্।

..."এই সেই ক্যাথীড্রাল। আর এই সেই লারিয়া-হাউস। এই সেই ব্যালকনি। ...আরে! কে তোমায় একটা শাদা গোলাপ ছুঁড়ে দিয়েছে! দেখো—দেখো!"

হাত খুলে দেখায় আধপোড়া একটা সিগার!

—"হাঃ! রোম্যান্টিক ডন্-কি-হোতে!" —হাসিতে ফেটে পড়ে পিউনো।

হাঁটতে হাঁটতে এসে গেছি থ্রী-চিয়ার্সে।

পিউনোর যেন, কত জানা আনাকে। সোজা ওর রান্নাঘরে ঢুকে ফ্রিজ খুলে বোতল আর গ্লাস বার করল।

আনা তো পিউনোকে দেখে অবাক!

—"আরে শে, তুমি কোথায় পেলে এদের?"

"শে'? শে' কে? —পিউনো কি শে?"......

আনার সামনের মাংসপিণ্ড দু'টো খুব দুলছে ওর হাসিতে। ও পিউনোর দাড়ি ভরতি গালে চুমো দিয়ে বলে—"ওর কি একটি নাম নাকি? ওকে অনেকে বলে—'ট্রট্স্কি'। আবার স্কুলের ছেলেরা বলে,—'মার্ক্স'। ওর পিয়ারী আনা বলে, 'এঙ্গেল'। এঙ্গেল্স্ নয় গো। এঙ্গেল্।"

তখন আমার মনে হল, ঠিক, মার্কস্ নামই ও চেহারায় মানায়।

দেখলাম, যা ভালো, যা সৎ তাকে পাগল বেশেই মানায়। সর্বত্যাগীর মতো সুন্দর কে?

ওর সামনে এক বাটী স্যূপ আর রুটীর প্লেট নামিয়ে দিয়ে আনা বল্লো—"আজ এখানেই থেকে যাও। আমাদের জমবে ভাল।" ...আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, "একে পেলে কোথায়? একে পেলে কোথায়?"

—"পাঁঠার গন্ধে পাঁঠা দৌড়ায় জানো না!" একথা বলতেই ওদের সে কী হাসি!

সিল্‌ভা সামোসো কুইরিনো ট্যাক্সী নম্বর QT444K যখন ফোন করলো, তখন সূর্য অবশ্য উঠেছে কি ওঠেনি। কিন্তু ঘুম খুব ভালই হয়েছিলো।

আনা খিদমৎগারী জানে। বিছানাটি পরিপাটী করে পেতে দিয়েছিল। আর জানালাটা খুলে রেখে বেশ মোটা পর্দা দিয়ে আলো ঢেকে দিয়েছিল। ভোরের আমেজ

পেতেই উঠে পড়তে আলস্য হল না। দূরে কার্ডিলেরার ধূসর বিস্তৃতি। বড় রাস্তার কোন গোলমাল এদিকটায় আসছেন না। উঁকি মেরে দেখি দুধের গাড়ি, রুটীর গাড়ি ছাড়াও বড় বড় ট্রাকগুলো পাহাড়ী পথের দিকে চলেছে। স্নান সেরে যখন লাউঞ্জে নেমে গেলাম, মধু তখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে ওর ঘুমের কোলে ছেড়ে দিয়ে কফির কাপ নিয়ে বসলাম।

পিউনোর চেহারা পালটেছে। আনা ওকে একটা নতুন প্যান্ট আর ধোয়া শার্ট দিয়েছে। আমি হেসে বলি—"এঃ! কোথায় মনে হচ্ছিল স্বয়ং জীউস; এ যে এককেবারে পৃথিবীর মানুষ বানিয়ে ছাড়লে তোমায়! —যাঃ, প্যারাডাইস লষ্ট।"

শুনে আনা চায় পিউনোর দিকে, পিউনো চায় আনার দিকে। দু'জনের চোখের সেই হাসির ভাবা ঝর্ণার মতো ফেটে পড়ল। আনা পিউনোর গলা জড়িয়ে বলল—"কাল সারা রাত আপেলের পর আপেল খাইয়েছি। প্যারাডাইজ্ লষ্ট হবে না?"

আবার হাসি! সুন্দর হাসি!

পিউনোর সঙ্গে কথা চলছিল কুইতো এবং আশ-পাশের দেখার মতো জিনিষের লিষ্ট নিয়ে। পিউনো বল্লে—"কুইতোয় যে দু'টি দ্রষ্টব্য, তা তো দেখেই নিয়েছ। এক, এই কুন্তী-শয্যাশিল্পী আনা, আর দ্বিতীয় এই অটুট অ্যাপোলো—আমি। এ দু'টি বাদে বাকি সবই বাদ দিতে পার। কিস্সু দেখার নেই।"

আমি বলি—"সে আমি নিশ্চয়ই মানি, মানবো। কিন্তু তোমাদের দেখব, মনের ভল্ট্-এ বন্ধ করে রাখব। কিন্তু চোখেরও তো ক্ষিদে আছে। দেখতে শুনতে হবে বৈকি! প্লেন কিন্তু ঠিক সাতটায়।"

—"কনফার্ম করেছ?"

—"সে কি? এয়ার পোর্টে নেমেই সীট বুক করে তবে শহরে ঢুকেছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তো ছাড়ছি।

—"তবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় চব্বিশ বার পুরো করলে তবে তো চব্বিশ ঘণ্টা। অঙ্ক কাঁচা কেন? এ হল পেরুভিয়ানা এয়ার পেরু। ঘণ্টায় ঘণ্টায় কনফার্ম করতে হয়।"

সে ঠিক। এদের শেডুলের ওলোট-পালোট লেগেই আছে। আবার ফোন করতে বললে, "আপনাদের প্রায়রিটি। আপনারা গেষ্ট। নো ও'রী!"

মধুরও খাওয়া সারা।

হঠাৎ আনা একটি বাটি ভর্তি সাঁৎলানো কড়াই-শুঁটী দিয়ে গেল। কেমন একটা নতুন স্বাদ। জিগ্যেস করতে জানলাম—কাঁচা তাজা শুঁটীগুলো জড়ো করে আগুন-চাপা দেয়। একটু পরে বা'র করে নিয়ে, তার পরে প্রচুর প্যাঁজ দিয়ে সাঁৎলায়। সেই পোড়া গন্ধটাই লোভনীয় করে তুলেছে।

একোয়াদর শাক-সবজী আর ফলের জন্য বিখ্যাত। এখানে বাড়ির সঙ্গে কিচেন গার্ডেন রাখা এক ধরনের বিলাস। খুব ভালো ফসল হয়। সারা পিচিঞ্চা প্রদেশই সব্জির জন্য বিখ্যাত।

পিচিঞ্চা একটা আগ্নেয়গিরি (৯৩৫০ ফুট)। সেই ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে একবার তেড়ে-ফুঁড়ে উঠেছিল। আর সেই থেকে জাগেনি। তবু কেউ বলে না, এ কুম্ভকর্ণ মরেছে। জাগতে পারে। জাগলেই সর্বনাশ। তাই পাহাড়ের গায়ে, মাথায় এখনও অবজার্ভেটরী আছে।

এই পিচিঞ্চা নামেই প্রদেশ পিচিঞ্চা। যার রাজধানী কুইতো। আন্দীয়ানে পশ্চিমের তাবৎ প্রাচীন রাষ্ট্রের মধ্যে সবার বড় এবং সবার সেরা রাষ্ট্র ছিলো কুইতু। 'কুইতু' কৌমেরই রাষ্ট্র। কিন্তু যখন ইন্‌কারা তাদের বিজয় যাত্রা চালালো তখন—দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই কোনো সময়ে পিচিঞ্চাকে ইন্‌কারা গ্রাস করে নেয়। কুইতুরা এবং পিচিঞ্চারা আজও আছে, তবে তারা, অর্থাৎ যারা এখনও বিশুদ্ধ রক্তের, তারা আন্দীজের দুর্গমে থাকে।

আমাদের গাইড 'আলেন্দী' বলে, তারাই নাকি ভবিষ্যৎ বিপ্লবের কাঁচামাল। সবাই তলে তলে গেরিলা।"*

"কেন বল তো?" —জিগ্যেস করি।

"কেন? ঐ যখন ইন্‌কারা এলো তখন এখানকার রাষ্ট্রের বাগডোর ধরা ছিল যাদের হাতে, তাদের নাম 'শাইরিস'। এই 'শাইরিস্' 'কৌম' এবং 'কারা' কৌম ফিরিঙ্গীদের 'দাঁত খাট্টা' করে দিয়েছিল। ইনকারা হেরে গেছে। আতাহুয়াল্লাপা মারা গেছে—এসব কথা ওরা বিশ্বাসই করতো না। ······যাও না আন্দীজের পূবে, জঙ্গলে। কতো যে কৌম। ওদের বদনাম যে, শাদা দেখলেই ওরা মেরে ফেলে। —এমন কি খেয়ে ফেলে বলেও প্রবাদ আছে।"

"বদনাম বলছো?" আমি ভ্রূ কোঁচকাই।

"হ্যাঁ, যারা বলে বদনামের মতো মশলা দিয়েই বলে। কিন্তু আসল কথা ওরা, অনেকেই বিশ্বাস করে না, যে আতাহুয়াল্লাপা, মাঙ্কো, বা রাণী কোয়ামিংলা মারা গেছেন। ওদের মনে যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসই বলে যে, ওদের রাজা অমর। ইচ্ছা না হলে তাঁরা পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে যান না। ওদের বিশ্বাসের জগতে যে ঘা দেবে, সে ওদের শত্রু।

"তাঁরা আজও আছেন। আছেন ওদের বিশ্বাসে। আর তাই, ওরা গেরিলা নয়, সংশপ্তক। ওরা কোনো দিন খাজনা দেয়নি। দেবেও না। ওদের ছিলো পঞ্চায়েৎ রাষ্ট্র; আছেও পঞ্চায়েৎ রাষ্ট্র।"

"ফিরিঙ্গীরা এই দুর্ধর্ষ আন্দীজ পার হল কি করে?"

"আন্দীজ যে পার হওয়া যায়, একথাই কেউ ভাবতো না। তাইতো, বোলিভার যখন তাঁর সৈন্যদল নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন কুইতোয়—সবাই ভাবল, এরা এক নয় দৈত্য—নৈলে ভূত। ও পথ দিয়ে মানুষ তো কখনও আসেনি। আসতে পারে না। না ওরা

[Statesman :—15.3.84—Bogota-র খবর:—ফ্লরেন্সিয়া শহরে চার ঘন্টার হাবলায় ১৪০ জন সরকারী কর্মচারীকে হস্টেজ রেখে গেরিলারা লড়াই চালিয়েছে। ৩২ জন কর্মচারী মরেছে। গেরিলারা ও হোস্টেজরা উধাও।]

আন্দীজ পার হবার কথা ভাবতই না। ওরা এসেছিল জলপথে। সেই কার্তাজিনা থেকে ডেরিয়ান উপসাগর পার করে পানামার স্থলপথ পার হয়ে, আবার জাহাজ নিত বোনাভেন্তুরা থেকে।"

বোনাভেন্তুরা (শুভযাত্রা) নামটি আজও ম্যাপে আছে। মাগদালীনা নদীর প্রসিদ্ধ অববাহিকায় প্রসিদ্ধ বন্দর আজ পেট্রলবাহী জাহাজে ভর্তি। আর পার হতে হয় না স্থল পথ। এখন পানামার খালই আছে। নাম-কে-ওয়াস্তে পানামা স্বাধীন পতাকাও ওড়ায়।

একদা পানামার দোরে এসেও ভিসার অভাবে পানামার মাটিতেও পা দিতে পারিনি। যখন ভাবি, এ পানামা কার, উত্তর পাই একটাই ;—"জিসকী লাঠী উস্‌কী ভৈঁস্!"

'কারা' নামক যে উপজাতি কুইতু রাষ্ট্রের ওপর গদিয়ান ছিল, তারা বরাবর দাবি করত যে, তাদের পূর্ব-পুরুষরাও এসেছিল সমুদ্র পথেই। কিন্তু সিবাস্তিয়ান দ্য বেলাল্‌-কাজারও এসেছিল সমুদ্রপথেই। সে ছিল স্পেনের জয়ধ্বজা তুলে, ফ্রান্সিস্‌কো পিজারোর প্রতিভূ হয়ে। সেই অদ্ভুত কুইতু নগরীটি সে অধিকার করল ১৫৩৪-এর ৬ই ডিসেম্বর। অধিকার করল, বলে নয়; কৌশলেও নয়। শুধু নির্মল মনের সদাশয় আতিথেয়তা এবং আপ্যায়নের পাখা-দু'টো কেটে ফেলে। যেমন রাবণ কেটেছিল জটায়ুর পাখা। সীতা ধর্ষণের মতো একটা সতী সভ্যতা ধর্ষিতা হোল আতিথ্যের বিনিময়ে।

এ ভুল 'কারা'-রা করত না। জানতই না যে, এটা ভুল; ভুল করা হচ্ছে। ওদের মনের বাতায়ন যে পশ্চিম সাগরের দিকে খোলা। ওরা জানত যে, ওদের পিতৃলোকের স্বর্গ পশ্চিম সমুদ্রের (প্রশান্ত মহাসাগর) পারে।

আর এরা যারা এল, এরাও তো এল পিতৃ-যানের সেই অর্চিরাদি পথেরই জ্যোৎস্না মেখে, দেবদুর্লভ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী হয়ে।

ওরা তো জানত না নৃ-তত্ত্ব বিজ্ঞান। জানত না করোটীর ভাষা। জানত না ভ্রূমধ্য থেকে পিছিয়ে যাওয়া কপালের ওপর খুলিটির ছুঁচলো গঠন। আর ভ্রূমধ্য থেকে সোজা খাড়া জেগে ওঠা গোল খুলির গঠনে কী তারতম্য। কী তারতম্য নীল আর কালো চোখে; কালো কোঁকড়া চুল আর সোনালী ঢেউ খেলানো চুলে। জানত না সরল উলঙ্গতায় উষ্ণমণ্ডলের সূর্য-রস পানের তৃপ্তি, আর কৃত্রিম যাদুকরতায় শীতমণ্ডলের কুণ্ঠিত আবরণের আড়ালে কৃত্রিম জীবনের বিষ-তৃষ্ণার বিরাট পার্থক্য।

ওরা জানত পশ্চিম দিক থেকে আসে বরুণপুরীর বদান্য মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মীয়েরা। বুঝতে পারেনি এরা অগ্নি কোণের বিনাশ, ঝঞ্ঝা, লোভ।

[এতো লিখছি ইতিহাস। কিন্তু ইতিকথা তো রূপ কথা নয়। নৃতত্ত্ববিদ্‌রা এবং বলতে কি, নৃতত্ত্ব-ভিত্তিক সমাজ-তাত্ত্বিকরাও বার বার জিজ্ঞাসা করেন, এই 'ইণ্ডিয়ান'রা নয় 'ভারতীয়' না-ই হোল। কিন্তু এরা কা'রা? কে? কোথা থেকে এল? এদের পুরাণ কথাও কবুল দেয় যে :—

(১) এরা এদেশের নয়; (২) এরা পশ্চিম থেকে এসেছে; (৩) এরা সমুদ্র পার থেকে এসেছে; (৪) এরা উত্তর আমেরিকার আজতেক, মায়া, মেক্সিকদের কেউ নয়। তা'রা দাবী

হয়তো তা'দের পূর্ব-পুরুষ কোয়েৎ-আল-কোয়াৎল্ এসেছিলেন পুব সাগর থেকে, বিলীন হয়ে গেছেন পশ্চিম সাগরে এবং আবার আসবেন পুব সাগর থেকেই। আর এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আজকের মায়ারা অবহিত চিত্তে দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুকে শত্রু মনে করে বাধা দিতে অস্বীকৃত হয়েছিল।

নৃতত্ত্ব বলছে, হয়তো বেরিং প্রণালী থেকে উত্তর আমেরিকার ঐ উপজাতি বা প্রজাতিরা এসেছিল। আসুক।

কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার এই তীক্ষ্ণ করোটীর মানুষরা কারা? এদের স্থাপত্য বিচিত্র; এদের দেবতার মধ্যে রক্ত পিপাসা কম এবং সূর্যের সম্মান সর্বাগ্রে।

সূর্য বন্দনায় স্বর্ণ এবং কুমারী উৎসর্গ করাকে দারুণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। সূর্য সন্তান যম ও যমীর মতো, মনু শতরূপার মতো, বাইবেলের আদম ও ঈভের মতো এদের মধ্যে ভাই-বোনে বিবাহ পুণ্য-শ্লোক মিলন বলে ধরা হোত। এদের হোম-পূজা, মন্ত্র-তন্ত্র, হোতা-উদ্গাতা, অধ্বর্যু ছাড়াও সূর্য চক্রমণের বৃত্তির মাপে মেপে মেপে এদের নানান ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতাঙ্গিক নানা বিচিত্র মেলা, নৃত্য, নাটকের আঙ্গিকে সাধারণ শোভাযাত্রার উল্লাস-উদ্দীপনা......এসব তো আজও আছে, কিন্তু অন্য নামে।

তবে এরা কা'রা?

এদের জঙ্গলে আছে বাল্‌সা, আছে তোতোরো ঘাস। তিতিকাকা হ্রদে এরা আজও মাত্র সেই তোতোরো ঘাসের আটার নৌকায় পাল খাটিয়ে (এখন তো মোটর লাগিয়েও) সমুদ্রের মতো বিশাল হ্রদ পার হয়ে যায়।

স্কাণ্ডিনেভিয়ান এ্যাডভেঞ্চারার থর হাইয়েডাল তো বালসা কাঠের নৌকা "কোন্‌-টিকী" ভাসিয়ে সারা প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েছেন। আর প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, কাঠের নৌকোয় প্রশান্ত মহাসাগর পার করে দক্ষিণ প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ তথা নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার যোগা-যোগের ভাবনা একেবারে অসম্ভব গাঁজাখুরী না-ও হ'তে পারে। হাইয়ের্দাল ছিলেন ভাইকিং-দের শোণিতে রঞ্জিত সমুদ্র বিজয়ী।

সুতরাং সূর্য উপাসক, ভ্রাতা-ভগ্নী উদ্বাহক, স্বর্ণ-রৌপ্য সম্বর্ধক, রাজতন্ত্রের পরিপোষক, সূত্র-গ্রন্থী-লিপি পাঠক, সমাজ-বন্ধনের ধারক একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা দক্ষিণ আমেরিকায় ভুঁই-ফোড় হ'তে পারে। সত্য হতেও পারে আতাহুয়াল্লাপার পূর্ব-পুরুষ পশ্চিম সমুদ্র বেয়েই এসেছিলেন। বিষয়টায় পরে আবার আসতে হবে!]

তবু তো এডমিরল বেনালিকাজার তার সৈন্যদল নিয়ে জাহাজ ছেড়ে নামেনি বন্দরে। সে এসেছিল তার সেনাপতি পিজারোর নির্দেশে সমুদ্রপথ ধরে।

একজন সে পথ ধরেনি। ভুল করে সে ধরেছিল পাহাড়ি পথ। তার নাম আলভোরাদো। পিজারোর প্রতিদ্বন্দ্বী। মেক্সিকো বিজেতা কোর্তেজের অতি বিশ্বস্ত সেনানী। কিন্তু তাকে ভুল পথে এনে ফেলেছিল 'পথ-প্রদর্শক'! পথেই শেষ হয়ে গিয়েছিল তা'র বেশীর ভাগ সৈন্য। ইতিহাসে প্রথম ও শেষ কার্ডিলেরাকে পার করে এসেছেন সাইমন বোলিভার।

কুইতোর চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে তখন গর্জে উঠেছে আগ্নেয়গিরি কোতোপাক্সী। সে ভীষণ উদ্গারের ফলে বাতাসে ভাসছে ভস্ম, আর বালির তরঙ্গ। সেই তরঙ্গের প্রকোপে শ্বাসবন্ধ হয়ে, চর্মরোগে, ক্লান্তি ও অবসাদে আলভারাদো যখন মৃতপ্রায়, বেনাল্‌কাজার তখন দুর্বার গতিতে চলেছে কুইতো লুণ্ঠনে।

কুইতো লুণ্ঠন খুব সহজে হয়নি। আতাহুয়াল্লাপার এক অখ্যাত ভাইয়ের সাহায্য

পেয়েছিল পিজারোর দল। কিন্তু সামনে পেরুর দুর্ধর্ষ সেনাপতি কুইজ-কুইজ্। দিনের পর দিন যুদ্ধ। ভীষণ যুদ্ধ! একদিকে ঘোড়া, বন্দুক, কামান; আর অন্যদিকে পদাতিক, বল্লম, পাথর, তীর-ধনুকও নয়। সে যুদ্ধের অপর নাম অপরিমিত সাহস, অকুণ্ঠ বীর্য, প্রচণ্ড প্রতিরোধ আর অভিজ্ঞ কৌশল।

সব হল। কিন্তু কামান বন্দুকের মুখে কত দিন? বিশেষতঃ ঘর-শত্রুর প্ররোচনার বিপক্ষে? আর পারে না সৈন্যদল। তবুও হারেনি তারা। জেতেওনি। কিন্তু যে দিন কুইতো থেকে সরে এলো বীরশ্রেষ্ঠ কুইজ্-কুইজ্: সেদিন পেরুর বিরক্ত, বিষণ্ণ সেনানীরাই বীরাগ্রগণ্য কুইজ্-কুইজ্‌কে হত্যা করল। তাদের ধারণা ছিল সেই বিশ্বাস-ঘাতক রাজকুমারকে মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কুইজ্-কুইজের কোন অভিসন্ধি ছিল। কে যেন আতাহুয়াল্লাপার ডান হাতখানাই কেটে নিল।

এ কাহিনী, বীরগাথা, পরে বলা যাবে। বলার মতো, শোনার মতো গাথা। যেন থার্মোপলি, হলদিঘাট, দোবারী।

আলভোরাদো যত এগোয়, শুধু দেখে পথে ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ। কোনো স্প্যানিশ সৈন্যদল আগে আগে চলেছে।—তারা কা'রা? কেউ কুইতোয় তার আগে পৌঁছে গেছে। তবে কি তার এত পরিশ্রম ব্যর্থ?

হ্যাঁ, তাই। পিজারোর নির্দেশে সেবাস্টিয়ান বেনাল্‌কাজার রয়ে গিয়েছিলো কুইতো ধর্ষণের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে। অসম সাহসী এবং অতি নীচ, নৃশংস এই বেনাল্‌কাজার। স্পেনের দরবারে সোনা ঘুষ দিয়ে কুইতোর ভাইসরয় পর্যন্ত হয়ে গেছে এই রাক্ষস।

কোরা-সেনাপতি রুমিনাভির সাথে বাধলো সংঘর্ষ। কোরারা এমন লড়তে পারে এ ধারণা ছিল না বেনাল্‌কাজারের। দুর্ধর্ষই শুধু নয়, বহুরক্তক্ষয়ী বহুদিনব্যাপী সে সংঘর্ষ। সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ। বহুবার ফিরিঙ্গীরা পালিয়েছে সব ছেড়ে।

কিন্তু শেষ অবধি হয়েছে গোলাগুলি আর বারুদেরই জিত। এবং সে জিত হারেরও অধম।

কুইতু নামক সোনার শহর তখন ডিমের শূন্য খোলার মতো পড়ে আছে ব্যর্থতার, অসারতার পরিচয় মেখে।

এই সেই কুইতু। বীর কুইতু। পরে নাম হয় কুইতো। সেই সেদিন পরেছিল শেকল। খুলে দিলেন ১৮২২-এ সাইমন বোলিভার। পিচিঞ্চার যুদ্ধে যেদিন সুক্রে জিতলেন সেই দিনই হোল কুইতোর মুক্তি। আর কুইতোর পথ দিয়ে সুক্রেকে পাশে রেখে যেদিন বীর সাইমন বোলিভার বীরের শোভাযাত্রায় হাজার কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধ্যে সহস্রের সম্বর্ধনা গ্রহণ করছিলেন—সেই দিনই জুয়ান-ত্থ-লারিয়ার প্যালেসের বারান্দা থেকে তার কপালে এসে লেগেছিল লাল একটি গোলাপ!

হঠাৎ আঘাত?

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে তাকিয়েছিলেন বিরক্ত বোলিভার।

কিন্তু কার জন্য ভ্রূ-কুঞ্চন? কে এই অপরাধিনী?

বোলিভার টুপী নামিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে সুন্দরী-বন্দনা করলেন।
কিন্তু কে এই গান্ধর্বী? কে?
সে গোলাপের অধীশ্বরী উর্শী-কাট্ এর মানুএলা সায়েঞ্জ!
আমি যাব সেই বারান্দা সেই লারিয়া প্যালেসে।

একটু হাসে সেই বিজ্ঞ এ্যালেন্দী, থুড়ি—পিউনো।

সেই লারিয়া হাউস্? যাবে? যেতে চাও? কিন্তু সে রাতটি কি আর ফিরে আসবে? কোথায় পালাল গত শীতের বরফের দল?' (যে রজনী যায় ফিরাইবে তায় কেমনে? সে সন্ধ্যায় কুইতোর পথ-ঘাট, বাজার লোকে লোকারণ্য। কুইতোর নিঃশ্বাস ছিল অসম্ভবের ঘন ঘন ঝাপটা।

সন্ধ্যার রসঘন মেদুর আকাশ মন্থন করতে করতে রক্তবর্ণ পশ্চিম চোখ বোজার আগে **সীডান চেয়ারের পর সীডান চেয়ারে** ইন্‌কা, কারা কুইতু বাহকদের মৃদু পদ-চালনের ছন্দে মদির মন নিয়ে নগরের ধনিকা, বণিকা-সুন্দরী, অসুন্দরীরা ঐশ্বর্যে শোভায় মণ্ডিত হয়ে আসছেন, নামছেন, সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন। আজ এই হলে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মহামানব সাইমন বোলিভার তাঁর সব কয়জন সেনাপতি, ফিল্ড্ মার্শালসহ ভোজে, নাচে কুইতোর সমাজ জীবনকে ধন্য করবেন।

রূপসীদের মেলা লেগেছিল; ধনবানদের নস্যদানী খালি হচ্ছিল, তরুণদের হৃদ্-স্পন্দন দ্রুত লয়ে দাপাদাপি করছিলো। চাকর, দারোয়ান, পানীয় সরবাহকরা, ভোজ্য পরিবেশকরা পায়ের চলনে ঘোড়ার দুলকি-চাল এনেছিলো। হলের মধ্যে হাসির হল্লা, প্রেমের ফিস্-ফিসানি, খেউড়ের প্রবাহ, চকিত-ত্বরিত হাজির জবাবের খোশবায় দিকে দিকে নানান রসের সায়র রচনা করেছিলো।

চিচ্‌চার স্রোত বয়ে গিয়েছিলো। পথে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল শুধু ল্যাম্প-পোষ্টগুলো, আর স্থির হয়ে চলছিলো চার পায়ে ভর করা গাধারা। মেয়েদের গাউন ধরে পথের মাঝেই টানা-টানি চলছিল। উল্লাস-উদ্দীপনা মুখর মেয়েদের চিৎকার ঘন ঘন ছিঁড়ে ফেলছিল রাত্রির বক্ষবাস আর কটীবন্ধ। সেটা ছিল বর্ষার মুখের একটি স্নিগ্ধ সন্ধ্যা। মানুষের রক্তে তখন বীজ বোনার ডাক।

১৮৮২ এর ১৬ই জুন স্পানিশ জেনারেল আয়মেরিশ ভীষণ যুদ্ধে ঠিক জেতার মুহূর্তেই হেরে গেলো। তরুণ সুক্রের দুর্দম শপথের লাভার মুখে অত সাধের স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের স্পর্ধা ধূলো হয়ে গেলো শপথ-বিদ্ধ বিপ্লবের পাঞ্জায় ঠেকে। বন্দর গুয়াকিলের বিদ্রোহ অবসিত হল পিচিঞ্চার বিজয়গৌরবে। সেই সেদিনের কুইতো, আর আজ এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কুইতো। চিলিতে আলেন্দী হত্যা, পেরুতে সামরিক শাসন, একোয়াদোরের পথে পথে গুপ্তচরের নিঃশ্বাস। সমস্ত দক্ষিণ আমেরিকার নিলাম ডাকা হচ্ছে। এখানে কি পাবে সেই ১৮২২ এর রূপসীদের মেলা? বুড়ো আঙুল চোষো ফিলজফার। ইতিহাসী-রূপকথার পান-ডুবিতে গুপ্তী-ডুব মেরে ঝিমোও।

কিন্তু জোসে লোরিয়া প্যালেস্ আজও আছে। আছে সেই বারান্দা। আমি ভেতরে চলে যাই। যেন আমার সব চেনা। সেই হলঘর। মাঝদিয়ে ওপরে যাবার সেই সিঁড়ি। সিঁড়ি উঠতে বাঁ-ধারে থামের সারের পরপারে সেদিন ছিল ইংরেজ অফিসার আর ভলেন্টিয়ার সেনানীদের ভীড়। একটা টেবিলের ওপর চড়ে ম্যানুএলা নেচেছিলো স্প্যানিশ দুনিয়ার লাস্য-বিমোহন সর্বগ্রাসা নাচ। এ্যাপাঙ্গা! ঠোঁট চাটা বিশপরা বলত, এ নাচের নাম হওয়া উচিত নারীদেহের মাংসল বিভ্রম—যেন কন্যা সালোমের নাচ পিতা হেরোদকে বিভ্রান্ত করার ফন্দীতে। আর তখন সেখানে কর্ডোভা, ফার্গুসন, ও'লীরী, ও'কনর, সুক্রে, রুপার্ট হ্যাণ্ড প্রভৃতি জাঁদরেল জাঁদরেলদের দল—উন্মত্ত, উল্লসিত, স্পর্ধিত বীরদলের প্রচণ্ড বিক্রম। সর্বনাশা, সর্বহারা, সর্বব্যাপী উন্মাদনা।

সেইখানেই সেই প্রথম দেখা। ঐতিহাসিক এবং অবিনশ্বর। চিলির প্রখ্যাত সান্-মেড্ল্-এর সোনার ঝলক ঝলমল করছে, সুবিম্বিত বুকের ওপর দিয়ে বাঁধা নীল সিল্কের ফিতের ওপর। চিলি-বিপ্লবের প্রখ্যাত সম্মানে ভূষিতা এ বিপ্লবিনী যে শুধু স্বাস্থ্য, রূপ আর যৌবনের দীপ্তিতেই মহা বিপ্লবিনী হয়ে দেখা দিতে পারতেন জীবনের রঙ্গমঞ্চে। বোলিভার স্পষ্টতঃই বিচলিত হলেন।

শুধু নিয়ম রক্ষার মতো দু-তিনটি নাচের জন্য অন্য সঙ্গিনীদের বেছে নিলেও যখন নাচের সঙ্গিনী হলেন ম্যানুএলা, তখন আর সঙ্গিনী বদল হোলো না। সারারাত চল্লো নাচ। আর কোনো সঙ্গিনী বদলের প্রশ্নই উঠলো না।

বোলিভারের জীবনে 'ভোগের' মুহূর্ত ছিলো খুব কমই। মদও খুব খেতেন না। পরিচ্ছন্ন পোষাক, পরিচ্ছন্ন দেহ ছাড়া, ভোগ করতেন শুধু নাচ। উপযুক্ত দ্বিতীয়ার সঙ্গে প্রাণময় বিদ্যুৎতরঙ্গের প্রবাহের মতো নাচ। তাই বার বার তাঁকে সহরঙ্গিনী বদল করতে হত। কিন্তু এই একটি বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে আলিঙ্গন করলো বৈশাখের মেঘ, যাকে বুক থেকে আর সরাতে হলো না।

অদ্বিতীয়া এ উর্বশী! আর পুরুরবাও বিভ্রান্ত!!

সারারাত এই মেঝেতেই লাতিন আমেরিকার প্রতিভাধর নৃত্য-শিল্পীর নাচ প্রত্যক্ষ করেছিল তাবৎ জন। আগুনে-বাতাসে, ঝঞ্ঝায়-তড়িতে সেই উদ্দাম সংযোগ লাতিন আমেরিকার ঐতিহাসিক কিম্বদন্তীতে অক্ষয় হয়ে রইলো।

......আর রাতের শেষে মদাতুর দৃষ্টি মেলে শত চেষ্টা করেও কেউ ঠাওর করতে পারলে না কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল দুটি নক্ষত্র—নৃত্যের আকাশে উজ্জ্বল দুটি তারা ঊষার আভাস গায়ে লাগতেই অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকের মনে শুধু দু'টি নাম—বোলিভার আর ম্যানুএলা।

বার বার রেলিংটায় হাত বোলাচ্ছি। বারান্দায় এসে বার বার ঘুরছি।

"কি হোলো স্যর?" —মধু জিগ্যেস করে।

কি করে বোঝাই! বিপ্লব, বিদ্রোহ, যুদ্ধ, রক্তক্ষয়, সংগ্রাম এসব তো আছেই—যেমন আছে সূর্যের জ্বালা, নীহারিকার ঘূর্ণি, সমুদ্রের মাতন, আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ; কিন্তু এ সব সত্ত্বেও জল পড়ে পাতা নড়ে, নক্ষত্র জাগে, গোলাপ ঘুমোয়, শিশু হাসে, বিধবা কাঁদে। সুন্দরের পদক্ষেপ শ্মশানে বসেও শোনা যায়। কী যে দেখি মধু! কী যে দেখি! বলতে পারি না! জীবন্ত ইতিহাস! ইতিহাসের জীবন। যা'র অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই।

কেন যে, সব সময় বলি ক্যাথীড্রাল স্কয়ার! বোধ করি স্কয়ারে স্কয়ারে ক্যাথীড্রালের পর ক্যাথীড্রাল দেখি তাই।

আসলে ঐ চৌকটার নাম "প্লাজা ইণ্ডিপেণ্ডিন্সিয়া" প্রথমেই চোখে পড়ে প্রচ্ছদ পটে সবুজ রং ঢালা পাহাড়টি। পরপর পূর্ব-উত্তর ধরে পাহাড়ী থাকের পর থাক। পিচিঞ্চার ঢল শহরের গায়ে গা লাগিয়ে। এ পাহাড়টা'র গা-ভর্তি নানা ধরনের বাগান-বাড়ি। ...... আরও জানি পাহাড়ের ও-পিঠ ভরতি বসন্তের গুটির মতো গিজ্‌ গিজ্‌ করছে বাড়ি। কিছু টালী, কিছু টিন, কিছু কাঠ-খড়ও আছে। দেওয়ালগুলো কাঁচা-মাটির ইটের। ইটগুলো ১´×৭´´×৫´´ ইঞ্চির। বেশ ভারী, বেশ মোটা। বাড়ি গড়বার সময় নিজেরাই কাদায়, খড়ে, আর কেউ কেউ গুড়ের রাব এবং চুনও মিশিয়ে মাখে; কাঠের ছাঁচ-বাক্সে থেসে গড়ে নেয়। ও আমি ঢের দেখেছি। মা, মেয়ে, বুড়ী, শিশু, রোগা, মোটা সবাই-মিলে মাখে।

ঢের দেখছি একই পাহাড়ের দু'ধার। একই শহরের দু'-পিঠ। একই জীবন-নাটকের প্রেক্ষাগৃহ × মঞ্চ × নেপথ্যের গ্রীণরুম × ঊর্ধ্বের মঞ্চ সজ্জার কলকব্জা।

ও আমার দেখা। সমাজে-সমাজে, দেশে-দেশে দেখা।

তবু তো আকাশ ছুঁতে নীল। যদি চ তার গায়ে উড়ছে সদা বুভুক্ষু, সদা হিংস্র-লোভী কণ্ডোর শকুনগুলো—আকাশের সব চেয়ে বড়ো পাখি।—সব চেয়ে ক্ষুধার্ত। লোভী আর চোর। কিন্তু তা বলে য়োরোপীয় বোম্বেটেদের চেয়ে ভাল। দেশকে ডলার জুগিয়ে দেয়।

ভেনজুয়েলায়, কারাকাসে সাইমন বোলিভারের সমাধি-সৌধে আমি তিন দফায় অন্ততঃ বারো-চোদ্দোবার গেছি। কিন্তু জানি, এখানে, এই ক্যাথীড্রালে আছে সেই দুর্জয় দীপ্ত বিপ্লবী যুবকের সমাধি, ইতিহাসে যা'র নাম সুক্রে।

বোলিভারের না ছিলো গৃহ, না সংসার। পুত্র-কলত্রহীন এই মানুষটা যেদিন শ্যামল-দীঘল টলটলে এই অফিসারটিকে দেখেন, সঙ্গে সঙ্গে তাকে আপনজন করে নেন। বলেন—"ছেলে নেই আমার। ভগবান আমায় এই ছেলে দিলেন।"

তখন সুক্রের বয়স পনেরো গিয়ে বোলো। আর বোলিভারকে যেদিন হিংস্র বিদ্বেষ-পরায়ণ আইন-অরণ্যের শ্বাপদেরা স্বার্থ-সিদ্ধির উন্মাদনায় কোণঠাসা করেছে, হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, নির্বাসনে যেতে বাধ্য করেছে—সে-দিন তারা এই বিশ্ববরেণ্য সেনানী আন্তোনিয়ো জোসে দ্য সুক্রেকেও হত্যা করেছে। সে ছিলো পেরুর পরিত্রাতা,

পেরুর প্রেসিডেন্ট, একোয়াদোরের জন্মদাতা। তার সমাধি এই প্লাজা ইণ্ডিপেণ্ডিন্‌সিয়ার ক্যাথীড্রালে।

পিউনো লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। সিঁড়িগুলো পার করে ক্যাথীড্রালের বাইরে সিঁড়ির পাড়ে একটা বন্ধ ফাটকের ভাঁজে বসে যায়। ওর নেই ভক্তি; নেই ইতিহাস। ও নড়বে না।

বুঝি, ও ক্যাথীড্রালে ঢুকবে না। পিউনোর সঙ্গে ভণ্ডামীর কোন যোগাযোগ নেই।

অন্ধকার ক্যাথীড্রাল। ইলেকট্রিক বাতি যা আছে, তা'ও ভণ্ডামীর সজ্জা রাখার চেষ্টায় মোমবাতির আকারের বাল্‌বের মধ্যে। ওরই মধ্যে কেউ কেউ আবার মোমবাতির শিখার মতো কাঁপছেও, যদিও নিপাট ক্যাথীড্রালের কারাগারী দেওয়াল ভেদ করে ভগবানের দেওয়া আলো-বাতাসের তিলও আসছে না।

এই সব দেওয়াল, অন্ধকার, টিমটিম আলো, রাশি রাশি থামের জঙ্গল—বিশেষ করে বড় বড় গেট বন্ধ রেখে গেটের কাঁঠালী দরজার পেট ছ্যাঁদা করে একটি সরু নীচু দরজার ব্যবস্থা,—সবই নাকি (পিউনোর মতে) ডাকাত, বোম্বেটের হাত থেকে ভেতরের বিস্তর সোনা-দানা, হীরে-মোতি প্রভৃতির ভাণ্ডার বাঁচাবার জন্য।

তা সত্যি। সোনার পাত না হলেও, ভারী সোনার কলাইয়ে মোড়া (লোকে বলে, গিল্‌টি) দেওয়াল, সিলিং আর থাম।

এই নরকেরই (বিশ্ব-বিধাতা মাপ করুন। কিন্তু বিশ্ববিধাতাই কি বলতে পারেন—তবে নরক কোথায়?) এক কোণে, ডান দিকের একটি চ্যাপেলের মধ্যে কালো পাথরের সমাধি। আজ আবার প্রচুর ফুলে সাজানো। প্রচুর মোমবাতি (আসল) দিয়ে আলোকিত। সদ্য সদ্য শেষ হয়েছে বিশেষ প্রার্থনা। বিশেষ প্রার্থনার বিশেষ সহকারিণী তরুণী নান্‌ গায়িকারা সবাই তখনও বিদায় নেননি। একসার দিয়ে পাঁচ-ছ'টি নানা বয়সের সাধারণ মেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে মন দিয়ে। বেশ কয়েকজন য়ুনিফর্ম পরিহিত নানা র‍্যাঙ্কের সেনানীও তলোয়ার মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দিরে মন্দিরে মোহান্ত মণ্ডিত আরতির চেয়ে কতো বেশী সত্য, জীবন্ত, দীপ্ত এই মনোময় প্রার্থনা।

এ ভূমি তীর্থ।

মনে পড়ে গেল, ঠিক একশো তিপান্ন বছর আগে এই মাসেই স্যুক্রে জিতেছিলেন বিশ্ব-বিখ্যাত অসম্ভবের অসম্ভব দুটি যুদ্ধ,—জুনীন এবং আয়াকুচো।

আর পাঁচ-ছ'টি প্রজন্মের পর স্যুক্রোর পরিবারের, বোলিভারের পরিবারের কেউ কেউ হাঁটু গেড়ে আজও মনে করছে বীর স্যুক্রের উজ্জ্বল অবদান।

হয় হোক ক্যাথীড্রাল, তবু মনে পড়ে যায় আমাদের ঋষির মন্ত্র :—

"বীরের এ রক্ত স্রোত
মাতার এ অশ্রুধারা
সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা!
স্বর্গ কি যাবে না কেনা?"

ঝন্-ঝন্ করে বেজে ওঠে মন। শত-সহস্র প্রতিধ্বনি মনের ক্যাথীড্রালের দেওয়ালে অনুরণন তোলে—

"স্বর্গ কি যাবে না কেনা? ·····স্বর্গ কি যাবে না কেনা······স্বর্গ কি যাবে না কেনা?······

বাইরে এসে আকাশের দিকে চেয়ে বলি :—

"যাবে কিনা জানি না। আজও যায়নি।"

তখন বসে পিউনো। মানুষটা যেন ইয়োলীয়ন্ হার্প। বাতাসের ছোঁয়াতেই সুরে ভরে যায়।

সবজান্তা গলায় প্রশ্ন করে, "কেমন লাগলো?"

ওর দিকে চেয়ে বলি,—"সময় তো নেই। মোটেই নেই। নৈলে কয়েকটা জায়গায় ঘুরতাম।"

"কোথায়?"

"মিউনিসিপ্যাল আর্কাইভ্‌স্, ন্যাশনাল আর্কাইভস্। যাসিস্তোয়িয়েঁা-যে-কা-আমাএো-র ব্যক্তিগত সংগ্রহ আর কুইতোর আর্কবিশপের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।"

"হাঃ-হাঃ-হাঃ !! " হেসে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে পিউনো। পথের লোক চেয়ে দেখে। যারা পিউনোকে চেনে, তারা আরও হাসে। ও প্রায় ঠেলে আমাদের গাড়িতে তোলে আর কি!

আমি বলি, "থামো—থামো। বেরিউকোজ পাহাড়গুলো কোন্ দিকে?"

"দক্ষিণমুখী দাঁড়িয়ে আছো, ঐ বাঁ-ধারে। পাহাড়ের পর পাহাড় চড়ে যখন জঙ্গলে ঢুকবে, পড়বে গিয়ে দুর্ধর্ষ পাজির-পা-ঝাড়া খুনে কন্সার্ভেটিভ এলাকায়। গিয়ে করবেই বা কী? তোমার সুক্রেকে দেড় শো বছর ধরে মনে রাখার মতো পাথুরে মন ওরা পোষে না। চলো, গাড়িতে তো ওঠ। বরং চলো গুয়াকিল। গাড়িতে যাবো, আসব। দিব্যি পথ। পথই তো দেখার। পথ আর মানুষ যেন পাহাড় আর নদী। একটা অক্ষয় হয়েও ক্ষয়ে যায়, আর অন্যটার দাঁত নেই, কামড় নেই—তবু ক্ষয়ায়।"

বলেই সে হাসে।

সাতটায় প্লেন। আমরা আছি দশ-হাজার ফুটের মাথায়। রোদ বুঝছি না। কিন্তু বিষুব রেখার ওপরে এ দেশের ঝাঁঝ তো সাহারার ঝাঁঝ হ'বার কথা! কতটা পথ?

"তা দিয়ে কি দরকার? "ড্রাইভিং টাইমটা বলে দিই। ধরো, আট ঘণ্টা আট ঘণ্টা—ষোল ঘণ্টা! আর, কোন না আট ঘণ্টা দেখা-শোনায় কাটবে? মোট তিন আটটে চব্বিশ!"

—"আর একোয়াটোরিয়ান স্থ এক্তিয়াসিয় যে মিঞ্চ মিঞ্চ করে চেল্লাবে। তার কি? ঘড়ি দেখেছো? সাতটায় প্লেন।"

"টেলিফোন। টেলিফোন করো—যাওয়া ক্যান্সেল। ও-তো 'হাতের পাঁচ'।"

"নাঃ. মধুর ছুটি তো অশেষ নয়। বরং এই শহরটাই দেখি। গুয়াকিলে দশলাখ লোক। কুইতোতে বড়জোর ছ'লাখ। অথচ, কুইতোই তো রাজধানী।—এ ক্যা বাৎ?"

—"আগে গুয়াকিলই ছিলো রাজধানী। কিন্তু কুইতো আর গুয়াকিলে আবহাওয়ার তফাৎ আকাশ-পাতাল। গুয়াকিল গরমে পুড়ছে। কুইতো?—চিরবসন্ত। এতো সুন্দর শহর দক্ষিণ আমেরিকায় আর নেই। তবু গুয়াকিল বন্দর, গুয়াকিল বাণিজ্য-কেন্দ্র, গুয়াকিলে শিল্প, সমৃদ্ধি, ব্যাঙ্ক, কারখানা, এক্সচেঞ্জ, দালালী।"

"এখানকার সবই, সত্যি, যাকে বলি সুন্দর। ছেলেদের সাজে-পোষাকে কেমন রুচি, নম্রতা, সৌম্য, সদাচার। অবশ্য তুমি ছাড়া। তোক গুয়াকিল যক্ষ-নগরী। এ যেন দেব-লোক। অবশ্য তুমি ছাড়া।"

"বলো কি! কাল আমায় মেজে ঘষে নতুন পোষাক দিয়ে আনা রীতিমত ভাজা সসেজ করে দিলে: তবু বলছ?"

সিলভা সামোসা কুইরিনো নং QT444K কি বুঝে কীযে হাসতে লাগলো! কি বললোও যেন। শুনে আরও জোরে হেসে উঠলো পিউনো।

বুঝলাম, ট্যাক্সিয়াল ঝেড়েছে কোনো কুট্টী।

কী বলে, সিল্‌ভা হতচ্ছাড়া (ড্যাম সোয়াইন)!

আবার হাসে পিউনো। "ঐ যে বল্‌লাম—না, গরম সসেজের মতো……তাই নিয়ে বদ্ মস্করা করছে।"

"বদ্ কিসের? ট্যাক্সিয়াল কি বাইবেল ভজবে না কি? আমাদের দেশেও আছে, কুট্টী। আর লণ্ডনে, আমস্টার্ডামে,—ওঃ! তওবা, তওবা!"

পিউনো বলে,—"এ বাবদে কেউ টেক্কা দিতে পারবে না—ইস্তানবুল, কায়রো আর এদেনী বয়েৎখোরদের।"

গাড়ি যতো চলে, ত'তো নয়ন ভরে যায় শহর দেখে;—শহরের ছিম্‌ছাম্ দেখে; দেখে এদের মেয়েদের। না, এদের মেয়েদের বয়স নেই। বারো থেকে বাষট্টি সবাই যেন বাইশে এসে থামতে চায়—থেমে আছে। হোক না কেন সে মা, দিদিমা। তবু, তবু—সাজে, পারিপাট্যে, নিপুণতায় এরা মেয়ে, প্রকৃতি, পুরুষের রঙ্গিনী, চিদাভাস।

এদেশের আকাশে বাতাসে ম্যানুয়েলা। এদেশে মেয়েরা চলে না,—নাচে! নড়ে না, —দোলে! কথা কয় না—গান গায়! চোখই রচে চলে কাব্য।

"সত্যি! নিয়ে যেতে পারো ডাঃ সায়েঙ্গের সেই বাড়িতে, যেখানে ছিলো ওর ডিস্পেন্সারী?—কসতো আড্ডা?"

হাসে পিউনো। QT444K পর্যন্ত হেসে ওঠে।

"পাগল হয়ে গেলে না-কি, ম্যানুয়েলা—ম্যানুয়েলা করে? এদেশে সেই পতি-ত্যাগিনীর নামও কেউ নেয় না।"

"খুব পতি-সোহাগিনী সতীদেশ বুঝি এই একোয়াদোর?"

এবার হাসির নায়াগ্রা!

"আরে, সে হোলো গোয়াকিলে। সে কি এখানে। এখানে বলো তো সেই নানারি আর সেমিনারিতে ঘুরিয়ে আনি। যেখানে থাকত কিশোরী মানুএলা।"

"সান্তা কাতালিনা? কতদূর? ওখানে নানেরা কি এখনও ছোটো ছোটো সদ্যঃপ্রসূত বাচ্চাদের গাঁ-ভুঁই থেকে কুড়িয়ে আনে?"

"আনে, কিন্তু তাদের চেহারা রংয়ে যে কাতালিনা চার্চের পাদ্রীদের চেহারার রোবার-ষ্ট্যাম্প মারা থাকে, তা মুছবে কে? নানেদের খুব দয়া। সদ্যঃপ্রসূত শিশুদের কুড়িয়ে এনে মানুষ করে।"

"তবে আর, ম্যানুয়েলার দোষ কি?"

"দোষ? ম্যানুয়েলার মা-নয় মজেছিলো কুইতোর মেয়রের দৌরাত্ম্যে। কিন্তু না মরা পর্যন্ত তার নামে কেউ কোনো বদনাম দিতে পারেনি। তিনি ছিলেন, সত্যি সতী।"

এসে গেলাম সান্তাকাতালিনার দরজায়। পরপর কালো, শাদা ঘোমটায় মাথা ঢেকে বেঞ্চিতে মাথা নীচু করে নানা বয়সের মেয়েরা জপ করছে। যে কেউ হোতে পারতো ম্যানুএলার মা।

আর, গির্জার বাইরেই ম্যানুয়েলাদের চমক লাগানো ভীড়। মফঃস্বল থেকে কতো মানুষ আসে শহর দেখতে। তাদের শখ মেটানোর জন্য থরে থরে বিপণি, দ্রব্যসম্ভার, গহনা (বেশীর ভাগই নানা দামের আংটী), বিয়ের পোষাক, টুপী, অর্গাণ্ডী, ভয়েল, লেস, পারফিউম আর জুতো।

কতো যে জুতোর দোকান, কতো যে ঘড়ি, চশমা, ব্রা আর গভীর গভীর অঙ্গের সাজ! এন্তার!

চামড়া, তামা, রূপো আর কাঠ। শিল্পের জন্য এসব মাধ্যমের ব্যবহার প্রচুর।

সব চলছে। একা নয়—জোড়ায় জোড়ায়, নয়তো ছেলে-পুলে নিয়ে। মেয়েদের পক্ষে একা চলার একটাই মানে। কেউই একা নয়,—অন্তত: মেয়েরা কেউ।

কিন্তু বিখ্যাত এ দেশের পথের বাজার। হাটই বলা যায়, তবে রোজই বসে। এসব বাজার মন মাতানো বাজার। নাঃ, কোন গাড়ি চলে না।

গাড়ি খানিক দূরে থামিয়ে রেখে এলাম। এখানকার সবচেয়ে ভীড়সংকুল বাজারে।

পৃথিবী বিখ্যাত ফ্রান্‌সিস্‌কান আর্ট স্কুলের ছাত্র এবং ছাত্রীরাও মাঝে মাঝে বসে, কোথাও কোথাও রীতিমত ট্রাইপড্ বসিয়ে, ঢালাও জল রংয়ের কাজও চালিয়েছে। বেশ ক'জন টেম্পেরার কাজ। সূক্ষ্ম কাজের মধ্যে চারকোল পয়েণ্ট পেন্সিলের কাজ করছে একটি মেয়ে। তার লক্ষ্য দুগ্ধপানরত একটি শিশু ও মাতার পরিস্ফুট স্তনভাগুটি।

শিশু অবশ্য পান কিছু করছিলো না, কিন্তু এ ভাবের রোজগার এ বাজারে করে করে এরা অভ্যস্ত। কেউ চেয়েও দেখে না।

কিন্তু কী পরিমাণ যে গাধা, ঘোড়া, ঘোড়ায় টানা রেঢ়ী! পেট্রল হয় এদেশে। কিন্তু এরা যে সব গাঁয়ে ফল, সব্জীর চাষ করে, সে সব গাঁয়ের সঙ্গে বাঁধানো পথের যোগাযোগ অভ্রভেদী পাহাড় কেটে এখনও করা সম্ভব হয়নি। এরা ঘোড়া, গাধা, খচ্চর তো ব্যবহার করেই; অনেক সময়ে পিঠে করেই বিশাল বিশাল ভার বয়ে আনে।

বাজার থেকে কিনে খেলাম তরমুজ, সফেদা, লুকাট—আর আমার প্রিয় ফল পেঁপে। আর এক এক করে তিন গ্লাস থ্পকে আনারস আর কমলা মেশানো রস খেলাম। লাঞ্চ কে খায়? খরচ হোলো চারজনের এগারো পেসো। এগারো টাকাই হবে বা।

শহরটা অদ্ভুত শৃঙ্খলায় সাজানো। বাগানে, চৌকে, লনে, পার্কে, ফোয়ারায়—যত যাও ততো আরও আরও, যেতে ইচ্ছে করে। একটুও ক্লান্তি লাগে না। বাড়িগুলোর গড়ন সেই সেকেলে। লোহার কাজের বাহারে বাহারে ছয়লাপ। অদ্ভুত চপল গাম্ভীর্য।

কিন্তু ফিরতে তো হবে। তাই হোটেলে ফেরা গেল। আর প্রথমেই স্নান সেরে একঘণ্টা ঘুম।

ব্যবস্থা পাকা ছিল যে, বিকেলে চারটে নাগাদ বেরিয়ে কুইতোর পাহাড়ী এলাকার প্রসিদ্ধ হোটেল এসমেরাল্ডার রেষ্টুরান্টে খেয়ে এয়ারপোর্টে যাব।

তাই হোল। কিন্তু গাড়ি চড়ার সময় দেখি বন্ধু পিউনো নেই। সে ঘুমোয় না। চলে গেছে। নীনা বুড়ি হাত-পা নেড়ে বাপ-মা তুলে গালাগাল দিয়ে যা বললো, তার মানে দাঁড়ায়—কুক্কুরীর গর্ভে শূকরের বীজে উৎপন্ন জানোয়ারগুলোর নাম পিউনো এবং পিউনোদের বংশকে বংশ, ঝাড়কে ঝাড় নীনা নাম্নী রমণী-প্রধানার একগাছা কেশেরও সমান নয়। ওর মৃত্যুদিনে নীনা কুইতোর মেয়ে পাড়ার কুকুরদের ভোজ দেবে। নিশ্চয়ই দেবে।

তা' হোক না হোক, এস্মারেলডায় খুব ভালো স্প্যানিশ ডিনার খেয়ে এয়ারপোর্টে এসে চেকিং করিয়ে নিলাম।

তারপরে শুনলাম প্লেন চার ঘণ্টা লেট।

লীমায় পৌঁছুলাম রাত এগারটায়।

লীমা—(১)

লীমা এয়ারপোর্ট দেখে পালম এয়ারপোর্ট মনে পড়ে গেল। 'স্যাডিজম্' কথাটার কী বাংলা হবে জানি না। কিন্তু বাংলা না জানলেও ঐ বিপত্তিটির চোয়ালে যে পড়েছে, সে তাবৎ মাতৃভাষা ভুলে যায়। বিশ্বাস করুন আমরাও ভুলেছিলাম।

পালমে যতবার পশ্চিমের প্লেন থেকে নেমেছি, সেই রাত দু'টো এবং তিনটের মধ্যে নেমে দেখেছি একসঙ্গে তিন বা চারখানা প্লেন। আর এমিগ্রেশনে গো-ঘাটার ভীড়। এ ব্যবস্থা লেগেই আছে। একে 'স্যাডিজ্‌ম্‌' বল্‌বো না তো, কি বলবো? কোথায় লাগে পুষ্করের মেলা, কোথায় লাগে হরিহর-সত্র। যে যার ব্যা-ব্যা করছি, আর ল্যাজ নাড়ছি। বলতে গেলে ল্যাজে-গোবরে এক করছি। কী বা ঘাম! কী বা চীৎকার! কী বা অগোছালির পারাৎপার। এর মধ্যে কোলের ছেলে চ্যাচাচ্ছে, মাঝের ছেলে বায়না ধরেছে—কোলে চড়বে। প্রথম ভুলের অপোগণ্ডটা তার বিশাল টেডি-বেয়ারটিকে বার বার আমার অপরিচিত গায়েই বেপরোয়া ঘষটাচ্ছে। ভালুকরা নাকি বুড়ো গাছের গুঁড়িতে গা ঘষতে ভালোবাসে। বেশ বুঝতে পারছি কাষ্টম্‌সে ঐ টেডি-বেয়ার পাশ করাতে কতো রকম সার্জারি, এক্স্‌-রে, ষ্টেথেস্‌কোপের কোপ পর পর পড়বে। টেডি-বেয়ারের পেটে কোকেন থেকে ককটেল্‌ কী না থাকে, থাকতে পারে? এই অবস্থা নিত্য, এবং এয়ারপোর্টের ভাষায় নৈমিত্তিক। ভাবতাম, ভারতই বুঝি এই স্যাডিজ্‌মে ভোগে। ভুল ভাবতাম।

লীমার রিসিভিং লাউঞ্জটা যেন হাওড়া ষ্টেশনের যাত্রী দলানোর সেই হলটি। কী না হচ্ছে, কী না হতে পারে! খুন থেকে খিদমৎগারী, পকেটমার থেকে গিন্নীমার, হাড়ভাঙ্গা, মনভাঙ্গা, কপালভাঙ্গা—সব ভাঙ্গছে,—খেজুরের গুড়ের হাঁড়ি, তেলের বোতল, আঙ্গুরের ঠোঙা, রসের হাঁড়ি, রসগোল্লার হাঁড়ি; সস্তায় কেনা ডজন দরে এক ডজন সখের কাপ-ডিস, মায় বীয়ারের বোতল, ছবির কাঁচ।

এসেছে পাঁচখানা প্লেন। তাবৎ মাল মেঝেয়। কায়ক্লেশে নানারকম জিমনাষ্টিক, নষ্ট করার পর স্যুটকেশ দু'টোর ঘাড় ধরে যদিবা বা'র করা গেল, সমুখে অভদ্রমহিলার কাগজের শপিং ব্যাগ ছিঁড়ে তাজা দু'বোতল হুইস্‌কিতে ভেসে গেল মেঝে।

অতো হুইস্‌কি মেঝেতে, সেই শুকনো মেঝে তার ধক্‌ সামলাতে পারবে কেন? রীতিমত টলতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ ভূমিকম্প! লীমার ভূমিকম্পের পরের কম্পও আখাম্বা। বিরাট এক চিৎকার লাগল। মুহূর্তে যতেক অফিসার ভোঁ। বহু প্যাসেঞ্জারও ভোঁ। সুরাসিক্তা ধরণী টলমলায়মানা।

কেবল আমরা দুই মূর্তি (আরো শ' দুয়েক ছিল) দাঁড়িয়ে।

মধুও কাঁপুনী খেয়ে পূর্বপুরুষের ভাষা হিন্দী বলতে শুরু করল। —"ক্যা হুয়া স্তর!"

আমি জবাব দি—"ভূ-ডোল। সমঝা নাহিঁ? ভূ-কম্প। আর্থকোয়েক্‌ সমঝ্‌তা? লীমা কা ভূ-ডোল্‌। জব্বর চীজ হায়।"

—"তো ক্যা? ও তো হো গয়া।"

—"হাম লোগ ভীতো 'এণ্ডাম্‌' হো সকতা থা? (end থেকে end-আম্‌। ওয়েষ্ট-ইণ্ডীজের হিন্দোস্তানী বাসিন্দারা এমন ইংরেজী-হিন্দী মিশেল ভাষা তৈরী করে নেয়। সেণ্ডাম্‌ to send. লেপাম্‌=মেঝে (ল্যেপে দেওয়া), ড্রিঙ্কাম=to drink) সন ছাষ্ঠ মেঁ লীমা মেঁ বহুৎ এণ্ডাম্‌ হুয়া। লীমা সপাট পাট হো গয়ী থী। ভূমি পর ফ্ল্যাট শো গয়ী থী।"

—"অব তো খড়ী হায়, স্তর।"

"—ওয়হ্-হী-তো। ওয়হ্-হী-তো! এভি তো গির ভী সকতা হ্যায়। ভূ-ডোল কো ভী ভ্যাঁদাল ব্যথা হোতা হ্যায়, জানতা?"

—"ভ্যাঁদাল? ভূ-ডোল কা ভী হোতা হ্যায়? ওহ্ ক্যা হ্যায়, জনাব?"

"জব হোগা, সমঝে গা। নহীঁ হোনেসে ভ্যাঁদাল য়া ভূ-ডোল নহীঁ সমঝ সক্‌তা। ওয়্‌হ হ্যায়—আফ্‌টার ইফেক্‌ট্‌ অফ্‌ ডেলিভার্ড লাইফ। ডেলিভারি-ই জব্‌ ন হুয়া, 'ভ্যাঁদাল' নহীঁ সমঝে গা। একবার জব ভূঁ-ডোলা তব হর্গিজ ফিরভী ভূঁ ডোলেগা হী ডোলেগা। ওয়্‌হী নিয়ম। হোনেই হোগা।"

কিন্তু অতক্ষণ যে ঘাবড়ে গিয়ে হিন্দী বলছি এ হুঁশ কার ছিল? মহা গণ্ডগোল। হুঁশ হল বাইরে এসে।

এখানে দেখা, দীর্ঘকান্তি সৌম্য দর্শন এক বিচ্ছুর সঙ্গে। অথচ স্যুটে ঠাটে সে যেন এক ডিপ্লমাটিক প্রটকলিক হাইব্রায়োটিক দারুণ লীমা-টিক পুঙ্গব।

কার্ড বাড়িয়ে দিয়ে বলে—"লার্কো-এরেরা, কী-ট্যুর্স। হোটেল ক্রিলঁ।"

······ত্রিনিদাদের ডঃ দে বলেছিলেন, 'ডাউন-টাউনের A-1 হোটেল 'ক্রিলঁ'। হাঁফ নিই। কার্ড নিই। বাড়ানো হাত নিই।

তখন মনে হলো, ভূমিকম্প জগর-ঝণ্টো করে না হয় পলকে বার করে দিয়েছে, কিন্তু যখন ফিরবো তখন তো ভূমিকম্প নাও থাকতে পারে। তখন যদি ইমিগ্রেশনের রাবার-ষ্ট্যাম্পটি চায়? কী করণীয় এখন?

এরেরা বুঝলো। আর তাড়াতাড়ি আমাদের মালপত্র হোটেলের ট্যাক্সীতে ঢুকিয়ে চল্‌ল ফিরে দপ্তরে।

সেখানে গিয়ে যার নাম ধ্বস্তাধ্বস্তি। বলে, আমরা আসলে স্মাগল্‌ড্‌ হিন্দোস্তানী। বড় কর্তাদের দপ্তরে নিয়ে গেল। ভাগ্যিস্ এরেরা ছিল এবং আমারও রেফারেন্স ছিল—দূতাবাসের উজাগর সিং এবং দূত শ্রী আর. এস. নারাং। ১৫০, ইগনেসিও বীলয়োলা, মিরাফ্লোরেস, লীমা। আর. গুরু শর্মা। নাগী ট্র্যাওর্স, আপার্তাদো ৫৩৫৩। এত্তো সব শুনে জগদ্দল অফিসারটি যেন চুপসে গেল।

পাশপোর্টে ষ্টাম্প্ লাগিয়ে দিলে। পার্দোঁ, পার্দোঁ করতে লাগল। এঞ্জয় ট্রিপ-ও বল্‌লো। হোটেল ক্রিলঁয় এসেছি, ঘড়িতে তখন দু'টো। কিন্তু সামনের পাঁচ-মাথার মোড়ে তখনও যাকে বলে, ট্রাফিক জাম। অর্থাৎ দিব্যি জম-জমাট।

"আভেনিদা নিকোলাস দ্য পিরোলা" বিশিষ্ট একটি পথ। বড় বড় রেস্তোরাঁ, যতসব এয়ার-ট্রাভেলস্ অফিস। জাঁদরেল পোষ্টাফিস। দোকানে দোকানে ছয়লাপ। পেভমেণ্টে মানুষ চলেছে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে। ঘড়ি বলছে, রাত দু'টো।

অর্থাৎ ত্রিনিদাদ থেকে ঘড়ি বদলায়নি শ্রীমান মধু, এবং প্লেনে ওর ঘড়ি থেকে সময় মিলিয়ে তালেবর মুডে আছি, অক্ষরেখায় অক্ষরেখায় সময় বদলাচ্ছি। কাণ্ড!

সত্যিকার তখন রাত সাড়ে এগারোটা। লীমার ঠেঁটে রজনী কিশোরীই বলা যায়।

লার্কো এরেরাকে বিচ্ছু বলেছিলাম অনেক ভেবেই। মুখপাতে এরা বেশ বিজ্ঞ বলেই

মনে হয়। বল্ল—'রাত হয়েছে। নীচেই রেস্তরাঁ। খেয়ে নিন। আজ রাত ঘুমোন। সকাল নয়টায় আসছি। কথা হবে।"

টাকা বদ্লাতে হল। বোলিভার নয় আর, পেসোও নয়। সোলেস অর্থাৎ এক ডলারে ১২ সোলেস। আমাদের হিসেবে এক টাকার মতই। একটু কম। কারণ ইনফ্লেশনটাও একটু বেশী। গরীবিও তদনুরূপ। ঘরটা ডবল বেড আর বেশ চড়া ঠাটের ব্যবস্থা। ক্রিলঁর পায়ের নখ থেকে চুলের টিকির ডগাটি পর্যন্ত একেকবারে খানদানী পালিশী। যেন সেজে-গুজে ইন্দ্রসভার উর্বশী। সেকালের সিলভার স্ক্রীনের এডল্ফ্ মেঞ্জু বা মরিস্ শিভেলিয়ে। আমাদের ঘর ভাড়া দৈনিক ন'শো বাট্ শোলে। অর্থাৎ হাজার টাকা ছোঁয় ছোঁয়। ·· অগত্যা।

'চিচিংফাঁক' হাঁক পাড়ার পর গুহার ভিতর পাহাড় প্রমাণ ধন-রত্ন পেয়ে আলিবাবার মেজাজখানা কিম্বিধ তালগাছ-চড়া-বং হয়েছিল জানি না, কিন্তু কাসিম বা মর্জিনা মধুকে হোটেল ক্রিলঁর ৫০৯ নং ঘরে ঢোকার পর দেখলে নিশ্চয় গান জুড়ে দিত না।

আমিও দিইনি।

শুধু বলি, "মধু, এতো ছোঁয়া, ঘাঁটা, খোলা, বন্ধ এ সব কেন ?"

—"মশায়, আপনার নয় মগজভর্তি সুইচ্। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখতে 'অন্' করেন তো আনা-রে পিউনো-রে, নীনা-রে—পথের নিঘিন্নি মেয়ে, ছেলে, বুড়ো, বুড়ী বৃহৎহারে টেপা-টেপি, ঘাঁটা-ঘাঁটি করলেন, করছেন, করবেনও। আবার যেই না অফ্ তো অফ্। সামনে দিয়ে ঘৃতাচী, রম্ভা, আফ্রোদিতে, আর্কিমিদিস যে যাবার যাক, আপনার কচু। ···আমি এখনো যে এ্যাপোলো-মজনুনের ব্রাকেটের কোকিল, মশায়। এমন সব বিছানা, পর্দা, চেয়ার-টেবিলই দেখেছি, না বিশ্বচরাচরে এমন বাথরুম হয় জেনেছি! তোয়ালের তো ঢেরী! এতো কেন মশায়? এত তোয়ালে কেন? বড়ো, তা-বড়ো, পেল্লায়, মেজো, ছোটো—কেমন তুলতুলে, আবার খাস্তা খরখরে, ব্যাপার কী?"

হাসি। "গা-রগড়াবার, মাথা-গা মোছার, বাথ থেকে ভিজে গায়ে মেঝেয় দাঁড়াবার জন্যে মেঝেয় পাতার, শ্যাম্পু চুলের ভাঁজ ঠিক রাখবার জন্য পাগড়ী বাঁধবার—দেখছ না, পুং বিভাগ এবং স্ত্রীবিভাগ আলাদা করা? ঠোঁট মোছা আর পা মোছা কি একভাবে চলে? কুঁচকী মুছে কি কেউ ভ্রূ মুছবে?"

—"ভ্রূ কেন মোছে?"

—"ওগো মোছে। তুমি না মুছলে অন্য কেউ মোছে। ড্রেসিং টেবিলে ভ্রূ, ঠোঁটের রং, গাল ইত্যাদি সংযোগের তোয়ালে আর তোমার চিরুণী মোছার তোয়ালে কি এক হবে?"

—"বুঝুন ঠ্যালা! এই সব ফর্মুলায় ভুল করেছেন কি উভলৈঙ্গিকের (হার্মো-এফ্রোডাই-টিজমের) ভূত ঘাড়ে চাপবে। বলছেন,—টিপে-টাপে দেখবো না! কী যে বলেন! এগুলো কি তোয়ালে?—যেন খাস্তা গরম কচুরী। আর, সাবানের, শ্যাম্পুর, অডিকোলনের কি সৌরভ, মশায়! সত্যি আলিবাবা না হয়ে যাই!······দেখুন, এই ছোট্ট ক্যাবিনেট্

ক্রীজ ভরতি যতোরকম প্রখ্যাত সুরা, মাধ্বী, আসব আছে সব—সব। মায় কোকা-কোলা, সেভেন আপ, শাদা-সোডা। ওঃ! এই তো হনুমানের দেখা মন্দোদরীর শয়নকক্ষ মশায়। —অবশ্য মাইনাস্ মন্দোদরী। আর এ টেবিল ভরতি খাম, প্যাড, পিন, গঁদ,—কী নেই, মশায়?" (মধু প্রতি মঙ্গলবার দল বেঁধে তুলসী দাস রামায়ণ পাঠ করে, বোঝায়)।

একটি ছোটো কার্ড তখন মধুর হাতে তুলে দিই।

পড়ে মধু হাঁ!—"বলেন কি? হঠাৎ চিঠি লেখার দরকার হলে, টাপরাইটার সহ টাইপিষ্ট ঘরেই! বলেন কি? এখানে তো চরিত্র রাখতে হলে সত্যিই চ্যাষ্টিটি বেল্টের দরকার—দেখছি!"

—"কেন? তেমন তেমন 'ডাইহার্ড' নারদ বা শুকদেব হলে ডিক্‌টাফোনও দিয়ে যাবে বলছে তো। তা-ও পরখ করতে পারো।"

হতাশ হয়ে মধু বলে—"নারদে, শুকদেবে আমার কিস্‌সু করতে পারতো না। আমিই আমি হয়ে যা করার করতাম। জ্যান্তো টাইপিষ্ট ছেড়ে ডিক্‌টাফোন! কিন্তু আপনি যে মাঝে এমন এক চায়না—দেওয়াল······"

—"কেন? নীনাকে তো একা তোমার সঙ্গে বোগোতার স্যাভয় হোটেলে পাঠিয়েছিলাম······কী হোল?"

জিভ কাটে। হাসে মধু!—"সে তো যা'বলার আপনি বলেই দিয়েছিলেন—ওরও তো 'টেষ্ট্' বলে কিছু ছিল।"

কিন্তু একটি সাবান, একটি ছোটো পলকাটা কাঁচের এ্যাশ-ট্রে আর তামাম প্যাড ও খাম ও তক্ষুনি নিজের স্যুটকেশে ভরে নিল। ছাড়ল না। ধমকাতে জবাব দিল, "মশায়, দৈনিক ন'শো-ষাট সোলেজ্ আমরা টয়লেট আর তোয়ালে দিয়ে উশুল করতে পারব না। ক'বার পায়খানায় যাবো? ক'বারই বা চান করবো? যাই বলুন, এ এক ট্যান্টালসের খাঁচা।"

—"কাগজগুলোয় হবে সব উশুল?"

—"বাইরে গিয়ে, দেশে ফিরে গুমোরের গরমে খানিকটা অন্ততঃ হবে।"

মধুর ও এক খোশ-খেয়াল, (হবি)! প্রতি হোটেল থেকে "না-বলিয়া" নেবার সংগ্রহ ও বাড়াবেই।

ঢের রাত তখন। তবু গরম জলের শাওয়ার নিয়ে দারুণ ঘুমের কোলে নয়, গ্রাসে, নিজেকে ছেড়ে দিলুম।

কিন্তু বুঝলুম বড় আলোগুলো নিবিয়ে দিয়ে মধু আমার খাটের পাশে বসে আমার গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছে।······এ সেবা ও করবেই। এটাকে খুশ-খেয়াল বলার মতো নির্মমতা আমার নেই।

বিরাট একটা প্রাতর্ভোজ শেষ হতে না হতে কন্দর্পকান্তি লার্কো-এরেরা হাল্কা নীল স্যুটের ঠাটে নিপুণ ভদ্রতা জাঁকিয়ে এসে বসলেন।
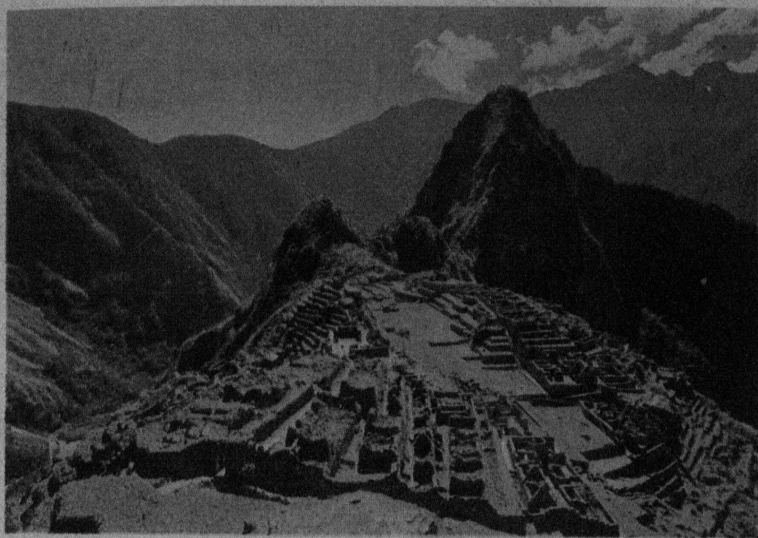
মাচু পিচু নগর এবং হুয়ানাপিচু
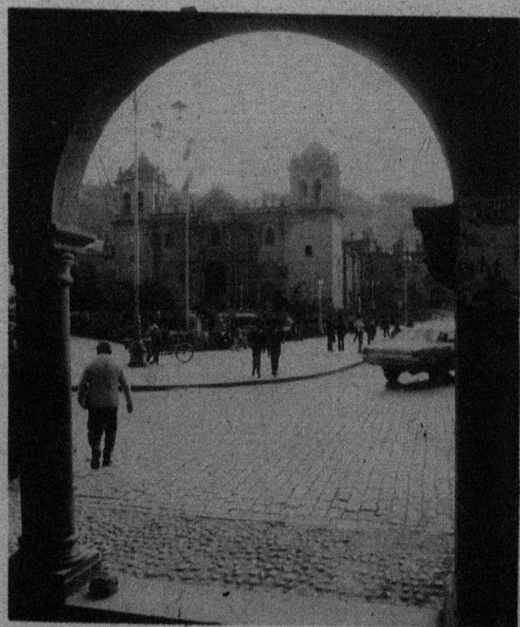
এই পার্কে পেরুর সম্রাজ্ঞীকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল

সাকসাহুয়ামান স্তূপে কণ্ডর পাখীর স্ট্যাচু

ম্যাচু পিচুর প্রবেশপথ

সঙ্গে এক গোল মুখ হাসি খুশী পঞ্চাশোর্ধ আধা স্প্যানিশ আধা ইন্‌কা অত্যন্ত সাধাসিধা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। নাম বললেন—প্রফেসর আর্নান্দো রদ্রীগেজ।

(এদের দেশে কী নামের অভাব? আমাদের দেশে এককালে রামবাবু, কালীবাবু, গোপালবাবুর র‍্যালা ছিল। এখন অবশ্য কমেছে। তবে তার জন্যেও বাঙালী ঋণী রবীন্দ্রনাথের কাছেই।)

—"ইনি আপনাদের গাইড! খুব পণ্ডিত মানুষ। পলিটিকাল কারণে একটু কোণ-ঠাসা হলেও আপনারা খোদ ভারতীয়, গান্ধী এবং চন্দ্রবোসের (সুভাষচন্দ্র বোস না বলে এরা চন্দ্র বোসটাকেই গোটা উপাধির মতো ব্যবহার করে।) পাক্। বহুকাল ইংরেজের সঙ্গে লড়েছেন। রোদ্রীগেজের সঙ্গে খুব জমবে। খুব সাদাসিধে লোক,—ঠিক যেন পকেটে রাখা দেশলাইয়ের বাক্স।"

রোদ্রীগেজ বাও করে বলেন—"অবশ্য আমি সিগারেট খাই না।"

চেয়ার ছেড়ে হাত বাড়ালাম। বৃদ্ধকে আদর করে বসালাম। বললাম—"কফি ইচ্ছা করুন।"

বেয়ারা ডিম এবং ফলের রস আবার দিয়ে গেল।

আগে কার কথা বলি? আমার অতিথিদের না, টেবিলের খাস্তা টোষ্ট, পেষ্ট্রিজ, রোলস্, ফ্লেক্স্, বিস্‌কিট্স্, কেকের কথা বলি? না-কি, কথা বলি সার্ভিসের আদিখ্যেতার? কাট্‌লারির চাকচিক্যময় মেজাজের কথা? আর অনবদ্য সেই কফির কফেট্রির কথা?

এক্ষেত্রে কিছুই না বলা ভালো। আমাদের দেশের কাণে ও সব দেশের কথা ঢোকালেই মনে হয়—"আহা মরি!" আসলে কিন্তু তা নয়। এদেশেই আমরা যদি হাজার সোলে দৈনিক খরচ করে হোটেলে থাকি। বোধ করি ঐ ঠাটেই থাকব। যথা, থেকেছি দিল্লীর অশোকে। আগ্রার শেরাটনে। খুব ঠাট।

তবু, এ-ও মনে হয় ঐ ধরনের রুটি, পেষ্ট্রি, রোলস্ মোদের দেশের অভেন থেকে বেরুবে কি না, সন্দেহ। বেশ সন্দেহ হয়। কিন্তু টিক্‌কা বা রুমালী রোটি বা মুর্গ্-মুসল্লম? তার বেলায়? ইলিশ মাছের ঝাল?—নাঃ, যে দেশের যা। দুঃখ করার কিছুই নেই। তবু বলবো—মানুষের আত্মিক যম-নিয়মের শিষ্ট বাঁধন, (ডিসিপ্লিন), অথবা সৃষ্টির সুচারুতার, সুষ্ঠুতার জন্য মানুষের যে অহঙ্কার—সে সব বাবদে ভারতীয় মন বেশ খানিক উদাসীন; বেশ খানিক কৃপণ ও ভীরু। বিদেশের 'পাব্‌লিক সার্ভিস' এর নিষ্ঠা দেখার পর এ কথা মনে না হয়ে যায় না। জাতির চরিত্রে এ অবসাদ, অনীহা কেন?

লার্কো এয়েরা তার পয়সা বানিয়ে নিয়েছে। এখন আমাদের গর্দান সঁপে দেবে রদ্রিগেজের হাড়িকাঠে। ব্যাপারে বোঝা গেল—তরবৎ জলবৎ!

বললো, রদ্রিগেজ নাকি 'হ্যানা-ত্যানা', ধানাই-পানাই। অনেক কিছু। মোদ্দা কথা, উনি পয়সা গুণে নিয়ে চললেন। অতঃপর রদ্রীগেজ।

তা ওরা একটা বড়ো জাঁদরেল কালো ভারী ক্রাইসলারই এনে দিল।—রদ্রীগেজকে

একা পেয়েই আমার বক্তব্য পেশ করলাম। এটা সবদেশে সব সময়ে 'এক-মেটে' করে রাখি। অভ্যাস। ফল সর্বদাই ভাল, সুস্থ এবং সার্থক হয়।

মানে, আমি কি চাই বুঝিয়ে দিই, এবং কী চাই না, তাও বুঝি দিই। খুব সাবধানে বোঝাই তিনটি আইটেম। প্রথম ও প্রধান আমি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের সৌখীন গবেষক হলেও ও-দুটির প্রতি আমার নজর শুধু মানুষে। 'মানুষ' নামক আশ্চর্য বিষয়টিতে আমার নিদারুণ তৃষ্ণা এবং উদ্গ্রীবতা আছে বলেই, এই পর্যটন। দ্বিতীয়, মানুষ সব দেশে বায়লজিক এবং কেমিক্যাল জীব হিসাবে এক হলেও সামাজিক বিপর্যয় হিসেবে মানুষ বিস্তর হেরা-ফেরির বিষয়। ওদের মন-মেজাজের নিরীখ পেতে হলে, বাজার, এঁদোগলি, ট্রাম, বীচ, বাসের আড্ডা, রেলওয়ে স্টেশনও যেমন দেখা দরকার,—তেমনি দেখা দরকার নাপিত, বইয়ের দোকান, বনেদী আর্ট-পৌরে রেষ্টুর‍্যাণ্ট, এবং অতি সন্তর্পণে বলা,—মেয়ে-পাড়া, মদ পাড়া এবং সম্ভব হলে গুণ্ডা পাড়া।

মেয়ে নিয়ে যুগে যুগে পুরুষ যেভাবেই আদিখ্যেতা করে থাকুন না কেন, "মেয়ে-পাড়া" বলতে দেশে দেশে পাড়ার 'নোর্ম' এক নয়। ওদের তবিয়ৎ-তহজীব-এ অনেক পার্থক্য আছে।

এক কথায়, দেশের রাজনৈতিক কড়ায়ের তলায় আগুন যোগাতে যে কাঠ পোড়ে, সেই কাঠের জঙ্গলে গিয়েও কাঠ বা গাছ বাছতে হয়; আগুনের তাত আর রং দেখতে বুঝতে এক হলেও কাঠের গন্ধের, ধোঁয়ার তারতম্যের তফাৎ থাকবেই। মানুষ 'মানুষ' হিসাবে আকাশ-মাটির রং-রৌশনের তফাতে বিশেষ তফাৎ। দেশে দেশে এই মানুষকে খোঁজা একটা অধ্যাস।

রদ্রীগেজ কেমন যেন ঝট্ করে সব বুঝে ফেলল। ওর ভাঁজ খাওয়া ছোট্ট কুৎকুতে চোখের ভেতরটা সজলও হল, জ্বলেও উঠলো। আমার কব্জীর ওপর ওর থস্থসে ভরা-ভরা হাত-খানা রেখে অল্প চাপ দিয়ে বলল—"হে অপরূপ বৃদ্ধ বায়স, তোমাকে ভাগাড় থেকে নিয়ে ভাগ্যবানের ভাঁওতা পর্যন্ত সবই দেখাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। বেশ্যা বলতে যা জানো বা জান্তে, মোপাসাঁ যা জান্তেন তা, এখানে বেশ্যা পাড়ায় কম পাবে। পাবেই না বলতে গেলে এক রকম। পাবে গল্‌গলে থস্‌থসে রোগের আড়ৎ। এ ছাড়া পয়সা ঢালতে চাও, রূপসীরা তামাম লীমা শহর আলো করে বসে আছে। আছেন মাদামরা এবং তাঁদের সালোঁ। সেই গোলোক ধাঁধায় ঢোকার মত সময় নিশ্চয় নেই তোমাদের হাতে। এ ছাড়া তবু নারীসঙ্গ যারা চায়, ওরই মধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, শিক্ষিতাও, এখানেই কাউণ্টারে বল্‌লেই রাত-দিনের সেক্রেটারী পাবে। কিন্তু তা তো তোমার উদ্দেশ্য বলে মনে হচ্ছে না। তবু যদি ঐ পাড়া চাও তবে, সে জন্য প্রথম দরকার ক্রীলোঁ এবং ক্রাইসলার পরিত্যাগ।"

কিন্তু তখনই তো পরিত্যাগ করা সম্ভব ছিল না।

রদ্রীগেজের দুই ছেলে। দু'জনাই তাকে ছেড়ে পাহাড়ে বাউণ্ডুলেদের মধ্যে হারিয়ে গেছে। বৌ প্রায় অন্ধ। বাড়ির কাজ-কর্ম মেয়ে দেখে। তার স্বামী পুলিশের গুলিতে মরেছে বলে শোনা গেছে। কোথায় মরেছে, কেউ তা জানে না। মড়া, মরে থাকলে,

জা-পাতা। কিন্তু শব প্রত্যক্ষে না দেখা পর্যন্ত সরকারী হিসেবে সে আজও মৃত নয়। —"আমরা কট্টর ক্যাথলিক, একবার বিয়ে হলে, আর করি না। সুতরাং সে মেয়ে আমারই ঘাড়ে। কিন্তু মশায় একটা কথা বলবেন ?"

কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় রদ্রীগেজ।

মানুষটার মুখে তীব্রভাবে আমি যেন বাঙ্গালীর আদল পাই। বিশেষ করে আমার মামা-বাড়ির মুখের আদল। এই অন্যমনস্কতার মাধ্যমে ওর মুখের মাংসল স্ফীতির রেখাগুলো কেমন সহজ সজল হয়ে যায়। ওর চোখ দু'টির দৃষ্টি হয়ে যায় উদাসীন। হোটেল ক্রিলঁ-র লাউঞ্জের সেই ময়-দানবীয় শিল্প-সজ্জা এবং অখণ্ড আতিশয্য সত্ত্বেও ওকে, বিশেষ করে ওর মনটিকে, যেন অত্যন্ত কাছের মন বলে মনে হল !

—"বলুন, কি বলবেন বলুন।"

—"আপনারা তো হিন্দু।"

—"ধর্মের কথা জিগ্যেস করছেন ? না-কি দেশের কথা ? আমরা হিন্দু, কারণ আমরা হিন্দোস্তানের লোক। অথচ আর্যাবর্তের লোক হয়েও আর্য নই ; যেমন—আপনি, পেরুভিয়ান হয়েছেন, ছিলেন ইন্‌কা। কিন্তু এখন ইন্‌কা নন। ···ধর্মের শ্রেণী বিভাগে আমাদের নাম হিন্দুতেই পড়বে। কিন্তু সে যে কি এক জঞ্জাল ! ল্যাবারিন্থ নামক যে ভুল-ভুলৈঁয়ার কথা হোমরে পাই, তার চেয়েও জটিল। সেই সমাজ পুরুষের বিধবা বিবাহ মানে ; বহু-বিবাহও। কিন্তু মেয়েদের বিধবা-বিবাহ ? —নাঃ। বিলকুল না, এবং বহু-বিবাহ তো নয়ই।"

হাসে রদ্রীগেজ। "ঠিক যেন, ক্যাথলিক। ···আর সন্ন্যাস ? ব্রহ্মচর্য ? সে-গুলো ?"

"সে বাবদে আমরাও নিদারুন ক্যাথলিক ?" হাসতে হাসতেই বলি আমি—"আমাদের মধ্যেও দারুণ এক ঋষকুল ছিলেন বালখিল্য। একটা কৌম, দল, গোত্র যা বলো। ওরা বিবাহিত জীবনে থেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করত। ছেলেপিলেও ছিল। ওদের স্ত্রীরাই আবার, শাস্ত্রে লিখেছে—এক উলঙ্গ সন্ন্যাসীর বেশ-ভূষা হীনতার সুষ্ঠু-সুঠাম সৌন্দর্যে মজে তালক্ষীর হয়ে গিয়েছিল। সে এক কিং-সাইজ বিভ্রাট।* পুরুষরা তো হৈ হৈ করে এল ! মেয়েরাও ততোধিক বিক্রমে দা-বঁটি নিয়ে হাজির পুরুষদের মুরোদ বুঝে নিতে ! কিন্তু সবই ব্রহ্মচর্যের গণ্ডীর মধ্যে থেকে। অথচ পুত্র উৎপাদন করা একটি অবশ্য কর্তব্য ছিল। অসম্ভব হলেও, বীজ ধার করে বপন করতে হলেও, ক্ষেত্র থেকে সন্তান সৃষ্টি সব-সে-সেরা ধর্ম ছিল। আজকাল তো গোরিলাদের গর্ভেও বীজ বপন করে ফসল তোলার চেষ্টা চলছে বলে জানি। আবার পরবর্তীকালে, আমরা যখন নাগিনী সেই সব তেজস্বিনীদের হাঁড়িতে-ঝাঁপীতে ভরে ফেললুম—তখন তামাম ঝোল পুরুষ-শেয়ালের পাতে ; মেয়ে সারস সরস বন্ধু হয়েও ভরা-পাতের কিনারে উপুষী রয়ে গেল। এই নিয়ম। সুস্থ জীবন্ত জাতি বিকৃত, বিবর্ণ হয়ে গেলে যা হয়।"

* বশিষ্ঠাশ্রমে উলঙ্গ তরুণ শিবকে দেখে ঋষিপত্নীদের 'বেভ্রম', ও বশিষ্ঠের বৃথা উষ্মা।—মহাভারত ; শিবপুরাণ।

রদ্রীগেজ বলে, "সবই বন্দোলত ধর্ম, চার্চ, পুরুত, বাইবেল। তাই না? তোফা, কেয়াবাৎ, বোঁ, হুর্‌রে!"

বুড়োর মগজে ফুল ফুটেছে! আনন্দে ডগমগো!

—"হ্যাঁ! খলিফা-বুদ্ধি বলতে তো এক ধারার বুদ্ধিরই নাম দিয়েছি। সে একেবারেই ক্যাথলিক, বুনিয়াদী। কিন্তু এ কথা কেন?"

—"কেন? ঐ যে বললুম, আমার মেয়েটা। ও আর বিয়ে করতে চায় না। ক্যাথলিক ধর্ম ও শিকেয় তুলেছে। কিন্তু ক্যাথলিক সমাজ! ...ওকে শিকেয় তুলে রেখেছে!"

হো হো করে হাসি। "তবে বল, ম্যাসুএলা সায়েগ্গ এখনও সমাজে বেঁচে। সমাজও বেঁচে।"

—"সমাজ মরে না; মরতে চায় না। তাইতো লেনিনের বড় কথা ছিল, নয়া সমাজ সৃষ্টি। মাও-জিতুং-এর তামাম তাকৎ নয়া সমাজ রচনায় নিয়োজিত। ...আমার কি মনে হয় জানো, আগে মানুষ, তারপর খেয়োখেয়ী, তারপর সমাজ আর সমাজেরই সৃষ্টি ধর্ম। সেই খেয়োখেয়ীই; তবে একটু রক্তের পালিশে চমকদার করে রাখা। তাই নয়?"

"আমরা বলি, স্বভাব যার যা—ধর্ম তার তাই। স্বভাবের বাইরে ধর্ম, সে কোন ধর্মই নয়। এটাই হিন্দু মত।"

"ওই কথাই ঠিক। স্ব-ভাব। যার যা মর্জি—নয়। যার—যা ভেতরের 'প্রেরণা'। ইম্পাল্‌স্‌ ইন্‌স্‌টিঙ্কট্‌, যা বলো। এর বিরুদ্ধে যাওয়া অধর্ম।"

হাসি—"ঠিক তো বল্লে রদ্রীগেজ। কিন্তু চেয়ে দেখছি এখন সেই ধর্মই হয়েছে সমাজের কুকুর!"

"কুকুর?"

—"হ্যাঁ, কুকুর। মানুষ অন্ধ হলে, কুকুরই হয় তার সহায়। সেই সহায়; জ্ঞানপাপী অন্ধের সহায় ধর্ম।"

হাসতে হাসতে উঠে পড়ি। "বলি—জানো রদ্রীগেজ, আমাদের ইতিহাস বলে, ধর্মের দু'ধারে দুই কুকুর তার সাথী। দেখছি ঠিকই বলে। বলে—স্বর্গের দরবারে কুকুরই ধর্ম। অন্ধ সমাজে ধর্মই কুকুর।"

—"কোথায় চলছি আমরা? তোমার মেয়ের কাছে?"

—"যাবো, যাবো। সেথায়ও যাবো। সে বড়ই সঙ্গীন পাড়া। বাড়ি নয়তো. পায়রার খুপরী। যাবো। এখন তো তুমি ট্যুরিষ্ট। মেহমান। ট্যুরিষ্টরা প্রথম যায় ক্যাথীড্রাল স্কয়ার।"

—"তো যাবো। কিন্তু জেনে রাখো, ট্যুরিষ্ট হলেও সাইট্‌-সীইং (দেখন্‌-বিলাসী) বাবদ আমি ফক্কারাম। আমি মানুষ, সমাজ, ইতিহাস—এগুলোই জানতে, দেখতে নয়,—জানতে, পেতে এসেছি। আমি সূর্য উপাসক। সূর্য যারই প্রজাতা আমি তারই ভাই। সূর্যের সংসার আমার পরিবার।"

হাঁ করে চেয়ে রইলো রদ্রীগেজ্‌। চেয়ে দেখলো মধুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে। ইশারা করে বললো, "খলিফা লোক তোমার গুরুজী।—'সূর্যের সংসার আমার পরিবার'। বাঃ! ব্রাভো। এ যেন কবিতা। কবি বুঝি?"

শুনে মধু হাসে। সে হাসি এক মধুই হাসতে পারে। ঝুঁকে ঝুঁকে লুটিয়ে পড়ে।

"আমাদের ইন্‌কা কবিও সূর্য বন্দনা গেয়েছে। শুনবে?"……(আমরা ক্রাইস্‌লার খানায় বসেছি। গাড়ি চলছে। খুব যে টের পাচ্ছি তা নয়। সকালের সীমা। একটু শান্ত সুস্থ চাল। দোকান-পাট এখনও খোলেনি—খুলছে, খুলবে এই ভাব। বাতাসে সকালের আলোর কুমারী গন্ধ।

—"পিতা মোদের, ধাতা মোদের
দিনের শেষের সাজে
শিখীর পাখায় মনোলোভায়
ডুবছে আলোর মাঝে
এক গামলা রক্তন মাণিক
পান্না হীরার হার;
তার ভিতরে ডুবে গেলেন
শোভন চমৎকার।
পেটীর বাঁধন চুণীর লালে
জ্বল্ জ্বল্ জ্বল্ করে;
ফুলের বাসর রূপের আসর
ফুটবে থরে থরে…… ।"—

[ইংরাজীতে বলার পর অনুবাদ করেছি। অর্থাৎ অনুবাদের অনুবাদ। কিন্তু এদের সূর্য-গাথা, ও নক্ষত্র-গাথা আজও চমৎকার। প্রেস্‌কট্ বলেছেন—"ইতিহাস লিখতে বসে কাব্য করা শুধু ধোঁয়া ছড়ানো। ওতে না আছে বস্তু, না জীবন।"……হায়, যদি মানতে পারতাম একথা; তা' হলে তো সারা ঋগ্বেদ, আদিত্য হৃদয়, ঊষা বন্দনা, পৃথিবী সূক্ত ভাসিয়ে দিতে পারতাম। পারলাম কৈ?]—

বার বার মেক্সিকো, মেসো-আমেরিকান তল্লাটে, কলম্বিয়া, একোয়াদোরে এই 'হোকালো' অর্থাৎ ক্যাথীড্রাল পাড়ায় এসে দেখেছি একই ছন্দ, একই স্থাপত্যশৈলী, একই ব্যবস্থা, একই প্রতিভাস। প্রথমটায় মেক্সিকো-সিটির 'হোকালো' পাড়ায় এসে যেমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম—তেমন আর হলাম না। ডঃ মুজতবা আলি সাহেব বলতেন, "বিয়ে অনেক হতে অবশ্যই পারে, কিন্তু বিয়ের রাত একটাই হয়। মেয়েও অনেক আছে দুনিয়া-বিহিস্ত্ মিলিয়ে,—প্রেম একটাই হয়।"

আমি বলেছি—"আলি সাহেব, উর্বশীরা আসে যায়। পুরূরবাদের ন্যেংটা করে ফেলে রেখেই যায়। কিন্তু মানবীদের হাটে যা পাওয়া যায়, একটি বারে একজনার কাছে, তাতেই 'স্বর্গ হইতে বিদায়'-ও কবিতা হয়ে যায়।"

সেই মাঝে-মধ্যিখানে দু-তিনটি ওয়েলিংটন স্কয়ার সেঁদিয়ে দেবার মতো ফাঁকা একটা বাঁধানো চৌক চত্বর। সে-টা পাথরে, ঘাসে, বেঞ্চেয়, আলোয় সাজানো। মেলায়, কার্ণিভালে, মহামতি পোপ বা পোপাম্ভিক মহর্ষিদের আগমনে লোকে-লোকারণ্য হয়। হলেও আমাদের

দেশের মেলার আনাচের কানাচের বাতাস যেমন মানুষের নাকে কাপড়, আর শূকরের নাকে রস সঞ্চার করে, এদেশে তা হয় না। অন্ততঃ এখানে না, যদিচ এ সব জায়গায়, এবং সংলগ্ন খিলেন তোলা বারান্দার মধ্যে হাজার-হাজার মা-মেয়ে, ছেলে-বৌ, পরিবারকে পরিবার রাত্রিবাস করে থাকে। সরকারী ব্যবস্থা পাকা-পাকি। সে সব সময়ে আরও ব্যবস্থা হয়। শুধু বড়ো হারে হয়; এবং হাজার বন্যা হলেও এরা সব 'জন-সংযোগ-প্রসাধন'-এর (পাব্লিক টয়লেট-এর স্বদেশী তর্জমা) ব্যবহার বিধিটি জানে। শৌচের গামলায় বা নলেতে কাগজ, সিগারেটের ডাব্‌বা, সিগারেটের ফাল্‌তু ল্যাজটুকু বা পানের পিক ফেলে না। জানে, ওগুলো ফেল্‌লে জলের গতিপথ ব্যাহত হয়ে এমোনিয়ার নদী বইবে। ওরা জানে, তরল পদার্থ কি এবং কোথায় তার স্থান; কঠিন পদার্থই বা কি এবং কোথায় তারই বা স্থান। অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান বজায় রেখে সবার সুবিধার সঙ্গে ছাঁদ মিলিয়ে নিজের সুবিধার ব্যবস্থা করে। এর অন্যথা হয় না। আমরা নিজের সুবিধা বলে যেটা মন-মাফিক করে থাকি, ভাবলাম 'টেক্‌কা' দিলাম—আসলে সে আত্মহত্যা; 'নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা'—হারিকিরি।

প্রশ্ন করি—'কেন এরা এত পরিষ্কার ?'

রদ্রীগেজ হাজির জবাবে বললে—"সেই প্রাচীন কাল থেকেই তো আমরা যাযাবর জাত। বহু বহু পরিক্রমার অন্তে যদি বা আমরা কোথাও নগর বসাতাম দেখতাম এক জায়গায় আবদ্ধ হয়ে অনেকজন বাস করার কতকগুলো দায় আছে এবং সেই নিদারুণ প্রাণান্তকর পরিক্রমণের ফলশ্রুতি হিসাবে স্নান ও শুচিতাকে,—কী আজতেক, কী ওলমেক্‌, কী মায়া, কী ইন্‌কা—প্রতিজাখাই যেন প্রাণের প্রথম ও প্রধান সঙ্গীকে সঙ্গী, রক্ষীকে রক্ষী, বিলাসকে বিলাস ব'লে মেনে এসেছি। পরিস্থিতিটা আমরা মানি, ভালোবাসি। গরমের দেশ। পচে তাড়াতাড়ি। মাছি পোকার উপদ্রবও অসাধারণ। আমাদের ইতিহাস বলে, স্প্যানিয়ার্ডদের গায়ের এবং কাপড়ের গন্ধের জন্য ওদের মেয়ে নিয়ে অভাব লেগেই থাকতো। এদেশের মেয়েরাই ওদের নিত্য স্নান করা শেখায়।"

"আর মূরেরা শেখায় টার্কিশ বাথ্‌স্‌, গুশল্‌, উজু। মূররাই স্পেনকে সভ্য করে।"—আমি যোগ করি।

রদ্রীগেজ বলতে থাকে,—"……হ্যাঁ; স্নান আমরা ভালোবাসি, যদিও আন্দীজের পশ্চিমে জলাভাব প্রখর। অবশ্য কলম্বিয়া, একোয়াদোরে নয়। ও সব শ্যামল দেশ। ও সবই তো ছিল ইন্‌কা সাম্রাজ্য। হুয়ানা কোপাক ও সব দেশ জয় করেন উত্তরে উজিয়ে গিয়ে।"

"কোথা থেকে উজিয়ে গিয়ে ?"—আমি জিগ্যেস করি।

"যাই বলুন, যেই বলুন,—আমরা ইন্‌কারা যেমন করেই হোক দক্ষিণ দিক থেকেই উত্তরে গেছি। তবে, দক্ষিণে এলাম কি করে—সে জবাব দেওয়া কঠিন। প্রবাদ এই যে, সমুদ্র থেকে এসেছি। আগে তো কেউ এই সমুদ্র পারের কথায় পাত্তাই দিতো না। এখন ঐ 'কোন্‌টিকি'র পর সবাই মাথা চুলকোয়। পানামা থেকে দক্ষিণ বেয়ে সমুদ্র

পথে নেমে স্পেনের ওরাই তো আকছার এসেছে। তাই তো প্রথমে ওরা কুইতোয় এল, রাজধানী করলো। নৈলে বন্দর শহর গুয়াকিল তো রাজধানী হতে হতেও হোলো না। তা আমরা ইন্‌কারাই যে, মেসো-আমেরিকা থেকে, বা পলিনেশিয়া থেকে কেন সোজা দক্ষিণে আসতে না পারবো, এই বা কেন? তিতিকাকা হ্রদটা তো সমুদ্র বিশেষ। তাতে পাল খাটিয়ে বড়-বড় বালসা জাহাজ তো আজও চলাচল করছে। গিয়ে দেখে আসবেন। নৈলে ইন্‌কা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাহাড়ের ওপরে, কুজ্‌কোয়। সম্রাট হুয়ানাকাপাকই প্রথম কুইতো শহরে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য অবশ্য ছিল। ঐ দুই রাজধানীকেই কেন্দ্র করে বিশাল সাম্রাজ্য শেষে তিনি দুই ছেলের মধ্যে ভাগও করে দেন। কুজ্‌কোয় রইলো এক ছেলে; সেটা দক্ষিণে, পাহাড়ের ওপর। সেটা পৈতৃক ভূমি, পৈতৃক রাজধানী।

"আর কুইতো, উত্তরে উর্বর দেশে, পাহাড়ের নীচুতলায়। এটা হুয়ানাকাপাকের এবং তাঁর ছেলে আতাহুয়াল্পাপারই বিজিত দেশ। এদেশের প্রধান নগরী কুইতো। এই উত্তরের খণ্ডটি ছেলে আতাহুয়াল্পাপারই রইল।"

—"নৈলে আন্দীজ তো কেউ পারই হতে পারেনি। কেউ না—"

—"স্পেনের বোম্বেটেদের মধ্যে আলভারদো ছিল সত্যি বোম্বেটে। মেকসিকো বিজয়ী কোর্তেজের ডান হাত। আলভারদো চেষ্টা পেয়েছিল স্থলপথে পানামা থেকে পেরু আসার। ওঃ! কী সাংঘাতিক সে পরিশ্রম, সেই কাহিনী। তবু আন্দীজ তিনিও টপকাতে পারেননি। সে পেরেছিল বিপ্লবী সাইমন বোলিভার। প্রথম। তা বলতে নেই, অনেক প্রথমই তো হল তাঁর এক জীবনে। এটিও প্রধান প্রথম।"

আকাশ কুয়াশাচ্ছন্ন। যেন বধির মন। এ প্রকৃতির, রদ্রীগেজকে বলতে ও বোঝাল—"এ কুয়াশা নয়। এ হল পেরুর অভিশাপ। এদেশে মেঘ জমে না, বৃষ্টি হয় না। ছাতা নামক বস্তুটির খবর আমরা রাখি না। এ্যদোবে নামক বড় বড় কাদার ইটের বাড়িতে কাদার প্লাস্টার করা দেওয়াল এখানে সর্বত্র। আজও। বৃষ্টি নেই; ভাজা ইটে কী বা প্রয়োজন? বড় বড় প্রাচীন শহরে দেখবে সারি সারি থাম খাড়া। ছাদ নেই; ছিলও না। চাটাইয়ের ছাদই ছিল যথেষ্ট। বৃষ্টিই নেই যে!"

—"কেন? চাষ-বাস? নেই নেই করেও তো লীমায় যথেষ্ট গাছপালা। এখানকার বাগানেরও নাম আছে।"

—"সে সব আছে। লীমা 'শহরটাকে টুরিষ্ট-মঙ্গল কাব্যে' বলা হয়, 'সিটি অফ্ সিংগিং রিভার।' নদীটি রীমা। শহর বলে এখানে কিছুই ছিল না। থাকবার মধ্যে ছিল 'লুরীন' বলে উপত্যকা। তাতে থাকত তোয়াস্তীনস্থয়ো, ইচিমে, ওয়ারী প্রভৃতি ভ্রাম্যমান কৌমদের জাখা; দল বলাই ভাল—তাদের উপনিবেশ। সেই উপনিবেশটি ঘিরে নানা গল্প-কথা মুকুলিত হল। শহর হল, পাচাকামাক। লীমারই দক্ষিণে—। যাব। তোমার পক্ষে সোনার জায়গা। এখানকার সরকারের পক্ষে নরক। ...বলব। পরে বলব।...

"ঐ পাচাকামাকে ইচিমে এবং ওয়ারী কৃষ্টিই ধীরে ধীরে গড়ে তুললো এক বিরাট পুরাণ কথা। গড়ে তুলল ৭০০ খৃঃ-পূর্ব থেকে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দ ব্যাপী পরিশ্রমে। রচনা করল পুরাণ, দেবতা, বিগ্রহ, মন্দির। বিখ্যাত সূর্য মন্দির, মামাকুনা শক্তি মন্দির। পাচাকামাক দৈববাণী পীঠ। হাজারে হাজারে তীর্থ-যাত্রী আসতো। তখনকার দিনে পাঁচ থেকে দশ হাজার মানুষই একটা বৃহৎ ব্যাপার বলে মনে হত।

"কিন্তু জলের ব্যবস্থার জন্য দূরে পাহাড়ের গা ছ্যাঁদা করে নীচু নালায় জল বইয়ে আনা হত। আকাশ থেকে জল আসত না।"

—"কারণ কি?"

—"বল্‌ছি, বল্‌লেই বুঝবে আকাশে কুয়াশা নয়, আকাশের বিষণ্ণতা নয়। এই এখানকার আকাশ। —মেঘ হয় কেন? সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত হয়, আকাশে উঠে যায়, শৈত্যের প্রভাবে নেমে আসে। পৃথিবীর তাপ ও উদ্ভিজের আর্দ্রতার প্রভাবে বাষ্প দ্রবীভূত হয়। —স্কুলের ছেলেরাও জানে, এই নিয়ম।

"অথচ আমরা জানি অন্য নিয়ম। পৃথিবীতে তাপ ছাড়া বাষ্প হয় না। সে তাপ জলের। কিন্তু সেই জলেই এখানে তাপ নেই। এখান থেকে নিয়ে সেই দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত সমস্ত সমুদ্র প্রবাহ নিথর শীতল। এই শীতল প্রবাহ বরাবর প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর পূর্ব দিক ঘেঁসে চলে গেছে। সমুদ্র হিম, বাতাসও হিম। এ্যান্দীজ পর্বতের শুকনো-হিম গাছ-পালা, মানুষ-পশুকে জর জর করে দেয়। জর জর করে দেয় এর পাহাড়। সেই জম্নিত পাহাড়ের গায়ে নেই কোন গাছ-পালা। কোন কিছুই শেকড় গাড়ে না; গাড়তে পারে না। পাহাড় কেবল জরে আর ঝরে। —ঝরে আর ঝরে। সেই সূক্ষ্ম বালুকণা এখানকার বেলাতটভূমিকে মরুভূমি করে রেখেছে। যে মেঘ স্বাভাবিকভাবে আকাশে ভেসে আসে, তাকে নামতে তো দেয়ই না, নামার আগেই শুকিয়ে যায় তার বিক্রম। নীচের দারুণ হিম প্রবাহ তাকে গলতে দেয় না। কাজেই দ্রবকণা এবং বালুকণা মিশ্রিত এই অন্তরীক্ষ আবরণই আমাদের আকাশ। ···একটা বাঁচোয়া। সূর্যের প্রখরতা নেই; চন্দ্রের স্নিগ্ধতা পরিস্ফুট। কিন্তু তার সঙ্গে আছে দুনিয়ার মধ্যে ভয়াল ভ্রূকুটির মতো একফালি মরুভূমি। অ্যান্দীজ এবং সমুদ্রের মাঝের বেলাভূমি 'আটাকামা' এক বিভীষিকা। পাখিও ওড়ে না সেই আকাশে।"

—"তবে খায় কি মানুষ? চাষবাসের জন্য পেরু তো প্রসিদ্ধ?"

"প্রসিদ্ধ? পৃথিবীকে ভুট্টা থেকে সুরু করে শত-সহস্র বীজ, শস্য, ফল-মূল, ফুল, সব্জী আনাজ—এই পেরুই শিখিয়েছে। পেরুতে অন্নাভাব, অনটন নেই। তবু মানুষ মরে, না খেয়ে মরে। অক্টাভিও পাজের বই পড়ো, পাব্‌লো নেরুদার কবিতা পড়ো। অনাহারের রূপ পাবে। তবু জানো—এই যে ইন্‌কা-রা (অবশ্য ইন্‌কা বলছি একটা বৃহত্তর অর্থে) —একটি বার ভিক্ষা করবে না। এখানকার বার-বণিতা বাজারে সত্যকার পাহাড়ী পার্বতী ইন্‌কা যাদের পাবে,—যদি পাও, জানবে তারা সব শহরের আশেপাশের স্কুল-কলেজ, কনভেণ্টের আবর্জনা ইন্‌কা।"

মনে পড়ে গেল নীনা-কে।

বললাম, "কুইতোয় তো পথে এমন মেয়ে পেয়েছি, রদ্রীগেজ।"

—"পেয়েছ? সে স্প্যানিশ স্কুল কলেজে পড়েনি? নগরের স্রোতে ভেসে আসেনি? গ্রামের মেয়ে? টাকার জন্য দেহ দিচ্ছে? —পেয়েছ?"

ভেবে বললাম, "না। তুমি যা বলছ, তার ক্ষেত্রে সত্যি সবই মিলছে।"

"গরীবী দেখতে চাও? দেখাব। এইখানেই দেখাব। ইন্‌কার হাল্ দেখতে চাও? যাচ্ছ তিতিকাকায়, বিংঘাম হাইওয়ে, উরুবাম্বাভ্যালী, সেক্‌সাহুয়ামান, আমাজোন। কত দেখবে ইন্‌কা ভূমি, ইনকা জনপদ, বসতি গ্রাম। কত,—কত! ···কিন্তু দেখবে না ভিক্ষা। হ্যাঁ, রেলওয়ে ষ্টেশনে, টুরিষ্টদের আড্‌ডায়—ছিটে ছট্‌কে কেউ হয়ত টুপী পেতে, কাপড় পেতে বসে আছে, হাতও পাতবে কেউ। কিন্তু সবাই বুনছে, গড়ছে, সেলাই করছে—কাজে ব্যস্ত। দাও তো দাও। একের জিনিষ দশও দিচ্ছে। কিন্তু দারিদ্র্য বলতে যে নিদারুণ ব্যক্তিত্ব হননের ফলশ্রুতি-মানব মর্যাদার, মানব অধিকারের অনুক্ষয় বা অবক্ষয় বলা যায়, সামাজিক কুষ্ঠও বলতে পার, সেই দারিদ্র্য তো কই, সংঘাত সত্ত্বেও, ইন্‌কারা তাদের মর্যাদা হননের প্রতিবেশী করতে পারল না। ওরা ঠোঁটে ঠোঁট টিপে সব যন্ত্রণা সহ্য করে। তুষের আগুনে ওদের জ্বালানো হয়েছে, জীবন্ত চামড়া খুলে নেওয়া হয়েছে। য়োরোপের দস্যুরাই এ সব করেছে। অর্থ পিপাসা, ক্ষমতার ক্ষুধা—কী না করে! শত অত্যাচারেও ওরা রা' কাড়েনি। শব্দ করেনি। ওরা ওদের মর্যাদা অটুট রেখে স্পেনের বর্বরতাকে পর্যন্ত অবাক করে দিয়েছে। স্পেনেরই ইতিহাসে, কড়চায়, ডায়রীতে এরই সাক্ষ্য ভূরি ভূরি।

"আজও ওরা তাই। তুমি তেমন গ্রামে গেলে রাতের সঙ্গিনী পাবে না—তা নয়। পেতে চাইলে জুটে যাবে। ওরাও মানুষ। মানুষের প্রয়োজন ওরা বোঝে। কিন্তু বৃত্তি হিসাবে ভিক্ষা, দেহ—না। ইনকার অভিধানে সব চেয়ে বড়, অক্ষরে লেখা মর্যাদা—যার বর্ম, অস্ত্র হল—সহিষ্ণুতা।

"তবু পেরু পৃথিবীর সেরা শস্য ভাণ্ডার। ওরা যে, পশু দিয়ে চাষ করা জানতো না। একা একা লাঠির ডগায় ছুঁচালো লাভা পাথর, গাছের গোঁজ, পরে ধাতব কিছু আটকে রণপা-র মতো চেপে চেপে চাষের মাটি খুঁড়ত। কাজেই ছোট থেকে ছোট ফালি, উঁচু থেকে উঁচু পাহাড়ী ঢালেও ওরা বীজ বুনতে পারত। সিঁড়িভাঙ্গা চাষের ব্যবস্থা যেমন একদিকে আজও, তেমনি জলের ওপর বালসা, পপলার ইত্যাদি সহজে ভাসমান কাঠের ভেলার ওপর চাষও আজও করে চলেছে। শুনেছি তোমাদের কাশ্মীরে এমন চাষ হয়।

"এটা সম্ভব হয়েছে পাহাড়ে। আন্দীজের ওপারে এবং পূর্ব ঢলেই তো শ্যামল বনানী। পেরুর তিনটে ভাগ, পশ্চিমের সাগর তীরের মরু-ভিত্তিক শুকনো প্রেত ভূমি; দ্বিতীয়টা এই আন্দিজিয়ান ক্ষেত-খামারীতে ছাওয়া ঢল, আর তৃতীয়টা নামেই "শ্যামলী",—ঐ ভীষণ ভয়ের বৃষ্টি লাগা আমাজোনিয়াম তল্লাট। অবশ্য আমাজোনিয়ান সমতলের চেয়ে ভয়াবহ জায়গা পৃথিবীতে নেইও, থাকা সম্ভবও নয়। সে কথা থাক।······

"···কাজেই এই ইনকারা যখন যেখানে গেছে, এই প্রথমটার ভাগে, বৃষ্টিহীনতার জন্যে

কেবল খোঁজ করেছে জলের। বাঁধ বলো, খাল বলো, জল সেতু (আকুইডাক্ট্) বলো—ওরা জলের ব্যবস্থা করতোই।···কিন্তু একটা কথা ভুলো না প্রফেসর। রাজধানী করার জন্য ইন্‌কারা কিন্তু লীমা গড়েনি। ইন্‌কা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিলো কুজকো। তার আবহাওয়া—দেখবে, কী চমৎকার! পাহাড়ী! আর বড় বড় সব নগর ছিলো পাহাড়ে—সেক্‌সাহুয়ামান, আয়াকুচো, আরাকুইপা, পিউনো। সবই বড়ো বড়ো তল্লাট। আর আছে এই পূবের ঢালেই যে সব নদী আন্দীজ ভেদ করে আসছে, সেইসব অববাহিকা। এদের ঐশ্বর্য বোঝাবার নয়। দেখার। পেরুকে দেখতে হয় থরে থরে।

—"লীমা তবে কার?"

—"দেখাবো। ওরা এ তল্লাটে প্রথম হামলা করলো কুইতোয়। কুইতোর তখন কতো ঐশ্বর্য। সম্রাট হুয়ানাকাপাক তখন কুইতো জয় করছেন 'কুইতাস্' কৌমের কাছ থেকে। তা'রা ধন্য হয়ে গেছে হুয়ানকাপাকের প্রজা হতে পেয়ে।"

—"সেকি! ধন্য?"

—"হবে না? কাপাকের রাজ্যে যেমন ভূমিহীন চাষী ছিলো না, তেমনি কেউই এক বছরের বেশী লীজ পেতো না। লীজ অবশ্য বরাবরই জারী থাকতো, তবু আড়-করা বাধা ছিলো ঐ এক বছরের।"

—"কারণ?"

—"কল্পনা করতে পারবে না, প্রফেসর। জমি-চাষ নিয়ে নানা নিয়ম ছিল। চাষীরা সবাই মিলে চাষ করবে। জনের প্রয়োজন, আবহাওয়ার ধরন, বাণিজ্যের ও শিল্পের স্বার্থ, সব মিলিয়ে তবে চাষ। ছেলে মেয়ে সব এক জোটে চাষ। চাষ হবে যৌথভাবে। অর্থাৎ—না, কম্যুনিজমের যৌথ খামার নয়,—এ যৌথ কীর্তির মধ্যে আধ্যাত্মিক সংবেদন ছিল। ধরো,—প্রথমে চাষ হ'বে সেই সব জমিতে, যে জমির মালিক জনসাধারণ অর্থাৎ দেবতা, পিরামিড, বিদ্যালয়, হাসপাতাল। দেব ও দেবস্থানের চাষ প্রথম। দ্বিতীয়, এরপর হাত লাগাবে সেই সব জমিতে যার মালিক রুগ্ন, খঞ্জ, পীড়িত, অন্ধ, বৃদ্ধ অর্থাৎ অপারগ। এর মধ্যে আছে সেই সৈনিকের ও রাজকর্মচারীর জমী, যারা রাজ্যের প্রয়োজনে দেশে অনুপস্থিত। তৃতীয় দফায়,—এসব কাজ শেষ হয়ে গেলে,—তবে গিয়ে নিজের বলতে যে জমি তার চাষ। এরও পরে রাজার জমিতে চাষ। এসবের আগে রাজাও নয়।

"কাজেই, ঐ এক বছরের লীজে ব্যতিপাত হলেই গেলো। শুধু তাই নয়, ইচ্ছাক্রমে বা আলস্যভরে জমির চাষে বাধা দিলে, বা আনলে শাস্তি, হোত কঠোর। মৃত্যুদণ্ড অবধি হোত। এইজন্য বছুরকী লীজের বাধা। নৈলে জমি প্রায় বংশগত।······কিন্তু প্রজাবৃদ্ধির সঙ্গে চাষ করার মতো জমিও বাড়তো, বাড়াতে হোত। সে ব্যবস্থাও ছিল। পাহাড়ের গা চাঁছো—আর জমি করো, সে কাজ লেগেই থাকতো। জমি, জল সরবরাহ, সরকারী গোলা, পশু-পাখির লালন-পালন। এ থেকে কা'রো অব্যাহতি বা অবসর ছিলো না। পেরু চাষের দেশ। কৃষি রাজধর্ম, রাজার দায়িত্ব চাষের জন্য শান্তি রক্ষা।

"ছিলো না 'মিতাক্ষরা' বা 'দায়ভাগ'। (ছিলো না অংশ-গ্রহণ-চিহ্নিত কটু নাম, দায়াদ

বা দুহিতা কেউ কারুর দায় নয়। কেউ কাউকে "দোয়" না।) বাপের ক্ষেতে কা'র অধিকার তা' সাব্যস্ত করার জন্য কোর্ট-কাছারী, উকীল-মোক্তার ছিল না। রাজা ও রাজ্যের দায়, রাষ্ট্রের দায়—যেত্তা মুখ, তেত্তা জমি। যেত্তা মুখ, তেত্তা জোড়া হাত, পা। রাষ্ট্র দেবে জমি। মুখের/পেটের মালিক দেবে হাত-পায়ের শ্রম। এ কম্যুনিজ্‌ম খুব গাড্ডুলে (crude) বোধ হলেও পাক্‌কা কম্যুনিজ্‌ম্। রাজা এবং রাজপরিবারকেও অন্ততঃ আনুষ্ঠানিক ভাবে হলেও চাষ করতে হোত। চাষ শুধু রাজস্বই নয়, সর্বস্বও বটে। এই ছিল, এই "বর্বর", অখৃষ্টান, অ-ইয়োরোপীয় সমাজের রীতি, আইন, ব্যবস্থা। ভদ্র ও সভ্য য়োরোপ এ ব্যবস্থার হন্তারক হ'য়ে জমিদারী, হাসিয়েন্দা, ব্যক্তিসম্পত্তির বিষ ছড়ালো।"

বিস্মিত হয়ে এই 'কম্যুন', অর্থাৎ লোকায়ত ব্যবস্থার কথা শুনছিলাম।

"আজ? আজ কি নিয়ম?"

"এখন? এখন আমরা সভ্য। য়োরোপীয় জমিদারী, সামন্তী আইন আমাদের করেছে ভূমিহীন চাষী, অন্নহীন শ্রমিক, গৃহহীন নাগরিক আর ক্ষমতাহীন ভোট-গণৎকার। এদেশের শ্রমিক—জমি-শ্রমিকের ৭৫ ভাগই বেগার এবং মুচেল্‌কার দাস। সাইমন বোলিভার এক কলমে বণ্ডেড্ লেবার এবং খনির বন্দীদের মুক্তি দিয়েছিলেন। কিন্তু অত্যাচারী, ডিক্টেটর ইত্যাদি বলে, যখন সবাই তাঁকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে যেতে বাধ্য করলো, তখন থেকে আজ অবধি জনগণ মানেই ভোটের পুকুর। যথাসময়ে জাল ফেলে তোলো, আর খাও। আবার জীইয়ে রাখ।

পেরুতে ঢুকেই সাইমন বোলিভার গেলেন পাস্‌কোর-রূপোর খনিতে। হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষানুক্রমে সেইসব খনির পেটের মধ্যে মানুষ ঘর বসত করেছে। মেয়েরা প্রসব করেছে। দম্পতী মৈথুন করেছে। মেয়ে পুরুষে শাবল কোপাচ্ছে। মরে গেলে খড্‌ডায় ফেলে দিচ্ছে। পুরুষানুক্রমে খাদ্য না পেয়ে স্কার্ভি, কুষ্ঠ; আলো না পেয়ে অন্ধ, রাত কানা। বালক বয়সে বোলিভার এদের কথা শুনেছেন। ফলে পেরুকে মুক্তি দেবার অব্যবহিত পরেই, তিনি ঐ পাস্কোর খনিতে গেলেন। সেটা ১৮২৫-এর চৌঠা এপ্রিল। জুনীন, আয়াকুচো, ফতেহ্‌র পর—পাস্‌কোর খনির ভেতর থেকে সেই সব শ্রমিকদের বাইরের আলোয় তুলে আনলেন। শত শত লোকের পায়ের বেড়ী নিজের হাতে কেটে দিলেন। বুড়ীদের, মায়েদের, কোলে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন।......আর আজ? পুনশ্চ বণ্ডেড্ লেবার, সেই 'পীনাল' ব্যবস্থা, সেই খনি, সেই জীবন। এ্যম্‌নেষ্টি ইণ্টারন্যাশনাল কী না জানে? কী না করে? কী করতে পারে? এ্যম্‌নেষ্টি ইন্‌টারন্যাশনাল কাদের মুখোষ? কে ব্যবহার করছে? কী অভিপ্রায়ে? দেশ দেখতে এসেছো, দেশ দেখো,—ঘরের বাছা ঘরে ফিরে যাও। অধিক জ্ঞানে সক্রেতিসের বিষ পান।"

কিন্তু এভাবে কতক্ষণ কথা বলবো। মধু অনেকক্ষণ চলে গেছে ওর স্প্যানিশ জ্ঞানের তৃতীয় ভাগী লাঠি হাঁতড়ে অন্ধের মতো। ওর সঙ্গী জোর্জ গেস্তী এন্‌জেলেস্—সেইক্রাইসলার সারথী। আমার চাওয়া দেখে রদ্রীগেজ বল্‌লো, "ওরা গেছে ক্যাথীড্রালে। গিয়ে দেখবে, সোনা, মণি-মুক্তা, ছবি, পিজারোর মমী। ছেলেমানুষী মন নিয়ে মানুষ যা' দেখে।"

উঠতে উঠতে আমি প্রশ্ন করি, "এতো মানসিক বল তোমরা পাও কোথা থেকে ?"

"কোথা থেকে ? পেরুর মন, ইতিহাস, সমাজ এক ভে-কাঠার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। —আমা সুআ, আমা কেলা, আমালুলিয়া। অর্থাৎ নো-ক্রুক (ঠগাই চলবে না), নো-লেজী (কুঁড়েমী চলবে না), নো-লায়ার (মিথ্যে কথা চলবে না)।—বলেই হো হো করে হেসে হেসে দুহা'ত তুলে বলতে থাকে—আমা সুআ ! আমা কেলা ! আমা লুলিয়া। হাঃ-হাঃ, হাঃ...... !!

"সেই ইন্‌কা সম্রাটের বাণী।"

হাসলে চোখ বুঁজে গেলেও মনে হয়, যেন সব দেখছে। তেজের বিকীরণে সূর্য যেমন দেখে রাতকে, চন্দ্রকে। আশ্চর্য মানুষটা। মন ভরানো। বলতেই থাকে,—"আমা সুআ,—ইন্সোরেন্স, ব্যাঙ্ক, সি-আই-এ, আমেরিকান ক্যাপিটাল,ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌, আমা সুআ। আমা-কেলা, ম্যানেজারীয়ল কাংলা, হাসিয়ে-ন্দার মালিক, সুদ খোর, ক্রোড়পতি—সে হোলো আমা কেলা। আমাসুলিয়া—উকীল, বেশ্যা, পুরুং,—মাষ্টার (আমায় আঙুল দিয়ে দেখায়)। গাইড (নিজেকেও দেখায়)। আর কী হাসি !...এই আমরা আমা লিসুয়া।——হাঃ, হাঃ, হাঃ—প্রগেস মানে রাবীশ, ফ্রড।"

"এখানে বেশ্যা আছে ?"—কি মনে হোলো, ঝট্ করে জিগ্যেস করেই ফেলি। জানি, কি জবাব দেবে। তবু,—

"শহর, বাণিজ্য, হোটেল, ব্যাঙ্ক, ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ রয়েছে—আর বেশ্যা থাকবে না ! যাও ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট—দিনে, রাতে — যখন ইচ্ছে। পাঁচ নম্বরে আছে এক রেষ্ট হাউস।—গেষ্ট হাউসও বলতে পারে। রোগ চাও, বেশ্যা বাড়ি যাও।"

—"ইন্‌কা মেয়ে আছে ? পাওয়া যাবে ?"

"চাই ? আমিও তো ইন্‌কা। আমার মতো মেয়ে পাবে ? এই ধরনের পাঁচ মিশালী জাত খোয়ানো বাষ্টার্ড। আসল ইন্‌কা ? না, ওরা খুব গরীব। বেশ্যাবৃত্তি প্রায় বোঝে না-ই বলতে পারো ! তবে ক্ষিধের জ্বালায় কখনও-সখনও গাউন যে তোলে না, তা'ও নয়।...তা'-ও দেখো কপালের ফের। একটা খাঁটী ইন্‌কা মেয়ে অন্ততঃ ৫/৬ টা গাউন পর পর পরে ঢোল হয়ে ঘুরবে। তুলতে তুলতেই রাত কাবার !" হো-হো করে হাসিতে সে ফেটে পড়ে। "কারণ ? বিশেষ কারণ আছে ? —কার্য হলেই কারণ। পাহাড়ে উঠলে বুঝতে পারবে। আন্দীজের ঠাণ্ডা, শুকনো ঠাণ্ডা। জরায়। সে ঠাণ্ডা হাড়ে লাগে প্রথম, চোখ অন্ধ করে। নিঃশ্বাসকে অবরোধ করে। তা থেকে পরিত্রাণ পেতে গরীব মানুষ অনেক ছিন্ন কন্থার ওপর একটি গোছালো পোষাক পরে। ওদের পোঞ্চোও বহু ছিন্ন বস্ত্রের সমষ্টির ওপর এক পর্দা পশুর লোমের কম্বল।

আমি বলি, "আমাদের দেশেও আছে। আমরা বলি কাঁথা, দোলাই। বড় লোকের দোলাই, কাঁথার নাম বালাপোষ।"

প্রথমেই এসে দাঁড়াই পিজারোর মমীর কাছে।—এই পিজারো বে-ধড়ক অত্যাচার

করে, ঠেঙিয়ে একটা শান্ত জীবন-যাত্রার শৃঙ্খলায় হনুমানের লঙ্কা কাণ্ডের মতো সবকিছু মুহূর্তে তচ্‌নচ্‌ করে দিলো। বললো, ক্রিশ্চিয়ানিটির নামে, সভ্যতার নামে স্পেনের সম্রাটের নামে বর্বরদের দেশ জয় করেছি, আমরা বীর।

ইতিহাসে পিজারোকে কেউ বীর বলেনি। ওটা আত্মশ্লাঘাও নয়। আত্মপ্রবঞ্চনা। সে কথা পরে বলা যাবে। কিন্তু এখন ছবি নিলাম।

লক্ষ্য করলাম, কয়েকবার গিয়েই লক্ষ্য করলাম যে, চার্চের মালিকেরা ক্যাথলিক ধর্ম, এবং ধর্ম বাবদে প্রাপ্তির সুসর করে দিয়েছিলো বলে পিজারোকে এক তালেবর স্থানই দিয়েছিলো। যতই তালেবর স্থান দিয়ে থাকুন না কেন (ক্যাথীড্রালে ঢুকেই প্রথমে ডান হাতি চ্যাপেলের মহিমা মণ্ডিত স্থানটিতেই) আসলে একালের পেরুভীয়ানরা যদি বা যায়, গিয়ে কিন্তু দেখে সেই শুকনো টিকটিকির মতো কুৎসিত মমীটাকে (কাঁচের বাক্সে রাখা, ধুলোর জন্য ভালোভাবে দেখাই যায় না)। ওদের দেখার ঢঙ্‌ দেখে মনে হয় না যে, ওরা বিশেষ আমল দেয়, সে মহিমার! বরং ওরা ভাবে—আমরা কেন এই পিণ্ডটায় এতো আগ্রহান্বিত, কেনই বা ফটো নিচ্ছি। ওদের কাছে আমরাও বা যতো, ঐ পেটিকা-বদ্ধ নগণ্য মমীটাও ততোই এক কৌতূহলের সামগ্রী।

এতোই শুকনো অকিঞ্চিৎকর সেই পিজারো নামধেয় চর্মসার পঞ্জরাকীর্ণ বস্তুটি যে, প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিশেষ সন্দেহ করেন কোনো টম্‌, ডিক্‌, হ্যারীর খাঁচাটি ধরে পিজারো নাম দিয়ে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে কি—না।

এ খাঁচা যে পিজারোরই, একথা কেউ হলফ দিয়ে বলে না। তবে একে এতো ঘটা করে ক্যাথীড্রালে পোষা কেন?

রদ্রীগেজের বয়ানে বোঝা গেলো যে, এতে ক্যাথীড্রালের কর্তাদের লাভ পাঁজীতে একটা দিনে ঢ্যাড়া মারা থাকে, মহাপ্রাণ ফ্রান্সিস্‌কো পিজারোর আবির্ভাব, তিরোধান।— বিশেষ প্রার্থনা, ফুলদান এবং কিছু দক্ষিণা।

নানাভাবে চার্চে দক্ষিণা লেগেই আছে। তার ফল আগাগোড়া চার্চের ভিতরের দেওয়াল, খিলান, ছাদ—সবই সোনার পাতে, সোনার রাংতায় মোড়া তো বটেই; বিশেষ বিশেষ বেদীর অংশও যাকে বলে রত্নখচিত, ভূষিত, আড়ম্বড়িত। ঠাকুর, অবশ্য সেই ঠাকুর—গোয়াল ঘরে যাঁর জন্ম; যাঁর মাকে সমাজ অশেষ দুর্গতিতে ফেলে বিব্রত করেছে; যার অঙ্গে জীবনে বা মরণে ট্যানা-ছেড়া জোটেনি। যার ভীষণ ক্রোধ ফুঁসে উঠতো আড়ম্বর—অতিশয্য দেখলেই;—দেবতার নামে সোনা-রূপো, বিকিকিনি, মন্ত্র-পুরুৎদের কেতাবী ভণ্ডামী দেখলে যীশু হতেন খড়্গহস্ত।

মধু অবাক হয়ে দেখছে। "স্যর, কী মামলা দেখুন।"

"দেখো, তুমি হে শিশু! সাপের ফণা দেখে বিস্মিত হও। বিষের মুঠো মুখে ভরো। অপোগণ্ড হ'বার সুবিধা অনেক।··· পিজারোরা এসে এদেশের দেবতার ষ্ট্যাণ্ডার্ড দেখেছিল। অঙ্কোর-ভাৎই বলো, তিওতিহুয়াকানই বলো, কুজকোই বলো—এসব নামের পেছনে মানুষের নৈবেদ্য রচার, সমর্পণ করার আবেদন ছিল। দেবকারী, ভুবনস্তু নাভিঃ,

দেবস্থান—এইসব নাম ছিল। এ 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' মন্ত্র নয়। দেবতার প্রতিভূ ছিলেন না এদের হুয়ানাকাপাক বা আতাহুয়াল্লাপা। ছিলেন দেবতার কর্মচারী, সেবক, জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্রতী, এবং সেই ব্রত পালন করার শপথ প্রতিবৎসর নিতেন; এবং ফিরিস্তি দাখিল করতেন জনহিতায় কী করা হয়েছে, কী হবে। রাজ্যের প্রতি বাসিন্দা এই ব্রত উদ্‌যাপনের ভাগীদার। প্রতিজন চাষ করার দায়ের সঙ্গে দেশ সমাজ রক্ষার দায় পোষণ করত। (পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সেবায়েৎ ও ঝাড়ুদারকে বলা হয়, পুরীর রাজা)।

"ওরা যখন এই সর্বস্ব সমর্পিত সমাজের নাভি-কেন্দ্রগুলো দেখল, সেই সব দেবস্থান, তিয়োকাল্লী, এবং তার অতুল ঐশ্বর্য, অপরূপ শিল্প, বিস্ময়কর স্থাপত্য, পাথরে উৎকীর্ণ প্রতীক ভাষায় লেখা, রহস্যময় মূর্তির গাম্ভীর্য, আর পারল না, যা-তা করে চার্চ গড়তে। সোনা ঢালতেই হল। এ তো দেখছ পাত আর রাংতা। সে ছিল ঠোস সোনা-রূপোর ব্যাপার। ···ওরা পেরুতে নেমে প্রথমে যে নগর লুঠেছিল, তার নাম পাচাকামাক। যাবে দেখতে। সেই পাচাকামাকের ঐশ্বর্য দেখেই পিজারোর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তারপর কুইতো, তারও পর কুজ্‌কো, দশহাজার লামার পিঠে লাদাই করে স্বর্ণ ভাণ্ডার স্পেনে পাঠান হল। সেই চুরির ওপর বাটপাড়ি করেই মেছো-বণিক ইংরেজ, তালেবর হয়ে পড়ল দেখতে দেখতে।"

···এসব সোনালী পাপ দেখি আর মনে হয়, ভাগবতের কথা—কলিতে পাপের আড্‌ডা করে দিয়েছে সোনায়, জুয়ায়, স্ত্রীলোকের বিক্রীত অঙ্গে এবং সুদে। সেই নিয়মে পাপে যদি ডুবতে চাও, এসো এই সব স্বর্ণঘটিত দেবস্থানে।

···যথেষ্ট দেখেছ। চলো। বেশী ধর্ম, বেশী প্রেমের মতই বায়ু বৃদ্ধি করে।"

"এখানে এককালে সূর্য-মন্দির একটি ছিল। এ চত্বর তারই চত্বর। বেদীর ঐ সোনার মাতৃকামূর্তি সম্রাট পঞ্চম চার্লস দান করেন। উনিশটি চ্যাপেলের অধিকাংশ শিল্পই শিল্পী নোগুয়েরার হাতের কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। বাইরের চৌকে যে বিশাল ফোয়ারাটি আছে, সেটও নোগুয়েরায় শিল্প। এসব চ্যাপেলে, তা' সে যে কোন দেশের চ্যাপেল হোক, কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ থেকে লীমা পর্যন্ত—গাদি গাদি পূত বস্তুর সংগ্রহ পাবে। যীশুর কেশ, যীশুর কোট, তাতে রক্তের ছাপ ধরা, বর্শার ফলায় কাটা, কতোরকম। ক্রুশের কাঠ। এমন ক্রুশ পৃথিবীতে বেশ কয়েকটা। কোটও বহু। এদের ম্যুজিয়াম আছে। বলে ধর্মের মিউজিয়াম। দেখতে গেলে বহুৎ ভক্তির দরকার।"

বাইরে দাঁড়াতেই চত্বরের অপর পারে বাঁ দিকের কোণে পিজারোর অশ্বারূঢ় মূর্তি। খুব জবর-জং মূর্তি। কিন্তু ডান ধারে দুটি চমৎকার প্রাসাদ। চার্চের সংলগ্নই পুরুৎ মশাইয়ের অট্টালিকা। তার গায়ে গা ঠেকিয়ে দেশের প্রধান বিচারপতির ফৈলাও বাসস্থান। মুরদের মতো দেয়াল থেকে ঠেলে বেরুনো কাঠের ঝোলা বারান্দা তো ফ্যাশানই। কিন্তু তার আগাপাশতলা কাঠেমোড়া বাক্সর মতো, এবং সেই বাক্সের ওপরে খোদাই কাজ বা খড়খড়ির কাজের কেরামৎ নিয়ে গাইডের বক্তৃতার বৈতরণী বয়ে যায়। আমাদের রদ্রীগেজ বলে, "ওসব হলো ক্যাস্টিলিয়ান আদিখ্যেতা। মুরদের পর্দানসীন কৃষ্টির উদ্‌গার।"

জজের বাড়ির পেছনে, দূরে দুটি সুদৃশ্য গম্বুজ দেখা যায়। সেণ্ট ফ্রান্সিস গির্জার গম্বুজ। এছাড়া চত্বরের একটা ধার পুরো বাঁ-ধার জোড়া গভর্ণমেণ্ট হাউস। পেরুতে যত না ভূমিকম্প, ততোই বিপ্লব। লীমায় 'বিপ্লব' মানে এই ইমারতখানা অধিকার করা। এই ইমারতের মেঝেতে নাক রাখলে চারশো বছরের রক্তের গন্ধ পাওয়া যাবে।

খুবই রমণীয় লাগল সেণ্ট ফ্রান্সিসের গির্জা। সৌষ্ঠব বলতে যা বোঝায়, তারমধ্যে যেমন থাকবে ছন্দ, তেমনি থাকবে সংযম। এই গির্জাটির 'ফাসাদ'-টির 'ষ্টাকো' (মুখপাতের পংখের কাজ) নিখুঁত, এবং সাবলীল। বোঝা যায় যে সেণ্ট ফ্রান্সিসের মূর্তি ছাড়াও চারটি এ্যাপোষ্টলের মূর্তি। ওপরে একটি আর্চ। রেলিং দিয়ে মাঝের তলা ঘেরা। তার ওপরে দুটি টাওয়ার। একটি ঘণ্টাঘর।

এর পাশেই আছে বিখ্যাত সন্ন্যাসিনী আশ্রম। বাইরে থেকে বাড়ির গড়নটি সত্যিই যেন একটি অতি সুস্মিতা সরল কুমারী। মননে, ছন্দে, পরিবেশে, হাল্কা হলুদ রংয়ে সেই শাদা-বিস্কুটি মেশানো পরিপাট্য—এককথায় স্নিগ্ধ।

ভেতরে ঢোকা আগে বারণ থাকলেও এখন কোনো কোনো অংশে ঢোকা যায়। বিশেষ করে বাগানটিতে।

এটি সন্ন্যাসিনীদের স্বহস্ত রচিত বাগান। বাগান-উঠোন, উঠোন-বাগান। কলকাতার প্রথম পাটে এমন বাগান ঘিরে চক-মেলানো থামওলা খিলেন দেওয়া শোভা অনেক বাড়িতেই পর্দানশীনে জেনানা মহলের গৌরব ছিল।

কনভেণ্ট দেখতে আমার ভাল লাগে। একটা আবেশ লাগে। ঝিম ধরে। বসে থাকতে চাই। কবিতা লেখার মেজাজে মন ভরপুর হয়ে ওঠে। নিউ-ইয়র্কে হাড্‌সন নদীর পাহাড়ীর ওপরে আছে 'সাজানো' এক কনভেণ্ট, ঠিক নদীর ওপরে। সেখানে কতই বসে থেকেছি একা। প্যারীতে এক প্রসিদ্ধ কনভেণ্টে (আজ ম্যুজিয়ম) শুধু চুপ করে বসে থাকতেই যেতাম। পোয়েব্‌লায় (মেক্সিকো) প্রসিদ্ধ এক কনভেণ্টে গিয়েছিলাম। বিপ্লবের মুখে সবার অজ্ঞাতে অগোচরে এই কনভেণ্ট এক যুগেরও বেশী 'আত্মগোপন' করেছিল। কন্‌ভেণ্টের মধ্যে যা চাষ করত, বুনত, ফলাত—তাই খেত। যা ওষুধ পারত নিজেরাই দিত। মরে গেলে তার ভেতরেই সমাধি দিত। নতুন কেউ এলে আশ্রয় দিত। আশ্রমটি বিশাল। ঘুরে ঘুরে বার তিনেক দেখেছি। প্রতিবারেই যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে বুঝতাম এ আশ্রম সর্বত্যাগিনীদের।

আমি অনুভবে পেয়েছি যে, যেখানে যেখানে মেয়েরা, প্রকৃতিরা নিজে আসনে বসেন, সমাহিতা হন—সে সব পীঠ বহুভাবে বরেণ্য। বহু অর্থে প্রাণবান্, সম্পন্দিত, গম্ভীর। শক্তির আধার যাঁরা, তাঁদের সাধন-স্থান যেন সর্বদাই এক স্পন্দিত অনুরণনের মূর্ছনায় আবিষ্ট। বহু রকমের প্রবাদাকীর্ণ এই সব আশ্রমের যৌন-জীবনকে অবলম্বন করে যোনি-পিপাসু রসিকরা বহু কথা লিপিবদ্ধ করেছে। কিছু কিছু তার ইতিহাসও বটে। কিন্তু স্নিগ্ধ মালাতেও মাছি বসে। তবু মালা—মালা। আমার যখন মালা ভাল লাগে, তখন মাছি-পোকার কথা মনেও আসে না। ইংরাজীতে বলে, "প্রফেশনাল হাজার্ড।" এই বাগান লাগানো উঠানটার এক কোণে আসন লাগিয়ে না বসে পারিনি।

মরুক-গে যাক! যে যা মনে করে করুক। কতলোক তো ভাবে আমি 'লেফ্‌টিস্ট্'। কিছু লোক আমায় ভাবে পাঁড় রাইটিষ্ট, —ভাবুক না। কী যায় আসে তাতে? 'লক্ষধারায়' পাত্র ভরিয়া' যাকে দিই, দিতে পারি, সেই তো 'ওগো অন্তরতম'।

হুবারাণের আঁকা মস্ত একটি বাইবেল প্রসঙ্গী ছবি এদের বিশিষ্ট সংগ্রহের অন্যতম। জাতীয় কৃষ্টির মিউজিয়মও এখানে।

যখন বেরিয়ে আসছিলাম, আর মহর্ষিদের ব্যালকনী মণ্ডিত আস্তানাটি দেখেছিলাম,—বার বার মনে হচ্ছিলো ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, ভোগবিলাস একই সঙ্গে সাধন করার মতো ভৈরবীয় ক্ষমতা ক'জন অভিনব গুপ্ত আয়ত্ত করতে পারে? পার্বতীকে কোলে রেখেও কে শিবতায় মগ্ন থাকতে পারে? 'নিপীত কালকূট' যে শম্ভু, তা'র হয়তো সাপের ডাঁশের ভয় নেই। কিন্তু আমরা 'পুয়োর মর্টাল্‌স্', গির্জার পাশে মেহগনী, সোনা, সিল্ক, পিনাখানার মধ্যে জুবড়ে পরে থেকে এতোগুলো প্রকৃতিকে কী করে সামলাই? পারেন এই মহর্ষিরা, আর পারতেন লক্ষ্ণৌর সুজা উদ্দৌলা, আসফ উদ্দৌলা, ওয়াজেদ আলি শা।

ভাবনা ভাবনাই। উড়ে আসে। জুড়ে বসে। আবার উড়েও যায়, সত্য; কিন্তু জুড়োয় না যে!

'চৌক। শহরের নাভিকেন্দ্র এই চত্বর।—মেক্সিকানরা বলে 'হোকালো' নাউহাৎল্‌ ভাষায়। মেলার সময়ে যা'তে এখানে একসঙ্গে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার লোক শুধু সমবেত হ'তে পারে—তা'ই নয়; বাদ্য, নৃত্য, গীত, খেলা, কিছু কিছু নাট্যাঙ্গিক মঞ্চাভিনয়ও দেখানো চলে।

সেই প্রাচীন ধারা থেকে স্পেনিয়েরাও কোনো নগর স্থাপনের জন্য এই নাভি-কেন্দ্রটিকে প্রশস্ত থেকেও প্রশস্ততর করতো। আজতেক, মায়া, ইন্‌কা কৃষ্টিতে এই সুব্যবস্থা যেমন কোন এক মন্দিরকে কেন্দ্র করে রচিত হোত, স্পানিয়ার্ডদের সময়ে ওরাও তেমনি, গির্জা-ঘরকে কেন্দ্র করেই এই চত্বরে জীবন-রস ছড়িয়ে রাখত। এটিকে ঘিরেই চার্চ, বিদ্যালয়। গভর্ণরের এবং বিশপের তথা প্রধান বিচারপতি ও মন্ত্রীদের প্রাসাদ। এক কথায় প্রতি নগরের এটিই হৃদয় ও মস্তিষ্ক তথা বাহুবলের কেন্দ্র।

তবে এক কথা। এ সব গির্জা, বিশেষ করে বিদেশীরা, বিধ্বস্ত মন্দিরগুলোর মৃত শবেরও ওপরই গড়ে তুলতো। মিটিয়ে দিতে চাইতো ঐতিহ্য এবং পরম্পরা। চাপিয়ে দিতে চাইতো বিজয়ীদের প্রভুত্ব।

চাওয়া এক কথা। হওয়া অন্য। দেশীয়েরা সে ব্যবস্থা স্বীকার করলো না। ওদের সম্রাট মান্কোকাপাকের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওরা বিদেশীদের প্রতিষ্ঠিত নগর, এবং সম্ভব হলে পিতৃপুরুষের ভিটে, ক্ষেত থেকেও বহুদূরে আত্মগোপন করে থাকতো। ফলে ওদের আচার, ধর্ম, ভাষা, ব্যসন, গান, মেলা, পার্বণ সবই অদ্ভুত রকমে (অন্যরূপ হলেও) এখনও অব্যাহত। এবং অখণ্ডিত। কাল প্রবাহের অভিযানে কালে কালে কিছু 'পরিবর্তন' তো আসেই; এসেও-ছে। কিন্তু সেদিন ভারতে বক্তৃতারতা একজন মেক্সিকান প্রত্নবিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করতেই ডক্টর ইসাবেলা ত্যুকে বললেন—"······সে তো বটেই।

সাক্‌সাহুয়ামান দুর্গ

অরিকুইপার নিদ্রিত পুরী

ইনকা চাষপ্রথা
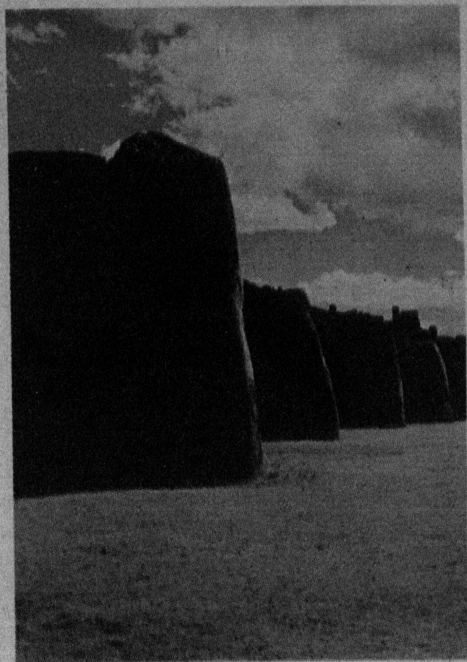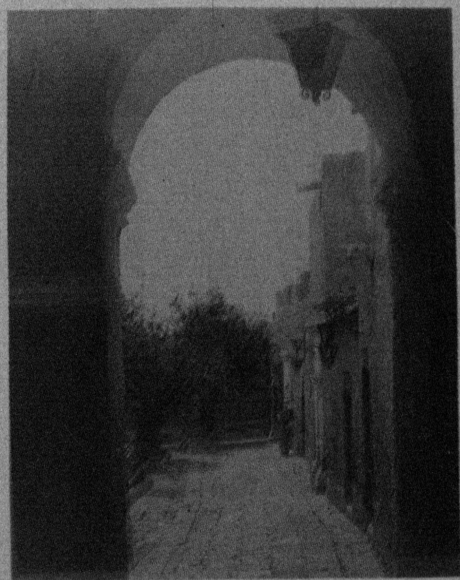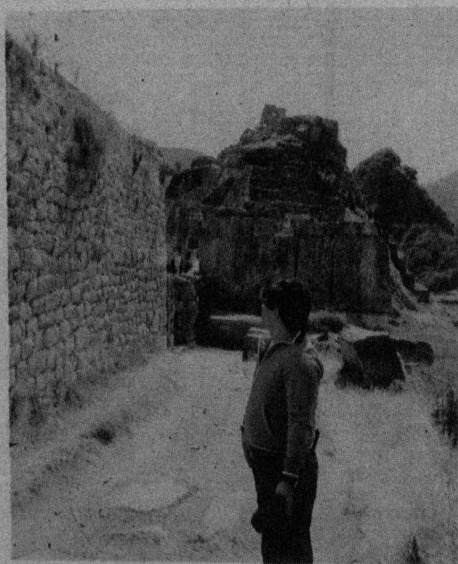
মাচু পিচু দেখে মধু অবাক

আপনি ঠিক বলছেন। মায়া ইনকা বা আজতেক্ যা-ই বলুন স্পেনের সংশ্রবে এসে যদি বদলেও থাকে, সে হয়তো ২০% মানুষের মধ্যে ১০% এর বদল। কিন্তু বাদ বাকী ৮০% মানুষদের ৯০%. এবং কোনো স্থলে ১০০% কৃষ্টি, সমাজ, ভাষা, ধর্ম, কৃষি, বাণিজ্য, ঔষধ, অর্থনীতি, যানবাহন, গতায়াত সবই সেই আদ্যিকালের। যেটুকু খৃষ্টীয় দেখছেন সেটা বাইরে বাইরে পোষাকী। এই খৃষ্টধর্মই, বিশেষ আনুষ্ঠানিক ধর্মটা,—একটু আঁচড়ালেই দেখবেন ইনকা গন্ধ। মেক্সিকোতে তবু যা সফিষ্টিকেশান পান—পেরুতে তা' নেই বললেই চলে।"

সেণ্টপিটার চার্চ খুব ধনাঢ্য। আমার চোখেও ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। সোনায়, রঙে, লাবণ্যে মুড়ে রাখা। যেন মেঝে থেকে ছাদ অবধি জড়োয়ার কাজ। মেঝের শাদা কালো চৌকো টালি নিখুঁত কাজ। সপ্তদশ শতাব্দীতে জেস্যুইটরা এটির পত্তন করে। এদের গুরু ইগনাসিও লয়লার বেদীটি রাঙা মহাগ্নি কাঠের সূক্ষ্ম কারিগরীর এক ক্লাসিক নিদর্শন। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে এই গির্জায় এক সারমন চলেছিলো তিনঘণ্টা ধরে। তখনকার দিনের একটা রেকর্ড।

কিন্তু রদ্রীগেজ বললো, "চলুন লীমার গৌরব, দু'টি প্রাসাদ দেখিয়ে আনি। সেইসব দিনে স্পেনের উদ্গার বোম্বেটে আর নিকৃষ্ট বেনেগুলো অর্থের দৌলতে 'শাসমল-জয়মল' হয়ে গিয়ে পেরুর নোবিলিটি হয়ে পড়েছিল। একে অন্যকে টেক্কা দিয়ে বাড়ি গড়েছিল স্পেনের—ক্যাষ্টীলিয়ান ছাঁদে। সেইসব ঔপনিবেশিক কালের সেরা সেরা বাড়ির মধ্যে দু'খানা বাড়ি দেখাই। তা হ'লেই তাবৎ বাড়ি দেখা হয়ে যাবে। সত্যিই সাবাসী দিতে হয় যে, ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে পেরুর তীরে পিজারো প্রথমেই কুইতো হস্তগত করলেন; তারপরেই পাচাকামাক এবং তার পরেই নিজের অপছন্দের ওপর নির্ভর করে ক্যাষ্টালিয়ান প্রথায় নগর স্থাপনার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৫০—২০০ লোক নিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের মোকাবেলা করার হিম্মৎকে সালাম না জানিয়ে উপায় নেই।

"সে সব পরে হবে। কিন্তু সেই সময়ে উনি বুঝে নিলেন—নতুন নগরী চাই। এলেঙ্গো আর জুয়ান—দুই ঘোড়সওয়ারকে বললেন,—'বার করো স্থান, কোথায় এক নয়া নগরীর পত্তন করা যায়!' আটটি দিন ঘোরাঘুরির পর এরাই খবর আনে লুরিন উপত্যকায় এক নদী,—নাম রীমাক। নদীর নাম নয়। রীমাক ছিলেন এক দেবী। তা'র মন্দির ছিলো পীঠস্থান। রোগে-ভোগে, চিন্তায়-জল্পনে, বিপদে আপদে এ দেবীর দোরে ধর্ণা দিয়ে কতো লোক কতো "আদেশ" পেয়ে এসেছে। বছরে একবার ক'রে তুলকালাম মেলা বসতো। তামাম দেশ এসে জুটতো। এ দেবী 'কথা বলে'। বাগ্‌দেবী। নদীও বাক্‌স্রোতা। [আমাদের 'বেদ'-এও বাগ্‌দেবী, অম্ভৃন্ (জল) ঋষির কন্যা 'বাক্'-ও রূপে নদী সরস্বতীই বটেন।]

"...'এই হবে আমার নতুন রাজধানী—সিটি অফ্ কিংগ্‌জ্। আর এ দেশ হবে 'নিউ ক্যাষ্টীল,'—বললেন পিজারো। আমরা এখন টুরিষ্ট ভাষায় লিখি, লীমা—সিটি অফ

সিংগস্, বা দি টকিং রিভার। ভুল, ভুল। রীমাক নদীর নাম নয়। সেই দেবীর নাম। ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, তা'ই নাম 'বাণী পীঠ'।—আদেশের ধ্বনিময় নদী। সে মন্দির নেই। দেবী নেই। রীমাক নদী আজও আছে। আছে তার ধ্বনিময়তা নিয়েই। আমরা প্রতি পেরুভিয়ান সেই শব্দ শুনি। আর মরে যাওয়া দেবীর কথা ভাবি। দেবী কী মরেছে? দেবীও কি বলেন-নি, আসছে প্রলয়ের দিন? আসছে রক্তবহার দিন?'—বলেছেন,…বোধ হয় এখনও বলছেন, প্রফেসর; আমরাও, কেউ শুনছি, কেউ শুনছি না। মেয়ে বলে—'বড় বুড়ো হয়ে গেছি। শুনি কম।'……

"…তবু আশ্চর্য লাগে। ন্যু-ক্যাষ্টাল রইলো না; রইলো ইন্‌কার পেরু। নিউ স্পেনও রইলো না; রইলো ভেনেজুয়েলা, একোয়াদোর, মেক্সিকো, পানামা, গোয়াতেমালা—সবই মায়া, ইন্‌কা, আজতেক ধ্বনিভরা নাম।

"রইলো না স্পেনের দেওয়া 'সিটি অফ্ কিংগস্' রইলো নদীর কলনাদিনী খ্যাতি।

"নদীটি কিন্তু ভালো। খুব বড়ো নয়। তোমরা গঙ্গা-সিন্ধুর দেশের লোক। কোনো নদীই চোখে লাগে না। টেমস্‌ও তোমাদের চোখে নালা। কিন্তু জানো তো, পেরুর উপকূল? মরুভূমিই বলা যায়। তবু মরুভূমি বলেও 'ওয়েসিস্'ও তো আছে।—মাঝে, মাঝে এই কার্ডিলেরা, এ্যাণ্ডীজের গা চুঁয়ে নদীও বার হয়। যখন যা বার হয়, যতই তিরতিরে হোক আমরা ইন্‌কারা সেই জল দিয়েই সোনা ফলাতাম। পাহাড়ে বাঁধ বেঁধে জলকে খাতে খাতে বইয়ে ফসল গড়ার ক্ষেত গড়া,—ও আমরা পারতাম। রীমা নদীকে বেঁধে শহরে প্রতি পথে পথে নালি করে দেওয়া ছিল। 'পাচাকামাক' বলে, এক নদীর তীরেও এমন এক শহর ছিলো—সেই শহরই শহর। প্রথম সেই শহরেই হামলা হয়, মন্দির ভাঙ্গে, শহর-মন্দির লুঠ হয়। মানুষ ঘাবড়ে যায়। সোনার পাহাড় ঘাবড়ে দেয় লুঠেরাদের। তখন ওরা শোনে কুজকোর কথা। কুইতো তখন লুঠ হয়েছে। পিজারোর কপাল ভাল। তখন পেরুতে প্রথম গৃহ-বিবাদ লেগেছে। ছোট ভাই আতাহুয়াল্লাপা, বড় ভাই হুয়াস্‌কারকে বন্দী করেছে এবং তাই নিয়ে একদল ইন্‌কা আদিবাসী আতাহুয়াল্লাপাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পিজারোকে মদদ দিচ্ছে। পিজারোর তো "পোয়া-বারো"। এ গৃহবিবাদের পূর্ণ সুযোগ নিতে হ'লে পিজারোকে নিজের দলের জন্য একটি মজবুত শহরের পত্তন গড়া চাই। সে শহরকে হ'তে হবে সমুদ্রের ধারে অথচ তীরের মরুভূমি বাদ দিয়ে। কুইতো হয়ে পড়বে অনেক উত্তরে। তা ছাড়া সেটা একটা পাহাড়ী শহর। বন্দরগাহ নয়। পাচাকামাক-কে তো ছাতু করা হয়েছে। সুতরাং রীমাক নদীর ধারে এই শহরের পত্তন হোল। ক্রমশঃ রীমাক নামটা ফিরিঙ্গী জিহ্বার তাড়সে হয়ে গেলো লীমা। সেই থেকে লীমা।……

"তা' লীমা গড়ে তোলায় পিজারো খুব উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখালেন। পথে পথে থাকবে জল-নালা, প্রতি বাড়িতে থাকবে বাগান। মাঝে মাঝে থাকবে চক মেলানো প্রাসাদের সারি। পথগুলো হবে সব বেশ চওড়া-চওড়া এবং বাড়িগুলো হবে বরফী-কাটা পথের ছকের ধারে ধারে, থাকে থাকে গোছানো সারি।

এখনও সেই ছক। এখনও চমৎকার শহর লীমা। নদী যদি একটা দিক হয়, এবং সেটাই হবে লম্বা দিক; বাকী সারা শহর আরও দুটো দিকে ঘিরে হয় একটা বিশাল ত্রিভুজ। এর মধ্যে প্রতিটা পথ সমকোণ। ১১৭টি বরফীতে কাটা শহরে সোজা সোজা পথ এপার থেকে ওপার দেখা যায়। যখন দেখবে বুঝবে এ শহরে পার্ক কতো, বাগান কতো, সবুজ কতো, অবকাশ কতো। বৃষ্টি না হোক; ঐ মেঘের আস্তরণ সূর্যকে প্রখর হতে দেয় না। দক্ষিণ মেরুর অবাধ বাতাস ঠাণ্ডা। সমুদ্রের স্রোত হিম শীতল; কাজেই সমুদ্রের বাতাসও ঠাণ্ডা। বিষুবরেখার এতো কাছে হয়েও পেরুর, বিশেষ করে লীমার, আবহাওয়ায় যেন বসন্তের মাধুরী। মানুষ তাই বারো মাসই খাটতে পারে। এছাড়া বাতাসে আর্দ্রভাব যেটুকু আছে ঐ মেঘ এবং শৈত্যের দৌলতে তার পুরোপুরি অনুগ্রহটুকু গাছেরা শুষে নেয়। তাই লীমা ঢলঢলে শহর। সবুজ শহর লীমা।......

"—এ শহরে প্রাসাদের অভাব নেই; তবু তোমাদের দেখাবো 'গোয়ানেচে হাউস্' এবং 'তোরে তাগ্‌লে প্যালেস্'। এ দুটি দেখালেই ঔপনিবেশিক লীমার ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি ও রুচির পরিচয় পাবে।

"গোয়ানেচে হাউসেও সেই মুর-বারান্দা, কাঠের ঢাকা এবং কারুমণ্ডিত। দরজার ওপর সজ্জা। একেবারে ওপরে কী একটা শীল্‌ড, চুন-মসলার কাজ। দেখে যেন মনে হয় ম্যাসনিক ধাঁধা। কিন্তু 'তোরে তাগলে' একেবারেই রাজসিক?"

'তোরে তাগলে'? নামটা শুনেই ভ্রূ কোঁচকালাম। রদ্রীগেজকে জিগ্যেস করি—'এ কোন্ তোরে তাগলে? একি সেই ধনকুবের যে বোলিভারকে সাহায্য করেছিলো? ম্যানুএলার বন্ধু ছিলো?"

রদ্রীগেজ হাসল। "বোর্জোয়াজী কারুর বন্ধু নয়। নিজেরও নয়। সে মৌকার বন্ধু। মৌকা পুজোয় সর্দার পুরুৎ হতে পারলেই তোরে তাগ্‌লে, জেঃ ফ্রাঙ্কো হাওয়া যায়!"

সেদিন আমাদের বরাৎ ভাল। কোন এক সিনেমা কোম্পানী সাইমন বোলিভারের জীবনী নিয়ে ছবির শূটিং করেছে। তাদের দরকার কলোনিয়াল প্রাসাদ। তোরে তাগলের প্রাসাদে তাই ছবি তোলা হচ্ছে। অমন কলোনীয়াল কীর্তি লীমাতে আর নেই।

তা হোক! আমার কিছু উপরি লাভ। সামনে দেখছি—সাইমন বোলিভারের ফৌজ তাদের সবুজ পোষাকে সজ্জিত হয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছে। সে ছবি আমি পেতাম কোথায়? আমার ক্যামেরা ক্লিক্ করছে। ফল, ভাইরে! কঠোর বিপত্তিতে পড়েছি। আমায় বাধা দিতে চায়। আমি একদম গাড়োলের মতো কিছুই বুঝছি না তখন। বাংলায় বলছি, "দু'টি শট্ বইতো নয়। নিতে দাও না মালিক। কেন গুঁই গাঁই লাগিয়েছ!"...

কিন্তু বাড়ির ভেতরে ঢুকে আমার অবস্থা মহীশূরের রাজপ্রাসাদে ঢুকে ১৯৪৯-এ আমার যা অবস্থা। একেবারে চোখে ধাঁধা। এতো ফৈলাও হারে বসত বাড়ি কেউ পুংখানুপুংখ-রূপে সাজাতে পারে? আন্দুলেশিয়ার (স্পেনে) শিল্পের সঙ্গে মুর শিল্প এবং বাইজেন্টাইন এমন কি এশিয়ার ছন্দ মিশিয়ে একটা সুষম সামঞ্জস্যে ভরপুর একটি সংহত সুঠাম নিবেদন।

সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর য়োরোপ বা স্পেনেও এমন নিখুঁত সৃষ্টি হয়নি। কাঠ, প্লাস্টার, পঙ্খের ব্যবহার, টাইল, ইঁট ও পাথর মিলিয়ে এ যেন যেখানে যা, সেখানে তা। কাঠের আভিজাত্য, পাথরের দার্ঢ্য, পঙ্খের মসৃণতা, টালির জ্যামিতি, বারান্দার সম্মোহ, খিলানের ছন্দ—সব যেন একটা অর্কেস্ট্রা। দোতলায় প্রার্থনা গৃহ আছে। সেখানে নানা চিত্র এবং রুচিময় চিত্র। এখন এই প্রাসাদে আছে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়।

দুটি চার্চ দেখা গেল, এতোই মূর্তির আধিক্য যে, চার্চ না বোলে, বলে টেম্পল, মন্দির, তিয়োকাল্লী। চার্চকে টেম্পলই বলে। পাদ্রীদের মনে হয় যে, এমনি বলার ফলে হয়তো বুঝিবা দিশী ইন্‌কারা কম তিক্ততায় চার্চকে গ্রহণ করবে। ওদের রক্তেই মন্দিরের ডাক। আমরা দক্ষিণেশ্বরের চার্চ বা কালীঘাটের গির্জা বা কাশীর বিশ্বনাথের ক্যাথীড্রাল বলতে ভালোবাসি কি? অনুবাদে অর্থ এক হলেও যেন সম্পর্কে সৎ-মা, বা সৎ-শাশুড়ী হয়ে যায়। জুৎ হয় না।

একটি তার সেণ্ট অগাষ্টিনের 'মন্দির'। সেণ্ট অগাষ্টিন মানুষটি আমারই মতো পাপে-পুণ্যে মিশ খাওয়া টোল-পড়া ঘটির মতো। ভালোলাগে এই মহাপণ্ডিত তপস্বী ভক্তকে। জীবন ও সংসার মানুষটিকে খুব পোড় খাইয়েছে। ওঁর সম্প্রদায়ের খ্রীষ্টানদের রীতিমত খেটে খেতে হয়। বসে বা ভিক্ষালব্ধ অর্থে জীবন যাপন করা চলবে না। যেন রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে-পায়ে খাটা স্বামীজীরা, সর্বদা ব্যস্ত।

সেণ্ট অগষ্টীনের আত্মচরিত একখানা পড়ার মত বই। নিজের অপজীবন ও অপকীর্তির অমন খোলাখুলি বিবরণ কাসানোভা বা গান্ধী পারেননি বলতে। রুশোর আত্মচরিত মাটিতেই বসে রইল। আত্মার কেউ হল না। কিন্তু সেণ্ট অগাষ্টিন যেন সে অনুপাতে গভীর আত্মদর্শী সাধক। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি তৈরী। বোরোকের কাজ সেরা হলেও বেদীর ওপরের আর্চটি মূরিস। ভিয়েনায় যে বিশাল বুল-রিং দেখেছিলাম, তার প্রবেশ পথ এমনি মূর ঢঙের এক বিশিষ্ট কীর্তি।

লা-মার্সেদ এক ব্রহ্মচারিণীর নামে উৎসর্গীকৃত মন্দির। বেদীটি রূপার। ভেতরে ক্লয়ষ্টায়ের খিলান দেখলে 'তোরে তাগলে' প্যালেসের খিলান মনে পড়ে। প্রবেশ পথের কাজ দেখলে প্রথমটা বোরোক মনে হলেও, এটি পাথরে খোদাই করা কাজ। পাথরের খোদাই করা কাজ পেরুতে ব্যতিক্রম।

অনতিদূরে রীমা নদী। রীমাক দেবীর বাণীরূপকে আশ্রয় করে রীমাক বা রীমা নদী। এ নদীর 'কল-নাদিনী' সংজ্ঞা (টকিং রিভার) চূড়ান্ত গোলমেলে। আসলে নদীটি শুকনোই। ঋতু হিসাবে জলধারা প্রখর। নৈলে নদীর বুকের এক তৃতীয়াংশ সীমায় একটি দেয়াল দেওয়ার ফলে নদীর জল সামান্য হওয়া সত্ত্বেও এই অংশে প্রবাহ আছে। এই প্রবাহই ভাগে ভাগে সারা শহরে জল নিয়ে গিয়ে শহরের শোভা বাড়িয়েছে। নদীর ওপরে সেতু। বলে 'পাথুরে সেতু'। নগরীর ও পারে এক কালে কুষ্ঠ রোগীরা থাকত। ডমিনিকান সন্ন্যাসীরা এই সেতু পার করে তাদের সেবা করতে যেত। কিন্তু খুব অল্প লোকই জানত কুষ্ঠ নতুন মহাদেশে ফিরিঙ্গীরাই এনেছিল।

স্বভাবসিদ্ধ সেই ভোলা মন হাসিটি হেসে রদ্রীগেজ,—পাষণ্ড রদ্রীগেজ বলে, 'আচ্ছা প্রফেসর, খৃষ্টান পাদ্রীকে খৃষ্টানতর, পাদ্রীতর প্রমাণ করার টোপ হিসেবে ইতিহাসে বার বার এই কুষ্ঠ সেবার ধুমটা করা হয় কেন গো? এতে বুঝি বাইবেলি গন্ধ বেশী? তোমাদের দেশ, আমাদের দেশ আরও আরও দেশে যে বুভুক্ষাই একটা মারণ রোগ তা কি ওরা জানে না? জানে না পৃথিবীতে আজ বছরে নব্বুই লক্ষ মানুষ না খেয়ে, আধা খেয়ে, অপুষ্টির রোগে মরছে? তার প্রতিবিধান করছে না কেন গো?—কুষ্ঠ নয় বলে?"

আবার হাসে সেই নচ্ছার গাইডটা।

এতক্ষণে শহর জেগে উঠেছে। দেরীতে জাগে, দেরীতে ঘুমায় এবং রাতটা ভোগ করে বলেই দিনে একটু ঘুমায়। দিনের 'সিয়েস্তা'—এক ঝলক ঘুম, প্রায় অফিসিয়ালি অনুমোদিত, ব্যবহারে অভিনন্দিত। এজন্য স্কুল-কলেজের এবং বহু অফিসেরও ছুটিই হয়ে যায় দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে।

একটা রেস্টুরান্টে ফল আর কফি খেলাম। তারপর গাড়ি এসে থামল একটা বিশাল প্লাজায়। বিস্তৃত, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর। মেট্রো, সেগিউরস্, ব্রিটিশ এয়ার ওয়েস্, এস্-ইউ-ডি আমেরিকা—বড় বড় রঙীন বিজ্ঞাপন। এত বিশাল স্কয়ার যে, তলা দিয়ে পথ করা, এপার-ওপার যাবার। ইউনিয়ন ষ্ট্রীট আর কারবায়া ষ্ট্রীটের মাঝের এই স্কয়ারটির অন্য দুপারে বিরাট চওড়া 'এ্যাভিন্যু নিকোলাস দ্য পিয়েরোলা'। এই এ্যাভিন্যুর পশ্চিম প্রান্তে 'সেকেণ্ড-মে-স্কয়ার'। (সেকেণ্ড মে, ১৮৬৬ কালাও দুর্গের পতনের সাথে পেরুতে স্প্যানিশ সরকারের পতন সম্পূর্ণ হয়েছিল।) আর পূর্ব প্রান্তে 'আবাঙ্কা এ্যাভিন্যুর' মোড়ে লীমা বিশ্ব-বিদ্যালয়, আর বিশ্ববিদ্যালয় পার্ক। এতো আঁট-ঘাঁট বেঁধে যে স্কয়ারটি সৃষ্ট এটি উৎসর্গ করা পেরু, আর্জেন্টিনা এবং চিলির সশস্ত্র মুক্তিদাতা সান মার্টিনের নামে। ঘোড়ায় চড়া সান মার্টিনের মূর্তি। প্লাজা-দ্য-আর্মাস্-এ (পিজারো নিজ হাতে যেখানে শহরের প্রথম ভিত-পাথর গাঁথেন) যেমন তলা দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ, এখানেও তাই। পিয়েরোলা এ্যাভিন্যু লীমার 'কনট্-প্লেস' বা চৌরঙ্গী। বিশাল পথ, সুদীর্ঘ পথ, যাকে বলে 'ডেড্ ষ্ট্রে-ই-ট্', এবং রাতে একেবারে ঝলমল করে। ক্রিলঁ হোটেল এই পথেরই ওপরে এবং ইন্‌কা এ্যাভিন্যুর মুখে। জেনারাল পোষ্টাফিসটি এই জংশনের সবচেয়ে বড় বাড়ি।

সান মার্টিনের বিশাল মূর্তিটি আরও বিশাল দেখায়, কারণ এর পাথুরে আনকোরা বেদিটির উচ্চতাই মাটি থেকে এগারো ফুট। আমরা একটা বেঞ্চিতে বসলাম।

রদ্রীগেজ বুঝতে পেরেছে, আমরা একটু ক্লান্ত হয়েছি।

আমি জিগ্যেস করি, "রদ্রীগেজ, তুমি সিগারেট খাও না?"

সে যেন অপমানিত বোধ করল। —"পবিত্র চিচ্চা। কঠিন পানীয়। এ থাকতে ঐসব ঘাস-পাতা পোড়ানো ধোঁয়া? ছিঃ, তবে কোকা কি দোষ করল?"

আমাকে দেখে-শুনে বল্ল, "মেয়ে নয়, মদ নয়, তামাক নয়, জুয়া নয়, ঘোড়া নয়, সাফ

নয়, বীচ নয়—তবে ভোগ যে করবে কী করে? —কোন মাধ্যমে? পৃথিবীতে মিলন হয় দেহে দেহে, বস্তুতে বস্তুতে। অপার্থিব মিলন হয়, বিনা বস্তুতে।

"ঘুরিয়ে বললে ভাল শোনাবে,—দেহ দিয়ে দেহের ভোগ, সে তো মরলোকের ভোগ। বিদেহ দিয়ে বিদেহের ভোগই তো 'অমৃত-ভোগ'।"

হেসে ফেলি। "এর বড় সত্যি কথা আর কী আছে? রঞ্জন বা অনুরাগ মানেই মনোরঞ্জন। মনে মনে দেয়া নেয়া। তারও বড় আমরা মানি, একা একা মানস কমলে জীবনের শ্রেষ্ঠ সুন্দর শিবকে বসিয়ে বসিয়ে দেখা। আমাদের এক পাগল রসিক গাইত—'মা, তোমায় আদরে রাখব নিভৃতে, হৃদয়ে। শুধু তুমি দেখবে (আমায়), আর আমি দেখব (তোমায়)।' —এ মিলনের মধ্যে আর কেউ নয়।"

রদ্রীগেজ বল্‌ল, "তবেই তো বলে হিন্দু,ভারতীয়। কেউ পারবে না ওদের ওপর টেক্‌কা দিতে।"

মধু বল্‌ল—"রদ্রীগেজ, তীর্থে গেলে তীর্থের পাণ্ডারা তীর্থ-মাহাত্ম্য শোনায়। শোনানোও ধর্ম, শোনাও ধর্ম। আমার গুরুজী সবজান্তা বেদব্যাস। (ও! আমাদের পুরাতত্ত্বের প্রফেসার—বলতে পার বেদ-ভিয়াস্‌)। কিন্তু আমি 'পুওর মর্টাল'। আমায় পেরু কথা শুনিয়ে রাখ। নৈলে বুঝব না।"

"শুনবে সে কথা? পেরুর কথা বেশী পুরানো নয়। অবশ্য আমেরিকায় এত পুরানো মানুষও আর নেই। এখানে প্যালিওলিথিক, নিওলিথিক মানুষের যা চিহ্ন পাওয়া গেছে, সে সবই ঐ এশিয়া বা অস্ট্রেলেশিয়ার সঙ্গে জোড়া-তাড়া। তবুও পর পর এ দেশে সাতটা কৃষ্টি-কল্প পার করে এসে অষ্টম কৃষ্টির ধারায় পাই, যার নাম এই রিম্যাকভ্যালীর কৃষ্টি।

"এর আগেরগুলোর নাম স্কুলে মুখস্থ করতে হত—প্রাক্‌ ইন্‌কা কৃষ্টি, আর তার পরে চেভিন্‌ কৃষ্টি। এগুলো পশ্চিম থেকে পূবে পাহাড়ের ওপর অবধি ছড়ানো। এছাড়াও পেরুতে 'মোক্‌সোস্‌' ও 'কোনা' কৃষ্টি ছিল। ভাষা ছিল আকারো, তা থেকে এল আয়মারা, কাউকী। এদের ধর্মে পশু-পাখিই প্রবল। পুমা, জাগুয়ার, কুমীর জাতীয় হাঙ্গর আর ঐ কণ্ডর-গুয়ানো জাতীয় পাখি। এরাই ঠাকুর। সবই বড় বড়। এদের পরে এল 'তিয়াহুয়া-নাকো'-কৃষ্টি। তিতিকাকা অঞ্চলে এদের চিহ্ন আজও মেলে। এরা মাথাটাকে শিশুর জন্মের পর থেকেই সরু করার জন্য বেঁধে রাখত। আর এরা বীরাকোচা (Viracocha) নামে এক অপরূপ সর্বশক্তিমান প্রসারকে (space) মানত 'দৈবী আধার' বলে। জাগুয়ার, কণ্ডর আর মহাসর্প সমন্বিত সূর্য-দেবতার খোদিত মূর্তি। 'সীয়েন্তেহুয়ান্‌কো' কথাটা ইন্‌কারাও ব্যবহার করেছে বিদ্যুতের তীব্র গতিকে বোঝাতে। এরাও মহাকালে মিশে গেছে।

"এর পরে এল, 'মোচিকা-চিমু' কৃষ্টি। এরা নিঃসন্দেহে সমুদ্র পথেই এসেছিল। ইতেন্‌ বলে মেছো-গাঁ আছে, সেখানে নেমেছিল। ল্যামবেয়েকোয়ে জেলায় এদের এক প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। দেবতাও নতুন। নাম চোং। এদের সর্দার নেলাপ যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি কুশলী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এরা রাজ্য বিস্তার করার নেশায় শত্রু বৃদ্ধি করতে লাগল। মোচিকা কৃষ্টিও সেই সঙ্গে যেন ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল।

"কিন্তু চিমু বলে কৌমটা ছোট হলেও আজও আছে। ওদের নিঃশ্বাসে সমুদ্রের গন্ধ আছে কি না? ব্যবসা, বাণিজ্যতে চিমুরা প্রখর। ছোট্ট—কিন্তু আঁট-সাঁট গোষ্ঠী। প্রায় সকলেই ধনী বণিক।"

আমি বলি, "আমাদের পার্শীদের মতো।"

মধু বলে, "ত্রিনিদাদের সিন্ধী আর সাইরিয়ানদের মতো।"

"এদের রাজধানী-নগর চান-চানের কিন্তু বৈশিষ্ট্য ছিল। আগা-গোড়া কাঁচা ইটের অর্থাৎ আদোবের তৈরি হলেও অত্যন্ত সুঠাম, সংহত, প্লান করে করা। পেরুর দ্রষ্টব্যের মধ্যে পড়ে। তবে তোমরা যাবে না। কারণ অমন আদোবের শহর কাছেই আছে—'পাচা কামাক'। দেখাব। তার আলাদা ইতিহাস।

" 'পারাকাস্' বলে এরপর এক কৃষ্টি এল (পিস্‌কো)। লীমার দক্ষিণে প্রায় ৩০০ মাইল দূরে চিঞ্চা দ্বীপের সার। এখানেই আসল দেশের মাটিতে ছিলো চিমুরা। আর তার আরও দক্ষিণে পারাকাস উপসাগরের কাছে পিসকো। এরা হয়তো বা আয়াকুচোর দিক থেকে পাহাড় থেকে নেমে এসেছিল। এদের কবরে যা বাসন-পত্র পাওয়া গেছে দেখলে মনে হয়, এরা খেতো-পরতো ভাল। পান করত বিস্তর। দামি জিনিষ যা পাওয়া গেছে, এবং যার জন্যে পেরুর ইতিহাস এই 'ঝল্‌কে' ওঠা সাময়িক কৃষ্টির কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী—সে হোল এদের অসাধারণ শল্য-বিদ্যা। তখনকার দিনে এরা অক্লেশে মাথার খুলির হাড় কেটে প্রয়োজন হোলে বদলে পর্যন্ত দিত। রূপোর বা সোনার প্লেট দেওয়া এমন করোটি মিলেছে! বেশ কিছু সার্জারির অস্ত্র-পাতির সন্ধানও পাওয়া গেছে। এখানে লীমার মিউজিয়মে কিছু রাখা আছে। সোনা বা রূপোর নানা রকমের সার্জিকাল ছুরি—নাম ছিলো টুমী। আর একটি জিনিষ এরা পেরুকে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ী জাত তো। ল্লামা পশুটির বিশেষ ব্যবহার। আগে ল্লামা খেত, আর তার চামড়া দিয়ে পোষাকই করত। ল্লামাকে এরা অন্য ভাবে পোষাক তৈরীর ব্যাপারে লাগাতে শেখাল। এরাই ল্লামার লোম সংগ্রহ, লোম ধোলাই, রঙানো; তারপর পাকানো এবং বোনা—এসব শিল্প-তত্ত্ব আবিষ্কার করল। কম্বল বোনা, আর তাতে নক্সা তোলা। তখনকার দিনে হাত-করঘায় অর্থাৎ হাতে চালানো ছোটো-বড়ো তাঁতে এমন নক্সা করার হিসাব রাখার আলাদা মাথা, আলাদা রুচির দরকার হোত। সভ্যতার শিশুকাল। এদের কাছে পেরুর 'লামা-কম্বল' শিল্প ষোলো আনা ঋণী বইকি।

'রায়া গ্রান্দে-দে-নীমা' একটি নদী কার্ডিলেরা থেকে নেমেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছে; পাস্‌কোর দক্ষিণে। এখানে আছে, আজও আছে শহর বলো, কসবা বলো—'ঈকা'। আজ এখানে এই বিস্মৃত "নাজকা"-কৃষ্টির কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না; কিন্তু এরাও আমাদের শিখিয়ে গেছে মহান্ এক বৃত্তান্ত। বোধকরি, মানুষের ইতিহাসে এরা শিখিয়ে গেলো সময়ে বৃষ্টির তত্ত্ব; নদীতে বেগের তত্ত্ব: সেই বেগ বেঁধে তাকে ইচ্ছামতো পথে চালাবার তত্ত্ব।

বলছি সে সব কথা।

"ঐ যে বললাম, রায়োগ্রান্দে পাহাড় থেকে নেমেই সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ছে এমন চার-পাঁচটি নদী, ছোটো হলেও ঐ পাহাড় থেকে নেমেই সমুদ্রে পড়েছে। অল্প দূরত্ব তো, তাই বেগ তীব্র। রীমা তাদেরই একটা। কিন্তু এই যে ক্ষয়িষ্ণু পারাকাস-কৃষ্টি এদের সাথে এসে যোগ দিয়েছিল, অন্য আর এক দল। কোথা থেকে তারা এসেছিল তাও কেউ জানে না; আর কোথায় মিলিয়ে গেছে তাও অজানা। কেবল জানা যায়, তার সঙ্গে তাদের দেবতা, পূজা এবং দৈবী শ্রদ্ধা এনেছিল। এই প্রথম নির্মিত হোল বিগ্রহ পাথরে এবং কাঠে। এই প্রথম হোল বিগ্রহের মনুষ্য আকৃতি, মনুষ্য স্বভাব! তার খাদ্য চাই, চাই তার পোষাক, সঙ্গিনী মনোরঞ্জনী চাই—আবাস, বিশ্রাম, উৎসব—সবই চাই। পারাকাসদের শেখালে এসব, সেই আগন্তুক একটি কৌম 'নাজ্‌কা।'

পেরুর পূজায় রক্ত আছে, বলিও আছে, নরবলিও আছে; যেমন আজতেকদের ছিল। কিন্তু আজতেকদের মতো বলির প্রসাদ নরমাংস এরা কেউ খেত না। ......তোমাদের নেই? নিশ্চয় আছে। মানুষ যা চায়, খায়, যাতে সুখ পায়—প্রাণের অধিক দেবতাকে তাই দিতে চায়। এই তার ভাবধারা, ব্যগ্রতা, ভক্তি। (Adoration and sacrifice, love and submission) ভক্তি থাকলেই স্বার্থত্যাগ, নিবেদনে বলি থাকতে হবেই। তোমাদেরও নিশ্চয়ই আছে?"

শান্ত কঠিন স্বরে আমি বলি,—"আছে। ভক্তিতে আছে এবং ছিল; কপটতায়ও আছে। তবে বলে, বলি নাকি ছিল না। পুরানো হয়ে গেলে ঠাকুর, দেবতা, মন্দির, অনুষ্ঠান, ধর্ম সবই হয়ে যায় পণ্য, ব্যবসায, ভণ্ডামী, দর্প। আত্ম-হনন। আমাদের ধর্ম খুব পুরোনো। সেই বহু পুরানো সময়ে লোকে কিশোর, বালক, এমন কি ব্রাহ্মণ বালককেও বলি দিয়েছে। বলি দিয়েছে মেষ, ছাগ, বৃষ, মহিষও। মহিষ বলি যারা দিত, তাদের নীচুস্তর মনে করা হোত। সে যাক—বলো, উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি, তোমার ঐ নাজ্‌কাদের অবদানের কথা শোনার জন্য। ওদের কী এমন দান?"

বলছি,—'ওদের দেবতার নামও প্রাচীন চেভিনদের দেবতা বীরকোস (Wiracocha); তিনিই প্রধান। আর আছে সমুদ্রদেব 'কন্' (Kon); যা থেকে হেইয়ের্দালে তাঁর নৌকোর নাম দিলেন 'কোন-টিকি' (KON-TIKI)। তফাৎ এই যে, পূর্বের সেই সব আগন্তুক দেবতারা সূক্ষ্ম চিন্তার অরূপ দেবতা থেকে মনুষ্যরূপী দেবতা হলেন। ওদেরই হাতে আঁকা পাহাড়ের গায়ে 'ইকড়ি-মিকড়ি'। যার ব্যাখ্যায় এক খলিফা (ডানিকিন) লিখে ফেল্‌লো মহাকাশের বুক থেকে পৃথিবীর মতো অখন্ত্যে সংসারে দেবতাদের আগমনের কথা! কী মুর্খ এই দেবতাগুলো, তা বলো।"

—"কেন? খলিফা কেন বললে? তুমি কি বিশ্বাস করো না? জানো কতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ডানিকিন গিয়ে বক্তৃতা দিয়েছে; ক'টা ভাষায় তা'র বই ছাপা?"

বলতেই আবার ওর সেই হাসি। হেসে কুটোপাটি।

—"থামো, থামো। অমনি এক খলিফা লিখিয়ে আছে, সাম্পান পাম্পা—না কি যেন

নাম! কেবল তিব্বত, যোগ, লামাসরায় সম্বন্ধে লেখে। আসলে ক্যানাডিয়ান। ওর প্রতিবেশী ক্যানাডিয়ান আমায় বলেছে যে, ও ক্যানাডা থেকেই বেরিয়েছে দু'-এক বার; এছাড়া বাড়ি ছেড়ে বা'রই হয় না। ওর যোগ সম্বন্ধে ডিক্শ্‌নারী পড়ে এক ভারতীয় বন্ধু ডক্টর সুব্রাহ্মানীয়াম হেসে বলে—'ওটা কি ডিক্শ্‌নারী? ওটা সেন্‌সেশনারী।'

—"তারাও তো বাজে কথা বলতে পারে।"

—"তালে তুমিও খলিফা। ...আমরা কি বলি জান?

"পূজার জন্য এই পারাকাস্‌ আর নীজ্‌কাদের বিশেষ করে গ্রহ-নক্ষত্রের সংস্থান গুণতে হত। সেই সব পঞ্জিকার জন্য পরে মায়ারা মেক্সিকোয় দারুণ দারুণ অবজার্ভেটরী গড়েছে। এদের তো সে সাধ্য ছিল না। এরা সব গুণে গেঁথে গ্রহ-বিজ্ঞানের খাতিরে, ধর্মের খাতিরে, কিছু কিছু রেখা টেনেছে; আর তার সঙ্গে বায়ুর গতি, সূর্যের গতির সঙ্গে মেঘের গতি-বিধি জানার চেষ্টা করত।...

"পারাকাস, বিশেষ করে নেজকাদের শ্রেষ্ঠ দান ছিল, এই চাষ-বাস, জল-প্রণালী রচন, নানাভাবে মাটিতে জল এনে মাটিকে সৃজনে বাধ্য করা। ঐ যে বলেছিলাম 'ঋণী', সে এই কথা। দূরন্ত নদীকে পাহাড় থেকে লাফাতে দেখেই ওদের ইচ্ছে হল এই বেগকে বেঁধে ফেলে। বেগকে লক্ষ্য করে তার ভেতরের শক্তিকে অনুধাবন করাটাই হচ্ছে একটা বড় কথা। সেই শক্তিকে আয়ত্ব করার সাহস একটা অসম-সাহসিক পদক্ষেপ। চিন্তার জগতে বিরাট দান। মনুষ্য প্রগতিকে এক তুড়িতে এগিয়ে দিল। তারপর সেটা আয়ত্ত করার জন্য 'বাঁধ গড়া'ও একটা বিরাট সৃষ্টি। সমাজের কত ঋণ এদের কাছে! বাঁধ দিয়ে সেই বাঁধা জলের ভাগ করে ইচ্ছামত বইয়ে দেওয়া যে দিন হল, সে দিন পেরুর কৃষ্টির ইতিহাসে এক সুবর্ণ মৃতসঞ্জীবনী অধ্যায় লেখা হল।...

"এরা চাষকে সভ্য করল, আয়ত্তে বাঁধল; নিসর্গকে, নিসর্গের শক্তিকে বাঁধল; কাজে লাগাল। মাংসের চেয়ে সব্জীতে বেশী মন দিল। পেরুর কৃষিসম্পদ পৃথিবীর ঈর্ষার বস্তু। এখানকার ফল-মূল, শাক-পাতা, শস্য, ফুল, ভেষজ ঔষধ আজ পৃথিবীর বাজারে বাজারে। মানুষ ভুলেই গেছে সেসব খাদ্য পেরুর সম্ভার, পেরুর দান। এবং এই কৃষি ও ভেষজ সম্পদের ঐতিহাসিক সাধনা প্রথম আরম্ভ করে এই পারাকাস্‌রা, তা থেকে নাজকা রা।...

"ঐ তথাকথিত আকাশ-দেবতাদের এরোড্রোমের ইকড়ি-মিকড়িও নাজকাদেরই। অমন 'ইকড়ি-মিকড়ি এখান থেকে নিয়ে কুজ্‌কো পর্যন্ত পাবে। বালুকাময় ন্যাংটা পাহাড়ের পিঠকে এমনি উল্‌কী পরানো এখানকার যুবকদের এক ফ্যাশান। ওতে না-কি যুবতীরা বেশী করে আদর করে। যাকে বলে—স্পোর্টস্‌, হীরো, ম্যাচো। জীবজন্তু আছে। 'জয়তু পেরু' লেখাও পাবে, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'-ও পাবে। আবার কোকা-কোলাও পাবে। আবার কে এক গাছও এঁকে গেছে। টুরিষ্টদের খুশীর জন্য তার নামকরণ হয়েছে ক্যাণ্ডেলেব্রা।...

"পাগল কত হয়! ঐ 'এরোড্রাম'-মার্কা ইকড়ি-মিকড়ির ফেরে পরে জুলিয়া নট্‌ আর জিম্‌উড্‌ম্যান নামে দুই ইংরেজ-আইকেরাস্‌ আর ডিডেলাস্‌, (হোমারে বর্ণিত—এরা

পাখা লাগিয়ে আকাশে উড়তে গিয়ে মারা যায়) এক ইন্‌কা বালুন তৈরী করে ঐ বাতাসে ভর করে ওড়ার ব্যবস্থা করেছিল।…

—"ফল?" মধু জিজ্ঞেস করে।

—"ওড়া? কচু। চমক লাগানো? হ্যাঁ, তা করেছিল। তবে ঐ পর্যন্ত। এই হল আমাদের প্রাচীন কাহিনী। এরপরে এল ইন্‌কা। ইন্‌কা নামটা স্পেনের মানুষদের দেওয়া। ইনকা কথাটা ওরা বারে বারে শুনত—আসলে যা শুনত সে শব্দটা 'য়োপাঙ্কোই'। এর অর্থ সর্বশক্তিমান। প্রথম য়োপাঙ্কোই, অর্থাৎ প্রথম ইন্‌কা—'মঙ্কো-ইঙ্কা'। আর তাঁর প্রকৃতি 'মাম্মা-ওল্লো'। এদের নিয়ে পুরাণ আছে। পরে বলব। কিন্তু এখানে বলে রাখি, এরা পূব থেকে আসে। তিতিকাকা হ্রদের ধারে প্রথম বসতি। এদের সঙ্গে এই প্রাচীন কৃষ্টিগুলোর সম্পর্ক এখানে আসার পর হয়েছে।……

"এদের, এই প্রাচীন গোষ্ঠীর একটি বিখ্যাত নগরী ছিল, যার নাম 'পাচাকামাক'। দেবতাদের স্থান। চাঙ্কে, চিলোন, রীমাক, হুয়াকা প্রভৃতি সমুদ্রতীরে বয়ে আসা নদীগুলোর ধারা ধরেই এসব কৃষ্টির গোড়া পত্তন।……"

হঠাৎ পণ্ডিতি করলাম, "পৃথিবীর সব কৃষ্টির বসতিই তো নদীর ধারে ধারে।"

তা ঠিক। 'পাচা' মানে 'স্থল'; আর 'কামাক' অর্থে নগর-পত্তনের দেবতা। ('স্থল-দেবতা', 'বাস্তু-দেবের থান')। এ নামটি থেকে মালুম হয়, এরা সমুদ্রের পার থেকে এসেছিল। স্থল পাবার জন্য দেবতার শরণ নিয়েছিল। আর নগর গড়ার অভ্যাস ছিল বলেই নগর-গড়নের দেবতাকেও জানত। জলের ভয়াবহ দুস্তরতার মধ্যেই মানুষ স্থলের ভাবনায় গ্রস্ত হয়ে থাকে। জল থেকে স্থলে এলে স্থলের দেবতাকে প্রণাম জানায়। এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। সেই হ'ল পাচাকামাক—স্থলের দেবতা। পাচাকামাকের শ্রেষ্ঠ দেবমন্দির ছিল "কোরিকাঞ্চা" নামক সূর্যের মন্দির। সূর্যের বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব হিসেব করে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে বহু তীর্থ ছিল। পাচাকামাক ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বাস্তু আর ইতুতে (আদিত্য) জবর যোগ।"

—(মনে পড়ল আমাদের সূর্যের একুশটি নাম। বারোটি প্রসিদ্ধ)।

—"কতদূর? সে শহর যাওয়া যায়?"

—"পাচাকামাক ছিল বলেই তো লীমা আছে। খুবই কাছে।"

—"তবে আজ নয়। আজ শহরটাই দেখি"

ন্যাশনাল হিস্ট্রি মিউজিয়ম নাম করা। সবচেয়ে ভালো লাগল স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস-মূলক ছবিগুলো। আর প্রত্নতত্ত্বের ম্যুজিয়াম। তবে, মেক্সিকোর সংগ্রহের কাছে, এ সংগ্রহ কিছুই নয়। একটি সোনার ছুরি দেখলাম। এই ছুরি দিয়ে আনুষ্ঠানিক বলি হত। গড়নটায় বিশেষত্ব আছে। ঔপনিবেশিক কালের ফার্ণিচার ইত্যাদি আমার মনকে টানে না। কিন্তু পুরানো দিনের মাটি, মাটির গায়ে প্রলেপ দেওয়া, সিরামিক পাত্র—এ সব যেন আমার শিল্প সত্তা, সমাজ সত্তার সঙ্গে কথা কয়। সখের বাসন-কোসন, খেলার পুতুলদের দেখলাম। তাদের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বলি।

"লীমার আর্ট ম্যুজিয়মে শুধু ব্যবহারিক আর্ট। যেমনি বলেছি 'টুমী' অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক ছুরিটির কথা। দেখলাম ঔপনিবেশিক কালের একটি স্বর্ণমণ্ডিত পালঙ্ক। বোঝা গেল, কলকাতার বাবুয়ানার যুগে পালঙ্কের পায়ের দিকের মাথার দিকে কোঁদাই করা যে সব মেহগনীর, আবলুশের কাঠের কাজের ঘটা ছিল—সে সব আড়ম্বর কোথা থেকে এসেছিল। শোবার ঘরে কটি খাট থাকা উচিত ও কেন থাকা উচিত তার বিশদ বিবরণ বাৎসায়নে আছে। বলা আছে, খাট কেন সহজ, সুগঠিত, নির্মল এবং অনুচ্চ হবে। এর তুলনায় পর্যঙ্ক হবে ভূষিত, সুখশায়ী এবং কোমল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার পালঙ্ক প্রতিভা যখন বড় বড় বারনারী গৃহের অলংকরণ হল (এবং সোনার টাকা লোহার টাকার দিকে যখন এগুতে থাকল) তখন পালঙ্ক নিয়ে আদিখ্যেতাও কমল। এখনকার ষ্ট্রীম লাইন ফার্ণিচারের বাজারে ঐ স্বর্ণ পালঙ্কটি দেখে অবাক হতে হল।

"হ্যাঁ, তা অবাক বই কি!" —বল্‌লে রদ্রীগেজ।

"প্রথম অবাক এই যে",—হেসে হেসে রদ্রীগেজ বলে, "ভেবোনা পালঙ্কের কোন অংশে ইন্‌কার গন্ধও আছে। শুঁকে দেখ। ইন্‌কা-রা তা সম্রাটও—সবাই মেঝেয় শুতো। উঁচুতে শোয়া ইন্‌কারা জানত না বলেই মাটির হলে মাটির মেঝেটি, নৈলে পাথর হলে পাথরের টালিটি এত মসৃণ করত। ওদের পাঞ্চোই ছিল ওদের লেপ, তোষোক, বালিশ। প্রথম স্পেনের ওরা এসে যখন বিছানা, তোষোক, বালিশ চালু করল ইন্‌কা-রা ঘৃণা করত। ইন্‌কা মেয়েরা খুঁৎ খুঁৎ করত, বলত—ওতে শুয়ে তারা আসলের মজা পেত না। তাছাড়া, এই নিত্য ব্যবহার্য বিছানায় গা দিয়ে ওদের বোধ হত, কার না কার এঁটো খাচ্ছি। অজানা জলের কাপে চুমুক দিচ্ছি। বলত—স্পেনের জানোয়ারগুলো নিঘিন্নে, দুর্গন্ধ, অপরিষ্কার। বেশীর-গুলোই তো নম্বরী ঘেয়ো কুত্তাছিল। আজও ইন্‌কা সমাজে খাট-পালঙ্ক নেই, হামাকও নেই। ছিলও না। এখন কর্ডিলেরার ওপারে হয়েছে। সে জলের জন্য, সাপের জন্য। কিন্তু পালঙ্ক? ও ফুটানী। না, পালঙ্ক ছিল না। আমার নেই। আমরা হামাকে শুই।...

"দ্বিতীয় অবাক্, হোক পালঙ্ক। এতো সোনা কেন? যাদের লুট করা, তাদের দেখিয়ে ভোগ করা এক জাতীয় মানসিক রোগ, যাকে বোধ হয় আনন্দ বলে। কিন্তু আনন্দ নয়। স্বামীকে পুত্রকে বেঁধে রেখে তাদের সামনে নারীকে ভোগ করা গ্রীকরাও করেছে। ওরাই বা কেন করবে না? গ্রীস বলতে তো য়োরোপ অজ্ঞান। অবাক্ বলে অবাক! তবু দেখ। দেখার আছে। তবু আছে।—অবাক হতে থাক। দেশ দেখতে এসেছ। অবাক হতেই তো এসেছ। এই অবাক হবার মনটাই তো যৌবন; হোক না দেহ শিথিল।

যাই বলুক না কেন রদ্রীগেজ, পালঙ্কের পুংখানুপুংখ কাজটি দেখবার মতো। বোরোকের পাঁড় এই আইবেরিয়ান-মুরীশ টেষ্ট। আসলে এই আড়ম্বরিত সজ্জা এসেছিল বাইজেন্টিয়াম থেকে। ওদের তো সবেই 'হদিস'-এর ধুয়া। অলঙ্করণে পশু-পাখী (রূপ) থাকবে না! সে হবে 'না-পাক্'। কাফীর। কাজেই ওদের যা কিছু শিল্প-কর্ম তিন ধারায় ছুটলো:—জ্যামিতিক বরফী-টাইল ধরে; কোরাণের বয়েৎ লেখার আশ্চর্য ঢংয়ের আরাবেস্‌ক্ ধরে; আর এই সত্যাসত্য মিলিয়ে লতা-পাতা-ফুলের ভুল ভুলৈয়া সৃষ্টি করে।

খুবই সুষমা, সামঞ্জস্য, বাহাদুরী, কারিগরী। কিন্তু যেখানেই জালি; সেখানেই ধুলো, নোংরা, পোকা। আর, কোন একটা কিছুর স্বতন্ত্রতা নেই।

কিছু কিছু সেকেলে পোষাক-আশাক আছে। সোনা মোড়া সিন্দুক। কিছু কাজ আছে টেপ্‌ষ্ট্রী জাতীয়। আমাদের দেশের বিহার, বস্তারী কাজের মতো। এ্যবষ্ট্রাক্ট্‌ আর্ট যাঁরা ভালোবাসেন, ভালোবাসেন প্রতীকী ভাষায় পৌরাণিকতার বর্ণন—তাঁদের ভাল লাগবে। আমার চিন্তা—এরা ছুঁচ পেত কোথায়?

পরে ম্যুজিয়মে কতো ছুঁচই দেখেছি! হাড়ের, মাছের কাঁটার, সজারু জাতীয় জন্তুর কাঁটা, রূপোর, সোনার, তামারও। জন্তুর দাঁত শুখিয়েও ছুঁচ দেখেছি।

পোর্সলিনের এবং পোড়ামাটির কাজের মধ্যে প্রায় সবই কুঁজোর প্যাটার্নে পানাধার, পূজার জন্য ব্যবহৃত জলাধার। একটি লাল রঙের জলাধারের পেটটা একটা মুখ। সে মুখ হাস্যোজ্জ্বল। (এখনকার পেরুতে ইন্‌কাদের মধ্যে হাসি দেখিইনি প্রায়। ভাবি ইতিহাসের চাপ, পেটের দায়, আত্মসম্ভ্রমের 'ওপর অভিঘাত মানুষের জীবনধারাকে কী সাংঘাতিক ভাবেই দুমড়ে-মুচড়ে বিকৃত করে দিতে পারে!) কালো কুঁজোটির মুখখানা খুবই অপ্রসন্ন। একটি পানাধারের মানুষটি নিজেই গড়িয়ে আছে। আর পান-পাত্রে মুখে দিয়ে কী যে পান করছে—জানি না। সবাই যে মানবিক তা নয়। মাছ আছে, কচ্ছপ আছে। একটি কৌতুক। জাঁদরেল কমণ্ডলুর মতো। তার মধ্যে থেকে এক শ্রীমান মুখ বার করে আছে। ভিতরে কি করছে কে জানে? তবে ভেতর বয়ে যা আসে, তা জলীয়ই। এদের কারুকার্যের মধ্যে শৃঙ্গার ও মৈথুনের যুগ্ম-কৃতিও অনিবার্যভাবে আছে। থাকে সব কৃষ্টিতেই। থাকুক, নানা ভঙ্গীতেই। একটু রূঢ়, বন্য, আদিম। হোক, কিন্তু একটি বিষয়ে (অন্যত্রও আছে। কোনারকে তো আছেই, জানি।) এখানে বেশী নজর। সমরতিক সৃষ্টির প্রতিই এদের সৃষ্টিকর্ম যেন বেশী সরব।

রদ্রীগেজ বলে "এদেশে এ বিষয়ে আলোচনা করলে এর স্বপক্ষে বড় বড় উকিল পাবে, এবং মেয়েদের কোর্টের উকীলরা কিছুতেই আনন্দ ও প্রীতির উৎস হিসেবে সমকামিত্বকে এক তিল নীচে স্থান দেবে না।......

"ওরা বলে, 'ক্ষেত কি কেবল ভুট্টা, আলু আর গাজরের জন্যই? ক্ষেতে মরশুমী ফুলও ফোটানো যায়। সেটা দরকারও এবং ভালোও। শুধু রং আর গন্ধ। সে কি কম? নাই বা হোলো দিন-রাত্তির ফলের চাষ?'......

"বল:বা কি, সারা দক্ষিণ আমেরিকার রাতের বাজারে বেশ্যালয়ের সঙ্গে এখন জোর কম্পিটিশন এই সমকামিক দোকানগুলোর। আইনতঃও এটা মান্য; শুধু সাধারণের দৃষ্টির মধ্যে মোয়াক্কিল-তোষণ বা প্রলোভন চলবে না—তা হলেই আইন ধরবে।"......

অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে দেখলাম। একটি লম্বা কাঠের যূপ। কী কাঠ জানি না। সিলীবাল্লী মনে হোল। ওবেলিস্কটির গায়ের আঁক পড়বার চেষ্টা করলাম। তলায় একটি মনুষ্যাকৃতির মাথায় সাজের ঘটা ওপরে উঠলেও তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন এক বীর-মূর্তি। এর পরে (অর্থাৎ আরও ওপরে) একটি লতার প্রতীক, পাতাগুলো পান পাতার মতো। তার

ওপরে একজন কেউ বিনীত ভাবে হাত-জোড় করে মাথা নীচু করে আছে। এবং কোন সম্মানিত 'গরুড়' তার বক্র চঞ্চু দিয়ে সেই বিনীত মাথাটি নিরুপদ্রবে খোবলাচ্ছে। কেউ কিছু বলছে না।......

......পাখিটি তো সূর্যের প্রতীক (বেদের গরুত্মান্); খোবলাচ্ছেন কি তবে উৎসর্গ করা বলি? সে বলি কি অন্ধকার?

...কে বলবে? এমন যূপ পরে আরও দেখেছি।

আমার বাতিক বোলিভার। তাঁ'র মূর্তি এখানে কোথায়? সে হোলো ইন্‌কুইজিশন স্কয়ারে।—নির্জন, গম্ভীর, সাজানো চত্বরের মাঝে সেই বহু পরিচিত অশ্বারোহী মূর্তি, মাথা থেকে হ্যাট খুলে হাতে নিয়ে সবার বন্দনার প্রতিবন্দন করছেন।

তখন কথা উঠলো, লীমার সেই প্রখ্যাত বাড়িখানা নিয়ে। এখানেই সান্ মার্টিন প্রথমে থাকতেন; বিপ্লবের যুগে এবং তা'র পরেও। সান্ মার্টিনের সে বিপ্লব যদিও লড়াইয়ের মাধ্যমেই সার্থক হোল,—তবু পরে, বিপ্লবীদের মধ্যে আপোষে খাওয়া-খাওয়ির সুযোগ নিয়ে স্পেন আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। ততদিনে কলোম্বিয়া-একোয়াদোর অঞ্চল বোলিভার মুক্ত করেছেন, জুনীন আর আয়াকুচোর লড়াইও ফতেহ্। তাই সান্ মার্টিন্ বিপদে থই না পেয়ে আবেদন জানালেন বোলিভারকে। দু'জনে নিভৃতে দেখা হোল এবং আজও ইতিহাস জানে না,—কী কথা হয়েছিল ঝড়ে আর বিদ্যুতে, আগুনে আর শিখায়। সেই কথোপকথনের পরে সান্ মার্টিন দক্ষিণ আমেরিকা ছেড়ে দিয়ে ফ্রান্সে গিয়ে শেষ জীবন কাটালেন। (আত্ম-নির্বাসন!...একদিন বোলিভারকেও এই পথ নিতে হবে?)

লোকের ধারণা, বোলিভার বলে দিয়েছিলেন—'পুরাতনের টেবিল সাফ' করে নতুন খেলার পত্তন না করলে, দেশের মধ্যে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংঘাত এসেছে তাকে বগলদাবা করে স্পেনের সঙ্গে লড়াই চলবে না। বোলিভার মানুষটা ছিলেন সাচ্চা পোখ্‌তো হাড়-সেদ্ধ ঘুন বিপ্লবী। তিনি আপোষ জানতেন না। তবু সান্ মার্টিনের এই নীরব নিষ্ক্রমণ দক্ষিণ আমেরিকার ইতিহাসে এক অতি করুণ বিষণ্ণ অধ্যায়।

সান্ মার্টিন্ অধ্যুষিত সেই বাড়িতেই বোলিভার আসেন এবং সেই বাড়িতেই না-ডাকার প্রত্যক্ষ অপমান সত্ত্বেও, ওপর-পড়া হয়ে এসে জোটেন সেই দুর্দমনীয়া প্রচণ্ড বিপ্লবিনী ম্যানুএলা; যাঁর জীবনে একটিই ব্রত—দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তি, এবং সে মুক্তির প্রত্যক্ষ ও প্রদীপ্ত নায়ক সাইমন বোলিভার।

তিনি অসুস্থ। তাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিতেই হবে। এতে আবার ডাকই বা কী! অপমানই বা কী?

রমণী কি কেবল শয্যা-বিনোদিনী, রতি-সঙ্গিনী? ম্যানুএলার অভিধানে লেখা 'উদ্দেশ্যের পুণ্যতাই কর্মকে পবিত্র করে।' আরও জানতেন তিনি: রতির শাসনও শাসন; রতির মুক্তিও মুক্তি। রতিমন্দির পরিক্রমা, রতিতীর্থে অবগাহন, তারই সুফল তো দেহ-

দাবানল থেকে মুক্তি। আত্মা হয়তো দূরের কথা; কিন্তু মনের মুক্তি তো বটেই। এ পুণ্য-কর্মে যাদের দ্বিধা তারা ভেতরে-বাইরে আগুন জ্বেলে খেলা করে। ধ্বংস হয়ে যায়। সুসম্পূর্ণ রতি-তর্পণ প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনের উৎস। এ-গুলি কামিনীতন্ত্রের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞান।

সাইমন ছিলেন বহুকালের যক্ষ্মারোগী। প্রচণ্ড আত্ম-শক্তির দাপটে সারাজীবন যক্ষ্মা সত্ত্বেও কাটালেন ঘোড়ার পিঠে, আর নারীর বুকে। কাজেই ম্যানুয়েলা সেই নারী-তৃষ্ণার পাত্র-ধারিণী, করঙ্ক-বাহিনী। নৈলে অপাত্রে এ রোগ রোগীদের উদ্দাম তৃষ্ণার ছোঁয়ায় আগুন হয়ে উঠে জ্বালিয়ে দেবে দেহ, মন। এখানেও ম্যানুয়েলা প্রত্যক্ষ অভিসারকে পরোক্ষ সংযম করে তুলেছেন, অবলীলায় লীলা-সঙ্গিনীর পদ গ্রহণ করে। রদ্রিগেজের মতে এটাই সেই অগ্নিক্ষরা বিপ্লবিনীর মনের ভাষ্য। তৃষ্ণার সংহত স্বরূপ। এই দুর্জয় লীলার মাধ্যমেই সংহত সংযত শাসনে, বাঁধে ধরে রাখা জলের মতো 'বেঁধে রাখার তপস্যা' ছিলো ম্যানুএলার। তিনি এবং তাঁর অসামান্য কামকেলি কৌতুকের বিভ্রম দুরন্ত রোগীকে তৃপ্তিতে ছেয়ে রাখত। রোগীর দেহ জর্জর হোত না। প্রাণ পেত স্ফুরণ। এ ক্ষমতা তো আর কারুর ছিল না।

যক্ষ্মার রোগী রিরংসু হয়। রোগ সত্ত্বেও, পিপাসা সত্ত্বেও সেই উদ্দাম অতৃপ্তিকে লীলা মোহিত করে রাখার ইন্দ্রজাল তো অপরা কারুর থাকার ক্ষমতাও ছিল না। কিন্তু তখন সেই বিক্ষুব্ধ যৌবন জলতরঙ্গ রুদ্ধ করে কে? তিনি ছিলেন যেমন 'ক্ষ্যাপা দুর্বাসা বিশ্বামিত্র-শিষ্য';—ম্যানুয়েলাও ছিলেন, সেই তালে তাল দিতে "হাম্বীর ছায়ানট হিন্দোল।" জানতেন তিনি সেই যাদুমন্ত্র, যাতে এই শঙ্খচূড়ও বশে আসে। তিনি ঘর বাঁধলেন এই বাড়িতে। শান্ত হলেন সাইমন। বন্ধু-ভৃত্য-সেক্রেটারী পালাসিঅস্ বললো—"বাঁচলুম! তুমি এলে!"

এই লীমায় আছে সেই বাড়ি, যে বাড়িতে জীবনের কয়েকটা সোনা-মোড়া দিন তার লাস্য-মণ্ডিত দেহ-মনের পাত্রে এনে ধরে দিয়েছিলেন ম্যানুএলা। বোলিভার বলেছিলেন —"ভালো খাওয়া,—শোওয়া তো দূরে থাক; বিশ্রামও যে স্বাস্থ্য,—সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম।"

ভুলবেন না কেন! চার বছরের মধ্যে লক্ষ বর্গমাইলকে মুক্তি দেওয়া, এবং সেই মানুষের পক্ষে দেওয়া, যে মানুষটা এই ব্রতের অনুষ্ঠানে হয়ে গেছেন অসহায়, কপর্দকহীন, রোগজীর্ণ, চারিধারে শত্রু-বেষ্টিত, তার কপালে কি সুখ-শয়ন আছে? থাকতে পারে? উপরন্তু বাইরের শত্রু গুপ্ত-ঘাতক, স্পেনের তাকৎ; আর ভেতরের শত্রু রোগ; তার আবার বিশ্রাম কি?

বোলিভারের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী জোসে পালাসিঅস্ এবং তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সামরিক সেক্রেটারী জেনারেল ও' লীরী লিখে রেখে গেছেন যে, বোলিভারকে সেই কয়টি দিন ম্যানুয়েলা আগলে রেখেছিলেন সব কাজ থেকে। স্বৈরিণী ম্যানুয়েলার স্তুতিতে তাঁদের দলিল মদির হয়ে আছে।

বড়ো বড়ো রাজনৈতিক, সামরিক এবং ডিপ্লোম্যাটিক সাক্ষাৎকার নিজের কর্ণেলের ইউনিফর্ম আর পেরুর 'সূর্য-পদক' পরে নিজেই করতেন। কেন করবেন না? শুধু কি রঙ্গিনী? মিলিটারী অফিসার, কর্ণেলও তো বটে। সে সব কাজ সুচারুরূপেই করতেন। এজন্য মাঝে মাঝে পুরুষশ্রেষ্ঠ বোলিভারের তর্জনও গিলে ফেলতে হয়েছে ম্যানুএলাকে। তবুও রোগীর বিশ্রামে বাধা আসতে দেননি। রোগীকে বিশ্রাম নিতে বাধ্য করেছেন। আবার মন রাখতে নেচেছেনও; শুয়ে শুয়ে গল্পও পড়ে শুনিয়েছেন। সার্ভেন্তেস ছিলো বোলিভারের প্রিয় লেখক। বহু বিষয়ে বই পড়ে শুনিয়েছেন; কোলে নিয়ে আদর করেছেন। কিন্তু তারপর না,—না,—না; বিশ্রাম নিতেই হবে। রোগীর জন্য পুষ্টিকর রুচিকর রান্নার পুংখানুপুংখ ব্যবস্থা করেছেন। নিয়ম মত স্নান আহারে বাধ্য করেছেন। অমন যে ফিট্-ফাট্ কেতাদুরুস্ত্ বোলিভার, তাঁকে আরও ফিট্-ফাট্ রাখার বন্দোবস্ত করেছেন।

সেই বাড়ি, সেই বাগান, সেই খানাঘর, শয়নগৃহ, ইণ্টারভ্যুর ঘর—এ আমায় দেখতেই হবে।

—"আছে কি? আছে সে সব?"

হেসে রদ্রীগেজ শান্তভাবে ঘাড় নাড়ে। "যতটা সম্ভব সেইভাবেই আছে। কারণ তার পরের প্রেসিডেণ্টদের পক্ষে ও বাড়ি নোংরা, ছোট আর বেমানান হয়ে পড়েছিল। তারা এসে থাকতেন, এখন যেটা প্রেসিডেন্সিয়াল হাউস 'প্লাজা দ্য আর্মাস্'-এ।

এলাম সেই তীর্থে। সেই মন্দির দ্বারে। শান্ত, নির্জন একটি স্কয়ার। যেন ঝামাপুকুরের ভেতরকার সেই স্কয়ারটি। একটু বড়ো। চারধারেই সব একতালা বাড়ি। গলি পথ। গাড়ি অবশ্য ঢোকে, কিন্তু সবই ওয়ান্-ওয়ে। পার্কের মধ্যে গোটা চারেক কৃষ্ণচূড়া গাছ। আনদরের ফুল হলেও গুচ্ছে গুচ্ছে ভারে ভারে ঝুলে পড়েছে। মাঝখানে বোলিভারের একটি আবক্ষ প্রতিকৃতি। মডার্নিষ্টিক মিষ্টিক ছোঁয়ার ফলে সাবলীল সেই বীর তাঁর যোদ্ধবেশ বিহীন হয়ে যেন দেবভাবে পূজিত আলেকজাণ্ডারের ঢংয়ে চেয়ে আছে। মাথার চুলগুলোকেও তেমনি গ্রীক ঘুঙুর ছাঁদেই খুদেছে।

কিন্তু ভেতরটা সেই পুরানো কালের গন্ধ নিয়েও সতেজ আছে। যেন মহীশূরের প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিশালা। একালের চামড়া বাঁধানো, রেক্সিন বাঁধানো না হয়েও কী যে আভিজাত্য, আর কী যে খাঁটী।

ঘুরে ঘুরে বেড়াই। ইটের টালিগুলি ক্ষয়িষ্ণু। কেউ কখনও তার ওপরে খালি পায়ে ঘোরেনি। আমি কিন্তু খালি পায়ে ঘুরলাম। স্পর্শ পেতে চেষ্টা করলাম: তীর্থ রেণু স্পর্শে অতীতকে দেহমনে একাত্ম করে নিতে পারা যায়।

হলের ও-পিঠে হলের মাপেই শিক দেওয়া বারান্দা। একটি জর্জর, কিন্তু ভারী, ওকের টেবিল। ওটাই ছিল খানার টেবিল। চেয়ারগুলোর কয়েকটা আছে। ছোট অপরিসর চেয়ারের বসার আর পিঠের ফাঁকাটা ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে মোড়া। শুধুই চামড়া। পাশেই

রান্না ঘর। তাকগুলো এবং একটা লম্বা তে-থাকাও আছে। বাসন-কোসন নেই। সব দেয়ালেই বোলিভার-পুরাণের নানা ছবি ফ্রেমে বাঁধানো।

কিন্তু না, ম্যানুএলা কোথাও নেই!

ক্যাথলিক শুচিতায় সে যে স্বৈরিণী, পতি-ত্যাগিণী, বিপ্লবিনী। মানুএলার নামও কেউ শুনতে চায় না। মানুএলা যেন একটা অশ্লীল শব্দ!

গেলাম শয়ন ঘরে। ম্যানুএলার নিজের হাতে সাজানো ঘর—আজও কেউ ছোঁয়নি। কোন কিছুই উজ্জ্বল, উচ্ছল নয়। সে বরং কায়াকাসে বোলিভারের পৈতৃক বাড়ি, এখানে সব কিছুই সাবধানে গোছানো হলেও ম্লান। তবু এই ঘর, এই খাট, এই বালিশ, এই বিছানা ম্যানুএলা নিজে হাতে পরিষ্কার করতেন। এ ঘরে কখনও কোন ফাঁকে মাছি, পোকা ছাড়া কেউ আসতে পেত না।

ভাল লাগল শয়ন গৃহের পাশে ছোট অথচ সাজান একটি ঘর। মাত্র একটি ঘরেই লামার পশমের পুরু কার্পেট বিছানো। লাল বনাতে ঢাকা চৌকির ওপর সোনার কাজ করা একটি যীশু মূর্তি। ওপরে ক্রশ ঝুলছে। সামনেও রূপোর প্লেটে ক্রশ একটা দাঁড় করানো। জপের মালা। মোমবাতি জ্বলছে। তাজা ফুল রাখা আছে—গোলাপ আর ম্যাগনোলিয়া।

বোলিভার যখন যেখানে থাকতেন সঙ্গে চ্যাপেল থাকত। যখনই হোক খানিকক্ষণ একা হাঁটু গেড়ে মাথা নীচু করে ধ্যানস্থ হতেন।

জানি না, মানুষ এটা কেন করে? কিন্তু করে। জীবনের নানা রহস্য ভাবনার সঙ্গে মানুষ নিজেকে একটা অন্তর্ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চায়। খোঁজে জীবনের ভারসাম্য। খোঁজে জীবন যজ্ঞের উদ্দেশ্য। নিজের উর্ধ্বে, নিত্যদিনের গ্লানির উর্ধ্বে, প্রত্যহের জঞ্জালকে অতিক্রম করে, প্রত্যক্ষ বাস্তবের রূঢ় বিরোধকে ঠেলে রেখে মানুষ নিত্যাতীত, প্রত্যহাতীত, প্রত্যক্ষাতীত এক অপরোক্ষ অনুভূতির সায়রে নিরালম্ব হয়ে ভাসতে চায়। সেই মগন থেকে ফিরে যেন এক নতুন মানুষ হয়ে যায়। এই আত্ম-সমাহিত সাধনা বাদ দিয়ে কোন দেহবাদী কখনও দেহকে তুচ্ছ করা সাধনাকে প্রত্যক্ষ রূপ দিয়ে দৃঢ় করে যেতে পারেনি। এ এক অপরূপ রহস্য। এই রহস্যের বেদীতে যে দেবী আসীনা তারই নাম ইতিকথা।

ওরা বার বার আমায় নিষেধে নিষেধে উত্যক্ত করেছে—'ছবি নেবেন না, ছবি নেবেন না। (আচ্ছা? নেব না তো এলাম কেন গোঁসাই? নেবই। তুমি 'না' বললেও নেব)।

বিরক্ত হয়ে আমার চিনন্ আর পেন্ট্যাক্স ক্যামেরাগুলো সব লেন্স, লাইট সমেত ব্যাগকে ব্যাগ জমাদারের টেবিলে রেগে পটুকে দিয়ে বলি, 'ঘ্যান্ ঘ্যান ছাড়ো তো। একটু একা থাকতে দাও। বাগানটা ঘুরি।'

এ বাগানে বোলিভার কাজ করতেন। একটা প্লাম গাছ লাগিয়েছিলেন। আমাদের লুকাট গাছ বা কাঠ গোলাপ গাছের মত। অনেক আঁকা বাঁকা শাখায় তার বিস্তার। গাছটা কেটে ফেল্লেও আবার গজায়, তাই এতোদিন আছে।

বেশ খানিক পরে বেরিয়ে এলাম। জর্জ গাড়ি চালিয়ে দিল। এবার খেতে যাব।

ক্ষিধে পেয়েছে জব্বর। রড্রীগেজ সহানুভূতি দেখিয়ে বল্‌ল—"জানি না ছবি তুললে কী ক্ষতি হত।"

—"যাও, দেখে এস ক্ষতি হয়েছে কি না।"

– অবাক হয়ে রড্রীগেজ বলল, "তার মানে?"

আমি বলি গম্ভীর হয়ে—"কিছু না। আমি তো তুললাম। কী ক্ষতি হল?"

চমকে বলে—"তুললে! তুলেছ!!"

পকেটে ছিল কোডাক্ ইনষ্টম্যাটিক। ছোট্ট যন্ত্র। দেখালাম। ওর মধ্যে ফ্ল্যাশ ফিট করা। চার-পাঁচটা ছবি নিয়েছিলাম।

রড্রীগেজের কী হাসি!

এখানেও মাস দুয়েক হল মার্কিনী মুর্গী-ভাজা কুবেরের 'কেণ্টাকী চিকেন' শাখা খুলেছে। লীমায় এখন এটা একটা 'গো'। আসলে এই ইয়াঙ্কীগুলো বিশ্বপ্রেমের গন্ধ ছাড়বে, ট্যুরিষ্ট হবার জাঁক দেখাবে। কিন্তু রোগ, মৃত্যু, জার্ম, ব্যাসিলির এমন ভয় যে, মাকেও হয়ত জিগ্যেস করে—জন্ম দেবার আগে এ্যান্টিসেপ্‌টিক ওয়াশটা থার্ডওয়ার্লেডের রাবিশ মাল ছিল না তো? নৈলে আমি কেন এমন হোঁৎকারাম হলাম?

ওদেরই যতো ভয় খাবার নিয়ে। এই যে ছুঁচালো দাড়িওলা ইয়াঙ্কীর ছবি, আর ইয়াঙ্কী মোরোগের ছবি—এ হলেই বাস্—"নট্-টাচ্‌ড্-বাই-হ্যাণ্ড।" হয়ে গেল। ও খাদ্য একেবারে উর্বশী-মেনকার হাতে চট্‌কানো সিণীর মতো মোক্ষদায়ক।

কী ভীড়। ইয়াঙ্কীদের সিকি জীবন কেটে যায় Q'-এর লাইনে। এই 'Q'-তে পেটে ক্ষিধে নিয়ে দাঁড়ানো ভট্টাচার্যের পক্ষে দুঃসাধ্য। এসে জর্জকে বলি—"চালাও এবং চল মীরা ফ্লরেসের কোনো এক খানদানী ইন্‌কা রেষ্টুরাণ্টে। মাছ খাব, আর খরগোশের মাংস। দেখি, আমার গিন্নীর চেয়েও ঐ দু'টি আইটেম্ ভালো কেউ রাঁধে কি না।"

'মীরা-ফ্লরেস' লীমার শহরতলী। এই কুবেরকল্পিত কানন-ভূমিতে থাকেন দেশ-বিদেশের দূতেরা। ভারতের দূতাবাসও এখানে। আজ যেমন কলকাতা 'হ্যাক থুঃ' হয়ে গেছে, ওদেরও ভয় এই আধা ঔপনিবেশিক, আধা-প্রত্নতাত্ত্বিক লীমা শহর তেমন হয়ে গেছে 'হ্যাক্-থুঃ'। মডার্ণ লাইফের মত করে সমাজ গড়তে হলে "নহে হেথা অন্য কোন খানে।" তাই লীমারই খানিক পশ্চিমে সমুদ্র ঘেঁষে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-ভিত্তিক উপায়ে, সৈকতের রুক্ষতাকে আয়ত্তে এনে এই কুবেরদের উপনিবেশ।

কে বলে লীমা থার্ডওয়ার্লডের কেউ? ঠিক যেন চাণক্যপুরী। সারা শহরটাই যেন পার্কের পর পার্কের কিনারায় বাড়ি গড়েছে। বড় বড় পথগুলো মনে হয় যেন বাগান চিরে চলে গেছে। সে সব কী বাগান, যেন লুক্সেমবুর্গ, ভার্সাই, ফঁতেব্লোর বাগানেরই বড়দিদি।

কিন্তু এখানেও তো জেলেদের, কার-ড্রাইভারদের, প্লাম্বার, হকারদের থাকতে হয়। সে কোথায়? স্বর্গ যেখানে আছে, নরক-কে যে থাকতেই হবে। আর্থিক ঔজ্জ্বল্যের শান-ই তো কন্‌ট্রাষ্ট! কোথায় সব, কোথায় রড্রীগেজ, সেই কনট্রাষ্ট?

রদ্রীগেজ এক ছিমছিমে বাড়িতে নিয়ে এল।

বুড়ো আর বুড়ী। আর বুড়ী যেন রদ্রীগেজের কেউ। ওরা আনুষ্ঠানিক চুম্বন বিনিময় করল। আর গল গল করে কথা বলতে থাকল। তারই মধ্যে বুড়ী ঝটিতি তৎপর হয়ে উঠল। বুড়ো দৌড়ুল সাইকেল-চেপে বাজারে। আমরা বসে গেলাম সদ্য নেংড়ানো এক এক গেলাস পামারাক আর ডালিমের রস নিয়ে। বড় লাল ডালিম এখানে প্রচুর এবং সস্তা। গরীবের খাদ্য পমীগ্রানেট্ আর পামারাক। পামারাক ফলটা আমাদের জামরুলের মতো; ওরা কিন্তু বলে জাম জাতীয়।

সেদিন সত্যই খেলাম রেড ফিশ ভাজা (লাল-রুই বলি কি কলকাতার বাজারে?) আর লেটুশ। চমৎকার জলপাই—তাজা টস্‌টসে। স্যালাদ হিসেবে লুকাট খাওয়া, তুঁতফল খাওয়া সেই প্রথম (এবং হয়ত শেষ)। মাছের পর এলো সুসিদ্ধ ডুমো ডুমো খরগোশের মাংস। মশলা মেখে মজানোই ছিল। একটু হয়ত ষ্টীমে বসিয়েছিল। নরম হতেই চড়া আঁচে ওয়াইনে-তেলে নাড়াচাড়া করে শুখিয়ে দিল।

—[ত্রিনিদাদে দাঁত তুলিয়ে দাঁত বাঁধিয়ে সেই বাহ্যিক দন্ত-শ্রেণী মুখে গুঁজেই বেরিয়েছি। নতুন দাঁতেরও বা যত যন্ত্রণা। যেগুলো তুলিনি তার আরও যন্ত্রণা। (বাড়ির ভাড়াটে তোলা আর দাঁত তোলার মধ্যে যেন যন্ত্রণায় যোগাযোগ মেলে)। বড়ই কষ্ট পেলাম এ যাত্রায়। বেশির ভাগ রস আর স্যুপ বা দুধ-পাঁউরুটীতেই চালাতে হচ্ছিল বাধ্য হয়ে। কিন্তু তা বলে এসব ডিশ কে ছাড়ে? মধু আগে ভাগেই বলে রেখেছিল। ফলে সবই খুব নরম। আমেজী নরম।] বুড়ী আমার চেয়ারে পিঠ ধরে খুব মিষ্টি মিষ্টি করে সব বলল। 'পারিনি বুঝিতে।' জর্জ তথা মধুও ব্যস্ত। রদ্রীগেজ প্রথমে বুড়ীকে কী বল্ল। তারপর আমায় বল্ল যে, আমার দাঁতের কষ্ট শুনে ও খুব যত্ন করে রেঁধেছে। ওর নিজের দাঁতও তোলানো হচ্ছে। তাই মাংসে ভিনিগার দিয়ে মজিয়ে রাখে। বার বার ধন্যবাদ দিলাম। বল্লাম—'আজ পেটভরে খুব খাব। আরবী প্রথায় ঢেঁকুর তোলার পর থামব। এর পরের বার পেরুতে যখন আসবো তখন আবার তুমি দাঁত তুলিও।...”
ওঃ! কী হাসি তখন ওদের!

পাচাকামাক

আমরা চলে গেলাম পাচাকামাক। প্রাচীন পেরুর সূর্য-তীর্থ। বিখ্যাত বন্দর-নগরী। ছিল। এখন মরুভূমি।

পথটা খানিক পরেই একেবারে-উথল-পুথল মরুভূমি। কালো বড়ো দানার বালি। আমি তো নেমে বেশ খানিকটা হাঁটলাম। ওরা নামলো না।

পথের ধারে হলেও বহু দূরে দূরে সারি সারি এবং বহু, প্রায় শ'-দুই আড়াই, আমরা

যাকে বলি দরমার দেওয়াল দেওয়া, ঘর-বাড়ি। সবগুলোই নতুন। সবগুলোতেই লাল ঝাণ্ডা উড়ছে। বসতির সবাই আমাদের চেয়ে দেখছে। কিন্তু সে দৃষ্টির ভেতর নেই অভিনন্দন, নেই অনুসন্ধিৎসা, নেই কৌতূহল। একটা খরা দৃষ্টি, সন্দেহের কালো ছায়ায় ঢাকা। বাচ্চাগুলো সব উদোম ন্যাংটা। শিশু হলেও তারা শিশুতা সরলতা হারিয়েছে। জীবনের নাম সংঘাত। আমাদের দেশেও এতো বড়ো মেয়ে ন্যাংটা ঘোরে না। লজ্জা গরীবের পোষায় না। ধনী ঠাটের ঠাটিনী পাইকিরী নির্লজ্জতার মোরব্বা হয়ে থাকতে উত্তেজিত, সার্থক বোধ করে। সে নির্লজ্জতার দাম গুনতে হয় চড়া হারে।

দূরে ডান ধারে সমুদ্রকে আড়াল করে বড়ো বড়ো স্তূপ—পর পর দশ-বারোটা। শত শত কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধা, আধাবয়সিনীরা স্তূপ ঘাঁটছে, আর সংগ্রহ করে ছোটো ছোটো স্তূপ করছে।

আমি রদ্রীগেজের দিকে চেয়ে বলি,—"এরাই বুঝি মীরা ফ্লরেস গড়ে তুলেছে?"

রদ্রীগেজ গম্ভীর হয়ে বলে, "জীবন দিয়ে; হাত দিয়ে নয়। এরা সব দক্ষিণ থেকে এসেছে। পাহাড় থেকে এসেছে। এদের জীবিকা—চিরকালের জীবিকা ছিলো মাছ ধরা, মাছের সার তৈরী করা। এখন জাপানী, ইয়াঙ্কী কোম্পানীদের বড়ো বড়ো ট্রলার। তারা টন টন মাছ ধরে। আর ক্যালাও বন্দরের আশে-পাশে বড় বড় ফ্যাকটরিতে যান্ত্রিক উপায়ে ঢেলে দেয়। এদের জীবনের ধারাটি ওই পাচাকামাকের বুকে রীমাক নদীর মতোই মিটে গেছে।... ..

"......ওদের একমাত্র উপায় ছিল ঐসব জাহাজে ফ্যাক্টরীতে গিয়ে কাজ নেওয়া। ওরা বলে, 'পেরু থাকবে স্বাধীন ঝাণ্ডা তুলে, আর আমরা হারাবো আমাদের স্বাধীন জীবন ধারা? কভী নেহী। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।'......

"......ওরা দলে দলে শ'য়ে শ'য়ে নেমে এসেছে। লীমা আর পাচাকামাকের মাঝখানের এই পিতৃতীর্থতে জবরদখল করে বসেছে। দূরে দূরে আরও দূরে ঐ পাহাড়ের গায়ে চেয়ে দেখো। কেবল দেখবে লাল ঝাণ্ডা। রাশি রাশি ইঁট গড়ছে, পোড়াচ্ছে। শহর থেকে ট্রাক আসছে। নিয়ে যাচ্ছে। এই ইঁট দিয়ে গেঁথে পাকা বাড়িও করে ফেলছে।...

—'ছাদ নেই কেন কোনো বাড়িতে?'

... .."দরকার কি? রোদ? ঐ চাটাই তো যথেষ্ট। বৃষ্টি? হয় না। চুরি? করবে কে? করবে কি? এই সব বড়ো আবর্জনার ডাঁই থেকেই ওরা অনেক কিছু পায়। ইণ্ডাস্ট্রী, বিশেষ জাপানী ইণ্ডাস্ট্রীতে রীসাইক্লিং তো একটা দামী সম্মানিত উপায়। কাগজেপত্রে সংবাদ সাজিয়ে লিখে জানায়, দেশের উন্নতি হচ্ছে। আবর্জনাও কাজে লাগছে। এ প্রশ্ন কেউ করছে না, আবর্জনা করছে কারা? সরানোতে কাদের স্বার্থ? রীসাইক্লিং করছে কারা? সেই ইণ্ডাস্ট্রী কার? এর মধ্যে দেশ কই? মানুষ কই? আমি কই? এরা কই? আবর্জনা এদের সৃষ্টি নয়। আবর্জনার মতো অপচয় ও

উদ্বৃত্তির সাধ্যই এদের নেই ; আবর্জনা না তুললে, না সরালে এদের কোনো ক্ষতি নেই। অথচ তুলে জড়ো করা হচ্ছে এককালের পিতৃভূমিতে, তীর্থস্থানে। ঐ যে বালিয়াড়ীটা দেখছো, ঐ যে পথ চড়াই চড়ে সোজা বেরিয়ে গেছে, ঐ তো পাচাকামাকের পথ। ইন্‌কা পথ। হাঁটা পথ, যা ইন্‌কারাই গড়েছিল। পেরু সভ্যতার প্রাচীনতম পথ। সোজা পাচাকামাককে চিরে চলে গেছে—শহরের ওপার হয়ে আরও দূরে।

"এরই পাশে আবর্জনা! ওরাও এখানে আড্ডা গেড়েছে। আর এমনভাবে গেড়েছে যে, ঐ পাহাড় ধরে ধরে ক্রমশঃ পূবে সেই পিউনো, তিতিকাকা, জুনীন, আয়াকুচো, কুজকো, একুইতস্, আরেকুইপা ধরে আমাজোনের জঙ্গল ধরে সারি সারি, পর পর বেশ স্থায়ীভাবেই এই লাল ঝাণ্ডার বসতি পাবে।......

"......কাল যাবো পেরুর সেরা বন্দর ক্যালাও। এখন ক্যালাও সামরিক অনুশাসনের কব্জার মধ্যে পড়ে গেছে। পরপর দু'টো গোলমাল হয়েও গেছে। ক্যালাওতে ইয়াঙ্কী স্বার্থ প্রখরভাবে সুরক্ষিত। গিয়ে দেখবে কতো জাহাজ, ম্যান-অব-ওয়ার, স্কুনার, হোয়েলার, ক্যাটামারান্ থেকে সাবমেরিন, ফ্রিগেট, ডেষ্ট্রয়ার, ক্রুজার, এয়ার ক্র্যাফ্ট-কেরিয়ার—কতো দেখবে। কিন্তু কেন? পেরুর শত্রু কে? কার বিপক্ষে কাকে রক্ষা কে করছে? এরা বলছে,—'দয়া করে আমাদের রক্ষা করার খেল্-টা থামাও।' এরা জানে, পেরুর ভবিষ্যৎ এই দরমার বাড়ি, ছাদহীন, ভিত্তিহীন বাড়িগুলোতেই লেখা হচ্ছে। কিন্তু এ সমুদ্রেও 'মাইন,' শ্রেষ্ঠ দেমক্রাসীর মাইন।......"

গাড়ি এগিয়ে চলে।

মন আরও দ্রুত এগোয়।

দেশ দেখতে এসেছি। এসব কি দেখছি? কেন আমি টুরিষ্ট হতে পারছি না? কেন বার বার মানুষ, সামান্য 'মানুষ' হয়ে যাচ্ছি? ইতিহাস যেন রাক্ষসী। ছায়া ফেলেও গিলতে চায়। সঙ্গ ছাড়ে না।

পাচাকামাকে এখন মস্ত বড়ো একটা প্রত্নতত্ত্বের আফিস। চারধারে আঁট-সাঁট বেড়া। সান্ত্রী পাহারা। সোজা পথ যে-টা সমুদ্র তীরের লাগাও বরাবর আসছিল, বরাবর ভিতরে চলে গেছে, সোজাই ; কিন্তু বেড়ার ধার পর্যন্ত এসে পথটা থেকে অন্যপথ ডান-হাতি বাঁক নিয়ে ঘুরে বাঁ-হাত হয়ে গেট দিয়ে ঢুকল। সামনেই আফিস। কোন টিকিট নেই। আফিস পার করে একটু হাঁটলে দু'টি পাশা-পাশি মিউজিয়াম। পাচাকামাক খনন করার ফলে যা' পাওয়া গেছে সেই সব স্মৃতি।

বহু জিনিষ। বোঝা যায় সেই প্রথম (১৫৩৩), যেদিন স্পেনের দস্যুরা এই বহুনন্দিত মন্দির নগরের অঙ্গ অঙ্গ বলাৎকারের রক্ত অবলেপে অপসিক্ত করেছিলো, পেরুর কুমারী ললাটে প্রথম এঁকে দিয়েছিলো জঘন্য উদ্দামতার বিষণ্ণ তিলক,—সেদিন এই চিরশান্ত নগরীর কোনো আয়োজন, কোনো সাধ্য ছিলো না আততায়ী নেকড়েদের রোখে, তাড়ায়, শেষ করে দেয়। এরা যোদ্ধজাতি ছিলো না। এরা মূলতঃ কৃষক, বৈশ্য, ধর্মভীরু, প্রকৃতির সন্তান। সেদিন অবাধ অগ্নিদাহ, ধর্ষণ, লুট-পাট, হত্যা চলেছিল। কিন্তু

বহু ক্ষতির পরেও পাচাকামাক বলতে পেরেছিল, 'সব গেছে যাক, মন্দির আছে, দেবতা আছেন, আমরা আছি।……'

সেই মন্দির নিঃশেষ হয়ে গেল। পিজারোর সোনা চাই, সোনা। আবিষ্কার, বীরত্ব, শৌর্য, হিরোইজ্‌ম্,—বাজে কথা। দস্যু। তার একটিই 'ন্যায়, যুক্তি',—চাই, চাই, সোনা চাই!

চললো লুঠ! অবাধ লুঠ!!

সে লুঠের অংশ পিজারোও পেয়েছিল।

কিন্তু পিজারো আসছে, কেন আসছে, জানতে পেরে প্রধান পুরোহিত প্রস্তুত হলেন। নাঃ! দেবতার কল্লে জনতার ওপর অত্যাচার সহন করা যাবে না। এরা দস্যু (মনে রাখতে হবে, পেরুতে স্পেন—সমগ্র ইন্‌কা সমাজে তালা, দোর, আবরণ বলতে কিছু ছিল না। মেয়েদের জন্য পাহারা ছিল না। মনে রাখতে হবে, কী পুরুষ, কী মেয়ের পরণে থাকতো ঘুন্‌সী বা বেণ্টে এ-পার ওপার লটকানো ভাঁজ করা একফালি তুলোর কাপড়—কৌপীনের মতো। সম্রাটও তাই, সেনাধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষরাও তাই। উর্ধ্বাঙ্গে পোঞ্চোরই রকমফের। অর্থাৎ এদের দেহাবরণও ছিল শুধুই সীমিত বলতে যতটুকু বোঝা যায়।) এরা লুঠ জানতো না। সোনা-র আকর্ষণী প্রলোভনকে জানত না।

"সুতরাং এদের প্রতিপক্ষ করে যে কোনো রাম-খেল-তিলক সিংই মহা হার্কুলেস বলে মান্য পেতে পারত। পেরেও-ছে। ডনকি হোতে-কে বাতাসে চলা মিলের পাখনাগুলোও যেটুকু বাধা দিতে পেরেছিল, এরা তো সেটুকু বাধাও দিতে জানত না। এরা হাতে বল্লম (ছোটো, বড়ো), বড়-ছোটো গুলতি আর ছোটো ছোটো তারা মার্কা বা দাল-নাড়ার বা দই মথনীর মতো পাথরের চাকতি বাঁধা হাতিয়ার ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্রের কথা জানতো না। বন্দুক তো দূরের কথা—তীর-ধনুকেরও চল ছিলো না। কারণ তেমন অসম বাহুবলী শত্রুও ছিল না।

"পুরোহিত জনতাকে বললেন, সব ধন-রত্ন যে-যার সরিয়ে ফেলো—পুঁতে ফেলো, পালাও। খাদ্য, জল শেষ করে পালাও।" আর তিনি নিজে রইলেন দেবতার মন্দির আগলে।

"পিজারো তখন ইন্‌কার রাজধানী কুজকো-জয়ে চলেছে। সে যখন শুনলো এই পাচাকামাকের কথা—দেখলো এর স্বর্ণ-ভাণ্ডার এবং আরও শুনলো এই পাচাকামাক মন্দির নগরীর সূর্য-মন্দিরের অপরিমিত ঐশ্বর্যের কথা, ভাই ফার্ণান্দো পিজারোকে বললেন, 'কুজকো যাওয়ার আগে পাচাকামাক ধ্বংস করা হোক।'

"পাচাকামাক দেবী মন্দির। বলি হোতো। তবু ইন্‌কা সম্রাট এ মন্দিরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিয়মিত পূজা পাঠাতেন। পাচকামাকের উৎসব জাতীয় উৎসব বলে পরিগণিত হ'তো।

"ফার্ণান্দো পিজারো দাদার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করলেন। লুঠ হোল মন্দির। ধ্বংস হোল বিগ্রহ। কিন্তু সোনা?

"ফার্ণান্দো পিজারো প্রথমেই সেই দেবতাকে ধূলিসাৎ করে তা'র গায়ের সব সোনা ছিঁড়ে নিলেন। সোনায় সোনায় ভরে গেল লামাদের পিঠের বস্তা। চষে ফেল্লেন মন্দির। সুন্দর সুঠাম একটি নগরী। পৃথিবী থেকে মুছে গেল। লাভ হোল সোনা কিছু।

"এই পাচাকামাক ছিলেন চাষীদের সেই সূর্য। যাঁর মহিমার কাছে চাষীরা ছিল সর্বদাই ঋণী। এ ছিলেন সেই সূর্য যাঁর পায়ে সমুদ্র পার থেকে যারা এসে এদেশে বসতি করেছিল, তারা সবাই নিবেদন করেছিল তাদের সকৃতজ্ঞ প্রণাম। যেদিন নরওয়েজিয়ান হেইয়েদাল 'কোন-টিকি'তে চেপে এই কালে আমাদের চোখের ওপর পশ্চিম পার থেকে পূর্ব পার প্রশান্ত মহাসাগর পেরুলেন, সে দিনও কেউ মানলো না যে, ওপার ওসেনিয়া থেকে এপার দক্ষিণ আমেরিকায় আসা যায়। যা ইউরোপ এবং 'তাদের মানা' বিজ্ঞান পারে না, তা' যেন কেউ পারে না।—কিন্তু যায়—পারা গেছে। এর অন্ততঃ দশ-বারোটা প্রমাণ আমিই দিতে পারব। তোমাদের স্কলার্লি-জ্ঞানের বাইবেল ঐ আমেরিকান পি. এইচ্. ডিও তা'বলেছেন। সে কথাও পরে বলব।

"তবে, দু'টি কথা এখনই বলি, ঐ সূর্যের নাম ছিলো কোরিকাঞ্চা ; এটিও যেমন, হেইয়েদালের নেওয়া 'কোন্-টিকি' নামটিও তেমন। হেইয়েদাল বাল্সা কাঠ আর তিতিকাকার খড় দিয়ে জাহাজ গড়ে নাম দিলেন 'কোন্-টিকি'। সেই 'কোন্-টিকি' ভাসিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, পেরুর আদি মানব এশিয়ারই মানুষ। 'কোন্-টিকি' দেবতা। কোরিকাঞ্চাও অন্য দেবতা। কিন্তু হুবহু দু'টি নামই সূর্যের নাম, দেবতার নাম হিসাবেই দুই তীরেই চালু। আমাদের মন্দিরের ওবেলিস্ক দেখো, আর গিলবার্ট, সামোয়া, টোংগা প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ-গুলোর 'এক-পাথুরে' জগদ্দল মূর্তিগুলো দেখো। নাঃ, পরে বলবো। তোমার এত করে এই সব প্রমাণ শুনিয়ে লাভই বা কি ? ·· বুড়ো বয়সে বকা এক স্বভাব··· ।

"···দেবতা ধূলিসাৎ হোল। পিজারো ধনও পেল। কিন্তু পিজারো আসার ভয়েই নগরবাসীরা তা'দের বেশীরভাগ ধন পুঁতে ফেল্ল। নাগরিকরাও তাদের সম্পত্তি সব মাটির তলায় ভরে রাখল।

"ভাগ্যি রেখেছিল !"

পাচাকামাকে এখন যে খোদাই চলছে তা'র ফলশ্রুতি হিসেবে বহু জিনিষ, লক্ষাধিক, পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে প্রমাণ যে, এখানকার প্রাচীনতম মৃত্তিকা ভাণ্ড অতি সুগঠিত হলেও সেটাও কিন্তু প্রারম্ভিক নয়। সে পাত্র এবং তার গায়ের কাজ অঙ্কনের সাথে দক্ষিণ সমুদ্রের পলিনেশিয়ান দ্বীপ কৃষ্টির বহু মিল।

বেশীর ভাগ জিনিষই অন্যান্য মিউজিয়মে গেছে। তবু এখানেও যথেষ্ট নিদর্শন আছে।

দেখছি পাচাকামাক মুজিয়ম।

সেই কবেকার (১৩শ' শতাব্দীর) তুলোর কাপড়। ১৬শ' শতাব্দীর 'কুইপুস'। পাচাকামাকে আলাদা 'কুইপুস-হাউস'-ই আছে। কুইপুস্ কিছু না; গেরো বাঁধা দড়ি। এক রঙ্গাও, আবার এক খোকায় নানা রঙ্গেরও। ইন্‌কাদের লিপি ছিলো না। ছবি-লেখা ছিলো। কিন্তু তাও খুব শালীন পোখ্‌তো নয়। অথচ শাসন ব্যবস্থায় খবর আদান-প্রদানের কাজ করতেই হোত। কিন্তু পাথরের লেখ বা ছবি-লেখ সে সব কাজে অব্যবহার্য। তাই এই 'কুইপুস্'। ঐ রং এবং গেরো মিলিয়ে খবর 'পড়া' যেত। আবার জানা গেছে যে, এ ধরনের গ্রন্থী-লিপি এশিয়ার চীন-তিব্বত ভূখণ্ডের আদিবাসীরাও ব্যবহার করত। এখন এ 'লিখন' পড়ার মতো পণ্ডিত নেই। এখানেও নেই, সেই এশিয়ার তল্লাটেও বিরল। এশিয়ার সঙ্গে সংযোগের কি 'একটা' প্রমাণ?

ইন্‌কা-রা মেয়ে-পুরুষ, আসলে পাট করা তুলোর নেংটী মতো পরতো পায়ের ফাঁক দিয়ে নিয়ে পেটে জড়িয়ে। তার ওপর অঙ্গ-রাখার মতো টুকরো পিঠের দিকে ঝুলিয়ে দিতো, তা'র দুটি প্রান্ত বুকের কাছে এনে কাঁটা বা গোঁজ দিয়ে গেঁথে রাখত। সেই কাঁটা তৈরী হোতো কাঠ, হাড়, তামা, রূপো বা সোনা দিয়ে—কতো বিচিত্র কারিগরী প্রকাশ থাকত তা'তে। সেই সব কাঁটা, চিরুণী, আংটী, বালার সারি। দু'হাজার বছরের পুরোনো লুরিগ-পাচাকামাক লীমা তল্লাটে হাঁড়ি-কুঁড়ি, খেলার সরঞ্জাম পাথরের কাঠের খেলার-ঘুঁটি, কাঠের মূর্তি, বেড়াল মুখো মানুষ, সাপ নানা ভঙ্গীতে। ওরই মধ্যে একটি মূল্যবান সংগ্রহ প্রাচীন এক পুরাণের অংশ; পাচাকামাক দেবীর স্তুতি এবং পাচাকামাক দেবী-মন্দিরের চৌকাঠ।

দ্বিতীয় ঘরটিতে বড়ো বড়ো জালা, বোধ করি মন্দিরের শস্য ভাণ্ডার ওতে থাকত। পাচাকামাকের একটি মানচিত্র, মন্দিরের ইতিহাসের উত্থান পতনের চার্ট। লিফ্‌তিকো, মোচার্ডেরো, তিয়ানা প্রভৃতি লঘু কৃষ্টির কিছু কিছু শিল্পিক চয়ন, পূজার বাসন, মন্দিরের বেদীর অংশ, হামান-দিস্তা, চন্দনবাটী, শিল, ঠাকুরের আসন, যূপকাষ্ঠ, কাঠের চমস, স্রুক-স্রুব—বেশির ভাগ সব পূজার ব্যাপার। বোঝা যায় হোম হোতো,—তা' যে ভাবেই হোক, যে মন্ত্রেই হোক, এবং মাংসের হবিটার যাথার্থের ওপর কোনো বৌদ্ধ প্রলেপের আড় পড়েনি।

বহির্দ্বারে এলাম। বিস্তীর্ণ ভূভাগ। এখন বালি ঢাকা। উঁচিয়ে আছে মন্দিরের পৈঠা বলো, বেদী বলো (য়োরোপীয়ানদের মতো পিরামিড বোলো না)। পাঁচিলের চিহ্ন আছে। সেই আদোবের-ই (কাঁচা ইটের) পাঁচিল। মন্দির পীঠের ভগ্নাংশ বাদ দিলে পাশাপাশি অনেক ঘরের চিহ্ন বিদ্যমান।

১৯৫৮তে ডঃ আর্তুরো হিমানেজ্ বোর্জা এটি খনন আরম্ভ করেন। মন্দিরই ছিল অভিভাবক, শাসন কর্তা, কর গ্রহিতা। বাজার-হাট, ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দিরের তদ্বিরে। মন্দির সংস্কৃতি ও তপোবন সংস্কৃতির এটাই প্রভেদ।

সংস্কৃতির নাড়ী কাটার প্রাক্‌কালীন দিনে দেবতার দুনিয়ার কারবার করতেন

পুরোহিৎনী। ক্রমে আলস্যের তোয়াজে দুর্ভাগিনী পুরোহিৎনী দায় চাপিয়ে দিলেন পুরোহিতকে। ফলে, আরও পরে পুরোহিতই হলেন রাজা। তারও পরে এলেন রাজার প্রতিভূ পুরোহিত। এই পৌরহিত্যের সর্বেসর্বা আমলে মন্দির নগরের আধিপত্য এল। পুরুৎ-নীরা চিরকালের তখত্‌ হারিয়ে সংসার ধর্মে বন্দিনী হয়ে গেলেন!

ব্যাবিলনেও এই সংস্কৃতির প্রবল প্রতাপ ছিলো। উর, নিনেভা, গুড়িয়া থেকে ব্যাবিলন, কিশ্‌, নিমরূপ পর্যন্ত ছিল এই মন্দির প্রধান সংস্কৃতি। মিশরে সাতবাহন, চোল-চালুক্য-পাণ্ড্য-পল্লব কৃষ্টিতে, বা বরভূধর, আঙ্কোর প্রভৃতি কৃষ্টিতেও মন্দিরের প্রাধান্য থাকলেও মন্দিরের প্রধান ছিলেন রাজা। পুরোহিত রাজ-প্রতিভূ। এখানে তা নয়। দেবতা নিজেই রাজ্যের ভাগ্য বিধাতা। ইনকা সম্রাটও মন্দিরেরই প্রতিভূ হয়ে রাজ্য চালাতেন। তফাৎ থাকত। দেবতার রাজত্বে মোটামুটী সমাজবাদী ব্যবস্থাই থাকত।

গরীবী ছিলো না। মানুষ না খেয়ে মরত না। কিন্তু সম্রাট এলেই গণ্য-মান্য, সামন্ত, সর্দার, ধনী, শ্রেষ্ঠী এসব পদস্থাতা আসত। তবু তত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, পেরুতে প্রাক-স্পেন শাসনের ফলে সমাজে সকলেই থাকতে, পরতে, খেতে, শুতে পেতো। অলস ও ভিক্ষোপজীবীকে সকলেই ঘৃণার চক্ষে দেখত। "গরীবী থাকলেও গরীব শ্রেণী ছিল না। গরীবী থাকলেও এখনকার এই হাড়ির হাল, গরীবীতে মানুষ যেমন পোকা-মাকড় কৃমির মতো ঘৃণায়, অবহেলায়, মড়ার বাড়া হয়ে আছে, এমনটা গরীবী ইন্‌কা শাসনে ছিল না,"—বলেছেন পেরুতত্ত্ববিদ্‌ ইয়াঙ্কী পণ্ডিত জন ম্যাসন্‌।

তাউরি চুস্বী প্যালেস একটি চৌকো ধ্বংসাবশেষ। এ প্যালেসে হার্নান্দো পিজারো বাস করার ফলে কিছু কিছু স্প্যানিশ জিনিষ পাওয়া গেছে।

এ-দিক ও-দিক বহু বাড়ি-ঘর-দোরের নিশানা। কতো বড়োই ছিল এই পাচাকামাক। দিগন্ত বিস্তৃত সেই ইন্‌কা-পথ, যেটা আমরা প্রথম গাড়ি চালাতে চালাতেই সেই মরুভূমি থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম। তার ওপর দিয়েই তো এলাম—উত্তর-দক্ষিণে সোজা শহর চিরে চলে গেছে। বিশাল সে পথ। প্রসিদ্ধ ইন্‌কা-পথ।

মাঝামাঝি মন্দিরের সামনে দিয়ে এক পথ। এই দু'টি পথকে মধ্যমণি রেখে মন্দির ও শহরের নানা পথ। এ জাতীয় বর্কীকাট্‌ নগর স্থাপত্য স্পেনের ওরা এই ইন্‌কাদের কাছে শিখে ইউরোপে নিয়ে গিয়েছে। এখন বলে 'ব্লক'। মার্কিন মুলুকের শহরগুলি এইব্লকে'র সমষ্টি।

দেখলাম সেই মূর্তি। কাঠের একটি স্তম্ভ। হাত-পা নেই। (মনে কি পড়ছে—সমুদ্রে ভেসে আসা নিমকাঠের জগন্নাথ?) উচ্চতায় নয় থেকে দশ ফুট। মাটীতে (বেদীতে) গেঁথে বসানো থাকত। দু'ধারে দু'টো মুখ—ভূত-ভবিষ্যৎ দেখত। অবশ্যই ভবিষ্যদ্বাণী করতে সুবিধা হোতো। (আমাদের ব্রহ্মার চার মুখ আরও কার্যকরী অবশ্য)। সৃষ্টি-প্রলয় প্রভৃতি জৈবিক সংসারের বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বতার প্রতীক এ দেবতার ব্যঞ্জনাময় আবেদন পরে সারা ইন্‌কা সাম্রাজ্যে মানুষের মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চেয়ে চেয়ে দেখছি। কেমন একটা বিষণ্ণতার আবেশ এসে যায়। কোনারকের

গর্ভগৃহের বেদীতে একদা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিলাম প্রতাপরুদ্র-ইন্দ্রদ্যুম্নের কালের ভক্তির স্পর্শ। গাইড বলেছিলো, 'আসল মূর্তিটি কলিকাতার মিউজিয়মে আছে।' কলকাতায় গেলাম। গাইড বললো, 'দিল্লীর মিউজিয়মে আছে। দিল্লীতে এখন বার বার সেই মূর্তি দেখতে যাই।—কী পাই? পাথর পাই। আর্টও পাই। কিন্তু যে আত্যন্তিকী ভক্তির প্রবাহে এ মূর্তি একদা অভিষিক্ত হোত, সেই ভক্তির স্পন্দন কই? কাশ্মীরের মার্তণ্ড স্বামীর সূর্য মূর্তিও আছে শ্রীনগরে (ছিল; এখন দিল্লীতে)। তাতে ভক্তের কি আসে যায়?

কিন্তু দিল্লীতে বহুবাহু মূর্তির মধ্যে এ-ও একটি মূর্তি। কসায়ের দোকানে যেমন ঝুলন্ত সব কাটা পাঁঠাই ব্যক্তিসত্ত্বা হারিয়ে কেবল মাংস হয়ে যায়, তেমনি মিউজিয়মের বাতাবরণে, পারিপার্শ্বিকে, গবেষণাসুলভ নৈর্বক্তিকতায় ঠাণ্ডা অবহেলার মধ্যে যা ছিল মূর্তি তা' হয়ে গেছে পাথর, শিল্প; এবং ভাবি—যখন মাইকেল এঙ্গেলো রূঢ় এক একটা প্রাণহীন পাথরের চাঁই কেটে গড়েছিলেন পিয়েতা, দাভিদ, তখন কি তিনি ভেবেছিলেন এটা পাথর? প্রাণহীন? বিজ্ঞান? শিল্প? তিনি কি স্পন্দিত হননি? সে স্পন্দনের অনুরণন পাননি? দিনের পর দিন সেণ্ট ক্যাথারিন, সেণ্ট থেরেসা, সেণ্ট এ্যাগনিস্ কি শুধু একটা আর্ট-সৃষ্টির পায়েই সম্পূর্ণ কৌমার্য-যৌবন-নারীত্ব-লোভ-পিপাসা আহুতি দিয়েছিলেন?

বিষণ্ণ হয়ে যাই, যখন রড্রীগেজ বলে—"এই সেই মূর্তি",—যখন মধু জিজ্ঞাসা করে—"কী কাঠ?"

আমি ভাবি প্রাণ! প্রাণ কই? প্রাণ নৈলে কী বা মূর্তি, কী বা তার প্রতিষ্ঠা, কী বা তার পূজা!

প্রাণো বৈ সঃ। পর পর কৌষীতকীর বেদগাথটি মনে পড়ে যায়।

ওয়ারী নামক যুগের পরে পেরুর দলিলে পাচাকামাক বাণী-তীর্থের খুব নাম ডাক। শহর নাম ডাকেরই ছিলো। বহুপথ। বহু সেতুবদ্ধ পথ। আজ শহরটি চোখে পড়ে; এখনও দেখতে পাই সেই বিধ্বংসের দিন-রাত্রি। সেই দশ হাজার 'ভারবাহী মানুষের' এক বিমর্ষ শোভাযাত্রা দেখতে পাচ্ছি; প্রত্যেকের পিঠে সোনা-রূপোর ভার। ওরা যাবে কাজামার্কার বন্দরে। জাহাজে তুলে দেবে সোনা। ক্যাস্টিলের রাজদরবারে দেখতে দেখতে খ্যাতি ছড়াবে স্পেনের হামলাবাজরা কেমন প্যাগানদের পাদ্রী বানাবার পুণ্য কর্মে আত্মদান করেছে! দেখতে পাই, ঘোড়সওয়াররা চাবকাচ্ছে মানুষগুলোকে। কোনোদিন কেউ ওদের শারীরিক পেষণ করেনি। সেই ওরা আজ পশুর মতো ভার বয়ে চলেছে। ওরা মা-মেয়ে, ছেলে-বুড়ো দেবতার অপমানে, পুরোহিতের নির্দেশে মাথা নীচু করে চলেছে। দেখতে পাচ্ছি। দিগন্তে পথ মিশেছে। কিন্তু সেই মানুষগুলোকে আমি দেখতে পাচ্ছি সোনার ধুলো হয়ে পশ্চিম আকাশে মিশে যাচ্ছে। তাদের শপথ—'তারা করবে না আর্তনাদ। চাবুকের ঘায়ে যন্ত্রণা ব্যক্ত করে জল্লাদের তৃপ্তি সাধন করবে না।' করেনি। স্পানিয়ার্ডদের বিস্ময়!'

এও জানি, সে সোনা স্পেনের দরবার অবধি পৌঁছায়নি। চোরের সামগ্রী বাটপাড়রা পুরোপুরি পায় না। ক্যাষ্টিলের রাজকোষ খবর দিলো—মাত্র সাতাশ পোঁটলা সোনা এবং দু'হাজার রূপোর মুদ্রার মতো রূপো জমা পড়েছিল। এবং তা নিয়ে চোরে ও বাটপাড়ে যে তুমুল কাজিয়াও হয়েছিল, তার গরমে ইতিহাসের বেশ কয়েকটা পাতা কালো আর লাল হয়ে আছে।

শহরের চৌরাস্তায় প্রায় পনেরোটি মন্দিরের বেদী পড়ে আছে। হায় বেদী! পাশে রাশি রাশি দেওয়াল ভাঙ্গন, ধুলো—এবং আরও রাশি রাশি নিঃস্তব্ধতা। আকাশের তলায় পড়ে আছে রাশি রাশি বোবা চিৎকার। দু'টোয় মিলে এক দারুণ কোলাহল আমার মানস-লোককে আচ্ছন্ন করে দেয়। মনে হয় ঐতিহাসিক সত্য,—কালেরই পদক্ষেপ। তার প্রতিধ্বনি আমায় ক্লান্ত বিবশ করে দিতে লাগল। মনে হোল, সেই যে কবে এখানে কারা ক্ষেত-খামারী সোনা-সংসারী দেবতা মানুষের মেলামেশা জীবন যাপন করত, তাদের যা'রা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল—তারা কী আজ তৃপ্ত? প্রসন্ন? তারা কি পেয়েছে অভয়দ অমিতাভ সেই কুমারী মাতার সুকুমার সন্তানের দক্ষিণ হাতের পুষ্পদল? তারা কি গেয়েছিল 'এবাইড্ উইথ মী'! বলেছিল; "তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছো ভালো"? কোথায় গেলো 'গ্যালিয়ন' বোঝাই করা সেই রূপো সোনার অন্তহীন চোরাই মালের ভাণ্ডার? সেই রাজদরবারের দাপট? গিয়েছিলাম স্পেনে। স্পেন বেশ গরীব দেশ!

ইতিহাস! মহাকালের ডম্বরুধ্বনি ইতিহাস। মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে না থাকলে তুমি দম্ভ, দর্প হিংসা, লোভ, তস্করতা, অশুচি বলাৎকার, অশুভ ধ্বংস।

পাদ্রীরা নেই। রড্রিগেজ আছে। বোঝাচ্ছে—কোন বাড়ি মানুষের, কোন বাড়ি জনের, কোন বাড়ি গণের, কোন বাড়ি দেশের। তাই পরিসরে কেউ ছোট, কেউ বা বড়ো। সব থাম নেই। এ যা' দেখছো প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গড়ে প্লাস্টার করেছে। কোথাও কোথ ও রং করেছে। বাকিটা কল্পনায় দেখে। এরমধ্যে ছেঁড়া পার্চমেন্টে বিস্তৃত কাহিনী অনাবিষ্কৃত অক্ষর-লেখে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পাওয়া গেছে রান্নাঘর থেকে লঙ্কামরিচ, ভুট্টার দানা, শিমের বীজ; ভাগাড়ে পাওয়া গেছে পাখির পালক, ডিমের খোসা, কুমারী মেয়ের চুল, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভাঙ্গা পুতুল। আর বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরীতে পাওয়া গেছে রুটীর উনুন, রংয়ের ভাটি, ভাজার কড়া, তেলের দাগ, বন-ভেষজ ওষধি, সেদ্ধ করে ওষুধ করার কারখানা। পাওয়া গেছে একটি নারীর বক্ষে জাপটে ধরে থাকা এক কিশোরীর কংকাল! একটি শিশুর কঙ্কালের সংলগ্ন একটি কাঠ-বেড়ালীর কঙ্কাল। কাঠ-বেড়ালীটা শিশুর প্রিয় ছিলো বোধ করি।

মন্দিরগুলোর ভেতরের পূজার বেদী দেওয়ালের এপার-ওপার ব্যাপ্ত। সমতল থেকে খানিক খানিক অঙ্গন বাদ দিয়ে এক এক ধাপ উঠছে। এক দুই তিন চার পাঁচ ধাপ অবধি উঠছে। ধাপে-ধাপে চার-পাঁচ ধাপ ছোটো মাপের সিঁড়ি—কখনও একপাশে, কখনো দু'পাশে। মাঝখানটায় একটা ঢালু সমানভাবে গাঁথা, ভারী জিনিষ টেনে, গড়িয়ে

নামানো ওঠানো যায়। শেষধাপে পুরো ঘর জোড়া বেদী। তার ওপরে সাজান আরোও বেদী। তার ওপরে থাকত সিংহাসন, মঞ্চ। তার উপরে ঠাকুর। এই বেদীগুলো সবই দক্ষিণদিকে, অর্থাৎ উত্তর-মুখো হয়ে পূজা করার বিধি ছিল।

আমাদের সঙ্গে মিল! কতো মিল বলবো?

এ প্যালেস্‌টায় নাকি ইন্‌কা সম্রাট "তৌরী চাষী" এসে থাকতেন মাঝে মধ্যে। প্যালেসে কিন্তু ছাদ, দেওয়াল কিছু নেই। বৃষ্টি নেহাৎ হয় না। তাই কাঁচা মাটি, কাঁচা দেওয়াল, কাঁচা ইঁট সত্বেও এই স্থাপত্য কঙ্কালগুলো আজও আছে।

মন্দিরের সামনে বাজার-চত্বর। ৩২০০০ মিটার স্কয়ার-এর চারধারে স্তম্ভ ছিল বেশ বোঝা যায়। ভক্ত সমাবেশের হেন ব্যবস্থা আমি দেখেছি বায়নে, আঙ্কর ওয়াৎ-এ; এবং আমার ধারণা সারা পেরুতে গির্জার সামনে বিশাল চত্বর রাখার পরিকল্পনার জন্য ক্যাষ্টিল বাচ্চাকে মাদ্রিদ, লিস্‌বোঁয়া বা ভ্যালেন্‌সিয়ায় দৌড়ুতে হয়নি। অন্ততঃ মাদ্রিদে বা তোলেদোতে এই ঢালাও ব্যবস্থা আমি দেখিনি। নতার্দেমের সামনে যে ফাঁকা সেটা এদের তুলনায় নজেঞ্চুষ।

সূর্য মন্দিরটির বেদীটি (পিরামিড বলে) পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর কীর্তি। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর সারাঙ্গা-কৃষ্টির চিহ্ন এখানে আছে।

বেদীতে অনেক ধাপ। প্রতিটি ধাপই বেশ উঁচু। এবং আশ্চর্য,—কালের অবক্ষেহ অতিক্রম করেও এখনও কোনো কোনো অংশের দেওয়ালে শাদা চুনের প্লাষ্টার পাওয়া যায়, দেখা যায় ঝিনুক, শঙ্খ পোড়ানো সেই চুনের সঙ্গে রং ঢেলে কতো বিচিত্র চিত্রকল্পের সৃষ্টি। এই বেদীটি এ তল্লাটের সবার বড়ো. সবার উঁচু, সবার বেশী সম্পূর্ণ।

এ মন্দিরের পর এবং এর সংলগ্ন মামাকুনাম্‌ এক্লওয়াসী-র প্যালেস। এটি একটি বিশাল বিদ্যালয়। মেয়েদের বিদ্যালয়। সারাদেশ থেকে দান আসতো সূর্যমন্দিরে কন্যকাদের জন্য। তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, রহন-সহন, সোহবৎ-সৌজন্য, মন্ত্র-বিদ্যা-সাধনা-সেবা, শিল্প-কারু-বয়ন সব কিছুই শেখানো হোত। এরা প্রায় অসূর্যম্পশ্যা না হলেও নিষিদ্ধা অঙ্গনা। একমাত্র ইন্‌কা নিজে এরই মধ্যে নারীশ্রেষ্ঠাদের নিয়ে যেতেন অন্যান্য মন্দিরে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে, কখনও কখনও শয্যা-সঙ্গিনী করেও। তখন তার মান ও প্রতিপত্তি হোতো রাজ্ঞী ও মহিষী প্রধানারও ওপর। কিন্তু এরা চিরকাল রাজভোগের কিঙ্করী হয়ে থাকত না। এরা গর্ভ-ধারণ করত না। এদের জন্য এদেরই বাছা জায়গায় কোনো ভাগ্যবান গ্রামে প্রাসাদ নির্মিত হোত। সেখানে সখী পরিবৃতা হয়ে তাঁরা স্বচ্ছল ও শিল্পিত জীবন যাপন করতেন। গ্রামের ও দেশের শিক্ষায় ভাগ নিতেন।

কিন্তু তাঁদের বিপক্ষে কোনো যৌন অনাচারের কথা জানাজানি ও প্রমাণিত হ'লে তাঁদের হোতো জীবন্ত কবর। প্রাচীরে গেঁথে ফেলা হোত। এবং গ্রামকে গ্রাম উচ্ছেদ করে চষে ফেলা হোত।

এখনও মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন দেওয়ালের মধ্যে কোন নারী-কঙ্কাল পাওয়া যায়। পাওয়া যায় বালুর গর্ভে নদীর ধারে সদ্যোজাতদের ভাষাহীন করোটী। তারা

প্রশ্ন করে এ পৃথিবীর সুধায় বঞ্চিত করে কোন্ ভগবানের ইষ্ট সাধন করেছিলে, হে ভক্তজন ?

লীমা-(২)

বড় ক্লান্ত। সোজা ফিরে এসে ক্রিলঁর রেষ্টুরান্টে বসে চা-কফি চল্লো। রোদ্রীগেজ বিদায় নিল। একটু পরে একটা ওষুধের টিউব এনে দিল। "রাতে দাঁতে লাগিয়ে শুয়ো। বিদেশে সফর করতে এলে সত্ত দাঁত তুলে। তুমি পিজারোর চেয়েও বড় বীর" —বলে সে চলে গেল।

চমৎকার মানুষটা। ভারী সুন্দর মন। পণ্ডিত।

আমি লিফ্‌টে চড়ে ঘরে এসে বাথ-রুমের টবটায় গরম জল ভরতে দিলুম। ঢেলে দিলুম তিন-চার খাবলা বাথ সল্টস্। তার পরেই জলে গা ডুবিয়েই পড়তে লাগলাম লিমার বিষয়ে সংগ্রহ করা একটা 'হাথ-বই'।

আমরা সত্যি অত্যন্ত উদাসীন। যা কিছুতে আমি নিজে বর্তমানে লাভ অর্থে বা অর্থ লাভে সংশ্লিষ্ট নই, তা' থাকুক, মরুক বা ভেসে যাক। প্রফুল্ল বলতো—'ফ্লোটস্ এওয়ে', বয়ে যাক।

বন্ধু প্রফুল্ল ইংরাজী অনুবাদ সাহিত্যে 'র‍্যাংলারস্য র‍্যাংলার!' 'হী ওয়েন্‌ট্ তো ওয়েন্‌ট্-ই ওয়েন্ট'—তার ক্লাসিক হয়ে আছে, আজও। 'সে গেলো তো গেলোই গেলো' এই বাক্যটির অমন জোরালো অনুবাদ আজও পাইনি।......বিদেশে, বিশেষ করে স্নান-ঘরে টবের জলে গা এলিয়ে বন্ধুদের কথা মনে পড়ে।......

......আমাদের দেশটা কতো বৃহৎ; কতো রকমের এর সৌন্দর্য! প্রাকৃতিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, জাগতিক—এমন নানাত্বে চমৎকৃত দেশ তো দেখি না। অথচ, কোনো বিদেশী কেন, স্বদেশীয় ব্যক্তিও যদি জলপাইগুড়ি থেকে সেকেন্দ্রাবাদ, বেজওয়াড়া বা উজ্জয়িনীতে গিয়ে পড়ে, কোনো নির্দেশিকা পাবে না যার ওপর ভরসা রেখে সে আশ-পাশের তল্লাট ঘোরার দেখার প্রেরণা পাবে। যখন যখন যে বিদেশী প্লেনে ঘুরেছি তাদের দেশ ও প্লেনের 'রুট' নিয়ে সুন্দর সুদৃশ্য মনোহর প্রচার পত্রিকা দেখেছি। লেখা থাকে—'এটি আপনি সংগ্রহ করলে খুশী হবো।' 'এয়ার-ইণ্ডিয়া'র মতো বিশ্ব জোড়া প্রতিষ্ঠান বছরে বছরে কোটী কোটী টাকার ডিভিডেণ্ড ছড়াচ্ছে। কিন্তু সবে এই ১৯৮৪-র এপ্রিলে বার করেছে 'নমস্কার'। প্রেরণাটি অনুপ্রেরণা। অন্যের দেখে।

নালিশ এখানেই। এদেশে 'ক্রিলঁর ডেস্‌কে কতো ভ্রমণ—পত্র-পত্রিকা? তুলনায় আমাদের দেশে অনুরূপ প্রচার? কৈ?

তৈরী হবার পর খাবার জন্য শেষমেশ ক্রিলঁর'ই ডিনার-টেবিলে বসলাম। দাঁতের অবস্থা কাহিল। সুপটা খেলাম। কিন্তু শেফ্ কানে কানে বল্লো—"ভয় পাচ্ছেন কেন,

স্যর। আপনার ছেলে আপনার 'প্রবলেম' বলেছে আমায়। আমি দই আর একটি অতি স্পেশাল স্প্যানিশ চীজে রসালো ল্যাম্বের কচি কচি টুকরো ভাপায় তুলতুলে করে রেখেছি, স্যর। নাট্‌মেগ আর শেরি ঢেলে দিয়ে যখন আপনাকে দেব, একটু সাবধানে 'হ্যাণ্ড্‌ল্‌' করবেন; বাতাসে উড়ে না যায়।—বড় টেণ্ডার, বড়ো ডেলিকেট।"

সেই ডিশটা ভরপেট খেলাম। পরে বড়ো একটা বাটী এপ্রিকট আইসক্রীম। বড়ো বড়ো এপ্রিকট আধখানা করে আইসক্রীমে ডুবিয়ে রাখা। মুখে দিচ্ছি, টের পাচ্ছি। নেবে কখন যাচ্ছে, ক্যা-মালুম।

শেফ্‌কে ধন্যবাদ জানালো মধু। "বাবা আজ ক'দিন পরে এই খেলেন"।

শেফ্ ছাড়বে কেন? আমার কানে কানে বল্‌লে,—"কাল লাঞ্চে আপনাকে এদেশের রান্না মাছ খাওয়াবো। দাঁত থাকলে খুলে খাবেন। না থাকলে বুঝতে পারবেন না যে, নেই। অনেক দিনের জানা মেয়ে মানুষ বা পরা জুতোর মতো নির্বিবাদ।"

—"বলো কি? অনেক দিনের জানা? সদ্যঃ জানাগুলো তবু যদি মোলায়েম হয়, অনেকদিনেরগুলো তো ঘাড়ে চড়ে টাকে বোঙ্গো বাজায়।"

—"আমাদের দেশে বলি, টাকে হাতুড়ি মেরে আখরোট ভাঙ্গে। ইণ্ডিয়ান হলে মিউজিক্যাল হবেই। কিন্তু স্যর, আমি স্ত্রী বলিনি। বলেছি মেয়ে-মানুষ। বিশ্বাস না হয় পরখ করে দেখবেন। তফাৎ আছে।"

—"ঠিক আছে। পরখ করা যাবে। কাল লাঞ্চে ঐ মাছ অর্ডার দিয়ে রাখলাম।"

উসখুস করছে মধু।

আমি লক্ষ্য করে বলি, "চলো একটু ঘোরা যাক। খাওয়াটা বেশী হয়েছে। খুব খিদে পেয়েছিল। দেখি, কতদূর যাই। তারপর আমি গিয়ে বিছনায় ঢুকব। তুমি বরং ঘুরতে চাও ঘুরো।......রাত দুটো অবধি লীমা কিশোরীই থাকে বলে জানি। লীমার প্রবীণপনার নেশা লাগে তিনটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।"

রাতে নিকোলাস দ্য পিরালো এ্যভিন্যু জমজমাট। শত শত গাড়ি ছুটছে। ফুটপাথ গিস্ গিস্ করছে। মেয়েরা স্বচ্ছন্দ, সুসজ্জিতা, সহজ—কিন্তু দু'টি জিনিস নেই। ইউরোপে, বিশেষ করে মার্কিন মুলুকের জিগীর তোলা নগরগুলোতে যা আতঙ্ক জাগায়। —এক বেলেল্লাপনা; হঠাৎ চিৎকার, হঠাৎ হাসির ভূমিকম্প, গায়ে পড়া আরণ্যক বিধি বা ভয়। সে এক জাতীয় ভয়—যা' দেখেছি, পার্শ্ববর্তিনী স্ত্রী, কন্যা, ছাত্রী, বান্ধবীদের মধ্যে। পায়ে হেঁটে ফুটপাথের ভীড়ে রাতে বেড়ানো লীমায় আরামের বিলাস, বিলাসিনীদের আরাম। আরো আরাম, দোকান-হাট সব খোলা। জব্বর বিকিকিনি চলছে।

সুন্দর বাতাস। হাল্কা চাদরে মিষ্টি মিষ্টি কাঁধগুলো ঢাকা পড়েছে। বলে, ম্যাণ্টিলা। এমন কোনো কণ্ঠ নেই, যা'র শোভায় আসলে-নকলে সোনায়-রূপোয় জড়োয়া বা মোতি না চমকাচ্ছে। লীমার মেয়েরা ছিম-ছাম অলঙ্কার ভালোবাসে। ভালোবাসে যে যার

বন্ধু বা বান্ধবীদের সঙ্গে ঘোরা। ওরা চুল রঙ্ করার বদরোগে ভোগে না। কারণ, ওরা জানে—রুগু, অবার্ণ চুলের চেয়ে শাদাদের ফ্যাশান ভালোবাসে ব্রুনেট, জেট্-ব্রুনেট। পেরুর মেয়ের চুলের রং মিশমিশে কালো। ভ্রু স্পষ্ট। পলক লম্বা গভীর কালো। ওরা সবাই কাজল পরে। বলে, কোহেল। নানাভাবে প্রভাবিত সেই মাদক মাদক দৃষ্টি আভায় ভরা। বোবা ভাষাহীন চোখ দেখাই যায় না। বলেছি, কিন্তু পেরুর মেয়ে। ইন্‌কা চোখ বড়ই বিষণ্ণ। বড় বেশী বিষণ্ণ। হাসির সময়ে, কথা বলার সময়েও বিষাদ-এর জলে ভেজাই থাকে ওদের দৃষ্টি। দেখে দেখে ক্রমশঃ কেমন একটা অস্বস্তি হয়। নিজেকে অজ্ঞাত কারণে ও করণে অপরাধী বোধ হয়।

একটা বইয়ের দোকানে খুব ভীড়। কয়েকটি মেয়ে আর ছেলে মিলে জিপসী গান গাইছে। সাউথ আমেরিকায় জিপসী নেই,—বা সবাই জিপসী। কিন্তু এ জিপসীরাও জিপসী নয়। ইউনিভার্সিটির ছেলে-মেয়ে। মাথায় ভূত চেপেছে। পরখ করতে চায়, কতো পয়সা রোজগার হয়। কিন্তু দারুণ দারুণ তালে গেয়ে চলেছে। শতশত লোক হাত-তালি দিচ্ছে। পথ চলতি সুসজ্জিতারাও থমকে দাঁড়িয়ে নাচ সুরু করেছে। 'ঞাপাঙ্গা' নাচ। অতিশয় যৌন 'ঞাপাঙ্গা' দেহভঙ্গী। হোক। কিন্তু নাচ। বিশ মিনিট যেতে না যেতে পথের প্রবাহে ভণ্ডুল মাতলামী। সে প্রবাহ-স্রোত পথ ছেড়ে ঢেউ রচনা করে উথলে পড়ছে চওড়া চওড়া ফুটপাথে। গাড়িগুলো এধার ওধার ঠেলে দিয়ে চালকরা সুন্দরীদের সঙ্গে নেমে পড়েছে। পুলিশ? হ্যাঁ। হাসছে। বেটন ঘোরাচ্ছে। অবসর মত পাও দোলাচ্ছে, কোমরও নাচাচ্ছে। কিন্তু বাধা দিচ্ছে না। কারণ, বাধা যদি এতেই দেবে, তাহলে জীবনে থাকবে কি নিয়ে? কেবল লেফ্ট্-রাইট্? কেবল লাল আর নীল আলো? এ সব অবস্থার আনন্দকে চাপা দিলে ব্যবস্থার মাথা-কাটা যায় যে!

আমি বইয়ের দোকানে।

হঠাৎ কাঁধে এক চাপড়। রোগা পটকা একটা ছেলে ভাহা ইংরাজীতে বল্‌লে—"এই বুড়ো, নাচছো না কেনো? ট্যাগোর বাজালে নাচোনা?"

কি করে বলি এই 'পুচ্ছটি উর্ধ্বে তোলা' উন্মাদনাকে যে,—'আমরা খুব সভ্য। নাচ দেখি। নাচি না। মেয়েদের নাচ শেখাই বিয়ের বাজার মাৎ করার জন্য। বিয়ের পর আর নাচতে দিই না। খুন্তী-বেড়ী নাচ ট্যাগোরও শিখিয়ে যাননি। আমাদের দেশে এমন নাচ আছে। 'অসভ্য' আদিবাসীরা নাচে। তাও আমরা দেখি। নাচি না। এখানেও দেখবো, নাচবো না'।

"নাচবে না? সে কি?"—বলেই যে মহিলা থপাৎ করে আমায় জাপটালেন তাঁর ওজন টনে না হলেও, তাঁর পুরোভাগের দোলোন আর পশ্চাৎভাগের কম্পন মিলে আমার কলেজা না হোক, পা-যে মচকাবার জো। পায়ে মোটা রাবার সোলের শ্যাময় স্যু। পা চলেও না। কিন্তু মাত্র মোমেন্‌টামের বশেই আমি অবশ্য নৃত্যের বশীভূত সঙ্গী। কিন্তু খানিক পরে, হায় রাম! আমি সত্যই নাচতে সুরু করলাম।

থামলামও অবশ্য। কিন্তু মধু কৈ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কন্দর্প বলে, "আমার গার্লফ্রেণ্ড তোমার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।'

অন্যে বলে,···"পুলিশ হাঙ্গামায় কোন ফল নেই। পেরুর আইনে ছেলে মেয়েকে ভাগালেই পুলিশ; তাও দিনে ভাগালে। রাতে সব মাওফ্। কিন্তু মেয়ে যদি ছেলেকে ভাগায়, দিনে-রাতে,—নো কেস্।"

কি যে আনন্দে কাটলো প্রায় এক ঘণ্টা। একঘণ্টা পরে সব ফাঁকা। মানুষ ফুটপাথে। পথে গাড়ি। কোনো গাড়ি একটুও শব্দ করছে না।

ঠাণ্ডা বাতাস। দীপ্ত সাহসী যৌবনমণ্ডিত গতিময় পথ।

রোগা ক্রকলাস ছেলেটা বসে। আমাদের নৃত্য-সখী একখানা বই আমায় উপহার দিয়ে চুমা খেল। বল্লাম—'অটোগ্রাফ করে দাও।' ছেলেটি দোভাষীর কাজ করতেই সেই জেলীময়ী খুব জোর মাথা নেড়ে হাসিতে লৎপৎ হয়ে স্বাক্ষর করে দিল। সেই এক মুখ হাসি চিবুকের বহু বিস্তৃত থরে থরে ঢেউ লাগিয়ে দিলো। খুশীর লেখন ইঁটের চেয়ে জেলীতে ফোটে ভাল।

আমার লম্বা কালো কোটের ওপর মাথায় রাশ্যান কালো উঁচু ক্যাপটার ফলে সবাই আমায় রাশ্যান তুর্কীস্তান বা পূর্ব মেডিটেরেনিয়নের কোটীপতি ভাবছে। অনেকেই ঘুরে ঘুরে দেখছে।

নাঃ! মধুর দেখা নেই। ও ইচ্ছে করেই হারিয়ে গেছে। আমি হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়লাম। ডেস্কে বলে দিলাম, 'বন্ধু এলে যেন দরজা খুলে দেওয়া হয়। এখন আমি দু'ঘণ্টার জন্য সুইসাইড করবো।'

কি আরামে ঘুমুচ্ছে মধু। একটুও শব্দ না করে। যখন স্নানাদি সব সেরে বাইরে লাউঞ্জে এসে দাঁড়িয়েছি, রিশেপশানের চশমাধারী প্রবীণটি সন্দিগ্ধ নয়নে চেয়ে দেখে, কী আবার হোল।

আমি ঘড়ির দিকে চেয়ে বলি—"সাড়ে পাঁচটা। এ অসময়ে খিদমৎ পাওয়া জুলুম বিশেষ। কিন্তু ভাবছিলাম, এক কাপ কফি খান্ না। আপনিও তো ক্লান্ত।"

—"পাঁচ-শো-নয়? বাতাশারিয়া? বেড্টীর সময় তো প্রায় হোল। কিচেন ব্যস্ত। বসুন, বেড কফি নিশ্চয়ই দেবে। বেরুচ্ছেন না কি?"

—"হ্যাঁ, নতুন দেশকে একা পাওয়া ভোরবেলা। দিনে সে ব্যস্ত। রাতে তার মন ভোলানোর তাড়া।"

—"কোথায় যাবেন ভাবছেন?"

—"বলুন কোথায়? বেশ নির্জন। বেশ একা।'

—"নেমে ডান হাত, আবার ডান হাত, পাঁচটা ব্লক। ব্যস্। বাঁয়ের ফুটপাথ দেখলেই একটা অবকাশ আপনাকে টানবে। একটা হলদে রংয়ের বাড়ি। ঢুকে যাবেন।"

—"এই ভোরে?"

—'এখন ভাড়াটে পাড়ার দোরও খোলা পাবেন না। কাজেই ঐ বাড়ি"

—"কিসের বাড়?"

—"মেয়েমানুষ ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু কোন মানুষই দেখতে পাবেন না।"

—"কনভেণ্ট্?"

—"হ্যাঁ। প্রসিদ্ধ এবং সুপ্রাচীন। যখন পাচাকামাকের সূর্য-কন্যাদের নিয়ে স্পেনের সৈন্যরা যে যার বিছানায় ঢুকে গেল, তারপরেও তো ছিল। তারাই পিজারোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাদের কথা মনে রেখেই পিজারো এই কনভেণ্ট্টি করে দেন।"

—"পুরুষ যায়?"

—"না। সে অর্থে যায় না। কিন্তু চ্যাপেল তো আছেই। চ্যাপেলে প্রবেশ কে নিষেধ করবে? কে করে? শুধু দেবদ্রোহী শয়তান। পাশের একটি পাখি দরজা খোলা থাকে, রাত-দিন। তারপরে সোজা বারান্দা। বারান্দার শেষ প্রান্তে একটি আধা দরজার বেড়া। সেটি পেরুলেই চ্যাপেল। বাইরে থেকেই দেখা যায়।"

কিন্তু বলে দেননি সেই কাউণ্টারনাথ ভদ্রলোক, যে সেই দীর্ঘ বারান্দাটি আর কিছু নয় থিলান দেওয়া চক মেলানো এক অপূর্ব স্থাপত্য এবং কী পরিষ্কার! টালিগুলো ঝক্-ঝক্ করছে। জুতো শুদ্ধ পা রাখতে রীতিমত সঙ্কোচ হয়। তপোবন সংস্কৃতিতে পৌরাণিক 'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং'—এর বন্যা, কাদা, এসব নোংরামী তো ছিল না; সে সংস্কৃতিতে ছিলো শুধু বেদী, হবি, সমিধ। এটা ভালোই ছিলো মনে হয়। পূজায় অগ্নিকে হারিয়ে যে আমরা বরুণের বাহুল্য করেছি, তার ফলে মন্দিরের নির্মলতার অনেক-খানি আমরা খুইয়েছি। অবশ্য তার ফলে পাণ্ডার পণ্ডাই গায়ে গতরে বেড়েছে। তপোবনের ঋষিরা কিন্তু ছিলেন কৃশ।

ঘুরে ঘুরে দেখলাম। চ্যাপেলে মায়ের মূর্তি। মা-কে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্যে কতো অপ্সরা, কিন্নরী আকাশের সূর্যমণ্ডলে ভাসছে। স্বয়ং দেবাদিদেব হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পরমা মাতৃকাকে ঊর্ধ্বে তুলে নিয়ে যাবার জন্য! এরা মাকেও পরিত্রাণ করার জন্য হাত বাড়ায়।

কিন্তু বসলাম গিয়ে বাইরের সেই চকমেলানো বারান্দার কোলের বিশাল অথচ সুন্দর কেয়ারী করা ফুল বাগানটিতে। আমার বড়ো কোটটা খুলে পাট করে তার ওপরেই আসন করে বসেছি। (ও-তো বসবোই। বাধা মানিনে।)

দু'টি মহিলা। বয়স হলেও আমার চেয়ে বেশ ছোটো। ব্রহ্মচারিণী বলেই বোধ হয় কৃচ্ছ্রশাসনের ফলশ্রুতি বাবদেও বেশ আঁট-সাঁট চেহারা। প্রসন্ন মুখ, উজ্জ্বল দৃষ্টি, সনির্বন্ধ অপেক্ষা।

কিছু একটা নরম গলায় বললেন। আমি হাসলাম। হাত জোড় করে নমস্কার করলাম। জপের মালাটি গলায় পরে কোট গায়ে দিলাম।

ইতস্তত: করে ছোটটি বললো বোধহয়, গায়ানীজ। আমি সাহায্য করার আশায়

ইংরাজীতে বললুম, "আমার ভাষাজ্ঞান খুব অল্প। ভারতীয় ভাষা হিন্দী, উর্দু, বাংলা ছাড়া সংস্কৃত সামান্য জানি। তবে ইংরাজী বলতে পারি, বুঝতেও পারি।"

"আপনি কতক্ষণ বসে আছেন?"—ইংরাজীতে বললেন ওরই মধ্যে অল্পবয়সী যিনি।

মনে নেই। ঘড়ি দেখে বলি, "তা' প্রায় মিনিট পঞ্চাশ হবে।"

—"এক ঘণ্টা! চলুন, সকালের খাওয়া দেওয়া হয়েছে। আপনি অতিথি। মাদাম সুপীরিয়রও বলেছেন আপনাকে নিয়ে যেতে।"

ধীরে ধীরে এগুতে এগুতে বলি—"ধন্যবাদ। মাদার সুপীরিয়র জানলেন কি করে আমার কথা? আমি কি কারুকে বিরক্ত করলাম?"

দু'জনে দু'জনার মুখ চেয়ে হাসে। বাগান থেকে ভেসে আসছে খুব মিষ্টি প্রকৃতির সুবাস। ফুলগুলির নাম জানি না। জানার চেষ্টাও নেই। মধু বাতা ঋতায়তে। সবকিছু মধুময়।

—"ভেতরে কেউ ঢুকলেই ওপরের টাওয়ারে প্রহরী টের পায়। মাদার সুপীরিয়রের ঘরে লাল আলো জ্বলে ওঠে। ক্ষীণ বেল্ বাজে। ইণ্টার-কমে কথা হয়। এ রাতের শেষ তিন ঘণ্টা আমাদের ভার, কেউ কোন সেবার জন্য এসেছে কিনা দেখা। এটা কন্ভেণ্ট। এখানে সবাই ঠাকুরের সন্তান।"

—"আমায় আপনারা দেখেছিলেন?"

"—না, মাদার সুপীরিয়র দেখেছিলেন; আপনি কোট বিছিয়ে প্রার্থনায় বসেছেন। তাই বিরক্ত করেননি। কিন্তু চল্লিশ মিনিটের পর প্রাতরাশের সময় বলে, ডাকতে পাঠালেন।"

একটু থেমে বলি, "যদি বুড়ো না হতাম?"

গিল্ গিল্ শব্দ করে হাসি। "কে বল্লো আপনি বুড়ো? এ-তো আবার ক'রে শিশু।—সবাই মায়ের সন্তান। অতিথির বয়স থাকে না।"

—"কিন্তু পোয়েব্লার কনভেণ্টে যে বড়ই কড়াকড়ি।"

—"হ্যাঁ, ওদের ওখানে অনেক প্রাচীন টুকিটাকি, মূর্তি, ক্রুসিফিক্স, বিশেষ বইয়ের সংগ্রহ আছে। মেক্সিকোর পোয়েব্লা তো? ওদের ওখানে তিন-চার বার চুরিও হয়েছে। তাই ওরা সাবধান। কিন্তু অতিথি সেবা ওরাও করে।"

—"তোলেদোয় করে না, আমায় ঢুকতেই দেয়নি। রোমেও না।"

—"য়োরোপের কথা বলবেন না। কিন্তু এখানে, অতিথি আমাদের পরম দেবতা। —সদ্য সদ্য বরদান করেন।"

কাটা পাথরের টালি ছাওয়া মেঝে। বিরাট হলের মাঝে দু'সারে মোটা কাঠের পালিশহীন টেবিল। তার ধারে লম্বা বেঞ্চি। কেউ খাচ্ছে না। বুঝলাম অতিথির জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা।

একমাত্র মাদাম সুপীরিয়র। বৃদ্ধা। কাঁধ মোড় খেয়ে মাথা ঝুঁকে গেছে। একটু ঘাড় কাৎ করে আড়চোখে দেখেন। ঐ দু'টি মহিলার মতো খুব কালো পোষাকের নিবিড়ে ক্ষীণ শরীর আত্মরক্ষা করছে। কেবল কপাল থেকে চিবুক দেখা যায়।

অন্য মহিলাটি গিয়ে দু'টি কাঠের 'বোল'-এ করে কী একটা খাদ্য ট্রেতে করে নিয়ে এলেন। হাতে ঝোলানো তোয়ালের মতো। আর কাঠেরই চামচ। সেগুলি রেখে এক জাগ দুধ এবং কাপ নিয়ে এলেন।

কিন্তু ইংরাজী ভাষিণীটি মাদারের পাশে দাঁড়িয়ে। মাদারকে অনেক কিছু বললেন ইনি।

মাদার হাত জোড় করে নিবেদন করলেন। আমায় বল্লেন, খেতে। আবার আপত্তি করলে ওঁর খাবার বিঘ্ন হবে ; ভেবে, আমি খাওয়া আরম্ভ করলাম। মধু দেওয়া পরিজ।

উনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি এসময়ে এখানে কেন এলাম। উত্তর দিতেই প্রশ্ন করলেন. জপ কতদিন ধরে করি। তারপর প্রশ্ন মালাটি কিসের ? 'রুদ্রাক্ষ'— (elaeocarpus ganitrus) বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হোল। ওঁর সুবৃহৎ পোষাকের ভেতর থেকে একটা ব্যাগ বেরুল। সেটি খুলে একটি ছোট চৌকো জেড্ পাথরের (জসমের) ডিবে। তার মধ্যে অনেকগুলি বীজদানা। আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, রুদ্রাক্ষ কোন্‌টি ? আমি একটি রুদ্রাক্ষ দেখাতেই বল্লেন, ওঁর দানাটি জাভার। তবে উনি গাছ লাগিয়েছেন। রুদ্রাক্ষের বিশেষ উপযোগিতা কি—জানতে চাইলেন। খুব বেশী কিছু বলতে পারলাম না। তবে বল্লাম, ক্যাথলিক গির্জার দোকানে যে সব কাঁচের পুঁথীর মালা বিক্রী হয়, সেগুলো জপের জন্য ভাল নয়। যে কোনো বনস্পতি-জাত বীজ বা কাণ্ড (যেমন তুলসী) ভাল। কিন্তু কাঁচ তামসিক।...তামসিক তাই যার মধ্যে এক কথায় রেসপন্স ফিকে, বা রেডিয়েশন খুব কম ; যেটুকুও বা আছে তা,— বিকৃত, অস্বাভাবিক আর নেগেটিভ।

জিজ্ঞাসা করলেন, জপের উপকারিতা কী ? মালার জপের বিশেষ কি গুণ ? বিশেষ বীজে বিশেষ কি গুণ ? হিন্দুরা জপে বুড়ো আঙ্গুল ও মাঝের দু'-আঙ্গুল ব্যবহার করে কেন ? তর্জনীর দোষ কি ?

যা' জানতাম বল্লাম।

—"আপনি কি যোগী ?"

হেসে বল্লাম, 'হিন্দুমতে বিয়োগ না হ'লে, যোগ হয় না।' কথাটা বোঝালাম।... খুশী হলেন। বলে উঠলেন "সত্য, সত্য ; নির্যাস সত্য !"

ঘণ্টা বাজছে। ওঁর ওঠার সময়। অল্প খেলাম। দেখে বুঝলেন। ভাল লাগেনি ? লজ্জিত হলাম। বল্লাম—'স্বাদের ভাল মন্দ বুঝি ; কিন্তু তারতম্যে ভোজনের পরিমাণে তারতম্য আনে না। হোটেলে বন্ধু অপেক্ষা করে আছে। গিয়ে খেতে হবে।'

সাধারণ চার্চ ; সাধারণ সজ্জা। দেখবার মতো স্থান একটি-ই, সেটি একটি কুয়া। সান্তা রোজা এক সন্ন্যাসিনী নিজেকে নানাভাবে শাস্তি দিয়ে কৃচ্ছ্র তপস্যা করতেন। কোমরে কাঁটাওলা শেকল জড়িয়ে রাখতেন ; সে একটি গাদি। তা'তেও তালা-চাবি ;

সে চাবি নাকি ফেলে দিয়েছিলেন এই কুয়োয়। পবিত্র কুয়া। জলের নানা প্রভাব আছে। তীর্থ। (পৃথিবীতে যেখানে যাও মানুষ ; মানুষ হলেই জ্বালা ; জ্বালা হলেই বাবা তারকনাথ, আর হজরৎ নিজামুদ্দীনের বাউড়ীর পানী। এ থাকবেই)।

কিন্তু মনে পড়ে যায় গীতা।—"কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামম্ অচেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্।"—জেনো, নিশ্চিত জেনো, যারা (ধর্মের নামে) শরীরকে কৃচ্ছ্র সাধনে চষে বেড়ায়, তারা শরীরের সাথে 'আমাকে'ও করে পীড়িত। তা'রা অসুর, অসুর।

…আরও একজন ঋষি বলেছেন, 'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।'

কাল্লাও

ফেরার মুখে ডান দিকে ঘুরে গেলেই লীমা ষ্ট্রীট আর জুনীন ষ্ট্রীটের জংশন। এটাই ক্যাথীড্রালের চৌক। মাঝের ফোয়ারাটা এই সকালে স্পষ্ট। জলের উৎসাহও খুব প্রফুল্লিত, উজ্জ্বল। প্লাজা আর্মাস্ পেতেই মনে হোলো দেরী হয়ে যাচ্ছে। ট্যাক্সি করে হোটেলে ফিরলাম।

রোদ্রীগেজ আর ড্রাইভার জোর্জ এঙ্গেলেস্‌কে নিয়ে প্রাতরাশে বসে গেছে মধু। আমার চেয়ার খালি। খাওয়া বাবদে আমায় নিরুৎসাহ দেখে রোদ্রীগেজ বল্‌লো—"ঠেসে খেয়ে নাও। যাচ্ছি কাল্লাও। কাল্লাও বন্দরের গায়ে বিখ্যাত দুর্গ।"

এছাড়া কাল্লাও বড়ো বন্দর। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মৎস্য ব্যবসায় পেরুতে। পেরুর শ্রেষ্ঠ মৎস্য-চাষ কেন্দ্র কাল্লাও। মাছের সার এতো কোথাও তৈরী হয় না। এ সার আর কোণ্ডোর পাখির বিষ্ঠার সার পেরুর শ্রেষ্ঠতম বাণিজ্য-সম্পদের অন্যতম। কোণ্ডোর পাখিরা এই মাছ খায়। কাছের দ্বীপের পাহাড়টি শুধু ওদের বিষ্ঠার। যন্ত্রের সাহায্যে সেই বিষ্ঠা অতি মূল্যবান সার হিসাবে রপ্তানি হয়। এখন যন্ত্রের ত্বরা-র সঙ্গে পাখিরা সাম্য রাখতে পারছে না। ফলে, মজুদ মাল কমছে, মন্ত্রীমশায়ের চিন্তা বাড়ছে।

আরও কারণ কাল্লাও দেখার। কাল্লাওতে বিপ্লব হয়ে গেছে। এখন কাল্লাও সবে কার্ফ্যুর পাঞ্জামুক্ত হয়েছে। সমগ্র কাল্লাও করপোরেশানই মিলিটারীর অধীনে।

ওখানে পথের পর পথ, শত সহস্র বাড়িতে জবরদখল করে বসে আছে জেলেরা, উঞ্ছ-বৃত্তিরা, ময়লার স্তূপ ঘেঁটে বাঁচার দল। ওরা বহুকাল ধরে ভাড়া দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। জল কেটে দিয়েছে ; তখন ওরা নিজেদের প্লাম্বিং নিজেরাই করেছে সঙ্গে সঙ্গে। ধনীদের, বণিকদের এলাকার জল বন্ধ করে দিয়ে প্লাম্বিং এর বয়কট করেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহও তা'ই। ট্যাক্স্ দেয় না। সরকার কিছুদিন লড়েন। পরে মেনে নিতে বাধ্য হন। ওদের শ্লোগান,—'যে সরকার ভাত-কাপড় জোগাতে পারেন না, সে সরকার পয়সাও চাইতে পারেন না।' কোথায় যেন এ ধ্বনিটা তাৎপর্যময়। (আমাদের

দেশ পর্যন্ত এ সব ধ্বনি পৌছতে দেওয়া হয় না। পৌছুলে বিপদ আছে। এম. পি-দের 'মারুতী'-কার পেতে দেরী হয়ে যাবে।)

পেরোলা এ্যভিন্যু পার করে সেকেণ্ড-মে স্কয়ারে এলাম। সেকেণ্ড-মে হোল দুই বছরের অবরোধের পর কাল্লাও বন্দরের মুক্তির দিন! লীমা তথা পেরুর মুক্তির ইতিহাসে এ তিথি ব্যাষ্টাইলের হামলার তিথির মতো উজ্জ্বল। বিশাল এক স্তম্ভ সেই স্মৃতি বহন করছে। এখান থেকেই কাল্লাও যেতে হ'বে। কিন্তু যে পার্কটার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে একটি মর্মর কীর্তি। খুব সুন্দর চার-পাঁচটা মূর্তির বসা-দাঁড়ানোর মধ্যে দেশের বাণিজ্যের সম্ভারের শিল্পের ইঙ্গিত। সুন্দর সুন্দর বেদী দিয়ে স্কয়ার সাজানো। সে সব বেদীর ওপর সাগর-প্রাণীর মূর্তি। সে সব সাগর-প্রাণীদের পিঠে সওয়ার বাচ্চারা। আর সেই সব প্রাণীদের মুখ থেকে জলের ফোয়ারা বা'র হয়ে পড়ছে নীচের গোল টবে। তা'র মধ্যে ফোয়ারা হয়ে জল পড়ার আরও দু'টি থাক। খুব যত্নে নক্সা করে এটি গড়া।

এসে দাঁড়ালাম এক শান্ত গ্রাম মতো জায়গায়। 'এভেনিদা বোলিভার' থেকে হঠাৎ বেঁকে খালের পারে বড় বড় গাছের মধ্যে একতালা বাড়িখানা দেখলে মনে হয় কোনো জমিদারের বাগান-বাড়ি। চিন-চিন নামক ইনকা শহরে খননের কাজ করার সময়ে বহু স্বর্ণ-সামগ্রী উদ্ধৃত আহরিত হয়। এদিক-ওদিক মিলিয়ে যাবার আগে ডন্ রাফায়েল লার্কো নামক এক ধনকুবের এই সব সংগ্রহ কিনে নেন। এবং এই প্রেরণায় আরও বহু মূল্যবান স্বর্ণাভরণ ও ঔপনিবেশিক আমলের আগ্নেয়াস্ত্র, তরোয়াল, যুদ্ধের বর্ম, ঘোড়ার সাজ কিনে ফেলেন। কিন্তু অবশেষে সমস্তটা দেশকে দান করেন। সেটাই আজ পেরুর রাফায়েল লার্কো এরেরার স্বর্ণ ম্যুজিয়াম,—"ম্যুজি-দি-ওরে।" এছাড়াও আছে নেভীর ম্যুজিয়ম, সৈন্য বিভাগের ফৌজী ম্যুজিয়ম, আর্ট ম্যুজিয়ম।—

এগুলো তখনকার মতো তুলে রেখে কাল্লাও দেখায় মন দিলাম।

সত্যিই সমগ্র শহরটা তো বটেই, বিশেষ করে বন্দর এলাকাটা একেবারে দাঁতে-দাঁত য়ুনিফর্ম-বেয়নেটিক খবরদারী। আশ্চর্য খবরদারী! চায়ের দোকানের বাইরে সিপাহি দাঁড়িয়ে।

আমার চোখে ভেসে উঠল সেই সুদৃঢ় সুবিশাল কাল্লাও দুর্গ। যেন সমুদ্রের বুক থেকে উঠেছে। এ হোল প্রশান্ত মহাসাগর। এমনি সমুদ্রের বুক থেকে ওঠা দুর্গ দেখেছি ডাচ্ এন্টেলিসের কুরাসাও বন্দর দ্বীপে,—দেখেছি স্পেনের পশ্চিম সাগরে সান-সেবাষ্টিয়ান-এর দুর্গ। শুনেছি, কোপেন হেগেনের দুর্গও এমনি। কিন্তু ওদের সঙ্গে যে আমার 'নাড়ী'র সম্পর্ক নেই। ওদের আমি 'জানি না।' কিন্তু এ যে কাল্লাও। এর হৃদ্-স্পন্দন যে আমার জানা।

পথগুলো জনতাহীন। বন্দর ঘাটায় ঢোকার পথে সাধারণতঃ ভীড় থাকে। 'পাব্'-গুলোই ফাঁকা। যেসব বাড়ি ভাড়াটে মেয়েদের বাড়ি বলে মনে হোল, সেখানেও সব জানলার শার্শী বন্ধ, পর্দার আড়াল। দরজা বন্ধ।

একটা পার্ক। ফাঁকা। সিমেন্ট আর চুণে মেশানো একটি শুশুকের (পার্পয়েস্) প্রতিকৃতি। দূরে সমুদ্রের বুকে বিশাল দুর্গের মতো দেখা যাচ্ছে এক ম্যান-অব্-ওয়ার।

আশ্চর্য ! পার্কের তিনধারের (তিনকোণা পার্ক) একতালা সারি সারি বাড়িগুলো সব বন্ধ, দরজা জানালাও সব। এ্যাডোবের বাড়ির ওপর প্ল্যাষ্টার। নানান রঙ্, যদিও নীল রঙই বেশী।

আরও দূরে ক্যাল'ও দুর্গের প্রাচীর। ধোঁয়ার মতো। লাখ-খানেক লোকের প্রায় আশী হাজারই এই শহরে থাকে। লীমা শহরের শিলান্যাস করার বছর তিনের মধ্যে (১৫৩৭) পিজারো লীমার জন্য আলাদা বন্দর করার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। দু'শো মাইল উত্তরে ত্রুহিলো বা আরও উত্তরে গুয়াকিলের ওপর নির্ভর না করে লীমা থেকে সাড়ে আট মাইল দূরে এই বন্দরকে পেরুর প্রধান বন্দর করার কাজে মন দিলেন।

আজ কাল্লাও বন্দরের বিস্তৃতি ৮০০ একরের বেশী। দু'ধার থেকে গ্রানাইটের বেড় আঁকশির মতো। তিনটি ব্রেক-ওয়াটার। আটটি 'কী' (জেটি)। একসঙ্গে চারশো বড়ো জাহাজ থামতে পারে। কাল্লাওতে যে কোনো সময়েই দুই থেকে তিন হাজার জাহাজ পাওয়া যাবে। বেশীর ভাগই মাছ-ধরা আউট মোটর ফিট করা ঢাউস ঢাউস নৌকো।

কিন্তু এই বন্দর ড্রেক (১৫৭৮) লুঠ করেছে। বার বার এই বন্দরের ওপর দিয়ে 'বুকানীয়র' (জলদস্যু)-দের ঢেউয়ের পর ঢেউ বয়ে গেছে। ১৭৪৬ খৃষ্টাব্দের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে যে বিশাল সামুদ্রিক স্ফীতির ধাক্কা খেয়েছিল কাল্লাও তা'র ফলে শহরটা মুছেই গিয়েছিল। তারপরে পোখ্‌তো করা হোল বন্দর। মজবুত করা হোল দুর্গ। সমগ্র শহরটাকেই প্রাচীরে ঘেরা হোল। এখন সে প্রাচীর না থাকলেও প্রাচীরের চিহ্ন আছে। সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে এমন সুদৃঢ় এবং গভীর বন্দর আর নেই।

তা'ই এটাকে আয়ত্তে রাখা দুনিয়ার মনিটারী করার জন্য দরকার। আর সেই নিয়েই হাঙ্গামা। সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। আসল কথা কেউ ভাঙ্গে না।

আমি বলি, "নাঃ, ওই বন্দরে যাব। সব কিছুই দেখব। ছবি নেব। মেছোদের সঙ্গে ভাব করব—"

"—তারপর জেলে যাব।" বল্‌লো মধু,—"এবং 'মিসিং' হয়ে যাব।"

আমি হেসে বলি,—"মিসিং বইটা পড়েছো, রোড্রীগেজ ? বিশ্বাস করে না লোক। ডে অব দি জ্যাকল, (Z) জী. আর ঐ সুরেরও ঢের বড়ো সুরের বই 'মিসিং ; তার ছবিও হল। মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল—"

"—যখন আলেন্দীকে মারা হোল তখন আমার এক বন্ধু ছিলেন সান্তিয়াগোয়, জান রোড্রীগেজ ? তা'র মুখে সেদিন সকালের এবং তারপর পর এগারো দিনের বিবরণ শুনেছি। শুনেছি, চিলির অরাজকতার অমানুষিকতার ইতিহাস। যেদিন গ্রীনেদায় মরিস বিশপকে মারা হয়, সেদিন আমি তার পাশের দ্বীপ ত্রিনিদাদে বসে রেডিওতে মিথ্যা শুনি, আর ধরি ক্যুবা, জাপান, মস্কৌ। কিন্তু সে সময় সঠিক খবর দিয়ে চলেছে বি, বি. সি.-ও,—সঠিক। কিন্তু সাবধান।"

—"এসব তো হচ্ছেই, প্রফেসর। আরও সব হবে।—চিলির বর্তমান অবস্থা,

নিকারাগুয়ার, সান-সাল্‌ভাদরের বর্তমান অবস্থা,—আর, বলে রাখলাম,—এই পেরুর বর্তমান অবস্থাও বারুদের স্তূপের মতো। বিপ্লব, রক্তপাত, মাচো-গোচোর খেলা দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর মতো কোথাও নেই।—এরা বসে নেই।"

মধু বলে, "তা' ব'লে আমরা মিসিং লিষ্টে পড়তে চাই না।"

রোড্রীগেজ হেসে বলে—'মিসিং' কথাটার আরও একটা অর্থ হয়, হে যুবক! তোমার বরং সেই মিসিং-এর টেষ্ট থাকা মানায়। এ বুড়োকে সে-টা মানাচ্ছে না।—ব'লেই 'মিসিং মিসিং' করছে। চল দেখি কী হয়।"

কী আর হবে! সবে বন্দরের শেষ পাথুরে দেয়ালে পা রেখেছি, সান্ত্রী ধরলে,—ক্যামেরা যেতে দেবে না। আমি ক্যামেরার লেন্স খুলে ক্যামেরার ব্যাগে ভরে দিয়ে বল্‌লাম,—"ছবি নেবো না; কিন্তু বে-টার (উপসাগরটির) মধ্যে এই পৃথিবী বিখ্যাত বন্দরটির এলাকাটি দেখতে চাই। এ্যামষ্টার্ডামের, রটেরডামের সেই বিশালতার তুল্য মূল্য কি-না। নাকি শুধুই ফোতো গুমর।"

লাতিন অহঙ্কারে ঘা লাগল। "তার চেয়ে অনেক বড়ো"—বল্‌ল সান্ত্রীটি। আণ্ডায়-গণ্ডা মেলাতে ঘুঘু রোড্রীগেজ বল্‌ল, তার ঠোঁট দু'টি ছুঁচলো করে—"ও-ও-ও! এ বন্দর! ও-ও-ও!" —দু'হাত ওপরে ছুঁড়ে বল্‌ল—"তুমি নিউ দিল্লীর ল্যাণ্ড হাগার। বন্দর তো কাল্লাও বন্দর। চল, দেখাব।······বল অফিসার, কোথায় পাই একটা মনোমত নৌকো—ছোট্ট মেছো নৌকো।······ও-ও-ও! দেখবে আজ কাল্লাও কী। আর কখনও ঐ সব ড্যাম্ বন্দরগুলোর নাম মুখেও নেবে না।····· আচ্ছা, চলি অফিসার।"

চমৎকার অভিনয়!

আরও চমৎকার করে তোমার জন্যে অপরা কীর্তি এক করলাম।

বাঁধের ওপরে একটা লম্বা হুড়কো। সান্ত্রী সেটাকে তুলে দিলে তবে ঢোকার বিধি। কিন্তু তারপরেই যেমন সারি সারি কণ্ডোর পাখিগুলো গলার থলে ঝুলিয়ে ফুলিয়ে বসে আছে; তেমনি সারিসারি বসে, দাঁড়িয়ে, বেঁকে, চলে পাঁচ-ছ'টি নানা বয়সের তরুণী এবং যুবতী, স্বল্পতম, নিকৃষ্ট রুচির, লাট খাওয়া পোষাকে (?) উপস্থিতি জানাচ্ছে। আমার যেন, ওদের দেখেই বন্দর দেখার সখ উবে গেল। যেন কত কথা জানি। ওরা স্প্যানিশ, আমি বাংলা। রোড্রীগেজ হেসে লুটোপুটি। একটি মেয়েকে ইঙ্গিতে বলি, 'চল নৌকা বিহারে।'······এবং ফল ফলল। সান্ত্রীর দৃষ্টি ফিকে হয়ে গেল এই বাউণ্ডুলে বাহাত্তুরে বুড়োর ঢংঢাং দেখে।

কিন্তু রোড্রীগেজকে চেনে এমন এক জেলেনী-বুড়ী তার সদ্যফেরা ছেলের জাল গোটাতে সাহায্য করছিল। ছেলের নাম লারিও রামিরেজ। নৌকোর নাম 'সান্তামারা'। নম্বর দিলাম না এবং নামেও একটু গোল করে রাখলাম। (কারুর কোন ক্ষতি না হয়)। ওর সঙ্গে রফা হল দশ ডলার।

সেই ঘোরাটা মনে থাকবে। জল যে কী ঠাণ্ডা, বলা যায় না। এখানে 'বীচ' মানে রোদ, আর নকল জলের পুষ্করিণীতে নকল সমুদ্র স্নান। শত-শত, সহস্র-সহস্র, নানা ধরনের

নৌকো থেকে এরোপ্লেন-কেরিয়ার। সমস্তটা ঘুরে দেখে ফিরতে দেড় ঘণ্টা লাগলো। আমরা কোথাও থামিনি। ক্রমাগতঃ ঘুরেছি।

এই কালাও বন্দর আর পেরুর ইতিহাস এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে সংশ্লিষ্ট। চারধারে চেয়ে চেয়ে সব দেখি—১৭৪৭ খৃস্টাব্দে পাইরেসীর জ্বালায় বিরক্ত হয়ে রীল্ ফেলিপ্ ফোর্টের পত্তন। শেষ হোলো ১৭৭৪ এ! ভাইসরয় ম্যানুয়াল আমাৎ-এর সময়ে। কিন্তু পাইরেসীর সেই শেষ।

শুধু কি পাইরেসী দমন? সান্ মার্তিন পারেননি স্বাধীনতার সংগ্রামে কালাওকে উচ্ছেদ করতে। সে ভার পড়লো জেনারেল সালেমের ওপর। পারেননি। সাইমন বোলিভার নেতৃত্ব দিলেন। দুর্গাধ্যক্ষ তরুণ বিগ্রেডিয়ার জোষে রামন রোডিল। দুর্ধর্ষ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনানী। দু'বছর লড়াইয়ের মধ্যে শেষ তেরো মাস বোলিভারের ব্যবস্থায় কঠিন অবরোধে ভেঙ্গে পড়লেন তেরো মাস পরে। সে কথা বলেছি।

২২শে জানুয়ারী ১৮২৬! রোডিলের বিচারের দিন!

ধবধব করছে পোর্ট কমিশনারের অফিস। বিশাল কলেজ নেভী শিক্ষার মিলিটারী ম্যুজিয়ম। এখন গোলমাল। এসব বন্ধ। কিন্তু সুন্দর সুঠাম এই বন্দর প্লাজা! মনে পড়ে, মাদ্রাজ. বম্বে—হায়! ডায়মণ্ড হারবার!! এমন কি খাস লণ্ডন পোর্টও। এ যেন সদ্য ধোয়ামোছা, ছবি টাঙ্গিয়ে রেখেছে কেউ। প্রায় ত্রিশ ফুট স্তম্ভের ওপর হাত তুলে লীমা যাবার পথ দেখাচ্ছেন জোষে এন্তনিও মান্সো দ্য দেলাস্কো, কাউণ্ট অফ্ সুপারুন্ডা—পেরুর ভাইস্রয় সুপারুন্ডা।

'তাহাদের কথা ভুলেছে সবাই'……ভোলেনি সাইমন বোলিভারকে আর বিগ্রেডিয়ার রোডিল-কে।

দেখছি সেই দুর্গ। রোদ্রীগেজকে বলি—ঐ দুর্গের দেওয়াল দেখছি, ঐ কামানগুলো দেখছি—আর মনে পড়ছে বোলিভারকে এবং সেই সঙ্গে মনে পড়ছে সাংঘাতিক দুর্ধর্ষ সেই রোডিল্-কে। জিদ্ করে পাঞ্জা সে ভিড়িয়েছিল। কেঁচো, সাপ, তেলাপোকা পর্যন্ত খেয়েছিল। খাইয়েছিল সংশপ্তক সহকর্মী যোদ্ধাদের। কী দেশাভিমান যে, তারা তাও খেয়েছিল। বিদ্রোহ করেনি।

"জানো মধু রোডিল তো সেই মুহূর্তে শেষই হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর কতোই রাগ ছিল বিপ্লবীদের। সে তো একটি বন্দীকেও বাঁচতে দেয়নি। দেবে কী? দিলেই যে খেতে দিতে হবে তাকে। জল? বৃষ্টির জলও তো ঝরে না এ আকাশ থেকে। কখনও বৃষ্টি হয় না। কাজেই বন্দী মানেই আর একটি মুখ যেখানে, সেখানে শেষ হ'তেই হবে।

"তবু তো এ মানুষটা বোলিভার।"

"বিচারে বসে বল্লেন, 'বন্ধুরা, আমি জানি আজ ব্রিগেডিয়ার রোডিলের বদলে যদি স্পানিয়ার্ডদের হাতে আমি বা আর কেউ বন্দী হতাম তাহলে আমাদের কী দশা হোত। ……কিন্তু বীরের সম্মান বীর ছাড়া কে করবে? যুদ্ধও হত্যা হয়ে যায় এ কথাটি মনে

না রাখলে। আমরা এই বীরপুরুষকে তাঁর অফিসিয়াল পদক, তরোয়াল ফিরিয়ে দেবো। আমরা ওঁকে পাসপোর্ট দিয়ে ওঁকে চিরকালের জন্য লাতিন আমেরিকার মুক্ত-মাটি থেকে সরিয়ে দেব। আমাদের একটা আক্ষেপ, এমন বীরকে আমরা কাছে আমাদের মধ্যে রাখতে পেলাম না। আর স্পেনও যে এঁকে নিয়ে কি করবে তাও অনিশ্চিত।"

সেদিন কায়াও বন্দরে "জয়তু বোলিভার" ধ্বনির সঙ্গে তোপ দাগার হর্ষ মিশে আকাশকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। ক'গুারগুলোর ডানার ঝাপটে সারা আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল।

ফেরার পথে রোদ্রীগেজ একটি ভয়ধরা এলাকা দিয়ে গাড়ি চালাতে বল্‌লো এরেরাকে। সত্যিই ভয় লাগে। পর পর লম্বা লম্বা পথ। উবড়ো-খুবড়ো বে-মেরামতির পথ। ভাগ্যিস জোলো জায়গা নয়। বাড়িগুলো ধূলোয় ভর্তি। মাঝে মাঝে হাতে ঠেলা 'রেড়ীর ওপরে টম্যাটো, শসা, কুমড়ো, আলু। কেউ বেচছে ডিম, বাসন, সাবান। কিন্তু সব অস্থির। সব 'এখুনি আছে এখুনি নেই'—ভাবের। আর কী সন্দিগ্ধ হিংস্র জঘন্য দৃষ্টি। কেন ? কেন ? ……ওরা মোটর চড়া সৌখীন টুরিষ্টদের 'দ্রষ্টব্য' জীব হতে ঘৃণা বোধ করে। আরও ঘৃণা করে ওরা খবরের কাগজের শকুনদের।

এরাই সর্বহারা। এরাই সবহারানো মহা বিপ্লবী। এরা সংশপ্তক। এদের সংঘাত এষ্টাব্লিশমেণ্টের সঙ্গে। সংঘাত চলেছে। কালাও শহরের অর্ধেকের বেশীর ভাগ ওদের আওতায়।

গাড়ির বেগ জোর হলেও পথের দুর্দশার জন্য গাড়িকে অনেক সামলে দৌড় মারতে হচ্ছে। আমি তারই মধ্যে দু'টো শট চুরি করে নিলাম।

রোদ্রীগেজ বল্‌লে, "খলিফা, আজও কি ইনষ্টমাটিক কায়দা চালালে ?"

—"কোথায় ?"

—"পোর্টে ?"

—"নাঃ! অন্য ক্যামেরাটা তো চালু ছিলই। জুম পরানোই ছিল। একটারই লেন্স খুলে অভিনয় করেছিলাম। ছবি ঠিকই নিয়েছি। আমাদের নেয়ের ছবি, তোমার বন্দরের ছবি, তোমার বন্দরের জখীম জখীম জাহাজের ছবি। সবই এসেছে। পাইনি ঐ স্কয়ারটার ছবি। তা জোগাড় করে নেব।"

এনে ফেল্‌ল স্বর্গ-পুরীর মত (যাইনি স্বর্গে কখনও, কিন্তু অঢেল মদ, ফালতু মেয়ে, আর বিনি পয়সার আলস্যের অর্থাৎ মেহনতহীন ভোগরাজ্যের ছবি বোঝাতে গেলে বলি স্বর্গ!) এক সুন্দর বীচ টাউনে। সেই রং-চং করা বড় বড় ছাতা, তাঁবু, বীচ চেয়ার, প্রায় উলঙ্গ দেহ বিস্তার মেলে, ধরে-দেখানো যৌবনের ঝাঁঝ, অযৌবনের ক্রন্দন, বয়সের বিষাদ, শিশুর কোলাহল, বীচ-হাউসের খিদমৎগারদের জো-হুজুরপনা, রঙীন বেলুন, কোকাকোলা, আইস্‌-ক্রীম—যা' শুনলে দেখলে এক ধরনের ক্লীবদের জিভে জল সরবে,—সব একৃকাঠ্‌ঠা।

জায়গাটার নাম পুস্তা। রোদ্রীগেজ বল্‌লে—'সখের জায়গা, বাবুসাব! খলিফা

জায়গা। বলো তো, ভালো রেস্তোঁরায় ভালো কিছুর সঙ্গে সঙ্গে ভালো রান্না খাইয়ে দিই। বেলা হয়েছে।"

আমি বলি, "তুমি বুড়ো হয়ে গেছো, রোদ্রীগেজ। বস্তি প্রদেশে খিঁচ ধরেছে। ওসব রস ছেড়ে কিছু ফলের রস খাওয়াও তো।"

গাড়ি থামলো, সে যেন খেজুর কুঞ্জ। হবেই তো। আসলে তো মরুদ্যানই বটে। গাড়ি থেকে নামতেও ইচ্ছে হোল না। মনে আছে মায়ামীর বীচেতেও আমার মন ঝগড়ুটে হয়ে উঠেছিল।

সে হিসেবে বীচ হতে হয়তো ত্রিনিদাদের বীচ্; সেণ্ট ল্যুখ্যার, তোবাগোর বীচ। রাজা বীচ বার্বাডোজের।

রোদ্রীগেজ রস এনেছে জাগ্‌ভরে। আমাদের গেলাস ধরিয়ে দিলে।

'ওঃ! কী রস হে? কী রস?' কী একটা নাম বল্‌লো। বুঝতে না পারায় নিয়ে এলো হাতের মুঠোয় ফালসা, খিণী´, আর যাকে ত্রিনিদাদে বলতুম "প্যাশন্ ফ্রুট্।"

গাড়ি এলো আরও একটি কিন্নর-নগরে।

রোদ্রীগেজ বল্‌লো, "বুল-ফাইট দেখবে?"

আমি? বুল ফাইট? জীবনে প্রথম ও শেষ বুল-ফাইট দেখেছি মাদ্রীদে। পরপর ছ'টি বৃষকে—নিরীহ বৃষকে অত্যন্ত নৃশংসের মতো বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে হত্যা করলো কয়েকটা মানুষে মিলে। শ্রীমান মাতাদো-র যে খেল দেখান, যখন দেখান তখন সে বৃষের কাঁধে বেঁধা অন্ততঃ চার-পাঁচটা বঁড়শী। ওঃ! কী যন্ত্রণা বলোতো। আবার ঘোড়-সওয়ার বীরেরা বর্শাও গাঁথেন। তবু দেখেছি সেই অবস্থাতেও একটি বৃষ একজন মাতাদরকে ধরাশায়ী করে শিংয়ে তুলে ছিটকে ফেলেছিলো। ওঃ! তখন সারা ষ্টেডিয়াম থেকে সেই ষাঁড়টাকে লক্ষ্য করে কুশন ছোঁড়ার কী ধুম। পাথরের মেঝেয় বসার অসুবিধা দূর করার জন্য মাদ্রীদে দর্শকদের বসার কুশন দিয়ে দেয়। ও পাপ আমি দেখবো না। তার চেয়ে ষাঁড়ের লড়াই ঢের বেশী ইন্টারেষ্টিং।"

জায়গাটার নাম মীরা ফ্লরেস্। এরই একধারে গতকাল এসেছিলাম। সত্যিই ধনকুবেরদের বাস। এখানে খাবার ব্যবস্থা। অর্ডার করলাম, 'পাঁড় লীমায়িক খানা—!' মানে লীমার সেই ইন্‌কা খাবার খাব। তবে লঙ্কা নয়। মানে তোমাদের তো আবার দু'শো আড়াইশো রকম লঙ্কা। ঝাল নয়। নৈলে লঙ্কার সুগন্ধ, ক্লোরোফিল, ভিটামিন—সুস্বাগতম্, সুস্বাগতম্।"

সামনে না আনলে টের পেতুম না। কলা পাতায় মোড়া ছোটো ছোটো পাটী-শাপটার মত আটটি। কলা পাতার বেড়টি পুড়ে ঝলসে গিয়ে পোড়া দাগ ধরেছে। সেটি সন্তর্পণে খুলে সামনে ডিশের ওপর চেঁছে তুলে দিল। সঙ্গে কাঁচা ভুট্টা সিদ্ধ আর লঙ্কা ও ডিম দেওয়া একটা সস্ এনেছিল। বললে, পাথর গরম করে চারধারে সাজিয়ে মাঝে এই পাতা মোড়া মাছ সাজিয়ে দেয়। ওপরেও গরম পাথর। পুড়ে গেলে খেতে হয়। বলে, পাচামাঙ্কা, পেরুর ইন্‌কা রান্না।

বলি, "কচু। এ আমার দিদিমার 'বৈর্‌হালিয়া' (বরিশালীয়া) রান্না। নাম 'পাতুড়ি'। ইলিশের পাতুড়ি, চিতলের পাতুড়ি, ঘুষি চিংড়ির পাতুড়ি নারকেল কোরা দিয়ে—তবে এটা কী মাছ? বললে বটে, সার্ডি। হবেও বা। কিন্তু ইলিশের যদি গন্ধই না হল, সে তো পৈতে ছাড়া বামুন। খাওয়ালেও পুণ্য নেই, খেলেও মজা নেই। কিন্তু পাতুড়ির সঙ্গে প্রচুর কুচো পেঁয়াজ এবং কয়েক টুকরো আভোকাদো। মজা এই যে, একটিও কাঁটা নেই।

এদের সেরা সেরা রান্না চিচারোন্‌স্‌, তামালেজ্‌, পাপ-আ-লা-হুয়াঙ্কাইনা—সবই পোর্ক বা বীফ্‌। ষাঁড়ের লিভার অতি প্রিয় খাদ্য এদের।

পাশে বসে মানুষটা কি ইঁদুর খাচ্ছে? বিদেশে খেতে বসে পাশের লোক, দূরের লোক কে কি খাচ্ছে, নজর করা আমার একটা (বদ) অভ্যাস। কিন্তু দেখি। না দেখলে শিখব কি? এ দেশী মেয়েরা যখন আমার সাথে বসে, আমার এই অভ্যাস বাবদ বিব্রত বোধ করে।

রোদ্রীগেজ বলে, "না, খুব বড়ো নৈলে ইঁদুর খেয়ে মজা নেই। মানিক্যু খুব সুস্বাদু মাংস। এটা গিনিপিগ্‌। গিনিপিগ্‌ হয়ও যতো, রাঁধতে জানলে খেতেও অপূর্ব।"

অপূর্ব কেন? অ-দক্ষিণও হয়ে থাক্‌। আমি অর্ডার দিলাম কোনো বিনা মাংসের কিছু।

এলো পাপা-আ-না-হুয়ান্‌কাইনা। আস্ত আলু সেদ্ধ করে ছাল ছাড়িয়ে একটু ভেজে পেঁয়াজ মশলায় গরগর করে দেওয়া, কাঁচা লঙ্কার কুচি নয়, গোল গোল ডুমো ওপর থেকে সাজিয়ে দেওয়া। বিশাল লঙ্কা, বিশাল ডুমো, কিন্তু নরম, কচি যেন শসা। খুব সুগন্ধ। ঝাল, ঝিঙ্গেয় যতো, তার বেশী নয়। চমৎকার! পাশে রাখা ডিশে সেদ্ধ আর্টিচোক, আর তারজন্যেই সস্‌।

এরপর নিশ্চয় মিষ্টান্ন। সবাই মত করলো আইসক্রীম। তারও পরে আমি কফি—ব্ল্যাক কফি।

ন্যু-ইয়র্কের অর্ধেক দাম। আমাদের অশোক হোটেলের চেয়ে ঢের সস্তা। জায়গাটা কিন্তু মীরা ফ্লরেস্‌—পেরু কেন, লীমার সর্বাধিক মহার্ঘ পাড়া।

এখনই একটু তাড়াতাড়ি লেগে গেল। সান্‌ ইসিদ্রো এ্যাভিন্যুতে একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। চিন্‌ক বা চিমু কৃষ্টি, পেরুর প্রাচীনতম কৃষ্টি। সেই সেকালের একাদশ শতাব্দীর একটি কৃষ্টির ঘুমন্ত প্রতীক। মোহেন্‌-জো-দারো এক হিসাবে ঘুমন্ত, ফতেহপুরসিক্রী অন্যভাবে ঘুমন্ত। শহর ত্রুহিলোর কাছে আছে চান্‌-চান্‌ শহর; তাদের চেয়েও ঘুমন্ত, তাদের চেয়েও জীবন্ত। লীমার উত্তরে এত প্রখ্যাত এবং বিশিষ্ট প্রত্ন-সম্পদ আর নেই। এর কয়েকটা কারণ আছে। ত্রুহিলো কাজামার্কা তল্লাটটাই যেন কলকাতা থেকে জামশেদপুর। পথটা দক্ষিণের মতো শুকনো না হলেও বৃষ্টি বলতে কিছু নেই। এই এলাকায় অন্ততঃ দেড় হাজার বছর আগেকার কৃষ্টির অনেক কিছু হুবহু পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফলতঃ পেরুতে প্রত্ন-সম্পদ্‌ দেখার দু'টি জায়গা। এক কুজ্‌কো,

দুই ত্রুহিলো। কথা হল সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে, রাত দু'টো আন্দাজ বেরিয়ে পড়া। ছ'টা নাগাদ পৌঁছে কোনো হোটেলে-মোটেলে তাজা হয়ে নেওয়া যাবে। দশটা নাগাদ ফিরবার পথে পথের দৃশ্য উপভোগ করা যাবে। বেলা দু'টোর মধ্যে লীমায় ফিরে লাঞ্চ আর বিশ্রাম। বিকেলে শহরের পার্কগুলো দেখা।

আমি রাজি। এরেরা বল্‌লো—"আমার গাড়িও রাজি।" স্থির হোল, আমরা পেট্রোল দেব, আর এরেরাকে দেব নগদ ত্রিশ ডলার।

এ বেলাটার অনেকখানি পড়ে আছে, বর আসার আগে কনের মতো সাজে। কয়েকটা জায়গায় থেমে থেমে দেখলাম হাতের কাজের বাজার। আলপাকা, লামা, ভিকুনার লোমের কম্বল, কার্পেট, শাল, পোঞ্চো, কোট, টুপী ছাড়াও কাঠের, তোতোরা বেতের কাজ। বড় বড় লাউয়ের খোলে ছুরি দিয়ে চেঁছে কাজ যা করেছে, কেবল আন্দাজে, সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে বার করে সাজাচ্ছে। এটাই শিল্প। এতে মানুষের মন আছে। এর নাম 'বুতিক', অর্থাৎ যার দ্বিতীয় নেই, তেমন সামগ্রীর দোকান। এমন 'বুতিক' ম্যাডিসন্ এ্যাভেন্যুতেও মেলে না। (ব্যুতিক বাতিক নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছে করে !)

হঠাৎ গাড়ি থামল একটা খাল পাড়ে। সামনে ছোটো গেট। একটি সুন্দর কিন্তু মাটির অর্থাৎ আডোবের তৈরী 'পিরামিড' ধর্মী সৌধ, কিন্তু পিরামিড নয়। বলে, 'পান্-দ্য-আজুকার, পান অর্থাৎ পিঠে (পান্-কেক্) আর আ-জুকার অর্থাৎ (সুগার), চিনি। সত্যিই চিনির পিঠে বটে। নিখুঁত সাজানো প্রায় শাদা মাটির সমান ব্লক। হাজার হাজার ব্লক দিয়ে সরল রেখায় অমন কোমল স্নিগ্ধ মাধুরী, দেখার মতো। অথচ হাতওলা মানুষ শুধু হাত দিয়ে গড়ে গেছে। সমস্তটা ঠোস। কোনো দিন, হাজার বছর আগে, কোনো দেব-মন্দির ছিল। তলাটা সরকারী খরচে সিমেণ্ট আর বড় বড় নুড়ি পাথরে বাঁধাই, ধ্বস্ না নামে। নামার হেতু নেই। কারণ নামাবে যে, সেই বৃষ্টি বলে তো কিছু নেই।

আমায় রোড্রীগেজ বোঝাচ্ছে, "রীম্যাক ভ্যালীর 'প্যান্-দ্য-আজুকার'-এরই মতো এক অপূর্ব স্নিগ্ধ মন্দির-বেদী পাবে সান-ইসিড্রোতে। রীমাক এবং লুরীন এলাকাতেই এদেশের, ইন্‌কাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি না হলেও, প্রাচীনতম কৃষ্টি পাবে ; তার মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিকের অনেক কিছু দেখার আছে। এসেছো যে কালে দেখেই যাও। ঐ 'ক্রিলোন' ছাড়। আমি 'স্যাভয়ে' নিয়ে যাব। অর্ধেক খরচা। সেই পয়সায় ঘুরে এস ত্রুহিলো কাজা মার্কা এবং দেখে এসো চান-চান। প্রাক্ ইন্‌কা চিমাক কৃষ্টির বলিহারি দেখে আসবে। কুজ্‌কো আর চান্-চান—এই তো পেরু।······

"এই প্রাচীন মন্দিরগুলোকে বলা হোত 'হুয়াকা'। পাচাকামাকে হুয়াকা পেয়েছ। প্রসিদ্ধ হুয়াকার মধ্যে পাবে 'সিয়েনে-গুইলা' (লুরিন), আর অপূর্ব সুন্দর ওয়ালামার্কা। তোমাদের তাজ, মিশরের পিরামিড। আর এখানে দেখার মতো ওয়ালা মার্কা। ডক্টর আর্তুরো হিমালেজ বোর্জা 'ওয়ালামার্কা কে নূতনের মতো করে সংস্কার করেছেন। লীমার আট মাইলের মধ্যে পাবে হুয়ানা জুলিয়াকা, হুয়ানা মারাঙ্গপ, হুয়ানা মাঙিও সালাদা। ডক্টর বোর্জা এরই মধ্যে গড়ে তুলেছেন সুসংস্কৃত মাটির ইঁটের প্রাসাদ। পুরুচুকো

আর্কিও-লজিক্যাল সিটি। তাতে আছে ম্যুজিয়ম। ···কিন্তু এই-সবই পাবে চান-চান-এ।

গাড়ি এ্যাভেন্যু-টাক্‌নায় এলো,লীমা শহরের অধিষ্ঠাত্রী সন্ন্যাসিনী সান্তা রোজার গির্জায়। আমি তখন আমার ভোরের কীর্তির কথা বলি। রোদ্রীগেজ বলে, 'রোসো', রোসো। তোমায় ছুঁই (**Let me touch you**)। ওদের কাঠের বাটীতে কাঠের চামচে করে পরিজ খেয়ে এসেছ। এখন লীমার সব মদ খেয়ে, সব কাটা ক্যাসিনোয় জুয়া খেলে, ভিক্তোরিয়া ষ্ট্রীটের পাঁচ নম্বরে ঢুকে বুনো পাঁঠার গাজর, মুলো খাবার তাড়ায় আট থেকে আশীটা জ্যান্ত বিবি চিবিয়ে খাও। তবু, তবু তোমার বেহেস্তের পথ কে রোখে ? কার সাধ্য ? খলিফা হে! খলিফা! হাঃ! হাঃ! হাঃ! সান্তা রোজার দরবারে প্রাতঃকালে উঠ্‌তি-পড়তি সন্ন্যাসিনী দের পাশে বসে পরীজ ভক্ষণ ? ওতো 'নেক্‌টা'র ভক্ষণ!"

সেই কালাও যুদ্ধের বিজয়ের দিনটা (২-৫-১৮৬৬) স্মরণ করে সেকেণ্ড মে স্কয়ারে একটি মনুমেণ্ট। তেমনি মনুমেণ্ট ১৯৪১এর চিলি-পেরু যুদ্ধের।

শিল্পী তাদোলিনির সৃষ্টি সাইমন বোলিভার ও তার ঘোড়া পাস্তর্ উজ্জ্বল করে দিয়েছে বোলিভার স্কয়ার। কিন্তু রিপাবলিক স্কয়ারে এসে নেমে পড়লাম। আরে—কুইপা এ্যাভেন্যুর মতো সুন্দর পথ খুব কমই দেখা যায়। মেক্সিকোয় 'নোভা চাপুলতেপেক পার্ক' আরও সুন্দর। কিন্তু গাড়ি ঢুকতে দেওয়া হয় না। এ পার্কের দু'ধারে চওড়া পথ। গাড়ি চলেছে যেন বিদারী শাড়ির নক্সী চওড়া পাড়ের বাঁধনের মাঝে মুক্তগতি ভীনাস ছুটে চলেছেন।

এরই একটা অংশে বিশাল রিপাবলিকান পার্ক। না নেমে পারা গেল না। শুনলাম, এককালে নগর প্রবেশের মুখে এ জায়গাটা ছিল ঘোড়ার গাড়ি, ওয়াগন্‌দের আড্ডা। ময়লার স্তূপ। গুণ্ডা, বদমায়েসি, নোংরামির তীর্থ। এখন চিন্তাশীল নগর-প্রধানদের প্রভাবে এবং নাগরিকদের হাতের গুণে এ এক নন্দন-বন।

রাশি রাশি ছেলের দল, শিশুরাও খেলছে। মায়েরা গাল-গল্প করছে। যারা পারে, কৈশোর-যৌবনের উচ্ছলতায় ভাসিয়ে দিচ্ছে চারিধারের শ্যামলিমা, ওপরের আকাশ। দূরে দেশ-মাতৃকার ঊর্ধ্বমুখী প্রতিমা সু-উচ্চ স্তম্ভের ওপর। এর প্রথম সারির তিনটি ব্লকের মধ্যের অংশটি সাজিয়ে দিয়েছে চীন। এখানে আছে বাহারি গাছের এক অনিন্দ্য সুন্দর উপবন। আর আছে ল্লামা মনুমেণ্ট ; একটি কৃষকের মনুমেণ্ট, জোয়ালে জোতা একজোড়া ষাঁড়ের মাঝে তৃতীয় শরীক হয়ে চলেছে। ····· কিন্তু এ কবে ? পেরুতে তো পশু দিয়ে চাষ ছিলো না। নিশ্চয়ই উত্তর ঔপনিবেশিক কাল।

সান্ ফ্রান্সিসের নামে চার্চটিতে রোদ্রীগেজ যখন জোর করে আনলো, তখনও অনেক বেলা আছে। ঢুকতে পয়সা লাগে। কারণ এতে আছে 'কাটাকুম্ব্'—অর্থাৎ মরে যাবার পর ধর্মপ্রাণ-গুলির দেহ-পিঞ্জরগুলিকে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখার মহাফেজখানা (আর্কাইভ্)। কয়ামতের দিনে শেষ বিচারের ডাকে সশরীরে জেগেই মৃতদের দৌড়

দিতে কষ্ট হয় না। বাক্স/কফিন/গোর/পাথর এসব ঝামেলা ঠেলে আসতে দেরীও তো হতে পারে।

কাটা-কুম্বের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রোমে। রোমে খৃষ্টানদের মনে করা হোত বিপ্লবী। যীশু কবে, কোথায় বলেছিলেন—"কে কার রাজা? সব রাজার রাজা আমি।" তাই তাঁকে কাঁটার মুকুট পরিয়ে উপহাস করা হয়েছিল। ক্রুশে ঝুলিয়ে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আর সাঙ্গোপাঙ্গোরাও যখন তেড়িয়া-মেড়িয়া করে বেড়াতে লাগল সব ক'টাকে একে একে শূলে চড়িয়ে, নানা যন্ত্রণা দিয়ে খতম করা হোল। আজ তারাই 'সেণ্ট', দেবর্ষি পদবাচ্য। সেণ্টপল্, সেণ্ট পীটার, সেণ্ট জেমস্, সেণ্ট সেবাষ্টিয়ান, সেণ্ট অগষ্টিন ইত্যাদি আরোও অনেকে দেবতার পূজা পান।

তবু খৃষ্টের দলেরা রোমে দাপাদাপ করে বেড়াত। চুপি চুপি সন্ন্যাস জীবন যাপন করত। মাটির তলায়, বনে জঙ্গলে, খণ্ডরে প্রার্থনা সভা বসাত। কিন্তু মরার পর কবর দেবার কি উপায়? রোমে তো রোম্যানরা সবকে জ্বালাত। কবরের জায়গা পায় কোথায়? গোপন হতে হবে। নৈলে সিংহের পেটে দেবে। জানাজানি থেকে বাঁচোয়া হওয়া যায় কী ভাবে? তাই মাটির তলায়, পরিত্যক্ত খনির গহ্বরে, কারুর কারুর বাড়ির তলায়, থাকে থাকে শবদেহ গুলো রাখা থাকত। মাউণ্ট সীনাঈ-তে খুব 'পবিত্র' শব-সংগ্রহ আছে। পরে প্রত্যেক শব-সংগ্রহের স্থানকেই পবিত্র তীর্থ (!) মনে করা হোত। 'কর্পাস্ ক্রিষ্টী' এবং 'অল-সেইণ্টস্-ডে' বলে দু'টি তিথি এই মৃতকের পূজায় চিহ্নিতই হয়ে গেল।

(কে বলে 'শ্রাদ্ধ' কর্ম নেই? দক্ষিণার মৌকা পেলে পুরুৎ তা কি কখনও ছাড়ে?)

যেদিন স্প্যানিশ লুঠেরারা মেক্সিকোর শ্রেষ্ঠ তীর্থ মন্দির নগরী চালুলা কেড়ে নিল এবং চালুলার সুবিশাল মন্দির ভেঙ্গে দিয়ে চার্চ প্রতিষ্ঠা করল, সে দিন চালুলায় পালন করা হয়েছিল বিষণ্ণ ও অশ্রুসিক্ত অরন্ধন-দিবস; চালুলার আকাশে এক মর্মভেদী ভীষণ কান্নার শব্দ ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের বিক্ষোভে উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু খৃষ্টের ভক্তরা তা শুনতে পায়নি, বা শুনেও গ্রাহ্য করেনি। শেষেরটার সম্ভাবনাই বেশী (মন্দির নগরী তীর্থ প্রধান চালুলাকে গুঁড়িয়ে তিনশো দিশী মন্দিরে তিনশো পবিত্র চার্চ গড়ে শহরটার বড়ো অংশেই লাঙ্গল চালিয়ে দিয়েছিল খৃষ্টের ভক্তেরা। —সেদিন তাদের অতো বড়ো জয়ের গৌরবের জ্বালা মেক্সিক জাতের চামড়া-হাড়-মাংস-মজ্জার মধ্যে চারিয়ে দেবার আশায় তারা সেই মন্দির বেদীর তলায় কাটা-কুম্বের, অর্থাৎ মড়া রাখার শ্মশানের ব্যবস্থা করেছিল! ডোমরাও একাজ করে না। এখনও গাইডরা থরে থরে সেইসব শবদেহের কেয়ারী দেখায়। ভক্তেরা মাথায় গায়ে ক্রশ আঁকে! ফলং—গির্জা-গুরুরা দু'-পয়সা দিব্যভাবে রোজগার করে। চালুলার গির্জায় আয় নাথ-দ্বারিকার মন্দিরের আয়ের কাছাকাছি।

এই গির্জার সন্ন্যাসীদের আশ্রমে ঢুকেই যথারীতি উদ্যান। উদ্যানকে ঘিরে খিলেনে-থামে-টালির মণ্ডনে মণ্ডিত শিল্পে ধন্য ধন্য করা পায়চারীর পথ। দেয়ালের ছবিতে ছাতা পড়ছে, চাকলা উঠছে, ধূসর, তবু দেখতে হয়। পাছে সম্মান দেখাতে ভুলে যাই, তাই

আগ বাড়িয়ে বলে দেয়, টাইলগুলো সিসিলিয়ানদের বৈচিত্র্যতে চিত্রিত। হায়! সেণ্ট ফ্রান্সিস, কতো সরল সহজ জীবনযাপন করতে তুমি; আর তোমার নামে এমন সৌখীন উদ্যানের ব্যবস্থা!! ভোগ করছেন সম্মানিত ত্যাগীর দল।

কাউন্সিল-গৃহে মেরীর ছবি। হাত এবং মুখ ছাড়া সেই বেচারী ইহুদী ছুতোরের 'বরাকী' স্ত্রীর সর্বাঙ্গে স্প্যানিশ সম্রাজ্ঞীর মত সোনার দাগড়া মারা এক পোষাক। সোনার রং দেখায় আর বলে 'আসল সোনার তবক গোলা।' (কেউ শোনায় না আসল মেরীর পিতৃপরিচয়হীন সন্তান বহনের বিপন্ন জীবন পরিক্রমার পুণ্য কথা)।

স্পষ্ট বোঝা যায় দিশী-ইন্‌কারা, যারা একদা মহাসমারোহে তাদের ভীরাকোচা, পাচাকামাক, কুইস্‌মাঙ্কু,—বা সূর্য, বা চন্দ্র দেবীর পূজা করতো তাদের বোঝানর জন্যই এ পোষাক। ষ্টাইলটা ইন্‌কারই বটে।

এর ভিতরেও মিউজিয়ম। অর্থাৎ গির্জার কাছে কী কী 'ইশ্‌শজ্যি' (ঐশ্বর্য) জড়ো হয়েছে তারই ঠাট-গুমর দেখানো। তা,—সে দেখানো সত্যিই হয়েছে। কুজ্‌কো-শিল্পীর বিখ্যাত জড়োয়ার কাজে ভর্তি কতো সোনার বাটী-থালা-চামচ মুকুট! চামড়ায় ছাপা পার্চমেণ্টে ছাপা এবং সচিত্র লেখা অনেক বই। আশ্চর্য হয়ে যাই এদের 'কয়ার হল' এ এসে। যাঁ'রা শুনবেন, তাঁদের বসার ব্যবস্থা। দেয়ালে লাগানো চেয়ারের পিঠ ধরে উঠে গেছে কারুকার্য করা, চমৎকার কারুকার্য করা, কাঠের খোদাইয়ের চরম,—সীডার কাঠের (আমাদের শাদা দেবদারু) চেয়ার প্রায় বারো ফুট উঁচু সে কাজে হলের সব দেয়াল ভর্তি! তেমনি মেঝে, তেমনি সব পার্টিশান—আর তেমনি পাথুরে চূণে গাঁথা বিরাট খিলান—প্রায় আটটি। মাঝে একটি গোল বাক্স। ঘোরালেই বাজনা।

এরপরে 'ক্যাটাকুম্ব'। সেই ১৬০০ খৃষ্টাব্দের শবও আছে। ইচ্ছে হলে বাক্সের ডালা তুলে 'পেত্যখ্যি' করে পরমতৃপ্ত হতে পারা যায়। এই ফ্রান্সিস্‌ ছিলেন খৃষ্টধর্মের কেন—মানুষের ধর্মের ইতিহাসে এক সর্বস্বত্যাগী মহাপুরুষ, যাঁর জপ, ধ্যান, পূজার বেশীর ভাগ সময়ই কাটতো বনের পশু-পাখির সঙ্গে বন্ধুতা করে। তাঁর লেখা বই আজও আমি পড়ি। আর ভাবি, এই পরমহংসকে দক্ষিণেশ্বরে বসাতে পারলে মা ভবসুন্দরী আর তার পাগল ছেলে কতো আদরই করতেন। মানুষের ভাবায়তনের ইতিহাসে আসীসীর সন্ন্যাসী ফ্রান্সিসের নাম এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

যথেষ্ট হল। এবার হোটেল, স্নান, ডিনার, ঘুম, সকালের যাত্রা।—

রোদ্রীগেজ বাড়ি যাবে। আমি বলি—"না, দাদা। তুমি চান করে কাপড় বদলে এস। তোমাদের নাম করা চীনা রেস্তরাঁ 'এবনী', তাম্বো, চিফালুংলুং (Ebony; Tambo; Chifa Loong Loong),—ওর একটা পরখ করতেই হবে।"

—"ভীষণ দাম, প্রফেসর।"

—"এবার কিন্তু তোমায়ই খলিফা বোধ হচ্ছে। চলো কফি খাও। বুদ্ধি খুলবে। তাছাড়া, স্বাভয়ের ব্যবস্থা তো করতে হবে।"

"ওঃ! ঠিক! বাড়ি হয়ে আসছি। দেড়ঘণ্টা সময় দাও।"

॥ ত্রুহিলো চান-চান ॥

ঠিক সময়ে গাড়ি এল। তখনও চোখে আঁট ঘুম। আমারা যাচ্ছি ত্রুহিলো-চিঙ্কিন্। এই অজুহাতেই আমরা হোটেলের ঘরও ছাড়লাম। কিন্তু প্রত্যেক 'রাজা' হোটেলে থাকে লেফ্‌ট্‌ লাগেজের ব্যবস্থা। লণ্ডনে পেয়েছিলাম রীজেন্ট হোটেলে, চেরিং ক্রশ হোটেলে। ন্যু-ইয়র্কে এ ব্যবস্থায় ঘ্যান্ ঘ্যানানী। বড়ো বড়ো হোটেলে আছে ব্যবস্থা, তবে আদৌ ফ্রী নয়। এরা রাখল। ফ্রীই রাখল। মায়ামীর হোটেল হলে নিজের দায়িত্বে 'হলে'ই রাখতে হতো। এখানে এরা সযত্নে রেখে দিল।

"ফিরে এসে বাক্স দু'টো বাগিয়ে আনার 'ভার' আমার,"—বল্‌লো বন্ধু রোদ্রীগেজ।

পথ অন্ধকার। নির্জন। বললাম, "রোদ্রীগেজ, আমি ঘুমুই; নৈলে মধুর নাকের ডাক শুনতে হবে।"

গাড়ি চলেছে প্যান আমেরিকান হাইওয়ে ধরে সোজা উত্তরে। এক্কেবারে সোজা অবাধ পথ। বাঁ-ধারের পাহাড় এবং বালিয়াড়ী থেকে উড়ে আসা বালির আস্তর ছাড়া পথে আর কোন বাধা নেই। মাঝে মাঝে ত্রিপল ঢাকা যে সব ট্রাক উল্টো দিক থেকে আসছে,—ওরা যাবে কালাও, লীমা। যাত্রী গাড়ি—বাসই হোক, ট্যাক্সি বা মোটরই হোক, নেই। এ সময়ে ওসব বন্ধ। পথে 'ব্যাণ্ডিট্‌' একেবারে নেই, তা নয়; কিন্তু প্যান্ আমেরিকান পথটি হবার পর বন্ধ।

বলছি ঘুমুচ্ছি; কিন্তু আমি তো ভাগ্যবান মধু নই। নিদ্রা আমার রোগ নয়, ভোগ। কম বা বেশী সময় সুবিধা বুঝে কমতি-বাড়তি হলেও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সিকি ভাগের বেশী দিতে নারাজ। ন'টা থেকে দু'টোর মধ্যে চার ঘণ্টা তো হয়েই গেলো। আর দু'টো থেকে সাতটার মধ্যে ঘুমে-জাগরণে হলেও আরামেই পাঁচ ঘণ্টার পকেট মেরে কোন না তিন ঘণ্টা আরাম করেছি। নাঃ! আমার ক্লান্তি বলে কিছু নেই। পথের একেবারে বাঁয়ে বরাবরই সমুদ্র। বাতাসে, গর্জনে ও মাঝে মাঝের দর্শনেও বোঝা যাচ্ছিল।

সাতটা বেজে গেছে। মোটেল 'ইন্‌কা'র বাগানে বসে আমরা প্রাতরাশ সারছি। দাঁতও কষ্ট দিচ্ছে। মধুও সেবা করছে। এনে দিয়েছে পাতলা করে কাটা রুটি ডিমে ভিজিয়ে ভাজা। আমার প্রিয় খাদ্য; পানীয়—ফলের রস।

আমি প্রশ্ন করি, "রোদ্রীগেজ, আজই নাম বোলিভিয়া, একোয়েদোর, কলম্বিয়া—কিন্তু সবই তো ছিলো ইন্‌কা সাম্রাজ্য। এদের ইন্‌কা নাম কি ছিলো?"

—"তোমাদের মাউন্ট এভারেস্টের কি নাম ছিলো ?"

হেসে বলি "কেন ?—গৌরীশঙ্কর।"

—"হাসছো কেন ?"

"কেন ? নাম করণের ভণ্ডামীর কথা ভেবে। আমরা বললাম্—গৌরীশঙ্কর। কিন্তু গৌরীশঙ্কর কি নাম নাকি ? ঐ সে নেপালী পাহাড়ী-জাত শের-পা, ওরা কি সংস্কৃত ভাষার কেউ ? ওদের দেওয়া নাম ছিলো—'শোমো-লুংমা'। এই হোলো বিজেতা আর পরাজিতদের মধ্যে সম্পর্ক। ইংরেজই বলো, স্পেনই বলো—জয় করার পরে বিজেতারা পরাজিতদের সমাজ থেকে দূরে থাকতে চায়। এই দূরত্ব বেড়ে চলে ভাষায়, পরিচ্ছদে, পঙ্কিকায়, উৎসবে-ব্যসনে ; এবং এই ক্রমবর্ধমান দূরত্বটার মধ্যে মিশিয়ে দেয় উপেক্ষা, অবহেলা, ঘৃণা, করুণা-মিশ্রিত ব্যবহার, মিথ্যা সহনশীলতার অতিরঞ্জিত ভাণ। ভারতবর্ষে ইংরেজদের কালের কোন শহর নেই যার মধ্যে নতুন শহর আর পুরোনো শহরের ভাগাভাগি নেই।"

—"কেন ? সেটা কি কেবল শান ?"

আমি হাসতে থাকি। "আসলে ভয়। বিশ্বাসের অভাব। প্রাণে প্রত্যয় নেই কারণ প্রাণের চোখ-রাঙানী আছে, অধিকারের মসনদে ঠেসে বসে হুকুম চালাচ্ছো, এ অধিকার তোমার মুঠোর অধিকার। মুঠো শিথিল হলেই সর্বনাশ। এই ভয়কে চাপা দেবার জন্য আড়ম্বর। বিদ্বানদের কলম ভাড়া করে লিখিয়ে নেওয়া 'সমর্থ জাতি' ও 'অসমর্থ জাতি' 'বলবান জাতি' ও 'দুর্বল জাতি', এবং এর চেয়েও গাঢ় বিষে ছোপানো কথা—'ঈশ্বরের বাছাই করা জাত' আর 'ঈশ্বরের করুণায় বঞ্চিত বেচারী জাত।' স্পানিশ, ইংরেজ, বা সিঙ্-সুঙ্, বা জর্মন-জাপানী নয়। আমাদের আর্যামীর দব্-দবানীও ঐ সংজ্ঞাই গো। আর্য নামক ডাকাত লুঠেরারা নগর ও সভ্যতা ধ্বংস করতে করতে এগিয়ে গেছে। এদের দলের লীডারকে লীডার হতে গেলে, অসুরকে, বৃত্রকে মারতে হোত, পুর-ধ্বংস করে পুরন্দর নাম নিয়ে এগুতে হোত। সার্দনাপেলস্ই বল, নেবুশাড্-নেজরই বল, অসুরবাণিপাল বা দারায়ুসই বল—পরাজিতকে পায়ের তলায় রেখে সংস্কৃতিকে মুছে ফেলে বিজিতের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়েই ইতিহাস চলছে। 'বড়ো-ছোটো' এ সব হলো সুবিধাবাদী কৌশলী কথা। ঐ গৌরীশঙ্করের নাম ছিল 'শোমো-লুং-মা' এখন হোলো মাউন্ট এভারেষ্ট। —জৈসা জৈসা পালা বদল ওয়্সা ওয়্সা নাম বদল। আমাদের দেশে ফোতো সমাজে এখন চালু বোল্ শুনবে ? মাম্মী, ড্যাডী, ডিম্প্ল্, হ্যারী।"

—"আমাদের দেশেও প্রতি অংশের নাম আলাদাই ছিল, প্রফেসর। ইন্‌কা শাসনে গবর্নর ছিল, সেনাধ্যক্ষ ছিল। দারুণ ব্যুরোক্রাসী ছিল, থাকার দরুণ যারা ছিল তারা নামকে ওয়াস্তে দাস বা 'সার্ফ' না হলেও, আসলে, কাজ করে কেউ পয়সা পেতো না। মুদ্রার বিনিময়ে লেন-দেনটা ওপরের মহলেই চলত। নৈলে সোনা, রূপো, ল্লামা। পাখির পালকের কলম অংশ কেটে কেটে সোনার গুঁড়ো ভরা হোত, তারই মাপে মাপে লেন-

দেন। কিন্তু প্রতিজনের নিজের বাড়ি হোত।…ক্ষেত থাকত।…খাদ্য, বস্ত্র, বাস—এ ছিলোই ছিল।

"দেশের নাম জানতে চাইছ? এ সব দেশের নাম ছিল তিয়াহুয়ানাকা, এখন যা' একোয়াদোর আর বলিভিয়া। আর্জেন্টিনা ছিল বার্‌রিয়ালীস্, উত্তর-চিলি ছিল পিচ্‌চালো। পেরু পেরুই ছিল। কিন্তু ত্রুহিল্লো নামটা পিজারোর এক পেয়ারের সেনাধ্যক্ষের (দীগো আলমাগ্রো) দেওয়া! আসলে এদিকে আসার পর (চিঙ্কিন্) চান-চান শহরের ধাক দেখে এবং চিমাক সংস্কৃতির জৌলুষ দেখে আলমাগ্রো মনে মনে ঠিক করে ফেল্‌লো স্পেনের তৈরী একখানা জাঁদরেল নগর না বসাতে পারলে এদেশে নাক-কান বজায় রেখে রাজত্ব করা চলবে না। পিজারো জন্মেছিল স্পেনের ত্রুহিল্লো নগরীতে। তাই এই নাম। পেরুর এটা দ্বিতীয় নগরী—বয়স সাড়ে চারশো বছর। দু'লাখের ওপর লোক থাকে এখানে। এখন রূপো-তামার খনি ছাড়াও নানা ইণ্ডাষ্ট্রী বাড়ছে। ত্রুহিলো দেখতে অবশ্য নিউ দিল্লী থেকে কেউ আসে না। আসে চান-চান দেখতে। দেখবার মতোই একটা জায়গা বটে।"

চলতে চলতে জেনে নিলাম যে, এত বড় সাম্রাজ্যের ওপর অধিকার রাখার একটি কৌশল ছিল। গ্রামকে গ্রাম, শহরকে শহর কিছু কিছু (বেশ কিছু) দিনের মোড়ে মোড়ে তোমাম গ্রামকে; 'সরিয়ে', 'ট্রান্সফার' করে অন্য গ্রামে 'বসতি' করানো হোত। তাতে আর্থিক কোনো ক্ষতি হয়তো হোত না, কিন্তু অনর্থ যা হোত তাতে কোথাও কেউ পুঁজীবাদ, শক্তিবাদ, জুলুমবাদ বা বানিয়াবাদ প্রয়োগে দেশকে বরবাদ করতেও পারত না। পেরুতে বুনিয়াদী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব স্প্যানিশেরাই প্রথম নিয়ম মাফিক চালু করেছিল।"

আশ্চর্য দেশ। শুকনো খট্‌খটে। কোনো যুগে কেউ বৃষ্টি দেখেনি। অথচ পাহাড়ের ওপর থেকে দাঁড়িয়ে সমগ্র উপত্যকাটা দেখছি যেন, প্লেন থেকে দেখা আয়র্ল্যাণ্ড, এমারেল্‌ড্ আইল্, পান্নাবর্ণা দ্বীপ। এটা অবশ্য উপত্যকা। পেরুতে উৎপন্ন চিনির ৬০% এখানেই হয়। চিনির কলের চিমনী মেঘহীন বিবর্ণ আকাশের গায়ে য়োরোপীয় সুরের স্বরলিপিকার সমত্ব রেখে খাড়া কালো কালো দাড়িয়ে আছে। সারাপৃথিবীতে (যদি পুরো ক্যুবাকেই একটা সমবায় বলা না হয়) এতোবড়ো শর্করা-সমবায়-প্রতিষ্ঠান আর নেই।

এই জলহীনতা, অথচ শ্যামলতা একটি দ্বন্দ্ব জাগায় মনে ঠিকই। সমস্যা পূরণও হতে পারে। সে থৈ পেতে গেলে মনে রাখতে হবে, এই চিমাক কৃষ্টিতে (ও পরে ইঙ্কা কৃষ্টিতে) পূর্ত ও জল-প্রণালীর ব্যবস্থা কত বিচক্ষণ, কার্যক্ষম ও পর্যাপ্ত ছিল।

আর একটি বিষয়ে ত্রুহিলোর খুব গর্ব। সেটা সারা পেরুরই গর্ব। শিক্ষা ব্যবস্থা পেরুর অতি প্রাচীন ব্যবস্থা। ত্রুহিলো বিশ্ববিদ্যালয় দেখবার মতো। লীমায় আছে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। তার মান মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে ঢের বেশী। যেমন মিশরের আল্-হাজার যে কোন আরব বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক উঁচুদরের মর্যাদা-পুষ্ট।

ইন্‌কাদের মধ্যে গরীবী যতো না ছিল, তার বেশী ছিল বিনয়, সদাশয়তা। ওদের মধ্যে না ছিল দাস, না ভিখারী—এখন দাস বা ভিখিরী বলতে যা বুঝি আমরা, অন্ততঃ সেই ধরনের মনুষ্যত্ব পিষে ফেলা ব্যাপার ওদের সমাজে ছিল না। থাকতে পেত না। ব্যবস্থাটাই ছিল, যাকে বলে—'র‍্যাডিক্যাল'।

[ওদের সর্বস্ব ছিল 'কৌম' বোধ, কৌমের প্রধান রাষ্ট্রপতি-রাজা-সম্রাট। তিনি ছিলেন যেন মৌচাকের মক্ষীরানী এবং সেই সম্রাটের দেব-দেবী অনুধ্যান ছিল শুধু 'দেশ'। দেশই ছিল তাঁর স্বপ্ন, কর্ম, মোক্ষ। অত্যন্ত ফিকে, ফ্যাকাশে, অনির্দিষ্ট বোধ হলেও 'দেশ' নামক একটা ব্যাপক দায়িত্ব ইন্‌কা জীবনকে সদা সর্বদা উদ্দীপিত করে রাখত···রাখুক। কিন্তু ইঙ্কা সম্রাটের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ছিল মাথা পিছু জমি, ঘর, কাজের ব্যবস্থা। দেশ-মাটি-জল-আকাশ। তার অংশ প্রত্যেকের প্রাপ্য। এটা পেলে তবে দেশবোধ!

শুনতে শুনতে একটা কথা আমার মনে ভেসে যেতে লাগল। জাপানের রাজ-বংশধরেরাও নিজেদের জাপান-দ্বীপের বাসিন্দা থেকে পৃথক রাখার বাসনায় অনেক পুরাণ কথা রচনা করে চালিয়েছেন। ওঁরাও বলেন সমুদ্রপথে দেবলোক থেকে ওঁরা এসেছিলেন। তার মানে সমুদ্রও ছিলো 'পথ'। বলেন, দক্ষিণের দ্বীপ থেকে এসেছিলেন। মনে ভাসে—শ্যাম, বহির্দ্বীপ, যবদ্বীপ। তারাও তাদের পুরাণে বলে 'সমুদ্র-পথ'। এ পথ কত বিস্তৃত? যদি যবদ্বীপ থেকে আরও পূর্বে হয় এবং আরও—আরও পূর্বে, তবে তো সেই 'বাল্‌সার নাও'-য়ের কথাতেই এসে পড়ি। বুঝতে পারি না এদের মধ্যে (পেরুভিয়ান মহৎদের মধ্যে) 'দেব' রক্ত (আর্যরক্ত?), কি পশ্চিম সমুদ্র থেকেই ভেসে গিয়েছিল? একই মানবধারা কি সিক্ত করেছিল জাপান, শ্যাম, যবদ্বীপ, দক্ষিণ সাগর দ্বীপপুঞ্জ, পেরু, চিলি, আর্জেন্টিনা, (পিচ্‌চালো, তিয়াহুয়ানাক্কা, বার রিয়ালিস্) ?]

ওসব ভাবনার কথা। ভাসা কথা। ভেসে যাক। এখন চলেছি বিখ্যাত ধ্বংসাবশেষ চান-চান্‌-এ।

চান্‌-চান্‌

ত্রুহিলো থেকে চান-চান পাহাড়ী পথে যেতে হবে। এজন্য শহরের প্রধান স্কয়ারের পাশে, বাজারের পেছন দিকে শেয়ারের গাড়ি পাওয়া যায়। কিন্তু সে গাড়িও পথেই থামে। সারনাথ, নালন্দার মতো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যাওয়া যায় না। রোমের ক্যাপিটল রুইন্‌সেও পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়। প্রায় দেড় মাইল পথ। আর সারনাথ? নালন্দা? পম্পে? —শহরগুলো ঘুরতে ঘুরতে পা ছিঁড়ে যায়।

এই পাহাড় চড়া আর পায়ে হাঁটার মধ্যে তীর্থ মাহাত্ম্য শুনতেই হয়। চড়াইয়ের মুখে যে চার্চটা আছে, সেটা এককালে ছিলো মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার বিশেষ মন্দির। আমাদের সোদর তীর্থ (কাশ্মীর) বা গয়াতীর্থের মতো। আজও মৃতকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা এখানেই হয়। কিন্তু দেবতা বেরিয়েছেন বাইবেল ছিঁড়ে; আর 'চড়া'ও যা চড়ে, যায় খৃষ্ট-সেবকদের সেবায়। মন্ত্রের ফারাক যাই হোক, মুদ্রাটি চালু হলেই হোল।

চান্-চান্ না দেখলে পেরুর সংস্কৃতি, প্রাচীনত্ব, প্রতিষ্ঠা এবং নগর-সচেতনতা সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। আধুনিক নগরপত্তনের ধারার মধ্যে সেন্ট্রাল মার্কেট, প্লাজা-মার্কেট, শপিং সেণ্টার, সুপার মার্কেট সহ, কিছু থিয়েটার-সিনেমা হলে, কিছু কিছু অপেরায় আর মিউজিয়ামে, যেন একটা মলাট বাঁধানো ছাঁদ হয়ে পড়েছে। এখনও মথুরার এক ফালিতে, প্রাচীন আগ্রা ও দিল্লীর কিছু অংশে, আর সত্যিকারের বলতে বারাণসীতে গেলে বেশ বোঝা যায়, সমুদ্রগুপ্ত, শ্রীহর্ষ, 'মুদ্রারাক্ষস—মৃচ্ছকটিকে'র' সময়ের 'নগর' বলতে কি বুঝতাম।—মহেঞ্জোদারো, পাটলিপুত্র, কনৌজ, উজ্জয়িনী, বিদিশা, শ্রাবস্তী, ধারা,—শুধু কবির গানের স্বপ্ন-অলঙ্কারের বাতায়ন হয়ে গেছে।

এই চিমু-কৃষ্টির (চাঞ্চান কৃষ্টি) কথা বলতে গিয়ে বিদেশী তাত্বিকরা তন্ময়; প্রত্নশালার সংগ্রাহকরা যেন সহস্রবাহু অর্জুন, শত-মুখ অগ্নি। চিমু-কৃষ্টির সর্বনাশ কিন্তু য়োরোপীয়েরা করেনি; করেছিল ইন্কারা। আমরা ইনকা বলতে হুয়ানা কোপাক, ভীরাকোচা, মাঙ্কো কোপাক, আতাহুয়াল্লপা, হুয়াস্কারকেই জানি।

কিন্তু আমাদের পাণ্ডবদের আগে পুরুরবার মত, রাণাপ্রতাপের আগে বাপ্পা রাওয়ের মতো এই মাঙ্কো, হুয়াস্কার, আতাহুয়াল্লপার আগের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে ৪০০ খৃঃপূঃ থেকে, স্পষ্টভাবে; অস্পষ্ট 'কিম্বদন্তী' 'শ্রুতি' ছড়িয়ে আছে, আরও হাজার বছর আগে!

আধুনিককালে নানাভাবে 'পরীক্ষা' চলছে ইতিহাসের পুরাকাল কতো 'পুরা' সেইটে মোপার জন্য। পেরুর কুলুজী ধরেছে খৃঃ-পূঃ ৮০০০ থেকে। কিন্তু প্রাচীনতম 'প্রমাণ' খৃঃ-পূঃ ২৫৫০ থেকে। খৃঃ-পূঃ ৮৫০ থেকে ৫০০ পর্যন্ত এক কৃষ্টিকে বলছে,—গুয়ানাপে, কুপিস্নিকে কৃষ্টি। কিন্তু সে পর্যন্ত 'দেবতা' অর্থে ছিলো পুমা, জাগুয়ার, সাপ। পবিত্র কৃষিকর্ম বাদে এই যুগে হাতের কাজেও মন দিয়েছে মানুষ। ঘর-বাড়ি তৈরী করতে লেগেছে। এর পরে পাচ্ছি পশু আর মানুষ মেলানো দেবমূর্তি। মন্দির না হলেও টিবির ওপর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ঐ-যে সিংহ-পুমা-সাপের ওপর চড়া মানবমূর্তি, বোধ হয় সিংহ-পুমা কৃষ্টিকে 'দমন' করে অন্য কৃষ্টিরই কথা। ভারতবর্ষের পুরাণে এসব তত্ত্ব রঙ্গীন নাটকীয় গল্পে ঢাকা হলেও—কিছু কিছু আবার আধ্যাত্মতত্ত্বের মশলা ছড়ানো থাকলেও, পাথর, বর্শার ফলা, হাঁড়ি-কুঁড়ির চিত্র এ-সবের সাক্ষ্য তো বাতিল করা যায় না।—উচিত ও নয়।

কিন্তু প্রথম সভ্য বলতে, সভ্য পাচ্ছি তিয়াহুয়ানাকো (১০০০ থেকে ১৩০০ খৃষ্টাব্দ!)। এই সময়ে রাজ-নীতির শাসনে বহু সমাজকে এক বন্ধনে আনার প্রচেষ্টা চলে। কোনো

কারণে প্রচেষ্টা ফলবর্তী হোল না; বরং কৃষ্টির ধারা ঘোলাটে, বিধ্বংসী, ন্যাড়া-বোঁচা হয়ে এল।

১৩০০ থেকে ১৪০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই চিমু-কৃষ্টি হঠাৎ নাগরিকতায় পাগল হয়ে উঠল। শুধু নগরই নয়, বিশাল বিরাট মহানগর। সে নগর অতীব সুপরিকল্পিত, সুশ্রী। এর সবটাই গড়ে তোলা হয়েছিল, কিন্তু স্থানীয় মাটি দিয়ে। শুধু মাটির গড়ন যে কত মহনীয়, কত সুশ্রী, কত পোখ্‌তো (!) হতে পারে তার নিদর্শন চিমু্‌ কৃষ্টির নগর স্থাপত্য। কোথায় পাথর? কোথায় চুণবালি সুর্খী? কেবল মাটি, পৃথিবীর অঙ্গমল। পার্বতীর গা-ধোয়া গণেশ। তা'তেই গড়া সৌধ, প্রাকার, যুগান্তস্থায়ী কীর্তি!

ঐ 'আডোবে'। মাটিরই বড়ো বড়ো ইঁট, বড়ো বড়ো চাঙড়া। কোন কোনটি জ্যামিতিক প্যাটার্ণ। মাটির শত্রু জল। গড়ার শত্রু ভূমিকম্প। প্রথম শত্রুর কোন চিহ্ন ছিল না আকাশে। মাটিতে পাহাড়ে জলধারা ছিল,—সাপের গায়ের মতো, সাপের চলার মতো তাদের গতিবিধি, গতিপথ দেখে অনুধ্যান করে এরা দেশকে-দেশ জলের ধারায় ধুইয়ে দিত। বড়ো হ্রদ করে তার বুকেই চাষ করত। সাপ ছিল এদের প্রবাহের প্রতীক। প্রয়োজন মতো এরা পাহাড়ে জল বেঁধে সমতলে বিতরণ করত; প্রয়োজন মতো পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কেটে অন্য ধারে জল নিয়ে যেত। শাসনব্যবস্থায় এরা স্থানীয় গোষ্ঠী—সংসদের ওপর 'ভার' দিতে জানতো। 'গোষ্ঠী' বিশেষের বিশেষত্বকে সম্মান করত। তাদের শিল্প ও আনন্দ লোকের ভাষা এরা পড়ার চেষ্টা করত; আনন্দলোক গড়ার চেষ্টায় সহকারিতা জোগাত। রাষ্ট্রকে একচ্ছত্র করতে চাইলেও জীবনের প্রতিভা ও স্ফুরণকে এরা মাটি, প্রকৃতি, আবহাওয়া, ফুল, ফল গাছের মতো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র-পরিচয়ে বিশিষ্ট বিশিষ্ট মর্যাদা দিয়ে উৎসাহিত এবং সংবর্ধিত করত।

উঁচু থেকে হঠাৎ দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যায় এমন শাদা। আর আশ্চর্য লাগে যে সমগ্র শহরটা কেমন সোজা সোজা লাইনে ভাগ করা। বিশাল শহর। প্রায় প্রত্যেকটি দেয়াল যথাস্থানে দাঁড়িয়ে। ছাদ কারো আছে, তবে বেশির ভাগই নেই। ছাদ ছিল, তোতোরা-বেত, বা অন্য খড়ের। কেন থাকবে না? না ছিলো চোর, না বৃষ্টি, কিছু কিছু মেরামৎ সংরক্ষণ-বিভাগ করলেও গাইড্‌ বললো—মূলতঃ সবটাই আনামত্‌ ঠিক আছে। কিন্তু সেই খড়ের ছাদ আর নেই। সারা শহরটাই যেন বে-আব্রু।

তবে ঠিকটা আছে কি? এই যে কুজকো, ত্রুহিলো শহর,—এত বড়োই এ শহরও। একটা কেন তিনটে শহর ছিল। বাড়তে বাড়তে তিনটে মিশে এক হয়ে গিয়েছিলো।

হঠাৎ এক এক সময় মনে হবে যেন, এক ঢিবি মাটি জড়ো হয়ে আছে—একটা দেয়াল ভেঙ্গে পড়ছে; একটা বাড়ির অর্ধেক নেই। কিন্তু স্থির হয়ে চাইলে দেখা যাবে, যেমন দেখা যায় ফতেপুর সিক্রীতে—এরা জীবন্ত ছিল, প্রাণবন্ত ছিল। নীরবে আজের ইন্‌কারাও সেই সেদিনের ইন্‌কাদেরই মতো কাদায় জল ঢালছে; পা দিয়ে 'ছানছে', বড় বড় কাঠের বাক্সে ঠেসে গড়ন দিচ্ছে। বাক্সটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে দরকার হবে,

উল্‌টে রেখে খালি বাক্সটা নিয়ে আসছে যথাস্থানে আবার ভরবে বোলে। যখন শুকিয়ে যাবে, পর পর গেঁথে ওপরটা কাদায়, রং-কাদায় পালিশ করবে। তৃণ দিয়ে সাজাবে। এমন ধারা 'সজ্জিত', 'বর্ণিত' দেয়ালের অংশ এখনও অনেকগুলো দেখতে পাওয়া যায়। সব কী বদলায়? তবু কিছু বদলায়। বদলেও, 'চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।'

শুধু বর্ণ নয়। ঐ কাঠের বাক্সে নক্সা করে ছাঁচও গড়ে তোলে এবং ছাঁচে গড়া 'ব্লক্‌স্' দিয়ে চমৎকার সৃষ্টি রচনা করে। এদের কাজ করতে দেখি, আর দেখি, গুছিয়ে টেনে নিয়ে আসা জলকলির প্রবাহ। আর মনে হয় যতো ক্ষীণ হও, যত 'প্রাথমিক', 'প্রারম্ভিক' হও, তুমি তো নিরন্তরই বয়ে আসছ। এই ইন্‌কা কর্মী কাজ করছে, এওতো সেদিনেরই ইন্‌কা; এই মাটি, এই আকাশ, এই জলের মতোই,—মানুষ হলেও এক বিচিত্র অর্থে, মহৎ অর্থে এই ইন্‌কা মজতুররাও 'এলিমেণ্টাল'-ই,—পঞ্চভূতময় বিভূতিরই প্রকাশ, যে প্রকাশের প্রেরণা অপরূপকে রূপ দেয়, অবর্ণনীয়কে বর্ণন করে। ওরা কাজ করে, সময়ের ধারা ধরে বয়ে আসে; অবাধ, অজস্র, অবিরত। মহাকালের পদধ্বনির সাথে এরা পা মিলিয়ে চলে এসেছে—শত শত বৎসরের পারে…মনে পড়ে সেই ক্লাসিক কবিতাটির মৃত্যুহীন পংক্তিগুলো,—

—"মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলে যবে
দেখি সেথা কলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ-যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।
ওরা চিরকাল
টানে দাঁড়, ধরে হাল,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে……"।

আজও করে, যেমন করেছে হাজার বছর আগে, চীমূ কৃষ্টির শৈশবে। যখন গড়ে উঠেছে ইঁটের পরে ইঁটে এই সুবিশাল নগরী।

প্রচুর, সুপ্রচুর সামগ্রী পাওয়া গেছে এখানে। মনে হয় এরা বিজিত হয়েছিল যে ইন্‌কাদের দ্বারা তাদের সামগ্রী বা স্বর্ণে কোনো 'লোভ' ছিল না। তারা শুধু একটি সংগঠিত কৃষ্টিতে (তাদের জ্ঞানের মতো করে ভাবনায়) সমগ্র মানব গোষ্ঠীকে বেঁধে দিতে চেয়েছিল।

এতো যে সামগ্রী পাওয়া গেছে, (ম্যুজিয়মে দেখাবার সামগ্রীর আর শেষ নেই) তার কারণ, প্রথম, বিজয়ীদের বস্তুর প্রতি অনৌৎসুক্য; দ্বিতীয়, এদের দেবতাদের অসাধারণ

বস্তুপ্রীতি, সে প্রীতি এদের পুরোহিত গোষ্ঠীরও ; তৃতীয়, এদের অন্ত্যেষ্টি প্রথার আড়ম্বর। মানুষটার শবদেহ হাঁটু-বুকে করে বসা অবস্থায়ই খুব কষে বেঁধে দেয়। পরে মানুষটাকে কাপড়ে জড়িয়ে জড়িয়ে একটা 'বসা' পুঁটুলীর মতো করে। তার পরে তার মাথার ওপরে (সবটাই তো ব্যাণ্ডেজে ঢাকা) একটা নকল মাথার প্যারডি বসিয়ে দেয়। ব্যাণ্ডেজের পরে যে কাপড়ের পুটলী করে, তার মধ্যেই শবের প্রিয়বস্তুর 'সংগ্রহ' ভরে দেয়। গোর-স্থানেও নানা দ্রব্য থাকে। এরকম মমী ক'টাই দেখলাম।

এর ফলে, এবং শুকনো আবহাওয়ার প্রভাবে, শবদেহগুলির মমী-রূপের সঙ্গে নিবেদিত নৈবেদ্যতে পাচ্ছি নানা রকমের বীজ, ফল, ভুট্টা, চীনা (?) বাদাম, লাঠি, লাঠির মাথা, নানা অলঙ্করণ, বোনা ও সেলাইয়ের ত্রিশ-চল্লিশটা ছুঁচ, কুরুশ, অন্যান্যভাবে ও উপকরণে বোনার কাঠি, উল্ পাকানোর তকলী, বা টাকু। কানের, আঙুলের, গলার নানাবিধ সাজ, অস্ত্র-শস্ত্র, ক্ষেতের কাজের নানারকমের যন্ত্রপাতি, কুড়ুল, দা, ছুরি। প্রচুর স্বর্ণদ্রব্য। বড় বড় গেলাস (কাজ-করা, পেটা-কাজ), সোনার মুখোশ (এথেন্স ম্যুজিয়মে রাখা আগামেম্ননের (?) সোনার মুখোশ মনে পড়ে যায়) একটি ঠোস্-সোনার মুক্ত-দেহ মেয়ে। চুলের পারিপাট্য, চুলের সাজ নিখুঁত। এতো সজ্জা, কিন্তু লজ্জা নেই। রদ্রীগেজ বলতে চায়—কোনো মাতৃকা মূর্তি। শুনে তৃপ্তি পেলাম। 'এখানেও তুমি (জীবন-মরণ) দেবী'। আর আছে বহু মাথার খুলি। তা থেকে বোঝা যায়—(১) শিশুকাল থেকেই মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে এরা মাথাকে ছুঁচালো করতো। (২) এরা খুলি কেটে সোনা-রূপের পাত লাগিয়ে দিয়ে মস্তিষ্কের চিকিৎসা করত।

নামার পথে রদ্রীগেজ বলছে—"এখন তুমি পেরু দেখ আর না দেখ। কুজ্‌কো আর এই চান্-চান্—এই পেরু ইতিহাসের মেরু-বৃন্ত। এর মধ্যে বিধৃত সমগ্র পেরু ইতিহাস। তিনলক্ষের বেশী লোক থাকত ষোল বর্গ মাইল জায়গার মধ্যে। আশে-পাশে ছিল বাগানের, চাষের ব্যবস্থা। মন্দির, প্রাসাদ, বাজার, ধনী পাড়া, স্কুল হাসপাতাল—কী না ছিল। নীরবে এসব ত্যাগ করে তারা অন্যত্র চলে গিয়ে ইতিহাসে মিশে গেছে। এতো বড়, একটা নগরের পাশে ফিরিঙ্গি চালিয়াৎ ডাকাত আলমাগ্রো নাম করা এক বড় শহর না গড়ে পারে? তাই ত্রুহিলো। প্যারের সর্দার পিজারোকে তেল দিতে তার জন্মস্থানের নামে এ নাম। এর মধ্যে ইন্‌কার প্রাণময়তা নেই।

"কিন্তু ত্রুহিলোর ধারে চান্-চানের কনিষ্ঠ হলেও গরিষ্ঠ তীর্থভূমি হোল 'মোচে'। মোচে যাবার পথে বলবো ইতিহাস। পুরাণ কথা, ইনকাদের কথা। এখন এই ছায়ায় বসো। গলা ভেজাও।"

সারনাথ, নালান্দা, বিজয়নগর, পম্পে দেখা এক—আর ফতেপুর সিক্রী দেখা আর। প্রথম তিনটি ধ্বংসাবশেষ যেন ঘোষণা করে মানুষের মহিমা। মানুষের সৃজনী প্রতিভাকে মানুষের বিনাশ-পিপাসা কী ভাবে শুষে ফেলতে পারে সেই বিষণ্ণ কাব্যাংশ। শেষেরটি তা নয়। স্বেচ্ছায় এক মহান সম্রাট তাঁর মহান ভ্রমকে সংশোধন করার জন্য ভ্রান্ত মানব সৃষ্টিকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে গেছেন। এ ফেলে যাওয়ার মধ্যে মানুষের বিবর্তন-স্পৃহার স্পর্ধা

ধ্বনিত। মাণ্ডু বা চিতোরের ধ্বংসাবশেষ দেখলেও বিষাদ আসে। সেই অন্য ধরনের বিষণ্ণতা মনকে এখানেও ছেয়ে ফেলে।

বিশাল এ দৃশ্য। একে সমগ্র দেখা-ও প্রচুর পরিশ্রম সাপেক্ষ। দু'হাজার আটশো ফুটের ওপরের বাতাস, আকাশে রোদ নেই, আলো আছে। আশে পাশে ধূসর, অবিমিশ্র, পেছু লাগা-ঘ্যানঘ্যেনে ধূলো,—তবু এই পরিশ্রম সত্ত্বেও পৃথিবীর এই ধূমাবতী রূপ চেয়ে চেয়ে দেখি। দূর থেকে আরও দূরে কে যেন ছড়িয়ে রেখেছে একদার সমৃদ্ধির শুষ্ক শুভ্র কঙ্কাল।

লক্ষ লক্ষ পদাতিক মুহূর্ত আছাড়ি-পিছাড়ি দাপাদাপি করছে ধূসর মধ্যাহ্নের বিচ্ছিন্ন শতগ্রন্থীময় আঁচলখানা টেনে ফেলার প্রচেষ্টায়। কতো কালের সীমারেখার পারে বসে ধুঁকছে ধুঁকছে। তবু পা ছড়িয়ে এই জরতী বসুন্ধরা অপরূপ এক করোটী-খেলায় প্রমত্ত, আত্মমগ্ন। ···এই দৃকপাতহীনা, অবজ্ঞাদীপ্তা, উদাসীনা ধূলিময়ীকে দেখি; আর সগৌরবে মনে গান বেজে যায়, তোমায়ও মধুমতী কবে দিতে পারে তারা, যারা গান গায় 'চরণ স্বাদুমুদাম্বরং' ,—যারা 'চরৈবেতি' মন্ত্রের বীর্যবান্ উদ্গাতা, হোতা। মনের মধ্যে আকুল হয়ে ওঠে বৈদিক ঋষির গাথা। আর আমার আত্মা বলে ওঠে, এই পথ, এই ধূলো, এই ধ্বংস, এই কবিতা যেন মহাকালের আপন ভাষার কাব্যরূপ।—

চলেছে এ পথ কতো মানবের বন্ধুরূপে
রথ-নেমীদের সাদরে বক্ষে কোরে বরণ;
নিষ্পাপ সাধু পথচারীদের পদক্ষেপে
নিস্তস্কর নির্ভয় চির সঞ্চরণ।
পথের জঠরে গহ্বরে আছে বিবিধ নিধি,
মণি স্থবর্ণ; ওগো ও পৃথিবী প্রচুর দাও;
তুমি নন্দিতা, তব ভাণ্ডারে নেই অবধি,
হে দেবি, তোমার শস্যে কুসুমে মনলোভাও ॥*

আমি বোধ করি ঈষৎ বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। গাড়ি চলেছে কান্তার ভেদ করে। মধু লক্ষ্য করে আমায় জিজ্ঞাসা করলো—"দাঁত কেমন আপনার?" ভাবল, বোধ করি দন্তশূলের উন্মনস্কতা।

---

* যে তে পন্থানো বহবো জনায়না
রথস্য বর্ত্মানসশ্চ যাতবে।
যৈঃ সঞ্চরত্যুভয়ে ভদ্র পাপা-স্
তং পন্থানং জয়েমানামিত্র-মতস্করং ॥
নিধিং বিভ্রতি বহুধাগুহাবসু
মাণং হিরণং পৃথিবী দধাতু মে
বসুনি বো বসুদা রাসমানা
দেবী দধাতু সুমনস্যমানা ॥ অথর্ববেদ: ১২।১।৪৭

আমি হেসে ফেলি। মধুর হাতটা চেপে দিয়ে রদ্রীগেজকে বলি—"আমায় তো তুমি ছেড়ে দেবে, লীমায় পৌঁছে। এর পরে পেরুতে রদ্রীগেজহীন জীবন কেমন লাগবে ?"

রদ্রীগেজ বলে, "স্ত্রীলোক রদ্রীগেজে আপত্তি আছে ? খুব খাঁটী মাল। যেখানে টিপবে সেখানেই লাল।"

মধু বলে,—"আপত্তি ? পথ থেকে রাতের বাসি মেয়ে কুড়িয়ে এনে হোটেলে নিজের বাথ টাবে রগড়ে ধুয়ে দিলেন এই সন্ন্যাসী কাজানোভা। আপত্তি !"

হেসে বলি,—"লাল মাল ? বল কি ? সে তো হালুম করে গিলে ফেলবো। বিবিটি কে ? কত বয়স ? ভাইটাল স্টাটিস্‌টিকস্ ছাড়।"

কী হাসি রদ্রীগেজের। চোখ টিপে বলে, "তোমায় মানাচ্ছে না ও কথা। মহিলাটির নাম 'ইসাবেল আতোকোঙ্গো'। দু'টি বাচ্চা আছে। স্বামী পক্ষাঘাতে পঙ্গু। মানে দু'টি বাচ্চা হবার পরের দুর্ঘটনা। সেই তোমাদের লেডী চ্যাটারলীর স্বামীর যা অবস্থা ছিল। তার ওপরে স্বামী চোখেও কম দেখে। ভদ্র-মহিলা কানাডায় থেকে ইতিহাস পড়েছিলেন। কুজকোয় কলেজে পড়াতেন। এই দুর্ঘটনার পর এখন অন্য কাজ করেন। মাঝে মাঝে গাইড—ও হন। তবে, ঐ যে বললাম—'যেখানে টেপো লাল'। কার্ডিলেরার পূর্বে গেলে এধারে দু'শো মাইল, ও ধারে দু'শো মাইল—সবাই চেনে।"

"তুমি চিঠি দেবে ? একটা ইন্‌ট্রোডাকশন ?"

—"না, টেলিফোন করব। লেখা-লেখি নয় কিছু। এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবে। এর মধ্যে মোদ্দুর জন্য খানিক ইতিহাস বলি।······

"কুজকো বোলে কথা ! বলে 'কুজ' হল 'ইতি'; আর 'কো' হল 'হাস' ('cuz' is 'his' and 'co' is 'story') ইতিহাসের মক্কা। না জানলে মজাই পাবে না। একা কুজ্‌কোই অর্ধেকের বেশী পেরু। এটাই তুমি শুনতে চাইছিলে। পেরুর পুরাণ শোনাব।"

রদ্রীগেজের একটানা কথার সুর রাখতে পারব না ! তবু যতটা পারি রদ্রীগেজের কথাই বলছি। কিন্তু নিজের ভাষার আঙ্গিকে।

*　　*　　*　　*　　*

পেরুকে খুব প্রাচীন বলে মনে করাই সঙ্গত বটে; কিন্তু যথার্থ প্রাচীন কি এর ইতিহাস ? প্রত্ন-তাত্ত্বিক বা ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসের কথা তুললে তো 'কাল নিরবধি, পৃথ্বী বিপুলা'। কিন্তু সে ইতিহাসের কথা হচ্চে না; হচ্চে ইন্‌কা ইতিহাসের কথা। এ ইতিহাস আশ্চর্যজনক ভাবে স্পষ্ট, বিঘোষিত-পণ্ডিতদের গ্রাহ্য। এ ইতিহাস বরাবর সম্রাট-নাম-বাহী ইতিহাস; যেমন রোমের, আরবের ভারতের (ছিল)। কিন্তু আশ্চর্য, যে যে তেমন হলেও সেটা আছে।

১২০০ (প্রায়) খৃষ্টাব্দ থেকে এ ইতিহাসের সুরু। প্রথম নাম সম্রাট মাঙ্কো-কাপাক। ইনিই একমাত্র 'পুরাণ' পুরুষ; (যেমন মনু)। এঁর পরের সবাই 'মানুষ', এবং এই

বংশেরই ত্রয়োদশ ব্যক্তি আতাহুয়াল্লাপা। এঁকেই পিজারো হঠাৎ ধরে ফাঁসী দেন। সে কথা পরে বলা যাবে। তার কথাই পেরুর কথা, কুজকোর কথা; পেরুর বলাৎকারের কথা।

এই বারো জনের মধ্যে প্রথম পুরাণ পুরুষ কিম্বদন্তীতেই শুধু বেঁচে আছেন (?)। কিন্তু শেষের তিনজনই পিজারোর খর্পরে পড়েছেন। বাকী নয়জনের ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে কুজ্‌কো (রাজধানী)-তে তাঁদের নয় জনারই 'মমী' মহাসমারোহে পেশ করতে পারত। নষ্ট করে ফেলে স্প্যানিয়ার্ডরা।

আমাদের এক পুরাণ কথায় বলে, মনু তাঁর ভগ্নীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। পেরুর পুরাণ কথায় মঙ্কো কাপাকও তাঁর ভগ্নীর গর্ভে 'ইন্‌কাদের উৎপন্ন করেছিলেন।

কথিকাটি কৌতূহলোদ্দীপক এবং তলিয়ে চিন্তা করলে সঠিক বলেই মনে হয়। বাইবেলেও আদম ও ইভ একই পিতার সন্তান।

অবশ্য সব পুরাণ কথার মতো এই পুরাণেরও নানা রূপ আছে। সর্বপ্রচলিত রূপটি পেরুর ইতিহাস লেখকদের চূড়ামণি গার্সিলাসো-দ্য-লাস্ ভেগা-র লেখা। সেটাই মান্য। তিনি পেরুর লোক।

কুজকো নগরের অগ্নি কোণে আঠারো মাইল দূরে আছে পাকারী তাম্পূ। সেখানে পাহাড়ে আছে তিনমুখো গুহা। নাম তার তাম্পূ-তোক্কো। এর দুটি মুখ থেকে বহু ইন্‌কা বার হল, কিন্তু মাঝের মুখ থেকে বার হল তিন ভাই এবং চার বোন। আয়ার আউকা, আয়ার কাচি এবং আয়ার উঁচু—তিন ভাই। মামা ওকোল্লো, মামা হুয়াকো, মামাকোরা আর রাউয়া—চার বোন। মাঙ্কো কাপাকের নাম হল আয়ার মাঙ্কো। মাঙ্কোকে নিয়ে ওরা আটজন। এই আট জন্যই অন্যান্য ইন্‌কা দলের নেতৃত্ব নিলেন।

এদের পরিব্রজন সুরু হল। কোথাও কোথাও আড্‌ডা গাড়লেও দু-তিন বছরের মধ্যে আবার যাযাবর। এর মধ্যে ভগ্নী মামা-ওকোল্লোর গর্ভে মাঙ্কো কাপাকের প্রথম সন্তান (পরে সম্রাট) জন্ম নিলো। একে একে বাকী তিন ভাইকে খতম করে দিল মাঙ্কো।

কিন্তু পরিব্রজন থামে না। তিন বোনকে (ওরা সবাই মাঙ্কার স্ত্রী) নিয়ে মাঙ্কো পৌছাল তিতিকাকা হ্রদে। সেখানে এক দ্বীপে গিয়ে মাঙ্কো সাধনায় বসে পড়েন। 'আর নিরন্তর ঘোরা ভাল লাগে না। স্থান বেছে দাও ঠাকুর।' ফলে দেবের দেব সূর্যদেব ওঁদের হাতে এক স্বর্ণ-দণ্ড দিয়ে দেন। বলেন, এই দণ্ড যেখানে রাখলে আপনা থেকেই ভূগর্ভে বসে যাবে, সেই হ'বে স্থান।

সেই স্থানটিই হল কুজকো শহর, ('কুইস্‌কে' ইন্‌কা ভাষায় অর্থ—'ভুবনস্য নাভিঃ') এবং এখানেও সূর্যের নাম পাতাকামাকদের মতোই কোরিকাঞ্চা। ইন্‌কা কৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। এর পাশে অবশ্য দেবী মন্দিরও ছিল; পাচাকামাক। তাছাড়াও চন্দ্রদেবীর মন্দির। কুজকো সেদিনও আর আজ ও "হুয়াকা" অর্থাৎ তীর্থ। এ তীর্থে আজও সেই ইন্‌কা পাল-পার্বণের মেলা বসে। যদিও প্রণামী চড়ে চার্চে।

—[কোন কোন পুরাণের কথায় মাঙ্কো এবং ভগ্নী ওকাল্লো সূর্যের বরে ভাসমান

এক ডিম্বের মধ্য থেকে তিতিকাকার মধ্যস্থ এক দ্বীপে প্রসূত হন। ডিম্ব থেকে প্রসূত ভাই-বোন ইনকাদের আদি জনক-জননী।]—

এই পুরাণ কথার পরে ঐতিহাসিক যে পুরুষকে আমরা মমীরূপে পাই তার নাম সিঙ্কি রোচা—মাঙ্কোর ছেলে। এরপরে পর পর ছ'জন সম্রাট (লোকো, য়োপাঙ্কি, মায়তা কাপাক, কাপাক ইয়োপাঙ্কি, ইন্‌কা রোচা, য়াহুয়ার হুয়াকাক এবং বীরকোচা ইন্‌কা); এই ছ'জনারই মমী একদা কুজ্‌কোয় সুরক্ষিত ভাবে ছিল। এঁদের পরে যাঁরা, তাঁদের তারিখও পাওয়া যায়। পাচাকুতি ইন্‌কা য়ুপাঙ্কী (১৪৩৮-৭১), তাপা ইনকায়োপাঙ্কী (১৪৭১-৯৩), হুয়ানা কাপাক (১৪৯৩-১৫২৫)। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন দুর্দান্ত শাসক ও পরম বীর ক্ষত্রিয়। এক হুয়ানা কাপাকের সময়েই ইন্‌কা সাম্রাজ্য সুদূর ভেনেজুয়েলা থেকে চিলি—আর্জেন্টিনা পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। প্রতি খণ্ডে জোরদার গভর্নর ছিল, বিপুল সৈন্য-শাসন ছিল। কিন্তু যেহেতু কর আদায়ের পীড়ন ছিল না ! খাদ্য-বাসের ব্যবস্থা বেশ ভালোই ছিল। বাজারে, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে ভীতিহীন নিরাপত্তা ছিল—সুবিচার ছিল , এবং অপরাধীর সাজা হত নির্মম। সেই হেতু ইন্‌কা সাম্রাজ্যের শাসনের আয়ত্তের মধ্যে আসার জন্য গরীব, চাষী, শিল্পী, কর্মীরা,—শিক্ষক, পণ্ডিত, বৈদ্য, এঞ্জীনীয়ার, গবেষকরা—খুব উৎসুক ছিল। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বোধ সমাজের দৃঢ়তার পরিচায়ক ও দেশের শান্তির ভিত্তি-প্রস্তর।

পিজারো যখন পেরুতে পৌঁছেছেন, তখন সম্রাট হুয়ানা কাপাক মৃত। তিনি ছিলেন অতি বিচক্ষণ সম্রাট। তাঁর শাসনকালে, সাম্রাজ্য হিসাবে ধরতে গেলে, বিস্তীর্ণ পেরু সাম্রাজ্যের হয়েছিল দিকে দিকে উন্নতি।

শাসন-যন্ত্রটাকেই তিনি বেঁধে দিয়েছিলেন এক অভিনব দৃঢ় প্রথায়। কৌমদের প্রাচীন ও সুপরীক্ষিত শাসনবিধিকে তিনি যথেষ্ট সম্মান করতেন।

সেটি ছিল 'আইল্লো' বিধি। অনেকটা 'আমাদের' গোষ্ঠী বা গোত্র বিধি। একজন 'সর্দারের' কাছে দশটি পরিবার। তারা যা যা বিহিত করতো মোটামুটি সবার মত নিয়ে। এই গোষ্ঠীর মতো দশ গোষ্ঠী বিশ গোষ্ঠী বাড়তে বাড়তে ঊর্ধ্বতম সংখ্যা পঞ্চাশ বা একশো গোষ্ঠীর প্রধান হতেন সম্রাটের 'অমাত্য'। এই অমাত্যরা প্রত্যেকে দেশের সমৃদ্ধি ও শাসন দেখা ছাড়াও নানাভাবে জাতিকে অগ্রসরণের পথে নিয়ে যাবে এমন অলিখিত, অনির্দিষ্ট দায়িত্বও পালন করতেন। এরই মধ্যে ছিল আইন, আদালত, বিচার, শাসন এবং প্রতিরক্ষাও।

দেশের গন্য-মান্য পণ্ডিত ও বিদ্বানদের প্রচুর সম্মান ছিল। এরা দেশকে সমৃদ্ধ করত নানাভাবে। তবে মূল কথা ছিল চাষ-বাস, শিল্প-বাণিজ্য এবং নিরাপদ যাতায়াত। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সংবাদ সর্বদাই সরবরাহ করা হত এবং এই কারণেই ইন্‌কা সাম্রাজ্যব্যাপী সহজ, সরল, দীর্ঘ, অবিশ্রান্ত এবং সুগঠিত পথ ছিল সাম্রাজ্যের গৌরব। সংবাদ বাহকরা খালি পায়ে দৌড়াত। যানবাহনের কথা তাদের মনেই আসত না। প্রতিদিনে তারা দশ থেকে বারো মাইল দৌড়াত। এ কখনও বন্ধ হত না।

তবে, সম্রাট করতেন কি? আর পেতেন কি? সে কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকই ছিল ভূমির মালিক। কিন্তু চাষ-বাস বা সমবায়যোগ্য শিল্প-কর্ম সমবেত জন শক্তিরই প্রাথমিক দায়িত্ব বলে নির্ধারিত করা হত। এ হিসেবে সম্রাটকেও চাষে যোগদান করতে হত। যোগদান করতেনও। আনুষ্ঠানিক হলেও করতেন।

কৌমকে প্রথমে চাষ করতে হবে অন্ধ, খঞ্জ, যুদ্ধ-বিকৃত রোগীদের জমিতে; তারপর করতে হবে দেবগৃহ, বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয়ের জন্য নির্ধারিত জমিতে; তারপর নিজের জমিতে। সর্বশেষে রাজার ব্যক্তিগত জমিতে। সে জমির উৎপাদনের ভাগ দেবগৃহে, বিদ্যালয়ে, চিকিৎসালয়ের মতো জনসংস্থায় যেতো। কিন্তু প্রতিরক্ষা, দান ও আপৎকালের সঞ্চয় রাজাকেই ব্যবস্থা করতে হত। সমগ্র দেশের ফসলের এক তৃতীয়াংশ ভাগ জনতার ভাণ্ডারে জমা হত আপৎকালের জন্য ও দেশের কাজে দামের সমতা রক্ষার জন্য।

বাজার-হাট অত্যন্ত পরিষ্কার সুশৃঙ্খল ও অবাধ ব্যবহারের কষ্টিপাথর বলে লোকে মনে মানতো। 'হট্টগোল' হত না। (আজও হয় না।) পেরুর 'হাট', মেলা দেখার মত। আরে কুইপার রবিবারের হাট আজও টুরিষ্টরা দেখতে আসে। সে যেন কুটির শিল্পের এক আশ্চর্য ভাণ্ডার বিশেষ।

এসব ব্যবস্থার জন্য দায়ী অন্ততঃ ৭০% সম্রাট হুয়ানা কাপাক নিজে। তাঁর বিচক্ষণতা, মনস্বীতা, উদারতায় এমন সুসংবদ্ধব্যবস্থা সম্ভব হয়েছিল।

এই বিচক্ষণ সম্রাটের জীবনেও ছিল একটি দুর্বিপাক। মানুষ মানুষ বলেই এই ঘাটে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাকে ডুব দিতে হয়। 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল।'······

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। ইনকা সম্রাটের দুই ভগ্নী। সুতরাং দুই স্ত্রী। যথেষ্ট হলেও তা যথা-ইষ্ট অর্থাৎ মন যা বলে তেমনটি নয়। সম্রাটদের নানা কারণে স্ত্রী গ্রহণ করে রাজ্য ও রাজ্যের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হত। ভাগিনেয়-সংশয় দূর করার জন্যই ভগ্নী বিবাহে সুবিধাও ছিল। কিন্তু এ তো ব্যবস্থার কথা। এর মধ্যে প্রাণ কই? সুর কই? নব-ধারাপাতের রসমেদুর সময়ে, শুভঙ্করীর গান গেয়ে কি আশ মেটে?

তার নাম মন। মনসিজের আসন। যে যতো বড়ো বড়ো মনীষী, গুণী, পরিশ্রমী— তার চিন্তা, আনন্দ, অনুভব ততোই প্রখর, স্পর্শস্নিগ্ধ, ভাবময়। প্রথিতযশারও চিত্ত আছে। শয্যার বাহিরেও তার প্রয়োজন চিত্তময়ীর, সহধর্মিণীর, সমভাবনায় ভাবিনীর। এ হেন প্রেম দেহের সীমা পারায়ে যায়। 'হারিয়ে যেতে হবে, ফিরিয়ে পাবো তবে।' এ যেন নিজ হাতে বিষ-পান। (পেশোয়া বাজীরাও এবং যশস্বিনী মস্তানী বিবির উদাহরণ স্মরণীয়।)

মনসিজের এই প্রকৃতিটিকে মনে রেখে এগিয়ে যেতে হবে এই ইতিহাসের বিচিত্র পথে, আমরা জানি, সমগ্র ইনকা সংস্কৃতির মূল নাভিকেন্দ্র ছিল, যাজনিক ধর্ম, আনুষ্ঠানিক প্রত্যয়, আর নৈমিত্তিক চর্যা। অর্থাৎ মন্দির ও দেবতার পরেই সম্রাটের স্থান ছিল না। সে ছিল মন্দিরে উৎসর্গীকৃতা 'সূর্য-কন্যাদের'।

নানা ভোগ-প্রসাদের মধ্যে উৎসর্গীকৃতা কন্যাকারাই ছিলেন মন্দির ভাবনার অনুসঙ্গিনী। দেশের প্রতি কোণ থেকে সুন্দরী কন্যারা নিবেদিতা হতেন সূর্য মন্দিরে। ……এবং বৎসরে মাত্র একটি দিন তাঁরা একটিই বিশেষ পুরুষকে তাঁদের নিরালা প্রাসাদে দেখতে পেতেন। সে পুরুষটি সম্রাট স্বয়ং। সম্রাট সব সময়ে সম্রাজ্ঞীসহ দেবদাসীদের প্রাসাদে যেতেন। এই নিয়ম। এই আচার।

এরমধ্যে যদি সম্রাটের মনে ধরতো কোনো মেয়ে,—নিশ্চয় সম্রাট তাকে নিয়ে যেতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সম্রাটের ভোগে সূর্য-কন্যাদের আত্মদানের গৌরবও প্রচলিত ও অনুমোদিত ছিল। সেই সঙ্গে ছিল—দু'টি বাধা। এক, সম্রাট যখন তাকে নিশ্চিন্ত প্রসন্ন চিত্তে বিদায় দেবেন, দেবেনই, দিতে হোত—তখন তাঁর খুশী মতো কোন স্থানে ভুক্তা সূর্য-কন্যাকে পরম ঐশ্বর্য ও মান্য ব্যবহার সহ ব্যবস্থাপিতা করতে হোত। যাবজ্জীবন সমাজে তাঁর সম্মান হোত জীবন্ত দেবীর সম্মান-এর মতো। [আমাদের শাক্ত মন্দিরে ভৈরবীর বড় কম প্রতাপ, বা কম সম্মান ছিল না।] কিন্তু এ কন্যার কখনও গর্ভাধান হোতে পারত না। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল।

দুই, যদি সেই একান্ত জীবনের প্রাচুর্য সত্ত্বেও সেই কন্যার কোন রতি-বিভ্রমের সংবাদ জনমনের আকাশকে ধূমায়িত করে, তখন পূর্ণ অনুসন্ধানের পর উপযুক্ত ক্ষেত্রে চরম শাসন নেমে আসত। কন্যকাকে জীবন্ত প্রাচীর সমাধি দেওয়া ছাড়াও সমগ্র গ্রামকেই ধূলায় লুটিয়ে দেওয়া হোত। গ্রামকে গ্রামের ওপর লাঙ্গল চালিয়ে দেওয়াই ছিল বিধি।

সব হোত। তবু সব হয় না। কবি বলেন—'এক হাতে সুধাভাণ্ড, বিষভাণ্ড ল'য়ে অন্য করে।' বিষ সঙ্গে নিয়েই প্রেমের জন্ম, তাই প্রেম এই মৃত লোকের অমৃত হয়েও বিষ।

একটি সূর্যকন্যার অপরূপ বৈভব অর্জুনকে অনর্জুন করে তুলেছিল। বাসুদেবকেও রুক্মিণী হরণ করিয়ে ছেড়েছিলো। সেলিমই মাত্র একটি ব্যতিক্রম নয়। হেলেনও কোনো বিশেষ বা একক অভিশাপ নয়। মহান শিল্পের এই ধারা। মহান্ আগ্রহে নিগ্রহ অনিবার্য।

এমন একটি সূর্য মেয়ে হুয়ান কাপাকের মন হরণ করেছিলো। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা'য় এক ভাবময়ী নারী-রত্নকে রূপায়িত করেছিলেন। 'স্নেহে নারী, বীর্যে সে পুরুষ', যিনি ছেলেকে 'দ্বিতীয় অর্জুন' করে তুলবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এই নারী রত্নটিও সম্রাটের প্রত্যেক রাজকীয় অভিযানে পরামর্শ, উৎসাহ, প্রেরণা দিয়েছেন। স্বর্গের দেবতারও চেয়ে পরম প্রত্যক্ষ স্বামীকে সেই সূর্যকন্যা সেবায়, যত্নে, উদ্দীপনায়, নিবেদনে ভরিয়ে রাখতেন। এই সম্পূর্ণ আত্মিক ঐক্য বন্ধনেরই অপর নাম—প্রেম। রহস্যঘন এক বোধ। আত্ম বিস্মরণের সুধাময় স্বীকৃতি। সম্রাট এই স্বাদের 'জীবন পাত্র উচ্ছলিত মাধুরী' পান করে ধন্য হয়েছিলেন। গোপন প্রযত্নে নিষিদ্ধ পান নয়। সর্ববাদী প্রত্যক্ষ সর্বজন অনুগৃহীত অনুমোদনে বিধৃত ছিলো সেই উন্মাদ আত্মবিভ্রম।

নিজের চেয়েও বড়ো তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তানকে সেই সূর্য-কন্যা, সূর্য-মাতা ঠিক

চিত্রাঙ্গদারই মতো যত্নে ও শাসনে মানুষ করেছিলেন। নিজে যেমন সদা সক্রিয়, সদা অগ্রসরণশীল স্বামীর সঙ্গে খেলায়, উৎসবে, ব্যসনে, যুদ্ধক্ষেত্রে, শাসনভূমিতে বিচরণ করতেন, তেমনি ছেলেকেও শেখালেন মহাবীর পিতার অনুগামী হয়ে তাঁর দক্ষিণ পার্শ্বের নায়কত্ব গ্রহণ করতে। এগার বৎসর (আকবরের মতো) বয়সে সে ছেলে সৈন্যদলের নায়ক হয়ে অভিযানে গিয়েছিলেন। যুদ্ধও জিতেছেন। এই কিশোরের দেহের প্রাঙ্গণে যৌবন যেন হঠাৎ অবিভূর্ত হয়েছিলো শৌর্যে, বীর্যে, পরাক্রমে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে।

এ ছেলের নাম আতাহুয়াল্লপা। না, তিনি সম্রাটের প্রধানা মহিষী-ভগ্নীর গর্ভজাত ন'ন। তার মধ্যে প্রথম ইন্‌কা মাঙ্কো কাপাকের রক্তই তরতর করে বইতো না ঠিকই, তবু সে তার অর্ধ-রক্তের মিশালীর তেজে হয়ে উঠেছিলো ইনকা জগতের কীর্তিমান পুরুষ। বাপের জীবিতাবস্থাতেই সে পিতৃ সাম্রাজ্যকে নিজ বাহুবলে উত্তরের দিকে বাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে, কুজকো ছাড়াও অন্য এক রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করলো কুইতোয়। গুয়াকীল, কুইতো, বোগোতা, বারাংকুইলো পরপর ইন্‌কা কৃষ্টির খণ্ড খণ্ড কৌমকে এনে বেঁধে ফেললেন বিশাল ইন্‌কা রাষ্ট্রে।

আতাহুয়াল্লপার পাশাপাশি তৈরী হয়ে উঠলো আতাহুয়াল্লাপারই তিন-চারজন দিক্‌পাল বন্ধু। তারাই যুদ্ধে, ব্যসনে, জীবনে, মরণে আতাহুয়াল্লপার শক্তি, সামর্থ্য, আত্মপ্রত্যয়। ক্রমে এরা প্রত্যেকেই হয়ে দাঁড়ালো প্রসিদ্ধ সেনাপতি। সেনাপতিশ্রেষ্ঠ কুইজ-কুইজ ছিল আতাহুয়াল্লাপার মায়ের ধাত্রীর ছেলে। সে ছিল আতাহুয়াল্লাপার সমান বয়সী ; তাদের দুজনার কিছু বড়ো ছিলো আতাহুয়াল্লাপার মামা, চালিকুচিমা।

কতো বিরাট প্রভাবশালী ছিল এই দুই সেনাপতি, কতো বিচক্ষণ বুদ্ধি ছিল আতাহুয়াল্লাপার তা বুঝতে হলে একবার মানচিত্রে চোখ বোলাতে হবে। উত্তরে মাগদালিনা নদীর মোহনা থেকে দক্ষিণে চিলির প্রান্ত ; পূর্বে আমাজোন অববাহিকা থেকে পশ্চিমে সমুদ্রতট, সমস্তটাই হুয়ানা কোপাকের সাম্রাজ্য হয়ে গেল এই নব যুবকদের মহা বিক্রমের ফলে। আতাহুয়াল্লপার বিক্রম সেই সাম্রাজ্য গঠনে প্রভূত অংশ নিয়েছে। দেশ আতাহুয়াল্লাপার যশোগানে মুখর।

আর ওদিকে কুজকোয় বসে রইলেন যুবরাজ হুয়াস্কার। হুয়ানা কাপাক তার দুই বোনকেই বিয়ে করেছিলেন। ছোটো বোনের ছেলে ছিলো খুবই ক্ষীণজীবি, ভ্রাতা-ভগ্নীর সংক্রমণজাত শিশু ক্ষীণপ্রাণ হবেই। মিশরের রাজবংশ তার উদাহরণ।

কাজেই হুয়ানা কোপাকের মন বলছিল, আতাহুয়াল্লপাই সম্রাট হোক, কিন্তু আইনতঃ হুয়াস্কারই (আতাহুয়াল্লাপার চেয়ে আঠ বছরের বড়) যুবরাজ।

এক্ষেত্রে তিনি দেশের অমাত্যদের ডেকে বিচারে মন দিলেন। মন দিলেন গণৎকারের নির্দেশে।

না। গ্রহ-নক্ষত্র বিচারে না হুয়াস্কার, না আতাহুয়াল্লাপা দীর্ঘায়ু। হুয়াস্কার ঘৃণিতভাবে প্রাণ হারাবেন। আর আতাহুয়াল্লাপা জঘন্য দুর্বত্তদের দ্বারা নিহত হবেন, কোন আত্মীয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ টলমল। বিদেশীরা এ রাজত্ব—রক্তে ধুইয়ে

দেবে। দেব-দেবীরা, ধর্মের সঙ্গে এদেশ ছেড়ে চলে যাবেন। ভবিষ্যদ্বাণী শুনে বৃদ্ধ সম্রাট থরথর করে কাঁপেন।

বিশ্বাস করলেও, অবিশ্বাস করা বা অবিশ্বাসের ভাণ যুগধর্ম হয়েছে। যুক্তি-প্রমাণের যুগে মানুষের করোটির মধ্যে যা না ঢুকল, তাই বাতিল। এক কালে, মূল্যবান প্রাণও বাতিল করা হয়েছিল অবিশ্বাসের হাড়ি-কাঠে। আজও মাত্র রাজনৈতিক মতান্তরের জন্যই প্রাণকে বাতিল করা হয়, হচ্চে। 'সত্য কি,' তা পন্টিয়াস পাইলেট বা যুধিষ্ঠির একই অর্থে জানতেন। প্রকৃত সত্য,—অনির্দিষ্ট। যা নিত্য সিদ্ধ, নিত্য সৎ তারই মতো অনির্দিষ্ট। আসল যা তত্ত্বং সে তো নিহিতং গুহায়াং। তবু মেধার-দাস যারা, তারা বলে থাকে—'যার প্রমাণ পাই না, তা অসিদ্ধ।'

এতো বড়ো মিথ্যা ভাষণের ওপর ভিত্তি করেই যুগ-বিপর্যয়ের সত্য সাময়িক ইতিহাসে স্থান করে নেয়।

নৈলে আমরা যারা জ্যোতিষে, গণনায় 'বিশ্বাস' করি না,—কেন করি না, তাও জানি না, কারণ জ্যোতিষই জানি না—ভয় পেয়ে করি না। ভয় কিসের ? উপহাসের। বাবুভায়েদের চোখে, 'বিজ্ঞানী'র চোখে,—নিজেকে পুরাকালের ঘূণ ধরা পিছিয়ে পড়া বলদ বলে মনে করি, একবার যদি বলে ফেলি, 'বিশ্বাস করি'। বিশ্বাস না করাটা মস্ত একটা হাম্বড়াই যেন। কাজেই 'জ্যোতিষ' বলতেই বিশ্বাস করি না। (শাকাহারী কতকগুলো অজা-পণ্ডিতদের কীর্তি-কলাপ অবশ্য জানি, দেখতে পাই; কিন্তু মূর্খের ব্যা—করণ তো পাণিনিকে অসিদ্ধ করে না। কাজেই মাকাল জ্যোতিষীর রং দেখে জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে তুড়ি মারা অব্রহ্মণ্য। অসিদ্ধ। ন্যায়ের পরিপন্থী।) বিশ্বাসে আর যুক্তিতে কিন্তু কোন দ্বন্দ্ব নেই; যুক্তি-ন্যায়ের একমাত্র কাম্য, একমাত্র সাধনাই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করা। (কবিগুরু তাঁর মৃত পুত্র শমীর আত্মার সঙ্গে কথোপকথন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ কি মোহগ্রস্ত ? মিথ্যাবাদী ?)

এসব কথা অনেক দূর অবধি চলবে। কাজেই থেমে থাক।···কিন্তু থামাই কী করে ? পেরুর পরবর্তী ইতিহাস চিৎকার করে ঘোষণা করছে যে, পেরুর সেই তথাকথিত 'অজাগল'গুলোর ঘোষণাই ইতিহাসে বর্ণে বর্ণে প্রতিফলিত হয়েছিল।

যাক, আমরা বিশ্বাস করি আর না করি হুয়ানা-কাপাক বিশ্বাস করেছিলেন। এত উদ্বেগ হয়েছিল তাঁর যে অগত্যা দ্বিতীয়া ভগ্নী-ভার্যার সন্তানকেই সম্রাট করে দেবার প্রস্তাবও তোলেন। সে হতভাগ্য সম্বন্ধে আলোচনা করার মধ্যপথেই মৃত্যুর দামামা বেজে উঠল। প্রথমে মারা গেলেন হুয়ানা কাপাক, তার পরে সেই ছেলে, দ্বিতীয়া ভগ্নীর অকর্মণ্য রুগ্ন ছেলে। কুজ্কোয় অন্য ভগ্নীর আদুরে ছেলে হুয়াস্কার কিন্তু সিংহাসনের দাবীদার রয়ে গেল।

মরবার আগে সম্রাট শুনে গেলেন মেক্সিকোয় বিদেশী কারা এসে 'দেবানাম্ প্রিয়' আজতেকদের সরিয়ে দিয়েছে; এবং আর একদল কারা আসছে পেরুর উত্তরের সাগর সেঁচে।

সর্দারেরা ফৈসালা দিলেন যে, হুয়ানা কাপাকের নির্দেশ অনুসারে কুজকোর রাজধানী

তথা কুজকোর অধীনস্থ তাবৎ প্রদেশে হুয়াস্কার-ই সম্রাট থাকুন। কিন্তু ছোট আতাহুয়াল্পা তাঁর বাহুবলে যে ভূখণ্ডকে ইন্‌কা সাম্রাজ্যভুক্ত করেছেন, তা তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকবে। তাঁর রাজধানী হবে কুইতো, যেখানে হুয়ানা কাপাক তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বৎসর কাটিয়েছেন। (তাঁর দেহ অবশ্য যথারীতি পিতৃভূমি কুজকোর সমাধি মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মমীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল সূর্য মন্দিরের ধারে।)

হুয়াস্কার মুখে এই বিভাজন মেনে নিলেও মনে মনে অতৃপ্ত। কারণ দিনে দিনে আতাহুয়াল্পাপার খ্যাতি বাড়ছিল। বছরে বছরে সে তার জয়যাত্রা বাড়িয়েই যাচ্ছিল। কিন্তু সম্রাট হয়েও হুয়াস্কার এই সব দিগ্বিজয়ী কাণ্ডকারখানা থেকে বাদ পড়লেন।—

তিতিকাকা হ্রদের ধারে বসত করতো দুটি লড়াকু কৌম-লুপাকা এবং কোল্লা। এরা একদা সম্রাট বীরাকোচার মৃত্যুর পর তার দুই ছেলের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে দিয়ে পাউকার কোল্লার যুদ্ধক্ষেত্রকে লালে লাল করে দিয়েছিল। লড়াই ছাড়া এরা থাকতে পারত না। এরা দেখল লড়াই নামক তামাশার আর এক মৌকা এসেছে।

ইতিহাসে বার বার মানুষের দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে অসাধারণ স্বার্থসন্ধী ক্ষমতা-প্রিয়দের দুরভিসন্ধির লাভা-স্রোত থেকে। ক্ষমতার নেশায় পরস্পর বিবদমান দুই দলের কোন একদল অনিবার্যভাবে একটি তৃতীয়কে ডেকে আনে; 'পঞ্চতন্ত্রে'র দুই বেড়াল যেমন ডেকে এনেছিল বাঁদরকে। আজতেক সম্রাটকে ঘায়েল করার আশায় কোর্তেজের হাতে হাত মিলিয়েছিল তলাকৃস্‌কাল তেকারা। কৌরব-পাণ্ডবদের বিবাদে হাত বাড়িয়ে ধেয়ে এলো ত্রিগর্ত এবং পাঞ্চাল। জয়চাঁদ এবং পৃথ্বীরাজের তকরারে ডেকে আনা হল মহম্মদ ঘোরীকে; সিরাজ এবং মিরজাফরের (ঘসেটী বেগমের) দ্বন্দ্বে ডেকে ডেকে আনা হলো ইংরেজদের; চাঁদা সাহেব কর্ণাটকে ডেকে আনলেন ফরাসীকে; চিয়াং-কাইশেক এবং মাওয়ের মধ্যস্থতা অসম্ভব হয়ে পড়ল মার্কিনের দালালীতে; ভারত ও আফগানীস্থান ঢলে পড়েছে—ভাবছে রুশ করবে মধ্যস্থতা। গীতা বলেছে—'এ স্থলে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমবুদ্ধিতার প্রয়োগ কর।' ইতিহাস তা করে না। সময় মত 'গীতা' যাদবরাই তুলে রেখেছিল প্রভাসে।

বীরাকোচার দুর্বুদ্ধিতার ফলে পাউকার কোল্লা হয়ে রইল ইন্‌কা ইতিহাসের এক ভীষণ কুরুক্ষেত্র। পাউকার কোল্লার বিজয়ের ফলে বীরশ্রেষ্ঠ ভীরাকোচা ইন্‌কা য়োপানকীকে ধরে এনে মন্দিরে সঁপে দিলেন। এই য়োপানকী একদা ইনকা সম্রাট হয়ে নতুন নাম নিলেন ইনকা পাচাকুটি। পাচাকুটীর সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল ৩,৫০,০০০ হাজার বর্গ মাইল। ঐতিহাসিকরা বলেন, পাচাকুটী এবং তস্য পুত্র তোপার কাহিনী আলেকজাণ্ডার, জেঙ্গীস বা নেপোলিয়ানের সমান।

একটি তথ্য এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। থোর হায়ার্দালের ১৫০ বছর আগেই এই দুর্দান্ত যোদ্ধা পাচাকুটী বালসা-কাঠের ভেলায় পাল টাঙ্গিয়ে বিশাল বহরে সৈন্যদল নিয়ে পেরুর পূর্বে প্রশান্ত মাহাসাগরের পালা-পাগস দ্বীপপুঞ্জ অধিকারে এনেছিলেন। এই সৈন্য দলের শিক্ষা এমন চূড়ান্ত ছিল যে, তারা আমাজোন অববাহিকা থেকে ১২০০০ ফুট

ডিঙ্গিয়ে সমুদ্রতীরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত, বহর নিয়ে সমুদ্রে দু'শো মাইল চলে যেতে পারত এবং যেখানে যেত জয় করেই ফিরত।

ইনকা পোচাকুটী প্রবর্তন করেন 'মিতিমা' প্রথা।

এই প্রথার ফলে কোন কৌমই 'চিরকাল' এক জায়গায় থাকতে পেত না। যাকে বলে 'ঢেঁকী শুদ্ধ' বিদায়, সেইভাবে গ্রামকে গ্রাম বসতি ওলট্-পালট করে পাঁচ বছর বাদে বাদে দেশের অন্য প্রান্তে বসত বাঁধতে হোত। এর ফলে সারা সাম্রাজ্যের মধ্যে একত্ববোধ আসত এবং ভাষা বা কৃষ্টির দোহাই পেড়ে প্রাদেশিকতার বিষ চাড়া দিতে পারত না। তোপা ইনকা তার বাপের সময়ের সাম্রাজ্য ত্রিশ বছরে হাজার গুণ করেছিল বলেই এখন ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে, পেরুতে হলো দুই ইনকা।

হঠাৎ পাঁচ বছর পরে হুয়াস্কারের খেয়াল হোলো ভাই তাকে তো কোনো 'কর' পাঠায় না। সেটাতো বিশৃঙ্খলা। কর পাঠানো নিয়ে বাধল লড়াই।

হুয়াস্কার দুর্বল ছিলেন না। তাঁর সেনানীরাও দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন! কুইজ্ কুইজ্ বা চালিকুচিমার প্রসিদ্ধির মোকাবেলা করার জন্য তারা নিশপিশিয়ে উঠল। যুদ্ধ অনিবার্য হল।

রায়োবাম্বা নামক অধ্বাহিকায় তুমুল যুদ্ধ হল। সেই যুদ্ধে নিহত সৈন্যের হাড়ের স্তূপ স্প্যানিয়ার্ডরাও দেখেছে। আতাহুয়াল্লাপারই জয় হল। তারও পরে যুদ্ধ হল য়ানামার্কা এবং কাজামাকরি। আবার জয়ী হলেন আতাহুয়াল্লাপা।

অন্তর্দ্বন্দ্বের যখন এই রক্তক্ষয়ী রূপ ঠিক তখনই পেরুর সমুদ্রে দেখা গেল সদূর ব্যাষ্টিলের রণতরীর বহর। ১৮০টি সৈন্য নিয়ে ইতিহাস লেখা ঘুচে যেতে পারত, যদি এই বোম্বেটেরা দশটা বছর আগে বা দশটা বছর পরে আসত।

কাজামার্কার তাতাপানীর প্রস্রবণ ছিল হুয়ানা কাপাকের আরামগাহ্। যুদ্ধশেষে আতাহুয়াল্লপা হুয়াস্কারকে কুজকোয় আটকে রেখে এখানে আরাম করছিলেন।

আবার গণৎকার। আবার ভবিষ্যদ্বাণী। বেচারী গণক বললেন—'দিন আগত ওই। ভীষণ যন্ত্রণা পেয়ে আতাহুয়াল্লাপার মৃত্যুর আর দেরী নেই। শুনে রাগে অন্ধ হয়ে আতাহুয়াল্লাপা গণৎকারের মাথা কেটে ফেললেন। শুধু তাই নয়, তিনি কাজামার্কার বড় মন্দিরের (মন্দিরটি তাঁর পিতার স্থাপিত) পুরোহিত ছিলেন বলে সে মন্দিরও গুঁড়িয়ে দেন বিগ্রহসহ, এবং মন্দিরে জমিতে শস্য বুনে দেন।

দূরে কুজকোয় আতাহুয়াল্লাপার মা এসব শুনে চোখের জল ফেললেন।

আবার হুয়াস্কার। আবার আক্রমণ। আবার প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ। এবার সে কুরুক্ষেত্র কুজকোর নদী অপুরিমাক-এর তীরে কোটাম্বার ময়দানে। হুয়াস্কারকেও গণৎকার বলেছিল —এক্ষণ তার পরম অশুভক্ষণ। কিন্তু তখন আতাহুয়াল্লাপার সৈন্য কুজকোর দোরে। অপেক্ষা চলে না।

হুয়াস্কারের জিত হলো প্রথম দিনে। কিন্তু হুয়াস্কার আতাহুয়াল্লাপা নয়। আখির

ম্যাচু পিচু থেকে হুয়ানাপিচর মাঝে কাঠের সেতু

ম্যাচু পিচু
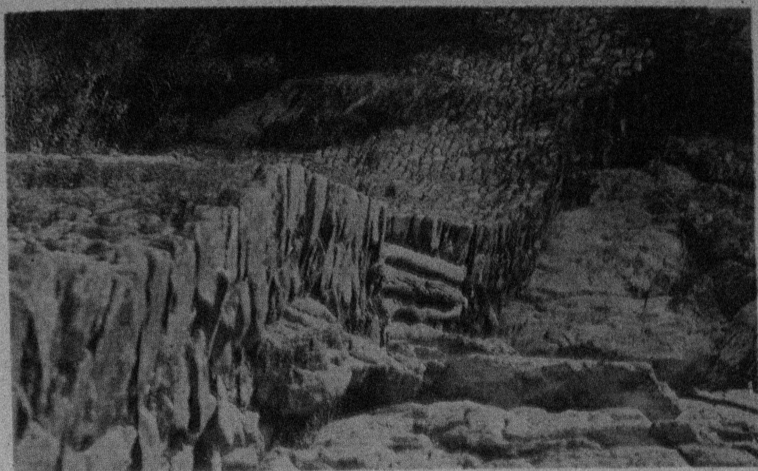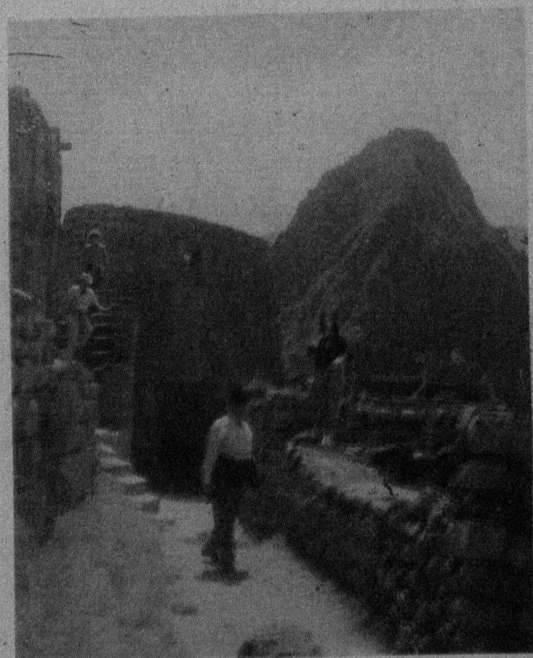
লেখক চলেছেন একা মন্দিরে (মেহিলাটি নিঃশব্দে—অনুসরণ করলেন)

সাকসাহুয়ামানে সূর্যচক্র

সন্ন্যাসিনী আশ্রমে কাপড় ধোবার ব্যবস্থা

'ফতেহ্' তারই মনে করে হুয়াস্কার রাতের বিশ্রামে মন দিয়েছে। কিন্তু বিনিদ্র আতা-হুয়াল্লাপা। বিনিদ্র চাল্‌কুচিমা এবং কুইজ্ কুইজ্। হঠাৎ হুয়াস্কারের ব্যক্তিগত শিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চালকুচিমা নিজে, পলায়নপর হুয়াস্কারকে তার পাল্‌কী থেকে টেনে নামিয়ে, নিজেই সম্রাটের পোষাক চড়িয়ে পাল্‌কী চেপে পালাতেই লাগলেন। তাই দেখে সৈন্যদলও সম্রাটের সঙ্গে পালাতে লাগল। যখন সকালে আসল খবর ছড়াল, তখন আতাহুয়াল্লাপা ও কুইজ্ কুইজ্ হুয়াস্কারকে বন্দী করে ফেলেছে।

কুজকোর ঘরে ঘরে তখন কী ভয়। আতাহুয়াল্লাপার হুকুমে কুজকো এবং তার মন্দিরের সেই দশা হবে, কাজামার্কার মন্দিরের যে দশা হয়েছিল।

কিন্তু কুজকোয় আছেন মা এবং মায়েরা,—বোনেরাও। আতাহুয়াল্লাপা কুজকো নগরীর কেশাগ্রও স্পর্শ করলেন না। কাজামার্কা থেকেই চালকুচিমাকে সংবাদ পাঠানো হোলো, কুজকোকে যেন স্পর্শ না করা হয় এবং হুয়াস্কারের যেন কোনো বিপদ বা অসম্মান না হয়।

এই সময় তুম্বেজ নামক বন্দরে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে পিজারো ১৮০জন স্প্যানিশ বোম্বেটে সহ সেই খেল খেলতে আসেন, যে খেল মেক্সিকোয় কোর্তেজ দেখিয়ে ক্যাষ্টিলের রাজ-দরবারে সোনার খেলাৎ পেয়েছিলেন।

ভুল আতাহুয়াল্লাপাও করলেন। ধর্মান্ধতার এই কুফল। জ্ঞানলব্ধ বিদ্যায় ধ্যান-লব্ধ বোধি ছাড়া কেবল বিগ্রহ সীমিত ধর্মবোধের ফলশ্রুতি নহুষের পতন, 'ভবানী'-খড়্গ দর্পিত মহারাষ্ট্রের পতন, যশোরেশ্বরীর বিরুদ্ধ দৃষ্টি দর্শনে প্রতাপাদিত্যের পতন। যুদ্ধ করাই নিশ্চয় হয়ে যাবার পর, সিক্রীতে বাবরের মতো, সামুগড়ে ঔরংজীবের মতো, সৈনাপত্য-নির্ভর-নির্মম যুদ্ধ করতে হয়। নৈলে পরাজয় অনিবার্য।

রাজার পক্ষে বলা সাজে না—'দ্বারে দেব-সৈন্য সমাগত; এদের অভ্যর্থনা কর।' ভক্তির আতিশয্যের সুবিধা না পেলে বল্লাল সেনকে পাঠান জব্দ করতে পারত না। বভ্রুবাহন? প্রবীর? হোক পিতা, হোক ইষ্ট—যখন শত্রুরূপে আততায়ী তখন যুদ্ধে তাকে পরাজিত, এমন কি হত্যাও করতে হবে। তা-ই ধর্ম।

যে দেবতার ভক্তিতে গদ-গদ হয়ে এইসব নপুংসক আচরণ করা হয়, সেই দেবতাই কি বার বার বলেননি—('নহি এতৎ উপপদ্যতে') 'এ উচিত হচ্ছে না? ক্লীবতা দেখাবে না? যুধ্বস্ব? যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ!' বার বার, বার বার! অথচ……

এর পরের কথা আতাহুয়াল্লাপার জীবনের শেষ কটি দিনের কথা; পেরুর যে জনসাধারণ এখনও মলিন বসনে, মলিন মুখে, বিষণ্ণতার প্রতিচ্ছবি হয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে, পাহাড়ে-জঙ্গলে, উপত্যকায়-অধিত্যকায় তাদের দিন কাটাচ্ছে—তারা আজও—না, খৃষ্ট নয়, মেরী নয়, সেণ্ট পল্, সেণ্ট পীটর, সেণ্ট জন্ নয়—আজও তারা আকাশ, মাটি, বাতাস, জলের দিকে তাকায়, তাকায় সূর্য-চন্দ্রের দিকে, তাকায় আগুন ছোঁড়া মেৎসী-র শিখরের দিকে—আর ভাবে, ভাবতে ভাবতে ডুবে যায়—'আমরা কি পেলাম? আমাদের এতো সরল প্রার্থনা। অক্লান্ত জীবন, অপূর্ণ সাধনের সামনে এসে তুমি কি দিলে; হে ধর্ম, হে দেবতা, হে শতসহস্র অধীর মন্ত্রের বধিরতা?'……

সাকসাহুয়ামানে সূর্যচক্র

সন্ন্যাসিনী আশ্রমে কাপড় ধোবার ব্যবস্থা

'ফতেহ্' তারই মনে করে হুয়াস্কার রাতের বিশ্রামে মন দিয়েছে। কিন্তু বিনিদ্র আতা-হুয়াল্লাপা। বিনিদ্র চাল্কুচিমা এবং কুইজ্ কুইজ্। হঠাৎ হুয়াস্কারের ব্যক্তিগত শিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চালকুচিমা নিজে, পলায়নপর হুয়াস্কারকে তার পাল্কী থেকে টেনে নামিয়ে, নিজেই সম্রাটের পোষাক চড়িয়ে পাল্কী চেপে পালাতেই লাগলেন। তাই দেখে সৈন্যদলও সম্রাটের সঙ্গে পালাতে লাগল। যখন সকালে আসল খবর ছড়াল, তখন আতাহুয়াল্লাপা ও কুইজ্ কুইজ্ হুয়াস্কারকে বন্দী করে ফেলেছে।

কুজকোর ঘরে ঘরে তখন কী ভয়। আতাহুয়াল্লাপার হুকুমে কুজকো এবং তার মন্দিরের সেই দশা হবে, কাজামার্কার মন্দিরের যে দশা হয়েছিল।

কিন্তু কুজকোয় আছেন মা এবং মায়েরা,—বোনেরাও। আতাহুয়াল্লাপা কুজকো নগরীর কেশাগ্রও স্পর্শ করলেন না। কাজামার্কা থেকেই চালকুচিমাকে সংবাদ পাঠানো হোলো, কুজকোকে যেন স্পর্শ না করা হয় এবং হুয়াস্কারের যেন কোনো বিপদ বা অসম্মান না হয়।

এই সময় তুম্বেজ নামক বন্দরে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে পিজারো ১৮০জন স্প্যানিশ বোম্বেটে সহ সেই খেল খেলতে আসেন, যে খেল মেক্সিকোয় কোর্তেজ দেখিয়ে ক্যাষ্টিলের রাজ-দরবারে সোনার খেলাৎ পেয়েছিলেন।

ভুল আতাহুয়াল্লাপাও করলেন। ধর্মান্ধতার এই কুফল। জ্ঞানলব্ধ বিদ্যায় ধ্যান-লব্ধ বোধি ছাড়া কেবল বিগ্রহ সীমিত ধর্মবোধের ফলশ্রুতি নহুষের পতন, 'ভবানী'-খড়্গ দর্পিত মহারাষ্ট্রের পতন, যশোরেশ্বরীর বিরুদ্ধ দৃষ্টি দর্শনে প্রতাপাদিত্যের পতন। যুদ্ধ করাই নিশ্চয় হয়ে যাবার পর, সিক্রীতে বাবরের মতো, সামুগড়ে ঔরংজীবের মতো, সৈনাপত্য-নির্ভর-নির্মম যুদ্ধ করতে হয়। নৈলে পরাজয় অনিবার্য।

রাজার পক্ষে বলা সাজে না—'দ্বারে দেব-সৈন্য সমাগত; এদের অভ্যর্থনা কর।' ভক্তির আতিশয্যের সুবিধা না পেলে বল্লাল সেনকে পাঠান জব্দ করতে পারত না। বভ্রুবাহন? প্রবীর? হোক পিতা, হোক ইষ্ট—যখন শত্রুরূপে আততায়ী তখন যুদ্ধে তাকে পরাজিত, এমন কি হত্যাও করতে হবে। তা-ই ধর্ম।

যে দেবতার ভক্তিতে গদ-গদ হয়ে এইসব নপুংসক আচরণ করা হয়, সেই দেবতাই কি বার বার বলেননি—('নহি এতৎ উপপদ্যতে') 'এ উচিত হচ্ছে না? ক্লীবতা দেখাবে না? যুধ্যস্ব? যুদ্ধায় কৃত নিশ্চয়ঃ!' বার বার, বার বার! অথচ······

এর পরের কথা আতাহুয়াল্লাপার জীবনের শেষ কটি দিনের কথা; পেরুর যে জনসাধারণ এখনও মলিন বসনে, মলিন মুখে, বিষণ্ণতার প্রতিচ্ছবি হয়ে গ্রামে গ্রামান্তরে, পাহাড়ে-জঙ্গলে, উপত্যকায়-অধিত্যকায় তাদের দিন কাটাচ্ছে—তারা আজও—না, খৃষ্ট নয়, মেরী নয়, সেণ্ট পল্, সেণ্ট পীটর, সেণ্ট জন্ নয়—আজও তারা আকাশ, মাটি, বাতাস, জলের দিকে তাকায়, তাকায় সূর্য-চন্দ্রের দিকে, তাকায় আগুন ছোঁড়া মেৎসী-র শিখরের দিকে—আর ভাবে, ভাবতে ভাবতে ডুবে যায়—আমরা কি পেলাম? আমাদের এতো সরল প্রার্থনা। অক্লান্ত জীবন, অপূর্ণ সাধনের সামনে এসে তুমি কি দিলে; হে ধর্ম, হে দেবতা, হে শতসহস্র অধীর মন্ত্রের বধিরতা?'······

—"সেই হতভাগ্য আতাহুয়াল্পাপার কথা পরে বলব।" বলল রোদ্রীগেজ। "এখন এই বিরাট পুরাণের বিরাট কথা এখানেই শেষ হোক। এর পরে যা শুনবে তা কেবল রক্ত, অশ্রু, বিভীষিকা, লোভ, রিরংসা, বিশ্বাসঘাতকতার কথা। প্রেস্‌কট্‌ সাহেব যাদের বলেন, সিভিলাইজ্‌ড্‌—তাদের কথা।"…

—"যাক একথা। বাকীটা কুজ্‌কোয় গিয়ে শুনব। এখন আমরা যা দেখতে এসেছি দেখি।"

ততক্ষণে মোচে, মোচিকার ধ্বংসাবশেষ আমাদের চোখের সামনে। দূর থেকে যে পাহাড় উঠে গেছে, আর তা ধূসর হিংস্র নয়। এখানে যেন শ্যামলতার ছোঁয়াচ। কী ভীষণ রুক্ষই ছিলো চান্‌ চান্‌। শাদ—শাদা—শাদা! এ তবু স্নিগ্ধ, সহজ।

বিশাল দু'টি মন্দিরবেদী আমাদের লক্ষ্য। আমাদের লক্ষ্য এই চিমু কৃষ্টির বহু আগের ইতিহাসের দিকে। তখন দেবী পাচাকামাক (মহাপ্রসূতি শক্তি), আর দেবতা কোরিকাঞ্চা (সূর্য) এখানে গেড়ে বসেছেন।

পথ থেকে বেশ দূরে (স্বাভাবিক ভাবেই) পড়ে গেছে মন্দিরবেদী দু'টি। সাবধানে সরু অ-পথকে বিপন্ন করেই গাড়ি এগুচ্ছে। কিন্তু বিশাল, বিশাল, সুবিশাল সেই বেদীর দিকে চেয়ে যেন এক ধরনের রোমাঞ্চ হয়—বিভীষিকা (mystic awe)। মানুষের হাতে তৈরী গোবর্ধন পাহাড়। তার গায়ের গাঁথুনীর মসৃণতা সৃষ্টি করার জন্য এক কোটি ত্রিশলক্ষ আদোবের (বড়ো বড়ো কাঁচা ইটের) প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। মানুষের হাত, মানুষের শ্রম সেই প্রয়োজন মিটিয়েছে! আর ঘটনাটা ঘটেছে ১৮০০ বছর আগে। ইটের গায়ে হাত বোলালে নিশ্চয়ই মনে হয়,—কাল, গতকালের কথা এ। পাশাপাশি দু'টি মন্দির—তার একটি সূর্য, আর অপরটি চন্দ্রদেবীর—ঠিক যেমন মেক্সিকোর তিওতিহুয়াকান। (আচ্ছা, যে কোনো দেশের পূজা বিধানে এই স্ত্রী+পুং মিথুনিত অর্ধনারীশ্বরতার সত্য রূপায়িত কেন?)

তবে ঐ পর্যন্তই। বিরাট, বিশাল, চমকপ্রদ। কিন্তু এর বেশী বেশী কিছু খুঁজলে হতাশ হতে হবে। খসে, জরে পড়লেও বোঝা যায় গড়নের মধ্যে রেখার সরলতা ও সুষমার প্রতি জোর খবরদারি ছিল।

প্যান আমেরিকান হাইওয়ের পশ্চিম দিকে আরও একটি মন্দির আছে, এখন নাম—'এল্‌-ড্রাগন'। এ মন্দিরের দেয়াল চারটিই ঢালু, লম্বায় বেশী, চওড়া—মানে উচ্চতায় কম। কিন্তু আডোবেগুলি নক্সা করা ছাড়াও সাজানোর কৃতিত্বে কেমন একটা জ্যামিতিক শৃঙ্খলায় গোছানো। ওপরে ওঠার ঢালু পথ আছে (উঠিনি)।

সব হতাশা মিটে যায় সংগ্রহশালা দেখলে। চান-চান্‌, পাচাকামাক ছাড়া এই চিমু কৃষ্টির নাম ও খ্যাতি প্রত্নতত্ত্ববিদের কাছে খুব বড়ো। সে ওদের সংগ্রহের জন্য। সংগ্রহশালার যুবক অভিভাবক ডঃ কায়াম্বী আস্‌পেরো। ভাগ্যক্রমে ইংরাজী ভালোই জানেন। বল্‌লেন একটি পোড়ামাটির কলস দেখিয়ে যে, তিয়াহুয়ানাকাও-কৃষ্টিতে মাটির গায়ে যে

রঙীন প্রলেপ পাবেন, সেটা না পাওয়া গেলেও এখানকার পোড়ানোর ধারা অনেক ভালো। কালো বাসন, বা লালের ওপর কালোর 'সীলহট্' করা কাজ পোড়ানোর তারীফ না থাকলে আয়ত্তে আনা যেতো না। শুনলাম, এর চেয়েও বড়ো মন্দির আছে, প্যারামোঙ্গায়। বহুলোক বলে—সেটা বেদী নয়, কোনো দুর্গের ভগ্নাংশ। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে আসতে যাবো, চৌকাঠে পা বেধে মধু পড়ে গেল।

ওরই কাঁধে ক্যামেরাগুলো। খুব শঙ্কিত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ফিরতে হবে। দীর্ঘ পথ। শহরে 'বিলি-বব' নামক প্রখ্যাত রেস্টুরাণ্ট। অমন বারবাক্যু নাকি দক্ষিণ আমেরিকায় নেই। ওরা খেলো, তারিফও করল। আমি নিলাম একেবারে পেরুর ঘরোয়া মাছ আর আলু সেদ্ধ, বলে—"কাস্ত-দ্য-কোপা"। কী মাছ, জানি না। কিন্তু হ্রদের মাছ, খুবই নরম, মিষ্টি আর অবশ্যই কাঁটাহীন।

আবার লীমা। ততক্ষণে আমরাও ক্লান্ত। বিধ্বস্ত। রাত এগারোটা বেজে গেছে। কিন্তু আভেনিদা নিকোলাস-দ্য পিরোলা পুরোপুরি গমগম করছে। পথের ধারে দামী দামী রেস্তরাঁগুলো মানুষে-জনে গিস্ গিস্ করছে। ব্যাণ্ড বাজছে। নাচ চলছে। হোটেল ক্রিলঁতেও চলছে তুমুল নাচ। কাঁচের দরজা দিয়ে অন্ধকার হলে নীল বাতির ঝলকে নৃত্য-চঞ্চল মণ্ডলিত তনুগুলি নজরে পড়ে।

চারজনেই চার গ্লাস, যে যার পছন্দমতো পানীয় নিয়ে বসি। কথা হয়ে রইলো যে, কাল ভোরেই যখন বেরুনো, তখন ফিরে এসেই হোটেল স্থাভয়ে বদল করা যাবে। মাল এখন থাকুক ক্লোক রুমে। কেবল ছোটো স্যুট কেসটা যাবে। এখন যাচ্ছি পাহাড়ে। শীতের দেশে। ঘড়ি ঘড়ি পোষাক বদলাবার তাড়া নেই। বর্ষাতি তো নয়ই।

কিন্তু পড়ে যাওয়া আঘাতটি মধুকে বড়ই বিব্রত করছিলো তখনই এক ডোজ আর্ণিকা দিয়েছিলাম। ভাবলাম আবার গিয়ে দেব।

এরা চলে যাবার পরেই আমি ওপরে গেছি। মধু সোজা শুয়ে। জিগ্যেস করলো—"স্নান করবেন?"

আমি পাল্টা জিগ্যেস করি—"তুমি করবে না? আরাম পেতে।"

"ভাবছিলাম, আপনার গা-হাত টিপে দেব।"

হাসলাম। "তুমি আর্ণিকার রুগী। চান না করো তো শুয়ে পড়ো। খুব চোট লেগেছে। আর্ণিকা খাও। খেয়েছ? বেশ।"

স্নান করে শুতে এসে দেখি বিভ্রাট। মধু কাঁদছে।

—"কী ব্যাপার?"

ও হাতে করে একরাশ 'এক্সপোজড্ ফিল্ম্' তুলে ধরল। বুকটা ধড়াস করে উঠতে গেলেও মনে মনে নিজেকে সামলে নিলুম।

—"আরে! এ সব তো হয়েই থাকে। ভেঙ্গেপড়ার কী হোল? যেখানে পঁচিশ-ত্রিশটা ফিল্ম্ এক্সপোজ করছো, সেখানে অমন কত হবে। হাজার হলেও আমরা

এ্যামেচার। দেখবে, কতো আসবে না, কতো লাইটের গোলমাল। এজন্যেই তিনটে ক্যামেরা। আমরা কি প্রফেশনাল? ক্যামেরার কিছু হয়নি তো? অনেক সময়ে বালি ঢুকে ক্লাচ আটকে দেয়।"

তুলে দেখলাম, বললাম—"ঠিক আছে। শুয়ে পড়ো।"

কিন্তু মনে মনে দুঃখ। আর সব জোগাড় হবে, কিন্তু সব চেয়ে বেশী ছবি তুলি মেলার, মানুষের, জীবনের বিচিত্রতার। হোলো না, হবে না। কিন্তু 'হিসাব মিটাতে মন মোর নহে রাজী'। মাঝে মাঝে তার ছিঁড়বেই।

একেবারে কস্‌কসে গরম জলে ডুবে বসে ডায়েরী লিখেছি। এখন পরমাক্লান্তি। পরিপূর্ণ সার্থকতার কোলে ঢুলে পড়লে যে নিদ্রা তার কোলে ঢলে পড়লাম।

মনে মনে চিন্তা, ঠিক সময়ে ওঠা চাই।

ফোন তুলে ডেস্ক্ এ্যাটেণ্ডাণ্টকে বলে দিলাম, ঠিক চারটেয় তুলে দিতে।

ঘুমটা কম হচ্চে। এ কথা ভাল নয়।

ঠিক খাওয়া চাই। ঠিকমত বিশ্রাম চাই।

ঘুমটা চাই-ই চাই।

কুজ্‌কো

সাড়ে সাতটায় গাড়ি। এসব পাহাড়ে ট্রেন লাইন পাতার খুবই হাঙ্গামা, কারণ ঝুপ করে পাহাড়; আর পাহাড় এলেই চড়-চড় চড়াই।

রদ্রীগেজ বার বার করে কয়েকটি কথা বলে দিয়েছিল। কুজকো দেখে ঐ পথেই যেন পুনো যাই। পুনো গেলেই তিতিকাকা হ্রদ দেখা যাবে। আর তিতিকাকা থেকেই যেন আয়াকুচো যাই। আয়াকুচো থেকে প্লেন নিয়ে যেন ফিরে আসি কুজকোয়। সময় সংক্ষেপ হবে, তা হলেও কুজকো থেকেই তো যেতে হবে মাচু-পিচু। তাই আবার কুজকো আসা।

ব্যাপারটা আমার কেমন গোলমেলে লাগল। বললাম্, "আমার প্রাণ এখন মাচু পিচুর জন্য ব্যস্ত। সেইজন্যই কুজকো। কুজকোয় আমি সপ্তাহখানেক থাকব। দেখে নেব সেক্‌সাহুয়ামান। মাচু-পিচু থেকেই যাবো পিউনো, আর আয়াকুচো যাব কার নিয়ে বা বাসই নেব। যা পাই। কঠিন পথ। তবুও যাব। সেখান থেকে ফিরে হুয়ানাকো। তখন আবার পোগ্রাম।"

রদ্রীগেজ বল্‌লো, "সব ভালো, কেবল মাচু-পিচুটা গোলমেলে। বাস যদি পাও-ও বড় কষ্টের সে যাত্রা। আর যদি ফিরতি পথের ট্যাক্সি পাও, সেই হবে ভাল।"

যাই হোক পরদিনের যাত্রা কুজকোয়ই ঠিক হোলো।

মধু লাগাল শুই-গাঁই। ওর টাকায় টান লাগবে; আর তার বড়ো টান লাগবে, ছুটি। আমি বল্লাম, "আমার কাছে পনের দিনের পনের শ'র জায়গায় পঁচিশ শো ডলার আছে। ভেবো না, ত্রিনিদাদেই তো লীমা-কুজকো যাতায়াতের টিকিট কেনা আছে, লাগবে না; আর তার করে দিচ্ছি, আব্রাল-ট্রাভেল এজেন্টস্ আমায় টিকিট ধার দেবে কুজকো-আগাকুচো। সব ঠিক হয়ে যাবে। কুজকোর হোটেলের কাউন্টার থেকেই সব ব্যবস্থা হবে। টাকা আসে-যায় মধু। সময় শুধু যায়; আর আসে না। মনে রেখ পেরু আসা নাইট ক্লাবে যাবার মতো সহজ প্রস্তাব নয়।

সকালে প্লেন ছাড়ল সাড়ে ছ'টায়—এয়ার পোর্টে আসতে হল পাঁচটায়। ঐ সময়টি আবার আমার দেহযন্ত্রের বায়ু-পিত্ত-কফের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ধোলাই, সাফাই, তেল-পাল্টানো, জলভরা, পেট্রোল ভরার সময়, এবং এবম্বিধ লম্বা-চওড়া নানাবিধ জাম-ঝাঁকাইয়ের ফলশ্রুতি বাবদ সহজ সরল পথে সেই সব এনট্রান্স্-এক্সিটের ব্যবস্থায় হয়ে যায় ওলট-পালট।

তবু ভাল, রাতের শেষ কর্ম হিসাবে গরম টাবে বসে থাকি; স্নান করে এসে শুই। খানিকটা সুস্থ-শান্ত থাকে নার্ভস্। বায়ুও প্রাণায়ামের জন্য সর্বদা 'রেডি' থাকে।···কিন্তু শরীরের নাম মহাশয় হলেও, কার্যকালে দেখেছি ও বলে, 'মশায়, কাঁহাতক সয় বলুন তো ?'

তা সে সকালের পাঁচটা আমার তেমনি এক ফাঁড়ার সকাল। ভেবেছিলাম, এয়ার-পোর্টে কোন্-না ঘণ্টাখানেক সময় পাব ? ঐখানে একটা কিছু কেরামাৎ দেখাব।

কিন্তু গেরো যখন ভ্যাংচায়, তখন শাশুড়ীর-ঝিও 'ছিঃ' করতে ছাড়ে না। এ আমি ঘরে-বাইরে, হিতে-বিপরীতে, জীবনে-মরণে দেখেছি। মধুকে বলে রেখেছিল ম, "আমায় খুঁজো না। জানই তো এয়ার-পোর্টের পাব্লিক এ্যাড্রেস্ সিস্টেম্ সর্বত্র সমানভাবে বেদ-অ-বেদ ধ্বনিতে পারঙ্গম। প্লেন মিস্ করব না। কিন্তু প্লেনের ব্রেক-ফাষ্টটা তো খেতেই হবে।"

তখন মনে ছিলো না—আম্মুও সুনীত চাড়ুজ্যে নই, পাব্লিক এ্যাড্রেস ও দোভাষী নয়। (যে যার রাষ্ট্র ভাষা নিয়ে নিজের কোটে। পশ্চিম বাংলার ষ্টেশনের নাম বল্‌মিন্দর সিং পড়তে না পেরে ঘাটশিলার জায়গায় কোলাঘাটে নেমে পড়েন, আর মালদার মাখন দা মোকামায় নামতে গিয়ে মালকাগঞ্জে নেমে কপাল চাপড়ান :—ইতি ভাষা-প্রীতি-কথা।) এখানে যা কিছু লেখা, চমৎকার লেখা; নিওন আলোয় ঝলমলে সাজান লেখা; কিন্তু পড়ি কি করে ? বিশেষ, বুঝি কি করে ? গন্ধ বুঝে যাব, এ তো হাওড়া ষ্টেশন বা দমদম এয়ার-পোর্ট নয়। সেটুকু সদাচারও তো এদের ব্যবস্থায় নেই। এখানে কোন গন্ধই নেই। কাদা-জলের দাগটিও নেই। বুঝুন, বাঙ্গালী বাচ্চার কী গেরো। ভারতীয় সৌজন্য বোধ এরা পাবে কী করে ?

কিন্তু কুণ্ঠাহীন চিত্তে ঐ বৈকুণ্ঠে যেতে আমায় হবেই। এখানে কানে পৈতের নিয়ম নেই, যে পহ্‌চান হবে। কেউ কানে পৈতে দিয়ে কোন দিক থেকেই বেরুচ্ছে না, ব

ঢুকছে না। বোধ হয় ওদের পৈতের ফ্যাশান নেই। (ও দৃশ্য লণ্ডনের এয়ার পোর্টে বার দুই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।)

কিন্তু এরা অন্ততঃ প্যান্টে বোতাম দিতে দিতে তো বার হয়। এবং—লক্ষ্য করেছেন কিনা জানি না—ঐ সব গন্তব্যস্থলে যাবার বেলায় মানুষের মুখে কিছু ল্যেপা-পোঁছা উদ্বেগ-আশঙ্কার ছায়া তবু পড়া গেলেও, বেরুবার বেলায় সে মুখ সন্ত দুধ মেরে দেওয়া বেরালের মতো 'ন-বিচাল্যতে'র অবস্থা। যেন হঠাৎ মানুষটা খুব সীরিয়স হয়ে বেরুচ্ছে।—কেউ যেন না দেখে, দেখলেও বুঝতে না পারে।

এই সব ফেস্ রীডিং এবং মুদ্রা-রীডিং করে যদি বা আমিও সীরিয়স মুখ নিয়ে বার হলাম,—দেখি, শ্রীমান মধু দূরে 'Q'-তে (কীউতে) দাঁড়িয়ে হাত ঝাঁকিয়ে হাতখানা ছিঁড়ে ফেলে আর কি!……মানে তৃতীয় ডাকও যে শেষ। আমি শুনিনি। আমার সেই আপৎকালীন প্রাইভেট কর্মস্থলের ঘরের পাবলিক এ্যাড্রেস সিস্টেম্ কোন প্রাইভেট রোগে বোবা মেরে গিয়েছিল।

কিন্তু আমি খুশী। প্লেনে ঠেসে প্রাতরাশ খেলাম। দাঁতের ব্যথাকে কলা-দেখিয়ে সব কিছুই খেলাম এবং অতি উত্তম কফি খেলাম। খ-চারিণী খিদমদ্‌গারিণীকে বল্‌লাম (বুঝুক না বুঝুক),—"তোফা কফি! উনো ক্লাস!" অন্ততঃ ৫০% স্প্যানিশ, ঠিক বুঝল। হাসল। মিষ্টি হাসি। অর্থাৎ বুঝল 'অমৃতং বালভাষিতং'। খোকা মুখে প্রথম 'বাবা' ধ্বনির স্ফোট হলে মা যেমন হাসে। বল্‌ল.—তবে, কী যে বল্‌ল 'সার্ভেন্তেস্' বা 'পিকাসোই' জানেন; কিন্তু আমি নারিন্নু বুঝিতে আমায় আরোও এক কাপ কফি দিয়ে গেল কিন্তু, সঙ্গে সঙ্গে বিমল হেসে বলেও গেল, পরিষ্কার ইংরিজীতে,—'বৃদ্ধ খোকন, এ বয়সে স্প্যানিশ শেখ ক্ষতি নেই; কফি এত খেয়ো না, বিশেষ করে ব্ল্যাক কফি। হার্ট থাকলে, নাচ নাচাবে।'

কার্ডিলেরা

দেখতে দেখতে আমরা কিন্তু কার্ডিলেরার পেছু ধরেছি। এ্যাণ্ডীজের ভয়ঙ্কর প্রবাহ এই কার্ডিলেরা পর্বতশ্রেণী।

অবশ্যই এ্যাণ্ডীজ এবং কার্ডিলেরার কথা আমি বহুদিন ধরেই শুনে আসছি। তা অগম্য! তা ভয়ঙ্কর! তার মধ্যে নানা দুর্বিপাক! মাঝে মাঝে হেথা হোথা সে দুর্বিপাকের রূপ ও পরিমাণের ভীতিপ্রদ ব্যাখ্যাও পড়েছি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জেনেছি,—এই

এ্যাণ্ডীজের রূপ যেন একই অঙ্গে দারিদ্র্য ও দাক্ষিণ্য। হিমালয়ের যদি গৌরী-শঙ্করীরূপ হয়, তো এ্যাণ্ডীজ যেন রুদ্র আর অন্নপূর্ণা। একদিকে:—প্রচণ্ড শুষ্কতা, চণ্ডতা; অগ্নিবর্ষী থরথর-কম্পিত ডমরুধারী এক-মহাবুভুক্ষু ক্রমাগত ধ্বনি তুলছে 'ভুখাহুঁ, ম্যয় ভুখাহুঁ'; আমি সর্বগ্রাসী, অথচ গ্রাস নেই, দাবানল কিন্তু সমিধ নেই।···অন্যদিকে এ্যাণ্ডীজ, অন্নপূর্ণা, শ্যামলী, পীনপয়োধরা, পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠি, শতরূপা নির্ঝরিণী, দিগন্তব্যাপী মহাবিটপী সমৃদ্ধা, থরে থরে শস্য-সমাহারে নিরন্তর পূর্ণা ভগবতী বসুধা।

হিমালয় নয়, কারাকোরম নয়, ককেশাস্ নয়, পীরানীজ নয়; আল্প্স্, রকী নয়। এ যেন প্রকৃতির এক সদানন্দময়ী জগদ্ধাত্রী বরেণ্যা বরদা রূপ—যে রূপে তিনি তাঁর চিরনাথ এক রুদ্রতাপসের মহা-বুভুক্ষার জ্বালাকে বুকের কাছে ধরে তাঁকে তাঁর সদামুক্ত অন্তহীন স্তন্যধারে সিঞ্চিত করেছেন। কিন্তু কিছুতেই যেন তৃপ্ত করতে পারছেন না। মহাক্ষুধার পাশে মহামাতৃকার সে এক নীললোহিত লীলা-বিভ্রম, অতৃপ্তিতে তৃপ্তি; প্রচণ্ডতায় স্নিগ্ধ, পিঙ্গল জটার আন্দোলনের মধ্যে নির্মল শুভ্র গঙ্গাধারা।

হ্যাঁ, প্রত্যক্ষ করছি। দেখছি। কারণ প্লেন ইচ্ছা করেই চলেছে পাহাড়ের এত কাছ ধরে যে, প্লেনের গতির আলোড়নের ফলে তুষারাকীর্ণ শিখরগুলো থেকে যে সব খণ্ড বিচ্যুত হচ্ছে, তাদেরও দেখতে পাচ্ছি। মাঝে মাঝে দেখছি গৈরিক-স্রাব; মাঝে মাঝে বিবর্ণ নীল, তাম্রাভ হরিদ্রা, পাটল, বা শুধুই যেন ভস্ম স্তূপ।······

মাঝে মাঝে মধু উল্লসিত হয়ে উঠছে, বলছে—'দেখুন, দেখুন—ঐ দেখুন···ঐ দেখুন।'

আমিও মধুকে দেখাই।—ঐ যে গভীরে পর্বত-শ্রেণীর গহনে দেখছো! এক ফালি নীল আকাশ, তুঁতের ছাদ—ঐগুলি কিন্তু হ্রদ—তুষার গলা হ্রদ। নাই বা হল পেরুতে বৃষ্টি। এই তো হাজার হাজার মাইল ব্যাপী দিগন্তে বিলীন অনন্ত তুষার সাম্রাজ্য। এই তো জলের ভাণ্ডার। ধরণীর তপ্ত ভ্রূণের কুণ্ডে কৃশানু ধনঞ্জয় শিখা সর্বদা জ্বলছে; সেই তাপে গলে যাচ্ছে সূর্যের এই তুষার আবরণ। তবেই তো পৃথিবীর সেই মহাসমস্যা-সঙ্কুল চির প্রশ্নান্বিত মহাধারা আমাজোন তার লক্ষ লক্ষ প্রবাহ নিয়ে নেমে যাচ্ছে এই অব্যাহত প্রচণ্ড ভস্মাবৃত কর্ডিলেরা থেকে। রায়োগ্রান্দে, রায়ো নেগ্রো, মারানন, হুয়াল্লগা, উকায়ালী, উরুবাম্বা, এনে, আকুরিমাস, পাম্পাস—কত অসংখ্য বিরাট বিরাটতর নদী বয়ে যাচ্ছে ক্যারাবিয়ান সমুদ্রে, প্রশান্ত মহাসাগরে, দক্ষিণমেরু সাগরে, অতলান্তিক মহাসাগরে। চারটি সাগরে জল ঢালছে এমন পর্বত তুমি কটা দেখেছো? আমাদের জানা পৃথিবীর ক'টা স্বাধীন রাজ্য শুধু ডুবেই থাকতে পারে এক আমাজোনের বহু বিস্তৃত সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত অববাহিকায়? সবই তো এই পাহাড়ের দান।···

"দেশ দেখা কি শুধু পণ্যের কাজ আর স্বর্ণাভরণ দেখা? বারের পর বারে গিয়ে মদ চাখা? থিয়েটারে থিয়েটারে অপেরা আর সিনেমা চাখা! হোটেলে হোটেলে নানা পাকের মেয়ে চাখা? মন্দিরে মন্দিরে নানা দেব-দেবী চাখা? দেশ মানে—আকাশ, মাটি, জল-ঝড়, ফল-ফুল, পশু-পাখি—আর মানুষ। এই সদা রঙ্গময়ী সদা প্রসবিনী স্বৈরিণী চটুলা চির কন্থকার কোলে দেখতে হবে মানুষ নামের শিশুটিকে, যে স্ফীত নিজের

দম্ভে, গর্বিত নিজের দর্পে, ভীত নিজের লোভে, বিকৃত নিজের অতৃপ্তিতে। তবেই দেখবে 'একো হি সঃ নানীয়তে স্বভোগাৎ'; সেই এক নিজেকে ভোগ করার জন্য নিজেকে নানা রূপে খণ্ডিত করেন। এ বোধ অহরহ মনের মধ্যে পুষে না রাখলে দেশ দেখাও এক ধরনের আত্মরতি, ইন্দ্রিয়-বিলাস বৈ তো কিছু নয়।"

মধু জিজ্ঞাসা করে, "মাঝে মাঝে কে যেন পাহাড়গুলোকে কেটে রেখেছে!"

"যেখানে মানুষ, সেখানেই বুভুক্ষা। অন্য দগ্ধোদরস্বার্থে—পোড়া পেটের জন্য মানুষ কোথায় না গিয়েছে—কী অসাধ্য না সাধন করেছে, কী না খেয়েছে? পাহাড় ভেঙেছে, বন কেটেছে, জমি চেঁচেছে, মরুভূমিকে শ্যামলা করেছে, সমুদ্রের গভীরে সেঁদিয়েছে, জলে চাষ করেছে; প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছে। পাহাড়, পাহাড়ের পর পাহাড়, কেটে কেটে কেয়ারী করেছে। সব পাহাড় দেশের মানুষই এমনটা করে। কেদার-বদ্রীর পথে, তিব্বত লাদাকের পথে, শিলং থেকে ডিব্রুগড়, শিলচর, তুমহুমা, গারো, নীলগিরি, পীরানীজ, আল্পস্ সর্বত্র এই কেয়ারী সাধনা। কাশ্মীরে, কুলুতে, নেপালে এই কেয়ারী যুগ যুগ ধরে জোগায় শ্রেষ্ঠ চাল, চা আর আখ। কিন্তু, এই এ্যাণ্ডীজের কেয়ারী চাষের মতো প্রতুল, অঢেল, বৃহৎ হারে চাষ কোথাও হয় না। এর জলসেচে আছে অভিনব কৌশলী মানুষের অভিনব কুশল অবদান। জলকে হতে হবে যথেষ্ট, অথচ তার ধারা থাকবে স্তিমিত, যাতে ওপরের নরম মাটির আবরণ ধুয়ে নেমে না যায়। এ চাষে পশুর শ্রম লাগেনি, লাগে না। এই যে আদিগন্ত চাষ, এ মানুষ তার আত্মবল, আত্মশক্তিতেই করেছে—আজও করে চলেছে, করেও চলবে মাত্র ইঞ্চি ইঞ্চি পরিমাণে শুধু হাতের জোরে, আর পায়ের চাপে। ঐ যে ধাপগুলো দেখছো, ওগুলো ক্ষেত, কোনোটা তিনফুট, কোনোটা পাঁচফুট আবার কোনোটা মাত্র একফুট চওড়া। সমস্ত পাহাড়, পাহাড়ের শ্রেণী, পাহাড়ের ঢল থেকে ঢলে ঢেউতুলে এই আঁচড়ের দাগ পাবে তুমি। তিতিকাকার হ্রদে চাষ, পেরুর শত সহস্র হ্রদে, নালায়, খালে, বিলে, জলায় ভাসা ক্ষেতের কোনো অভাব নেই। এই ইনকা সাম্রাজ্যে চাষের ওপর খবরদারী ছিল জবর। না খেয়ে মরা, দুর্ভিক্ষ—সে যেন ইনকা রাষ্ট্রের পক্ষে ছিল ঘোর অপমানের কথা। এখানে মন্দিরের গায়ে, পথের দেয়ালে, বাড়ির দেয়ালে ছবি যতো ছিল তার মধ্যে চাষের, শিল্পের, বাজারের লেন-দেনের ছবিই ছিল সবচেয়ে বেশী।"

মধু হঠাৎ আবেগময় কণ্ঠে বলে উঠল—"স্যর, আপনি ছিলেন তাই। তাই এ সব দেখা হোল। স্কুলে পাঠ নেবার সময়ে এসব দেখার অদম্য ইচ্ছা হোত। সে ইচ্ছা পুরণের উৎসাহ তাগিদ পেতাম কি, আপনি না জোর করলে? সেই সবই তো একে একে দেখলাম। অতলান্তিক মহাসাগরে স্নান করলাম, প্রশান্ত মহাসাগরে (মেক্সিকোয়—আকাপুলকো) স্নান করলাম, পোপোকাতিপেৎল আগ্নেয়গিরি দেখলাম, এখন দেখছি এ্যাণ্ডীজ; দেখবো আগ্নেয়গিরি মেতী; দেখব তিতিকাকা, আমাজোন।"

কুজকো বিমান ঘাঁটী ছোটো হলেও গড়নটায় বেশ করে ইনকা সুর ল্যেপে দেওয়া। এই

অধিত্যকাটিকে ইনকা পুরাণে বলা হয়েছে, 'রাজরাজেন্দ্রের অধিত্যকা'। একালের টুরিষ্ট সাহিত্য বলে,—'ইনকার মক্কা।' ফলকে লেখা—'প্রাচীন ইনকার রাজধানী—১১৩০৮ ফুট।

'কুজকো' অর্থাৎ 'কুইসকো' শব্দের ইনকা অর্থ হল—"পৃথিবীর কেন্দ্র।" এইখানেই যে ইন্‌কারা রাজধানী গড়বে, এই ছিলো বিধাতার নির্দেশ। ওদের পুরাণ তাই বলে। মাঙ্কো কাপাকের কথা বলেছি। কাজেই কুজকোর বয়স আনুমানিক আট-শো বছর তো হবেই। আর এই আট-শো বছরের চার-শো বছর ধরে প্রতি সম্রাট কুজকোকে বাড়িয়েছে, গড়েছে, শোভায় / খ্যাতিতে পুষ্ট করেছে, ধন্য করেছে।

সমগ্র সাম্রাজ্য থেকে বেছে বেছে যোদ্ধা, পণ্ডিত, এঞ্জিনীয়ার, ভিষক্, জ্যোতির্বিদ্, শিল্পী, কবি, কারিগর, বণিক এখানে জড়ো হয়েছে; সরকার প্রত্যেকের জন্য সসম্মানে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে। হঠাৎ লুঠেরা ফিরিঙ্গীরা এসে এই চমৎকার শহরটাকে ধর্ষিতা নারীর মতো তচনচ না করে দিলে আজও কুজকোর সে সম্মান বজায় থাকতো।

প্লেন নামার মুখেই কুজকোকে দেখা যায় চতুর্দিকে পাহাড়ের বলয়ে বেষ্টিত। কোথাও বাড়ি-ঘর-দোর, কোথাও বরফের নিষেধ; কোথাও বা চাষ-বাস হচ্ছে। বাতাস স্নিগ্ধ। সিমলা, দার্জিলিংয়ের অক্টোবর নভেম্বর মাস যেন। ১১৩০৮ ফুটের মাথায় এ শহরের প্রায় ঘরে ঘরেই জলের ব্যবস্থা। এখনকার এঞ্জিনীয়ারদের কিছুই করতে হয়নি এ বাবদে। পাহাড়ী জলকে সেই সেকালে বেঁধে ফেলেছে। কথায় বলে বরুণের পাশ। এ যেন পাশের বরুণ।

সমস্ত ভ্যালীটি বলে—'রাজার ভ্যালী'—রাজাভ্যালী। বসতিতে পরিপূর্ণ। পাহাড়ের গায়ে গায়ে বসতি। আর, তার ছাদের লাল টালিগুলো সারা কুজকোকে যেন রাঙিয়ে রেখেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বাস পেলাম। বাস নিয়ে এসে থামলো হোটেল কুজকো-তে। এগার হাজার ফুটের মাথায় হলেও ততো ঠাণ্ডা লাগছে না। কিন্তু···

এই 'কিন্তু'ই কিন্তু সর্বনেশে। দুই পা চল্‌লেই হাঁফ। সিঁড়িগুলো তো বুঝে সমঝে চড়তে হয়ই, পা তুলছি যেন হাঁটি-হাঁটি পা-পা; না চলতে হলেই ভাল। ঘাড়ে বোঝা, এমন কি ক্যামেরা নিয়ে চলাও ভারী ঠেকছে।

ব্যাপার গতিক সুবিধের নয়।

কিন্তু তখনই হোটেলের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক আমাদের সামনে 'চা' এনে দিল; যেমন সুতো বাঁধা চায়ের প্যাকেট থাকে; গরম জলে ডুবিয়ে রাখতে না রাখতে······নাঃ, এ চায়ে রংই নেই। জল জলই রইলো; একটু হয়ত ফিকেস্য-ফিকে সবুজ। আমি চাই মধুর দিকে; আর মধু চায় আমার দিকে। বন্ধুবর জুলিও কোর্বাচো (তত্ত্বাবধায়ক) তেলালো হেসে বলেন—'খান। চা আনছি। ওটা কোকা-চা। এখানে বাতাসে অক্সিজেনের বড় অভাব। তাই কোকা পাতা চিবুনো বিধি। এই দেখুন আমার গালে ঠাসা।······এতোটা তো আপনার সৈবে না।"

আমি বলি,—"খৈনীও সয় না।"

—"সেটা আবার কি?"

—"তামাক পাতার ডেলা।"

—"কতোটা তামাক খেলে মরে যাবেন?"

—"মানি না। মণখানেক খেতে হবে হয়তো।"

—"তাতে'ও মরবেন না। পাগল হতে হবে।······কিন্তু কোকেন,—এক টিপেতেই শেষ। এ মাত্র পাতা। তা'ও কটি মাত্র, গুঁড়ো গুঁড়ো। চা-টুকু খেয়ে ফেলুন। খুব স্বাভাবিক বোধ করবেন।"

—তা' এমন স্বাভাবিক বোধ করলুম, ঘর থেকে নেমে এসে বলি, "আর এক কাপ দাও।"

দিয়ে বল্‌লো—"এখানে পথে-ঘাটে সর্বত্র চায়ের দোকানে এটা পাবেন। বেশী খাবেন না। তখন আবার বয়স কমে যাবার ভয়।"

—"ভরসাই বা নয় কেন?"—হেসে টিপ্‌পনি কাটি।

জিভ কেটে মুখ ফিরিয়ে জুলিও বল্‌লে—"না, সঙ্গে ছেলে আছে বলে, বলছিলুম।"

আমি নাছোড়-বান্দা। বলি,—"কমাতে গেলে তো আমার চল্লিশ বছর কমাতে হবে। তা যদি হয়, ছেলে তো হয়ে যাবে এক বছরের শিশু। ও কি আর আমার ঘরে ফালতু 'মাম্মী' পেলে খুশী না হয়ে থাকতে পারবে?"

ওঃ! জুলিওর কী হাসি!

মধু একটু আড়াল পেয়ে বল্‌লো, "হোলো স্যার; ঐ জুলিও এখন আপনার 'মুর্দা-ফরাসের' কাজও করে দেবে। লোককে জমাতে পারেন বটে!"

চমকে বলি, "সর্বনাশ! মরলে তবে শবদেহ নিয়ে যাবার জন্য মুর্দাফরাসের দরকার মধু!"

—"কিন্তু আপনিই তো (service) সেবা-কর্মের উর্দু বলেছিলেন···"।

—"হ্যাঁ! উর্দু শেখাচ্ছিলাম তো! তাই বলছো? ঘাট হয়েছে বাপ্‌। সে কথাটা হোলো শুধু-'ফরাস'। এ ক্ষেত্রে 'খিদমদ্‌গার' বলতেও পার। কিন্তু একেবারে মুর্দাফরাস?—ছোঃ!"

—"সরি স্যার। খিদমদ্‌গার এসেছে স্যর।"

জুলিও বেশ কয়েক প্যাকেট কোকো পাতা দিয়ে গেল।

একটা লাভ আরও হোল। বল্‌লাম,—"মধু' কোকো-চায়ে আমার দাঁতের যন্ত্রণা (যথার্থতঃ নতুন বাঁধানো দাঁত পরার অস্বস্তিটা) বিলকুল গাপ।"

কিন্তু এ হোটেলটি কখনও কোনদিন পাঁচ-তারার হয়তো ছিল; এখন যেন ট্যারাট্যারা বিরূপাক্ষ। সমস্ত হোটেলটা ধরলে বিশাল। দু'টো অংশের মাঝে খানা-ঘর, আফিস, লাউঞ্জ—আর সেকালের স্থাপত্য হিসাবে মাঝে মাঝে চৌকো উঠোনে নানা-রকম টবের গাছ।

আমরা আছি দোতালায়। ঘরখানা বড়ো। কিন্তু বেজায় ঠাণ্ডা! বললো, মিথ্যে বললো, সেণ্ট্রাল হীটিংয়ের কৈবল্য লাভ হয়েছে, তবে ঘরে হীটার এনে 'দেবে'; 'দিলাম'—নয়, এবং দিলোই না।

হোটেলের অনতিদূরে একসার বাড়ির পরেই তর্-তর্ করে বয়ে চলেছে নদী আপুরিমাক। ঐতিহাসিক নদী। আমি মধুকে বল্‌লাম—"লাঞ্চের আগে কোথাও যাওয়ার কথা নেই। বাস আসবে দু'টোয়। চলো একটু এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে আসি।"

প্রথমেই এলাম সেই নদীর পাড়ে। আপুরিমাক একটি পাহাড়ী নদী। এ ধারের সব নদী আমাজোনের পরিপূরক।

মধু প্রশ্ন করল—"আপুরিমাকের ধারেই তো সেই কোটাবাম্বার যুদ্ধ হয়েছিল না?"

"হ্যাঁ মধু। কিন্তু কুজকোতো হাজার বছরের শহর। এ শহরের 'লে-আউট' একটুও বদলায়নি। এ শহরের যতো বাড়ি, বাজার, পথ, গির্জা দেখবে সবই প্রাচীনের ওপরে নবীন।"

—'কেন? নিশ্চয় কোন কারণ আছে।'

ধীরে ধীরে নেমে এসেছি তীরের দিকে। ঘাসে ঢাকা ময়দান। প্রচুর ফলের গাছ। নানারকম ফল। ইনকারা ফল ভালোবাসতো। এসব ফলের বেশীর ভাগের মালিকই দেবতা, গির্জা।

নীরবে কাজ করছে যারা, তারা সবই মেয়ে; কিছু কিছু ছেলেও; কিন্তু কী বিষণ্ণ—কী আত্মমগ্ন; যেন ওদের দেহ সীমার বাইরে কোনো পৃথিবী নেই। বা ওদের ভেতরে একটা স্বতন্ত্র পৃথিবী আছে। সেই পৃথিবীর আকাশেই যেন মেলা ওদের দৃষ্টি।

এখানে এলে দিব্যি মনে হয় অন্যদেশ, বি-দেশ, অজানিতের অপ্রত্যক্ষের অন্দরমহলে এসেছি। বৃন্দাবনে তা' মনে হয় না; কিন্তু আসল কাশী বলতে যে কাশী—অর্থাৎ পঞ্চ-গঙ্গা ঘাট, ত্রিলোচন ঘাট, রাজঘাট দিয়ে গলি-গলি পথে লছমী-চবুতারা, ঠঠেরী বাজার, বৃদ্ধকালেশ্বর, লাট ভৈরবের অন্ত্রে অন্ত্রে ঢুকলে—বেশ বোঝা যায়,—মন, মনন, দেহ, অনুভব সব চলে গেছে সমুদ্রগুপ্ত পেরিয়ে বোধিসত্ত্বের বারাণসী ভূমিতে। 'কিছু বদলায়নি' বলতে যতটুকুর বদল তা'র বেশী নয়। যে উঁচু পাথরের ঘরটার মধ্যে বিজলী জলছে (দিনমানে), পাখা ঘুরছে, যার মধ্যে ঢুকে গেছে টেলিফোনের তার, সেই বাড়ির গায়ের পাথরের বড়ো বড়ো 'সিল্লী'গুলোকে থাবলে ধরে আছে প্রাচীন লোহার পেটানো আংটি।

এখানেও তাই। পথের ধারে ছয় থেকে নয় ফুট উঁচু করে মোটা পাথরের দেয়ালের ওপর যেসব বাড়ি, সেগুলো ষোড়শ, সপ্তদশ শতাব্দীর সময়ের। নদীর ধার থেকে বাজারের মাঝ পর্যন্ত সাধারণ বাড়ি। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সবই পাথরের চৌকো ইঁটের পথ। প্রাচীন পথ। সব পথেই প্রায়, গাড়ি যায়—যেতে পারে, কিন্তু যাচ্ছে খুব কম এবং ওয়ান-ওয়ে। বেশীর ভাগ লোকই হাঁটছে। হাঁটাই দস্তুর। বাড়ির বাইরে

কিন্তু সেই আদোবের ওপর পলেস্তারা। শাদা রংয়ের প্রাচুর্য। আর ছাদের কাঠের ফ্রেমে মাটির লাল টালি।

কী পোষাকে, কী চলায়, অপরূপ ব্যস্ততাহীনতায়, নৈঃশব্দে—এ যেন এক সর্ব-আচ্ছাদনকারী বচনহীন, ভাবহীন জীবনধারা —কুজকো যেন সত্যিই এক অন্য যুগান্ত থেকে ছিঁড়ে আনা অতি প্রাচীন নগরী। এখানে প্রতিপদক্ষেপ সাবধানী, প্রতি নিঃশ্বাস মর্মধ্বনি, প্রতি দৃষ্টিপাত ঐতিহাসিকতার যবনিকায় আবদ্ধ; প্রতি কুতূহলের কপালে আঁকা বৃহৎ ঘটনার নাটকীয় রক্তটীকা। 'পেরু বলতে কুজকো, কুজকো বলতে পেরু'—এ প্রবাদ সত্য।

অন্য দেশে 'টুরিষ্ট' যেন প্রত্যক্ষ টাকার গাছ। সে গাছ নাড়ার জন্য শতশত হাত মুখিয়ে থাকে। এখানে যেন হাতির গায়ে উই-পোকার চলা ফেরা। অবহেলা দিয়েও কেউ গ্রাহ্য করে না আমাদের ছায়া, আমাদের পদধ্বনি। বস্তুতঃ কেউ চেয়েও দেখছে না। এরা সত্যবেত্তা; জানে যারা আসে, তারা চলে যায়। যা তাদের দেবার তা তারা কিছু নিয়েই দেবে। যা নেবে তা খুঁজে বার করবে।

অথচ, আমি যেন এ পথ চিনি, এদেশ জানি। মধুই বরং ভাবছিল, কেন জিজ্ঞাসা করছি না? কিন্তু করবো কাকে? এ দেশ ইন্‌কার দেশ। এখানে সব—সব—সব্বাই ইন্‌কা।—সেই তাম্রাভ শুষ্ক, দৃঢ়, কর্কশ-চামড়া ঢাকা হাত, পা, চেহারা; ('মুখ' বলবো না), কোনো কোনো মুখ মসৃণ, গোল, যাদুময়—মনে হয়, তিব্বতের বিচিত্র রহস্যসঙ্কুল তঙ্কা পট। গোলমুখ, সোজা চুল, বেঁটে গড়ন, ভারী পদক্ষেপ, ছোটো চোখ, অল্প নাক। এরা কিন্নর, এরা মোঙ্গোল, এরা প্রশান্ত সাগরের দ্বীপের কেউ। এরা গন্ধর্ব, যক্ষ। এরা আমাদের নয়; এ দেশ আমাদের নয়, এদের ইতিহাসে আমরা নেই। আমরা সত্যই অন্যদেশে এসেছি।

আমরা যে পথটা দিয়ে ফিরছি তার নাম সান্তা থিরেসা। থেরেসা? অবশ্যই চার্চ থাকবে একটা। এই সান্তা থেরেসার চার্চ ছিল ইন্‌কাদেরই মন্দির। পথেই পড়ে চার্চের ভেতরে যাবার গেট। এটা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল ইন্‌কা স্থাপত্য শৈলীর কীর্তি থেকে দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়া। কিন্তু আমি জানতাম, প্রথম শ্রেণীর সূর্য-কন্যার জন্য বিখ্যাত যে আশ্রম ছিল, এটি সেই আশ্রমের ভিত। তাছাড়াও এটি ছিল কন্যকা আশ্রমই বটে। জানিনা কন্যকারা সেই দারুণ দুর্দিনে খৃষ্টান হয়ে আত্ম-সম্মান রক্ষা করেছিলেন, না পিজারোর বিজয়ী সৈন্যদের ব্যারাকে রাত কাটিয়েছিলেন। এখন কিন্তু ইনকা মেয়েরাই খৃষ্টপ্রিয় হয়ে এর মধ্যে থাকে; তবে তাদের সংখ্যা খুব কম।

আরও খানিকটা এগিয়ে 'কুজকো সিটী হল্‌' নামে যে শান্ত ইমারতটি পাওয়া গেল, তার সুমুখেই একটি খুব সুন্দর সাজানো পার্ক। শিশুদের নিয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন বৃদ্ধারা। সিটী হলটির সামনে কয়েকটি মূর্তি। এদের চিনলাম না।

এরপরই গার্সিলাসো এবং হেলাডোরেস স্ট্রীটের ক্রসিং। বলছি স্ট্রীট, বলছি ক্রসিং, কিন্তু পথগুলি চওড়ায় ছয় থেকে আট ফুট। ফুটপাথ নেই। একটু করে ফালি আছে

তারই ওপর দিয়ে পা ফেলে মানুষ চলে। কারুর কোনো তাড়া নেই। সবার হাতেই সময় আছে। আজকালকার দিনে যে কোন প্রথম শ্রেণীর নগরে এই সহজ শান্ত গতিবিধি, চলন-বলন, আশ্চর্য ঠেকে।

ছেলে-মেয়ে, বেশীর ভাগ লোকের পায়েই 'জুতো' বলতে আমরা যা' জানি-বুঝি তা' নেই। পরে দেখেছিলাম জুতোর দোকানও খু-উ-ব কম। আমি দেড়খানা দোকান আবিষ্কার করেছিলাম। তার একখানায় কুরিও এবং স্যাভেনিরও বিক্রী হচ্ছিল। দ্বিতীয়টায় জুতোর সঙ্গে অন্যান্য চামড়ার জিনিষ—পার্স থেকে বেল্ট্ এবং স্যাডলারী পর্যন্ত। পুরুষরা মার্কিন (মোটা জিনও) বা ঐ জাতীয় সূতী পা-জামা পরে, হাঁটু গোঁড়ালির মাঝ অবধি ঝুল, তার ওপর কটা শার্ট জানি না; বোনা সোয়েটার, পোঞ্চো এবং ব্রোমবেরো (ওম্ব্রেরো) অর্থাৎ বোনা বেতের টুপী। পুরুষদের পায়ে 'জুতো' বলতে যা' দেখেছি তাকে 'কণ্ট্রাপশন্' বলাই ভাল। চামড়ায়, ফিতেয়, ফেল্টে মেশানো একটা কিছু।

মেয়েদের তা'ও নেই। মোটা মোটা পায়ের গোছ। পাহাড়ী চলনের চিহ্ন—দুলে দুলে চলে, যেন আর্থ্রাইটিস্। পুরুষের প্যাণ্টের মাপেই শুধু ঘাগরা মতো। গোটা কয়েক পরেছে বোঝা যায়। শার্ট জাতীয় ব্লাউজের ওপর বোনা জামা, সোয়েটার। আর ওপরে ম্যান্টিলা বা পোঞ্চো। পিঠে সর্বদাই কিছু না কিছু বোঝা বাঁধা। অর্থাৎ মেয়েরা এমনি 'বেড়ানোর' বা নৈষ্কর্মের হাওয়া খাচ্ছে না। ব্যস্ত, খুব ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত; অথচ ধীর তা'দের পদক্ষেপ। কাজ করছে, করছে, করেই যাচ্ছে—কিন্তু শান্ত! এ যেন পৃথিবীর দেশের বাইরের অন্য কোনো দেশের জীবন।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। এরা শিশু পালনে প্রধানতঃ স্তন্য-নির্ভর। পার্কে বা পথেই স্তন্য-পান করানোয় এদের কোনো সমস্যাই দেখা দেয় না। যদিও স্বাভাবিক ভাবেই একটু ধার কেটে আবডাল করে বসে, সেটা শিশুকে বা তার পানীয়ের আধারটিকে 'নজর' থেকে আবডাল করার জন্যও হতে পারে। 'নজর' বাবদে এরা খুবই হুঁশিয়ার।

গার্সিলাসো স্ট্রীটটা থেকেই দেখতে পাওয়া যায় একটু ফাঁকা। আর সেই ফাঁকায় ব্যস্ততা দেখে আমি হোটেলের দিকে না গিয়ে সেই দিকেই চল্লাম। তখন লক্ষ্য করি পথটা যেন আপেক্ষিক বেশী ব্যস্ত। আরও লক্ষ্য করলাম ফুট-পাথ কিছু না থাকলেও, দেয়ালে দেয়ালে যে দরজা গাঁথা তা'র মধ্যে চোখ রাখলে বোঝা যায় ভেতরে দোকান।

আবার মনে হোল কুজকো তার প্রাচীন ধারা বদলায়নি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল কাশীর কুংজী টোলা, চৌখাম্বার কোটীপতিদের খানদানী দোকান। মনে পড়ল জয়পুরের মূর্তি-মহল্লা। সেও তো সড়কহীন, ফুটপাথহীন গলির দেয়ালে হঠাৎ দরজা। কলকাতার বৈঠকখানা লেন, দর্জিপাড়া লেন, নেবুবাগান।

এর পরেই এসে পড়লাম বহু ক্যামেরায়িত চিত্রিত স্কয়ারে। বলে না ক্যাথীড্রাল স্কয়ার। বলে, প্লাজা ডু আর্মাস। আর এরই চারধারে প্রখ্যাত সব প্রাচীন সৌধ, একদা এরা সব ছিল মন্দির, প্রাসাদ, অতিথিশালা, বিদ্যালয় রাজগৃহ—এরা এখন হয়েছে চার্চ, চার্চ-

আর চার্চ ;—বড়জোর মুজিয়াম বা বিশপের, এস্. পি.-র অথবা ম্যাজিস্ট্রেটের বসত বাড়ি।

ডান মোড় ফিরতেই চমক লাগল। লম্বা ঢাকা খিলান দেওয়া একটি বারান্দা—স্কয়ারের এ মোড় থেকে ও মোড় পর্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলে গিয়েছে। সেই সেকালে এদিকটায় ছিল ইনকা রাজ-পরিবারদের প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক বস্তুর বিপণি। এটা আর বণিক বোম্বেটেরা ধ্বংস করেনি। না করলেও ওপরে বাড়ি তুলেছে। নগরীর বর্তমান অভিভাবকেরা 'তাদের বিস্ময়কর প্রতিভার বলে' এটার আর কোনো 'সংস্কার' করেননি, কিন্তু নিপুণতার সঙ্গে এই অতি প্রাচীনকালের নাগরিক ব্যবস্থার নিশানাটিকে 'বাঁচিয়ে' রেখেছেন অতি যত্নে। ফলে সে-কাল থেকে এ-কাল এই অংশটি হয়ে রয়েছে বণিক-জীবনের একটি সেতুবন্ধন। (আর্মানী গির্জার পাড়াটা যেদিন চেঁচে ফেলা হোল, সাফ হয়ে গেল চীনাবাজার,—মনটা হায় হায় করেছিল। সিংগাপুরে, হংকংয়েও তো গলিস্থ গলি বহালতবিয়তে আছে।)

তলা দিয়ে হাঁটছি। দেখছি ছাদের ভার বইছে সেই সেকালের কাঠের কড়ি, বরগা। ছাদটিতে বালি পাথরের চ্যাটালো 'সিল্লী' পাতা। কোথাও কোথাও লোহার কড়িও দেওয়া হয়েছে। তবু, প্রাচীনতার গন্ধ লেগে আছে।—মধুকে লক্ষ্য করতে বললাম।

উত্তর আর পূর্বদিকে পাহাড়ের বলয়। চীড়, বরাস, দেবদারুর ভীড় থাকলে কাশ্মীরই মনে হোতো। কিন্তু আণ্ডীজের এপারটাও যেমন, আকাশের রংও তেমন যেন এক ধূমাবতীর আঁচলে ঢাকা। তবু তা'র ওপারে দেখছি তুষারাচ্ছন্ন গিরিশ্রেণী, আর নীচু পাহাড়ের গায়ে গায়ে কেয়ারী, যেন ধারীদার অঙ্গরাখা পরা এক সন্ন্যাসিনী হাত-পা মেলে বসে। বোঝা যায় পশ্চিমের নীচু পাহাড়ের গায়ে যে ঘনতম বসতি সেটায় সেই ইনকা-কাল থেকেই প্রলেতারিয়েৎদের বাস। দিল্লীতে মুঘল আমলের দরিয়াগঞ্জ এমনই বোর্জোয়াগঞ্জ ছিল। আজ সেই বোর্জোয়সী-রাই প্রলেতেরিয়েৎ হয়ে আছে।

বলেছি এটার নাম "প্লাজা দ্য আর্মাস"—সৈন্যদের কুচকাওয়াজের চৌক। নামটা ফিরিঙ্গীদের চাপানো নাম। (বড় বড় শহর মাত্রেই,—ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শহরে 'ক্যান্টনমেন্ট' পল্লীর মতো,—'প্লাজা দ্য আর্মাস', অর্থাৎ 'সৈন্যদের কুচের জায়গা'—ফিরিঙ্গীরা গড়েছে)। এরই চারপাশে সেদিনের প্রাসাদগুলো: সম্রাট বীরাকোচা, পাচাকুতেক, তুপাক, য়োপাক্যোয়ে, রোচা কোপাক, হুয়ানা কোপাক—প্রভৃতি সম্রাটদের আলাদা আলাদা বাড়ি।

এদের প্রাসাদ তৈরী হোত আট থেকে দশ ফুটের বিশাল বেদীর ওপর এবং সে সব বেদীর প্রাচীর গাঁথা হোত বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই পরপর গায়ে গা লাগিয়ে সাজিয়ে রেখে।—হ্যাঁ, সাজিয়ে রেখে। গাঁথা নয়। কোনো মশালা নেই। য়োরোপীয় মার্কিন টুরিষ্টার জোড়ের বুকে ছুরীর মসৃণ ফলা ঢোকাবার চেষ্টা করেছে, পারেনি।

সত্যিই বুঝিয়ে বলার মতো এই অপূর্ব চমৎকারী কারিগরী।—পর পর চৌকো ইঁটের পরে ইঁটের সামর্থ্য কী যে সেই সব বিশাল প্রাসাদের বোঝা এবং সেই সুবিশাল বেদীর

ভূমি-স্তূপের পর্বতভার সামলে রাখে! এ হোলো নানা ছাঁদে কাটা গ্রানাইট। কোনো কোনো পাথরে চার কোণের জায়গায় ৮, ১০, ১২ কোণও আছে। কী তাদের ওজন! পাথরগুলোর একটাও দু'-তিন টনের কম নয় ওজনে। নয় টনের পাথর অনেক ক'টা।

এই পাথরের কিনারগুলো সময়ে সময়ে চার-'ধার' ছেড়ে ছয় বা আট 'ধার'ও হোত। ধারগুলিও সব সমান, খুব কম ক্ষেত্রেই হোত। ফলে পাথরগুলোকে খাঁজে খাঁজে 'জিগ্-স পাজ্ল'-এর চাক্তির মতো এমন টাইট্ ফিট্ করতে হোতো যে, একবার পোখ্তো হ'য়ে সেঁটে গেলে আর আলাদা হ'বার সম্ভাবনাই থাকতো না। অতো যে ভূমিকম্প পেরুতে, তা' সত্ত্বেও না।

এই ধারে ধারে অতি মসৃণ এবং সূক্ষ্ম (প্রায় ধারালো) কাটাই কারা করত? কীভাবে করত? যন্ত্রপাতি কী ছিল? লোহা?—না ছিল না। পাথুরে হাতুড়িরই নানাবিধ রূপ ছিল। তা'তে থাকত তামা-পেতল। বোধহয় দস্তারও মেশাল। পাথর দিয়েও পাথর কাটা হোত। বালি-জলে ঘষা হোত।······ভাবতেও মাথা ঘুরে যায়। কতোকাল কতো পরিশ্রম, কতো বিচার, কতো প্লানিং। একটি চাক্তিতেও এক সেন্টিমিটারেরও ভুল হ'বার জো নেই।

সারা কুজকোই যেন এই দেয়ালের ওপর চড়ানো, সাজানো ছিল। এখনও সারা কুজকো শহরের পথঘাট ছাড়া পথ-ঘাটের দু'পাশে যতো বাড়ি সবই যেন, এই দেয়ালের ওপর গড়ে তোলা।

হ্যাঁ, বিদেশীরা সব প্রাসাদ মন্দির গুঁড়িয়ে দিয়েছে সত্য; সত্য যে, সে সব জমি আত্মসাৎ করে বিলিয়ে দিয়েছে। নিজেরা বাড়িঘর তুলেছে। কিন্তু পারেনি এই প্রাচীর-গুলোকে টস্কাতে। ফলে যেখানেই যাই কুজকোয়, এই মোক্ষম জগদ্দল নিপুণ আশ্চর্য দেয়ালের মাঝের সরুপথ ছাড়া গতি নেই।

পাহাড়ী শহরতো বটেই। কুজকো অন্ততঃ ১১৩০৮ ফুটের ওপরে, এবং কুজকোকে রক্ষা করার মতো দুর্গ (দুর্ভেদ্য দুর্গ) সাক্সাহুয়ামান—আরও দু'হাজার ফুটের ওপরে। কাজেই পথগুলো কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। তা'র ফলে সারা কুজকোয় এই পথের মালার বৈচিত্র্য পথগুলোকে বৈচিত্রময় সব নাম দিয়েছে—অজগর, নাগিন, গোসাপ, দড়ি, আলনা ইত্যাদি। তবে প্রসিদ্ধ চার্চ বা প্রসিদ্ধ বাড়ির নামে পথও আছে। শুধু এই সব পথের ছবি দিয়েই এ্যালবাম ভরানো যায়।

আবার বলি, এ সব পথের প্রতিটি ইঞ্চি তক্তকে, ঝরঝরে পরিষ্কার। মনে রাখতে হবে, এদেশে বৃষ্টি হয় না। যা' ধোয়া মোছা করতে হয়, মানুষের আনা জলে, মানুষের পরিশ্রমে।

এখানে 'লরেটো' নামে এবং 'সার্পেনট্স' নামে দুটি পথে (প্লাজা-আর্মাস থেকেই বেরিয়েছে বলে বোধ হয়।) খুব বেশী ফটোগ্রাফারদের ভীড়। এই পথ ও পথের দেয়ালের ছবি অনেকে নেয়। আমরাও নিলাম।

ভিখিরী দেখলাম। চাইছে না। বিরক্ত করছে না। কিন্তু পথে বসে আছে।

যখন দোকানে ঢুকছি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে। ভারত মনে পড়ে: বিশেষ কাশ্মীর, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, কাশী, পুরী। যেখানে 'ধাম', যেখানে টুরিষ্ট—ট্রেনে, স্টেশনে—কেবল ভিক্ষা।

আর মনে পড়ে যায় রোত্রীগেজের কথা—'আমরা স্প্যানিশদের দিয়েছি সোনা, রূপো, মণি-মুক্তা, কফি, পেট্রল, মাছ—স্প্যানিশরা আমাদের দিয়েছে কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, উপদংশ, চুরি, ঠগাই, ভিক্ষা, ভায়োলীন, গীটার, জুয়া, দুপুরের ঘুম, বেশুমার (অন্তহীন) রমণ, বুল ফাইট। এর মধ্যে চার্চ দিয়েছে ভিক্ষা, পোষাকী পুরুৎ, আর কুমারীত্ব নিয়ে নানা ভণ্ডামী। (ওদের সূর্য কন্যারা ভণ্ডামী করতো না—এটাই বলার উদ্দেশ্য)।

মাঙ্কো কাপাকই নাকি কুজকোর নক্সা কাটেন। অর্ধেক তা'র আপার কুজকো' অর্ধেক লোয়ার, নদীর ধারে। কুজকোর অধীনেই ছিলো সমগ্র ইনকা শাসন। প্রথম তা'তে ফাটল ধরালেন সম্রাট হুয়ানা কাপাক। তিনিই সাম্রাজ্যে দু'জন সম্রাটের বিষ ছড়িয়ে যান।

যাবৎ পিজারো এই নগরীকে লুঠ করার জন্য বলাৎকার না করেছিলেন, তাবৎ কুজকো ছিলো সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকার ধন-রত্নের, রসদ-খাদ্যের, শিল্প-সম্ভারের একমাত্র ও প্রধান ভাণ্ডার। পেরুর সব অংশ থেকে এখানেই সবার সমর্পণ, নিবেদন, পুরস্কার, কর, তোফা এসে জড়ো হোত। অগাধ ঐশ্বর্য ছিল কুজকো নগরীর।

চৌকে লোকজন অনেক হলেও দিল্লীর (ভারতের) ভীড় দেখা-চোখে সব খালি-খালি বোধহয়। প্লাজার পার্কে এদিকে ওদিকে বেশ কয়েক জন বসে বসে পড়াশুনা করছে। কুজকো বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি আছে। সারা পেরু থেকে ছেলেরা, মেয়েরাও, পড়তে আসে। কুজকোতে পেরুর পুরুৎ-বাণিজ্যের সর্বোত্তম বিদ্যা ব্যবস্থা আছে।

পার্কের উত্তরে বিরাট ক্যাথীড্রাল, এবং পূর্বেও একটি বিশাল গির্জা (সোসায়টী অব্ জীসাস্)। এটা ছিল ইন্কা মন্দির। কিন্তু তখন এগিয়ে গেলাম সান্তা কাতালিনা স্ট্রীট ধরে। এইখানে আছে শহর কোতোয়ালী।

এই কোতোয়ালীটিই এক কালে ছিল ইন্কা সম্রাটের প্রাসাদ। এখন সেই ইন্কা দেয়ালের ওপর স্প্যানিশ নক্সার বারান্দা দেওয়া বাড়ি। এ প্রাসাদ যে কতো বড়ো ছিলো, তা বুঝতে গেলে দেয়াল ধরে চলতে হবে সান্তা কাতালিনা স্ট্রীট, আর কুইপা স্ট্রীট, মারুনী স্ট্রীট, সান্ অগস্টন ষ্ট্রীট, হেরোজাস স্ট্রীট, তুরেন ফো স্ট্রীট।

আমি চিক্কণ পাথরের ওপর হাত-বোলাই আর চলতে থাকি।

মধু জিগ্যেস করতে বলি, তুপাক য়োপাঙ্কী পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের সম্রাট। এটা তাঁর বাড়ি। চল যাই হুয়ানা কাপাকের নাগপ্রাসাদে (আমারুকঞ্চা)। এখন। বলে, সার্পেন্ট ষ্ট্রীট। এরই দেয়ালে গাঁথা সেই বিশ্ববিখ্যাত স্থাপত্যের বিস্ময়, 'বারো কোণার পাথরখানা।' এখানে চব্বিশ খাঁজের পাথরও আছে এক জায়গায়।

পথের শেষ প্রান্তে ছিল বিশাল তোরণ। এখন গাঁথনি দিয়ে ভর্তি হলেও তোরণের ওপরে সাপের উৎকীর্ণ শিল্প সেকালের সাক্ষ্য দেয়।

পর্তুগীজ এসে পুতির মালার
বদলে সোনার তেলা নিচ্ছে

ব্যবসায় পথের প্রয়োজনীতা

কুজকোর গলি

পিজারো তাঁর বসত বাড়ি করেছিলেন ইনকা রোচা আর ইনকা পাচাকুতেকের প্রাসাদ মিলিয়ে এক করে নিয়ে। এটা প্লাজার অপর দিকে।

ফিরে যেতে হবে হোটেলে। বললাম, "বাজার হয়ে চল"।

বিরাট বাজারের বিল্ডিংটা সেই আদোবের গাঁথনির ওপর শাদা পালেস্তারা। রোদ লেগে ঝলমল করছে। যেন বাজার থেকে উথলে বেসাতদাররা মালপত্র নিয়ে বসেছে বাইরে পথে এইভাবে চিলতে চিলতে ফুটপাথে গদাইলস্করি মেজাজে না বসলে বাজার বলে মালুম হয় না। নাম করতেই বাজার। নইলে যজ্ঞি-বাড়ি উঠোন বললেও দোষ হয় না। ......মজা লাগে দেখতে, আলু, ভুট্টা নিয়ে যে মেয়েটা টুপী মাথায় দিয়ে বসেছে সে পা ছড়িয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বাঁ দিকে রাখা সেলাইয়ের কলে সেলাইও করে চলেছে, আর শিশুটি মায়ের বুকের দুধ খাওয়া ছেড়ে আমাদের দিকে চেয়ে আছে অবাক বিস্ময়ে। বোনা চলছে, উলে রং করা আর উল শুকুনোও চলছে; কিন্তু কেউ বেচছে খাঁড় চিনি, কেউ শুকনো শক্ত রুটীর ডাঁই, কেউ ব' বেচছে আচার, জ্যাম। তরি-তরকারি মাংসের অভাব নেই। আর নেই হট্টগোল। কেউ চুল আঁচড়াচ্ছে না, উকুন বাচছে না ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে। কিন্তু মাথা দেখে অবশ্য মনে হয়, টুপী না থাকলে হয়তো ঝুরঝুর্ করে ঝরেই পড়তো।

ফিরবার পথেই এক মিছিল। এক কালো-বরণ মূর্তি, ক্রস-বিদ্ধ। তাকে সিংহাসনে চাপিয়ে কাঁধে নিয়ে বয়ে চলেছে সুসজ্জিত প্রবীণদের দল। সবাই ইন্‌কা। যীশুর পরণে দামী জরীর কাজকরা স্কার্ট। হাতে, মাথায়, ক্রশে লাল-ঘুড়ির কাগজে কাটা মালার ছড়াছড়ি। কালোয় লালে চমক এনেছে। ভক্তেরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে এই লাল কাগজের ফুল দিচ্ছে। উৎসাহীরা বাঁশের ডগায় কাগজের মালা আটকে সেই কাঁধে-তোলা দেবতার ক্রশের গায়ে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। খুব ভীড়। খুব উৎসাহ। সামনে প্রায় জনা দশেক স্ত্রী-পুরুষ পালা (দণ্ডী) খাটতে খাটতে চলেছে।

জিজ্ঞাসা করে জানলাম, ভূমিকম্প গেছে। তাই ভূমিকম্পের দেবতাকে শান্ত করা হচ্ছে। ইনি প্রাচীন দেবতা। ভূমিকম্প থেকে রক্ষা করেন (তবু ভূমিকম্প হওয়া বন্ধ করেন না!)। পুরোহিত-তন্ত্র আর কাকে বলে!

মেলা গিয়ে থামবে ক্যাথীড্রালে। বিশপ মহারাজ 'ব্লেস্' করবেন!

ইসাবেলা-আভোকোজো

হোটেলে ফিরতেই খানাঘর। ভাল করে মাছ, ভাত, দই খাওয়া গেল। তারপর অপেক্ষা। বাস আসবে। টুরিষ্ট্ বাস। প্রথমে ইনকা দুর্গ সাক্সাহুয়ামান যাবে,

তারপর ওদের কতকগুলো ধ্বংস হওয়া কীর্তি-শ্মশানে নিয়ে যাবে। ফিরবে বেলাবেলি। সন্ধ্যায় শো আছে।—টাইট্‌ প্রোগ্রাম। এর নাম ট্যুর।

আমি বলি, এ এক বিদ্‌ঘিকিচ্ছি ইন্তেজাম। ঐ টুরিষ্ট বাসে বন্ধ হয়ে কী বা আমি দেখব !···কিন্তু মধু বলে,—ইকনমী।

আর্দালী কাছে এসে আদাব করে জিগ্যেস করে,—"মশিয়ে বাত্তাশারিয়া ?"···অন্য দিকে চেয়ে দেখি একটি মহিলা, কাগজে নাম টাইপ করা—মিসেস্‌ ইসাবেলা আতোকোঙ্গো।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করি। উনি মৃদু গলায় প্রশ্ন করলেন,—"হার্ণান্দো রোদ্রীগেজকে চেনেন ?"

বুঝলাম। বললাম,—"বড় ভাবনায় পড়েছিলাম,—এজমালী টুরিষ্ট বাসে যেতে হবে ভেবে।—আপনি এলেন, বাঁচোয়া।"

তখন বিনীতভাবে ইসাবেলা বললেন—"হ্যাঁ সাধারণ ট্যুরিষ্ট বোঝান এবং ব্যক্তিগত আলোচনা করা, সুর আলাদা হবেই। তবু সারবস্তু তো একই হতে হবে। আজ আমি এই বাসে এনগেজ্‌ড্‌। কাল সমস্ত দিন আপনার সঙ্গে কাটাব মনে করেছি। ডন রোদ্রিগেজ খুব খাঁটি ভদ্র স্কলার।"

মেয়েদের কথা কথায় এসে পড়লেই বয়স, দেখতে কেমন ইত্যাদি বলার একটা বিধি আছে। সময় মতো বলতে পারারও একটা স্বতন্ত্র ভাষা আছে।

"···প্রহর শেষের রক্তেরাঙা সেদিন চৈত্র-মাস তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ"। বলতে পারার ভাষা বটে ! কিন্তু তা বললেও তো বলা হোত না কিছুই। অমন চোখে চোখে সর্বনাশ তো নয়ন দেখে না, দেখে 'নয়নের মাঝখান'। এখানে চাই অন্য কথা। ব'লে না দিলে কিছুতেই ধরা যেতো না দু'টি শিশুর জননী। কী আশ্চর্য সুকোমল এই উদ্ভিন্ন দেহিনীর দৃশ্যমান অবয়বাংশগুলি। কথা না বললে ভাবতাম ঠোঁট দুটি মোমের, শেকহ্যাণ্ড না করলে ভাবতাম আমার ছোঁয়ায় ঐ আঙ্গুল কলিগুলো ভেঙ্গে যেতেও পারে। হোলেও অতীব দুঃসাহস আমি চোখ দুটির ভাষা পড়তে চাইলাম। কিন্তু সব ছাপিয়ে একটি সদ্য ধোয়া সুপ্রভাতের মতো মহিলাটি দাঁড়ালেন আমার সব আশংকা, সংশয়, দ্বিধা ভেঙ্গে ফেলে। হ্যাঁ, গোল মুখের রক্তিম আভায় কুজ্‌কোর আকাশের মতো এক পর্দা ধূসর ম্লানিমা। চোখ দুটি বিষণ্ণ। ইন্‌কাদের দীঘলতার অভাব এঁর দেহের যষ্টিতেও। তবু দৃঢ়। গঠনে সংযত, চারু নিবিষ্ট। চলনে বলনে সেই 'সালোঁ'-সুলভ আধা ধোঁয়াটে, আধা পিছল ভাবটি,—যা' বহু আয়াসে সাধনে আয়ত্ত করা যায়। চুল আর চোখে পুরোপুরি ইন্‌কা কালো। কিন্তু বয়স হলেও আমার ঝাঁপাতে ইচ্ছে হোল সেই ঘা-খাওয়া গভীর দৃষ্টির নিথর আগুনে।

বড় সুন্দর। সপ্রতিভ। টানে। তবু···তবু···কেমন যেন বিচ্ছিন্ন, উদাসীন, স্তিমিত। 'অভিজাত' বলতে এইটিই বুঝি। এই সসম্ভ্রম দূরত্ব, অথচ এই মানসিক

প্রতিবেশিতা। নর-নারীর স্বাভাবিক আকর্ষণ, বন্ধন, তার সবটাই কি যৌন? সৃষ্টির, আবিষ্কারের আনন্দ কি সবটাই ইন্দ্রিয়ের উদ্‌গার? সুন্দর তবে কি?

আবার বলল,—"আমি ফাঁক পেলেই আপনার কাছে আসবো, আপনিও ফাঁক বুঝে আমায় ছেড়ে দেবেন। কেমন?"

বললুম, "রোদ্রীগেজ কিন্তু বলছিল, তোমায় যেখানেই কেন টিপি, সব নাকি লাল। আমি তো দেখছি, না টিপতেই লাল তুমি। সৌম্যা (pleasant)। আমার বড়ো মেয়ে তোমার চেয়ে বড়ো। আমার নাতি-নাতনী দুটিও তোমার ছেলে-মেয়ের বড়ো। তবু নিশ্চয় বলবো তুমি যেন রাত-চলা পথিকের মনভরা আশ্বাসময়ী শুকতারা। ভালো লাগবে পেরুর এই কঠিন পর্যায়।"

—"বয়সে কি আর বেড়া লাগে? আপনার বয়সের মার্কিনীরা আমার মতো গাইডের কাছেও রাতের সঙ্গিনীর খবর চায়, এবং তারা কি চায় বুড়ী? বরং তারা কিশোরী পেলেই বর্তে যায়। আমাদের এই কাজ খুব ঝকমারী, ডেলিকেট। কিন্তু সবই তো জানেন। আপনার সঙ্গে দু'দিন তবু সময় কাটবে ভালো। ডন রোদ্রীগেজ বাজে কথা বলেন না। আমাদের মহলে ওঁর খুবই নাম। মানুষটার সাহস অসীম।"

সাক্‌সাহুয়ামান

বাস আমাদের, পাহাড়ী পথ দিয়ে চড়ে যথা সময়ে নিয়ে এলো সাক্‌সাহুয়ামানে। টুরিষ্ট বাসের মধ্যে মাইকে প্রথমেই ঘোষিত হোল—"আমরা ইন্‌কাদের প্রখ্যাত দুর্গ, রাজবাড়ি এবং তীর্থ সাক্‌সাহুয়ামান-এ চলেছি। অনেকে ভাবেন, এখানে বুঝি সেক্সী উয়োম্যানের ছড়াছড়ি। (খুব হাসি উঠল) কিন্তু সারা 'রুইন্‌সে' সেক্সী উয়োম্যান মাত্র একটি কি দুটি—আমি এবং আমাদের সামনের ওই রাঙ্গা-গাল বৃদ্ধা। কোথা থেকে আসছেন? ডেট্রয়েট? সেখানে কি সেক্সী উয়োম্যানের রুইন্‌স্ বহু? (আবার খুব হাসি।)

"না, রঙ্গ-রস বাদ দিয়ে কথা,—বড় পবিত্র এ জায়গা। আমাদের তীর্থ।"

গাড়িটা আচমকা থামল।

—"আচ্ছা। এখানে একটু নেমে কুজ্‌কো শহরটা পাহাড় থেকে দেখব আমরা।"

কুজ্‌কো শহরের ওপর যেন ঈগলের মতো পাহারা দিচ্ছে সাক্‌সাহুয়ামান (কোয়েচুয়া ভাষায় যার অর্থ=বিচিত্র ঈগল/বাজ।) একটি নয়, এমন দুর্গ পর পর সার দিয়ে তিন-

চারটি। একটির চূড়া থেকেই কুজকোয় আসার সেকালের একমাত্র পাহাড়ী পথের ওপর বহুদূর থেকে নজর রাখা চলে। এমনি দুর্গ কুজকো শহর থেকে কিছু তফাতে ভাগে ভাগে ছড়ান। তার মধ্যে সাক্‌সাহুয়ামানই আজও খাড়া আছে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে লেখা, 'ভিভা পেরু'। 'ভিভা রিভলসিয়ঁ'। কতো ছবি! হিজিবিজি!

এই দুর্গ গড়ার কীর্তি সম্রাট পাচাকুটির বিচক্ষণতার সুফল। সাক্‌সাহুয়ামান্, কোয়েন্ কোয়ে, পুকা পুকারা—তিনটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তিন স্তরে কুজকোকে রক্ষা করছে।

তিনটি ঈগল যেন পাহারা দিচ্ছে ইন্‌কা সাম্রাজ্যের রাজধানী।

সেকালে কুজকোয় আসতে হোলে এই পথ দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে হোত। শহর থেকে হাঁটা পথে আজও এখানে আসা যায়। গরীব পথচারীরা আসেও। বাস পথ ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। কিন্তু চিরকালের পথ আজও জীবন্ত।

কিন্তু এ দুর্গ যে দেখেছে, অবাক হয়েছে। স্প্যানিশদের কড়চায় বলা আছে, ('সারা ইউরোপে) এমন দুর্গ নেই'। একালের স্যর ক্লীমেণ্ট মার্খামি বলেছেন,—"পৃথিবীতে এই দুর্গের স্থাপত্যের কাছাকাছি দাঁড়াবার মতো যোগ্যতাও কোনো স্থাপত্যের নেই।" (অবশ্য গোলকোণ্ডা, রান্থাম্ভোর না দেখেই এমন অতিকথন। তা হোক্।...)

কিন্তু এমন প্রশংসা কেন? প্রতি পাথর গ্রানাইট। আট-ন' ফুট লম্বা, পাঁচ-ছ' ফুট গভীরতার বিশাল চাঙ্গড়া শত শত। কারা কীভাবে কোথা থেকে এনে একের পর এক নিখুঁত ভাবে কেটে বসিয়ে দিয়েছে? বারোশো' ফুটের একদিকের দেয়ালে পর পর সাজানো ছাব্বিশটি গোল-গা 'বাট্রেস'। প্রত্যেকটিকে অর্ধ-চন্দ্র আকার দেওয়া হয়েছে। বিশ ফুট উঁচু প্রথম প্রাচীর। তা'র ভেতরে সিঁড়ির পর সিঁড়ি দিয়ে ইনকা সম্রাটের থাকার ব্যবস্থা পরিপাটি। পাথরগুলোর গা মসৃণ, গোলাই অসাধারণ। কেন না গেঁথে নয়, কেটে গোল করা, আর কেটেছে সেই নিওলিথিক কৃষ্টির যন্ত্রপাতি দিয়ে। কিসের সাহায্যে এনেছে এ পাথর? দড়ি? ল্লামার চামড়া পাকানো? কী? কি দিয়ে, কেমনভাবে এই রাশি রাশি পাথর কারা কেমনভাবে এনেছে? বিস্ময়ে শুধু চেয়ে থাকি। পশু নয়, যন্ত্র নয়, শুধু মানুষ।

পরে আমাজোনিয়ান জঙ্গলে যখন দেখি লিয়ানা লতার আকার, পোখতাই, লম্বাই, বিশ্বাস করেছি লতা দিয়ে পাথর বেঁধে লতার জালে পাথর ভরে গুঁড়ির ফালক্রাম্ এবং রোল্‌স্ দিয়ে স্রেফ মানুষের পেশীর টানের বলে এ পাথর নড়ানো যায়, এবং চড়ানো যায়;—এবং তা'ই হয়েছে।

এ দুর্গের সহরক্ষী হিসাবে পর পর সমান্তরাল তিনটি দেয়ালের পর গভীর পাহাড়ী খাড়ি। দুই প্রাচীরের মধ্যে মানুষের বসতি ছিলো; ছিলো বাজার; চাষের ব্যবস্থা।

ইন্‌কাদের তপস্যা ছিলো জল। আজও মানুষ অবাক হয়ে চেয়ে দেখে কাছিমের পিঠের মতো পাহাড়ের গা থেকে অন্তহীন জলধারা আসে কোথা থেকে? ইনকা সম্রাটের দুর্গের ভেতর দিয়ে স্তরে স্তরে, পরতে পরতে বয়ে এসে বাইরে দু'টি ধারায় পড়ছে—একটি পাথরের বড় চৌবাচ্চায়, সেটা আবার পড়ছে এক ধারায় নীচে। স্নানের জায়গা

এটা। সম্রাট এই তীর্থ বারিতে স্নান করতেন। জল প্রণালীর এমন ব্যবস্থা ছিল যে, প্রাকৃতিক এই জলধারা কখনও দূষিত জলের সঙ্গে মিশতে পারতো না।

সুতরাং এটা ছিলো তীর্থ। সূর্য তীর্থ। বীরাকোচা, সূর্যের মন্দির। হাজার হাজার মানুষ এক হোত এখানে। এই তীর্থকে বলে, 'অম্পু-মাচে'। এর পাশে আছে কে'এঙেকার মন্দির, যেখানে মৃতদের শেষ সমাহিত করা হোত।

'ইন্তী' নামক সূর্যের গতি লক্ষ্য করে এখানে হোত সূর্য উৎসব। কবে সেই গুহামানব চন্দ্র, সূর্য, ধূমকেতু দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল, তার স্পন্দন এখনো রক্তে ঢেউ তোলে। আজও। তাই এই মেলার খ্যাতি এবং আকর্ষণ। সে আকর্ষণ এতো বেশী—যে, সে মেলা আজও হয়ে চলেছে। দেশজ এরা কারুকে ইন্‌কা সাজিয়ে সে কালের সব অনুষ্ঠানের পূর্ণ অভিনয় করে। প্রায় হাজার দশেকের জনতা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে গাম্ভীর্য, পদ্ধতি এবং শীল বজায় রেখে সেই উৎসবে যোগদান করে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে, নিপীড়িত এই কৃষ্টির বুকের মধ্যে আজও ভক্তি প্রেম, পাথরের মধ্যে জলের মতো নিরন্তর প্রবহমান। ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় আত্মার অধর্ম।

আমরাও তো রাজা রামের নামে উৎসব করি। মনে মনে ভাবি আর ভাবি, যা-আমাকে ভাবায়।

ইসাবেলার ক্রুনের কাজ শেষ। ওর বাস যাত্রীদের নিয়ে নেমে গেল। ইসাবেলা রয়ে গেলেন। আমি অনেক আগেই মধুকে নিয়ে বসেছি সেই পাথরখানায় যেখানে হোমকুণ্ড খোদাই করা ছিল; ছিল বলিস্থান। দূর থেকে শুনছি অবিরত জলধারা পড়ছে পাহাড়ের ওপর থেকে, দুই থাকে তিন ধারায় জল পড়ছে, আবার পাহাড়ের ফাটল দিয়ে নেমেও যাচ্ছে। শান্ত গম্ভীর অপরাহ্নের আকাশের তলায় আমরা দু'জন। বহুদূরে যা'রা গ্রামান্তর থেকে এসেছিল শিল্পজাত বস্তু বিক্রী করার জন্য, তারা একে একে চলে যাচ্ছে। সেও নিঃশব্দে। দূরে নিশ্চয় গাঁ আছে।

একটি বছর দশেকের মেয়ে ইন্‌কা সাজে সেজে এসেছে। মাথায় তা'র লাল টুপী। সঙ্গে ওর পোষা আলপাকা। আলপাকা আর ল্লামা দুই জাতের মেষ। ল্লামারা বড়ো, পাহাড়ের নীচের দিকে থাকে। প্রজননের হার বেশী। আলপাকারা সাইজে একটু ছোটো। লোম বড়ো, খুবই নরম, আর বেশির ভাগই সাদা। এরা গরমে থাকে না। উঁচু পাহাড়ের গায়ে লেপটে থাকা ঘাস খেতে ভালোবাসে। এ ছাড়া এক ধরনের ছোটো জাতের মেষও আছে, যা'রা ভারী লাজুক। পালিয়েই বেড়ায়। খুবই উঁচুতে পাহাড়ের ভাঁজে আড়ে লুকিয়ে থাকে। নাম ভিকুনা। এদের লোম অত্যন্ত কোমল এবং অত্যন্ত দামী। পেরুতে রাজা, রাজবংশ এবং প্রধান পুরোহিতরাই এই পশম ব্যবহার করতে পেতো।

[মেক্সিকোয় যেমন সবুজ পালক কোয়েৎজালকোৎল পাখির। সম্রাট ছাড়া অন্য

কেউ ব্যবহার করলে মৃত্যুদণ্ডও হতে পারত। আমাদের দেশে শাহ্‌-তুষ এর খুব নাম ছিলো। এখন সে তুষ পাকিস্তানে, তিব্বতে।]

মেয়েটিকে একটা পেসো দিতে কী যে চমৎকার হাসলো! অনভ্যস্ত খুশীর দমক উছলে পড়ার লজ্জায় তা'র সেই হাসি অপরাহ্ণের আকাশখানাকে নীরবে মুখর করে দিল।

মধু মেয়েটার চলে যাওয়ার দ্রুত ভঙ্গী লক্ষ্য করে বল্‌ল, "একটা পেসোই কেমন করে একশো হয়ে গেল! বাঃ!"

এসে বসেছে ইসাবেল। বল্‌ল—"কী ভাবছেন? কবিতা, না কি মানুষের কথা?"

—"মানুষহীন কবিতা কি হয় নাকি? মাছ ধরব, আঁশটে গন্ধ হবে না; প্রসব করব, রক্তক্ষরণ হবে না; কবিতা হ'বে, মানুষ ছোঁবে না,—সম্ভব? যদি বলো নিছক নিসর্গ, সে যদি মানুষের বোধ থেকে জন্ম নিয়ে থাকে, মানুষের গন্ধ না থেকে পারে? নেরুদা, ওকাম্পো, পাজ—।"

—"পড়েছেন ওদের কবিতা?"

—"এই তোমায় যেমন পড়ছি। যা আমার নয় তাকে আমার করার চেষ্টা, শুধু মানুষ হবার সুবাদে। কবিতা খুব পড়ি। দেশ-বিদেশের মনের ছবি ধরা যায়।"

হয়তো ঈষৎ হাসল সে। একটু নড়ে চড়ে বসল। বল্‌লে—"কী ভাবছিলেন বলুন।"

"ভাবছিলাম,—একটা ঝড় দাপট ভূমিকম্পের মতো হামলা এসে যখন একটা সংস্কৃতিকে বলাৎকার করে, তখন কি সত্যিই ভ্রূণের অধিকারের বলে মায়ের রক্তের রং, নিশানা, চিৎকার, ভাব, ভাবনা, স্বপ্ন, সাধ, আহ্লাদ সব শেষ হয়ে যায়?"

"কী মনে হয় আপনার?"

"এই তো চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম, ঐ সিংহাসনের দরবার। কতো বিশাল বিরাট কাছিমের পিঠের মতো চট্টান। সামনে পর্বত বলয়ের মাঝে ঘাসে ঢাকা বিশাল মাঠ। মাঝখানে মঞ্চ বেদী। ওরা আজও তিথি দেখছে; দেবতার জন্য আনছে হৃদয়ভরে প্রার্থনা, আসছে অঞ্জলি ভরে উপহার নিবেদন। ওদের মন্ত্র লাতিন হয়ে গেছে, দেবতা সেন্ট্‌ হয়ে গেছে, নাম বদলেছে ইন্তী-র, কারিকাঞ্চা-র, পাচাকামাক-এর। কিন্তু ওরা ওদের পিতৃপুরুষের নির্ধারিত তিথিতে শতশত মাইল দূর থেকে এসে উৎসবে জড়ো হয়; যে অনুষ্ঠানে ইন্‌কারাজ ও রাজ-পুরোহিত যে ভাবে যোগ দিতেন, ঠিক সেইভাবেই ওরা এবং ওদের বাছাইকরা সম্রাট-সম্রাজ্ঞী অংশ নিয়ে থাকে, এবং চরম নাটকীয় মুহূর্তগুলিতে উল্লসিত, উত্তেজিত হয়েও ওঠে। ঠিক সেদিন যেমন হোত। কোনো নাটক পুরো নাটক মাত্র নয়। যারা জয় করেছে, তারা কী জয় করেছে? কেন? কোন্‌ লাভের প্রশ্রয়ে?···ক্ষেত্রের অধিকার কি মনের অধিকার?

"দেখো ইসাবেলা, জাপানে শিণ্টো এসে বুদ্ধকে সরায়নি। শিণ্টো ছিলো। বুদ্ধ এলো। পিতৃপুরুষের চিন্তার সঙ্গে মানুষের, জীবনের, প্রত্যক্ষের চিন্তা মিশলো। এককে উপড়ে অন্য নয়। এককে উপড়ে অন্ত হয় না। ওপড়ানো যায় না। মালয়, ইন্দোনেশিয়ায়

ইসলাম এসে রামকাব্য সরায়নি ; সরাতে পারেনি। যীশুখৃষ্টকে সামনে রেখে যারা একটা প্রলেতারিয়েৎ (গণ) বিপ্লবকে প্যাগান ইম্পীরিয়ালিজ্‌মের (পুরুৎ-ভজা সাম্রাজ্যবাদের) পোষাক পরিয়ে দিল, তারাও ক্রীটের, মিথ্‌রাইজ্‌মের, আহুরমাজদার সংস্কৃতি মুছে ফেলতে পারেনি। মিথ্‌ হিসেবে মিথ্‌-ই পরে হলেন যীশু, মিথের-যীশু,—কুমারী মা থেকে নিয়ে ঐ ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত। সবটা। নৈলে ক্রুশে যীশু আদৌ মরেছেন কিনা খুবই তর্কের ব্যাপার।”

“জানি, ইম্পীরিয়ালিজম্‌ (সাম্রাজ্যবাদ) গ্রাস করে। কিন্তু কেন করে ? তার পেছনে এথিক্‌স্‌ (শুভচিন্তা) কী আছে ? সোনা ? কেন ? শক্তি ! শক্তিই বা কেন ? লোভের তাড়নায় সবার অধিকার নষ্ট করে অল্পের অধিকার কায়েম রাখা ছাড়া তো আর কিছুই নয়। কী জঘন্য !” —ইসাবেলা ধীর কণ্ঠে বলে।

“অথচ এই মাঠ, এই আকাশ শুধু মানুষের উল্লাসের বন্যাতেই ভেসে যায়—ইতিহাসের সমস্ত গ্লানি তুচ্ছ করে, পীড়নের সমস্ত যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে। এ উল্লাসই জীবন। এটাই জীবনের ধর্ম। বাকী সব ঐশ্বর্য, পোষাক, শোভা, অলঙ্কার। তাই না !”

উৎসাহ ভরে বলি, “ঠিকই তো। সারা জীব জগতের মধ্যে, নর-নারীর মধ্যে, উল্লাসই হোলো প্রেম। সেটাই সত্য। আর সেই প্রেমের আঙ্গিকেই অঙ্গে অঙ্গে যে মিলন হয়ে পড়ে অবশ্যম্ভাবী তারই রসে মাতাল হয়ে ওঠে জীবন মহাদেবের নৃত্য তাণ্ডব। সেই জীবনের ধর্মেই প্রাণের প্রসার ; এবং এই সবটাই সেই ধর্মের স্পর্শে হয়ে যায় প্রেমের অলঙ্কার। ভাবি, সেই প্রেমই যদি না রইলো, নীরব অলঙ্কার তো শুধু বোঝা। শক্তির অপচয়ই শক্তকে শিথিল করে, করবেই। পিজারো সত্য নয়, সত্য এই সাক্‌সাহুয়ামানের মেলা।”

উঠতে উঠতে ইসাবেলা বলে,—“মার্কিনরা এ জায়গাটার নাম বলে সেক্সী-উয়োম্যান। প্রচণ্ড আঘাত লাগে মনে। ওদের হয়তো লাগে না। মেরী-মাকে এ্যাডালট্রেস্‌ বললে, আর যীশু খৃষ্টকে নোংরা বেজন্মা বললে—কিন্তু খুবই লাগে কারুর কোথাও। নিশ্চয় ওদেরও লাগে। উন্মাদ ক্ষমতার বিষের ধোঁয়ায় ওরা তা বুঝতে পারে না।”

আমরা বেরুলাম মস্ত একটা প্রবেশ পথ দিয়ে। ‘গেট্‌’ বললে আর্চের আভাস আসে, লিন্টেলের আভাস আসে। কিন্তু ইন্‌কারা লিন্টেল জানতো না। তবু এটা একটা সিং-দরজা তো বটেই। মাথায় ধারে সাপের চিহ্ন খোদাই। এটাই প্রবেশ দ্বার। সুমুখ দিক। বাসের পথে সুবিধার জন্য ঘুরে পিছন দিয়ে আসে সবাই। নামতে কোনোও কষ্ট নেই। সরু পাহাড়ী পথের দুটি ধারই উঁচু। যাতায়াতের পথে কে যাচ্ছে আসছে বাহির থেকে জানা যায় না।

ওপর থেকে বুনো গাছ ছাড়া বেগন-ভেলিয়ার লতা ঝুঁকে পড়েছে। ছোটো ছোটো বুনো গোলাপের ঝাড়। আগডালে, ঝুলন্ত মুচকুন্দ মোশাই এখানেও হাজির। গন্ধ বিলুচ্ছেন। বহু তিতির। খানিকটা নামতেই গ্রাম এবং শহরতলি। গিজগিজে বস্তি

(স্লাম)। কিছু কিছু নোংরাও।—এসে পড়েছি শহরের মধ্যে আধা ঘণ্টাও লাগেনি। কাল্লে-রেসবাল্স্ শেষ হতেই ডানদিকে ঘুরে ককোরি কাল্লে স্ট্রীট। খুব ঢালু পথ। মাঝে মাঝে সিঁড়িও করা আছে। প্রোকিউরাডোরেস স্ট্রীটটির 'খ্যাতি' কম অসামান্য নয়। প্রোকিউরাডোরেস যে! ওরা ডাকলেই আসে; প্রেম-প্রেম খেলে, পণের বিনিময়ে পণ্যা; গণের তৃপ্তিসাধিকা, গণিকা; বেশ সর্বস্বা, বেশ্যা। তবে একালে ক্রমশ বস্তি এলাকা ছেড়ে দিয়ে এই বসতি বাসিনীরা 'বিশ্বময় ছড়ায়ে' গিয়েছে। এই পথটাই এসে মিশলো লরেটো স্ট্রীটের মুখে, একেবারে 'হোকালো' পাড়ায়।

'প্লাজা-ড্য-আর্মাস' তখন মানুষ-জনে গমগম করছে। কেবল গমগম শব্দটি আসছে না। লণ্ডন, পারী, নিউইয়র্কের মত পথে ললনাদের জুতো থেকে লোহার হিলের কট্-পট্, কট্-পট্ শব্দ নেই; নেই বাসের ভ্যাকুয়াম ব্রেকের ফোঁস, 'আণ্ডার গ্রাউণ্ডের হাড় মুড় মুড়ী ঘড় ঘড়, এবং নেই একটি বারের জন্য একটিও কারের হর্ণের আওয়াজ। ট্রাক তো নেই-ই। স্পেশাল টেম্পোরারী লাইসেন্স নিয়ে, মাত্র মাল ওঠানো-নামানোর জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ট্রাক থামবে। P. W.D-র এমন দু'খানা ট্রাক দেখলাম মাল নামাচ্ছিল।

আশ্চর্য! এরা পথ মেরামত করে ঝটপট, গুছিয়ে। মেরামতের আগে বা পরে কোনো মাল-মশালা পড়ে থাকে না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এটা সম্ভব হয় একটি ছোট্ট উপায়ে। বড়ো কন্‌ট্রাক্ট দেওয়া হয় না। ছোট ছোট অংশ ভাগ করে কন্‌ট্রাক্ট। আর পথের বেদখলির জন্য ভীষণ হারে ট্যাক্স। সেটি আবার নগদ দেয়। জরিমানা বলে না। কন্‌ট্রাক্ট মাফিক কাজ করো, ফের কন্‌ট্রাক্ট নাও। নয়তো 'কলা খাও'।

তখন একটি রেষ্টুরাণ্টে না বসে চলবে না। চার্চগুলো, মিউজিয়মগুলো অবশ্যই খোলা আছে। কিন্তু বিশেষ করে যা' দেখার সে সব পাঁচটার পরে বন্ধ। ইসাবেলা বল্লো, সকালে আসবে—শহর দেখাবে। এই তো রেষ্টুর‍্যাণ্ট। 'এল্-বুকারে'য় ভীড়। কিন্তু খুব ভালো ব্যবস্থা। খাবারটা নিশ্চিন্তে খাওয়া যায়।

'এল্-বুকারে'-য় দেখলাম ইসাবেলাকে সবাই শুধু জানেই না, মানেও। একেবারে ছোঁ মেরে সব ঘর-দোর পার করে ভেতরের একটা বারান্দা ঘেরা সবুজ উঠোনে হাজির করলো। কুলকুল করে জল বইছে। ইসাবেলা বল্লে—"সেই সাক্‌সাহুয়ামানের জল; এখানে এই স্বাভাবিক জল বাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়া একটা ফ্যাশান। ধনী-গরীব নেই। যা'র যেমন সখ।"

—"আলাদা খরচ লাগে না?"

—"না, বিশেষ নয়। মিউনিসিপ্যালিটি সব ব্যবস্থা করে দেয়। বাড়িতে একাধিক ট্যাপ বা শাওয়ার বাথ লাগালেও তো খরচ হয়। জলটা ভাল। খুব ভাল। আর এ শহরটাতো পুরোন, বনেদী। কনজার্ভেটিভ বলবো না। প্রাচীনপন্থী নয়, ঐতিহ্য ভালবাসে। দেশের জন্য অহঙ্কার আছে। তা'তেই একটু তেজস্বী, স্পর্শকাতুরে। সময় সময় দুর্মদও। কুজকোয় ধনী লোক যত, কৃপণ তার বেশী। ফলে খুব হিসেবী। বেহিসেবের অপচয় নেই।"

হেসে বলি, "খড়ের গাদা। একটু ফুলকী লাগলেই হোলো। এক কালের ধনী, অথচ স্পর্শকাতুরে, পাশাপাশি। বিপ্লবের আঁতুড় ঘর।"

চোখের কোণ-দিয়ে চেয়ে বলে—"হ্যাঁ তাই। ভাগ্যি সেই নবজন্মের সম্ভাবনা আছে। নৈলে মরে যেতাম।"

মধু জিগ্যেস করে—"এ জলের জন্য ব্যবস্থা কী? মানে ঐ পাহাড় থেকে বাড়ির ভেতরে আনতো কী উপায়ে?"

—"উপায়টি আজও তাই আছে। আনতো নয়; আনে। আজও আসছে। ব্যবস্থা পাল্টায়নি। পাহাড়ের গা বেয়ে ধারা, প্রস্রবণ বয় জানা আছে, আশে-পাশে পাহাড় থাকলে তা'র তলার মাটি থেকে জল উথলে পড়ে, বলে 'স্প্রীং' (কাশ্মীরে বলে—'নাগ') তাও জানি। কিন্তু সাক্‌সাহুয়াম্যানের জল তো দেখলেন। পাহাড়ের মাথা ফেটে জল বা'র হচ্ছে! সেকালের মানুষের আশ্চর্য হ'বার কথা বই কি। তাই ওরা সূর্যের মন্দির (কোরিকাঞ্চা), মা মাম্মা কুইল্লার মন্দির, আর কুলচীর মন্দির ওখানেই করেছিল। ইন্‌কা নিজে থাকতেন ঐ দুর্গে। মাত্রই জলই খেতেন।…

"শহরে এ জল আসছে,—বলছি·· প্লীজ · একটু সময় চাই। ক্ষমা করবেন। একটা টেলিফোন করে আসি।"

চলে যেতে মধুকে বল্‌লাম—"ভাবছিলাম, কখন উঠবেন।…বাচ্চাদের খোঁজ নিতে গেলেন। অদ্ভুত মহিলা। রীতিমত বিদ্যার আভিজাত্য, জ্ঞানের গরিমা।"

—"আর কী অদ্ভুত সুন্দর! মনে হয়, কিছুতেই আঠারোর বেশী নয়।"

ফিরে আসতেই জিগ্যেস করলাম—"বাচ্চারা ভাল আছে?"

মুখখানা লাল হয়ে উঠল। ভাল দেখাল। বেয়ারা এর মধ্যে এসে কোকা-চা রাখল। অর্ডারের জন্য দাঁড়াল।

আমি বলি, 'মধু চা-টা তুমি ঢাল। আর, আপনি হাল্কা কিছু অর্ডার দিন। আপনিই অর্ডার করুন। আপনাদের দিশী রান্না।"

—"আমি? আমি শুধু চেরী দেওয়া দই খাব। আপনারা?"

—"না, দই নয়। আর কি আছে কফির সঙ্গে চলবে?"

—"মাছের ডিমভাজা খান। ট্রাউটের ডিম। খুব ভাল। খুব হাল্কা। ভাজার কায়দা আছে। লেবুর সসে ডুবিয়ে খেতে হয়।"

আমি বললাম—"বাচ্চারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ওদের আনিয়ে নিন না। ডিনার খাওয়া যাবে।"

কোকার চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে ঘাড় নীচু করে কপালের ওপর দিয়ে ঈষৎ ম্লান চেয়ে বললেন—"ভাই বাতাসারিয়া, আমার তিনটে বাচ্চা। তফাৎ শুধু এই শেষেরটি আমার চেয়ে চার বছরের বড়ো। কিন্তু সেই-ই আমার সব চেয়ে ছোট এবং ভাল বাচ্চা।"

কথাটা পালটে বলি—"জলটা কিভাবে আনা হোত বলছিলেন।"

বুঝলেন প্রস্তাব পালটেছি। স্মিত চাহনিতে চেয়ে হাসলেন। 'নিখিল যৌবনের

জন্মভূমির নেপথ্যে' তেমন হাসি ফুটে ওঠে নিস্তব্ধতায় মন্দিরে। বললেন, "পাথরেরই লম্বা লম্বা চৌকো চৌকো চ্যানেল। কেবল চ্যানেলের ছাদটাকে ঢেকে দেওয়া হোত খুব মসৃণ পাথরে। এমন খাঁজে খাঁজে সেটা বসে যেত যে, বার হোত না জল কোন রকমেই। ফাটলে তামা আর রূপো গলিয়ে ঢেলে পিটে দিত।"

"রূপো !! নালী ভরার জন্য !!"—মধু চেঁচায়।

হাসে ইসাবেলা।—"আমি কাল নিয়ে যাব চার্চে। এখন চার্চ। সেকালে পেরুর শ্রেষ্ঠ মন্দির ছিল। সারা দেয়াল সোনা আর রূপো পিটে জোড় লগোনো, আমরা এখন সিমেন্ট বালি দিয়ে থাকি যেখানে।······সে সব সোনা গেলো কোথায়? গেলো তাদের শক্তি বাড়াতে যারা শক্তির দাপটে মানুষকে অশক্ত করে রাখার ব্যবসায়ে মশগুল।···

"······আমাদের ইন্‌কা কৃষ্টি তো চাষীর কৃষ্টি। অদল-বদলের কৃষ্টি। মুদ্রা, সোনা, রূপো এসবের কিছুই মূল্য ছিল না। মূল্য ছিল কোকোর দানার, কফির দানার, আর পশমের। সোনা আর রূপোকে আজ আমরা যে ভাবে দেখি—সেকালে দেখতাম মার্বেল কাগজ, ঘুড়ির কাগজ, রাংতা, টিন্ শেলের মতো। সাজাবার জিনিষ। তাও মণ্ডনের জন্য হলেও, শুধু গৃহ মণ্ডন। মানুষ নয়। সূর্য মন্দিরের পুরো দেয়ালে সোনার পাত ছিল। এই কুজকোতেই 'লা মার্সেদ' আশ্রমে আছে খৃষ্টান চার্চের সব চেয়ে পবিত্র পাত্র, যাতে যীশুর রক্ত আর মাংসের ভোগ চড়ানো হয়। আর যে প্রসাদ গির্জার প্রত্যেকে ভক্তিভরে গ্রহণ করে। সেই একটি পাত্র (রেমনস্ট্রান্স), যার দাম আজও কেউ করে না, সেই পাত্রটি পেটা সোনার, ওজন সওয়া-বাইশ কিলোগ্রাম। ছ'শো পনেরটি মোতি, দেড় হাজারের বেশী হীরে ছাড়াও চুনী, পান্না, মরকত, নীলা, পোখরাজ মুঠো মুঠো। কেউ তা দামে মাপার সাহসই করে না। এই কুজকোর মিউজিয়ামে আছে টোপাজ কেটে মূর্তি, সিন্দুভারের পালঙ্ক, হাতির দাঁতের ঘরের পার্টিশন। সোনা-রূপোর আদৌ কোনো দাম আছে জানতে পেরে, পেরুর লোকেরা স্প্যানিয়ার্ডদের পাগল ভাবতো, ভাবতো ছেলেমানুষ। তাই সম্রাট আতাহুয়াল্লাপা সহজেই ঘরভরা সোনা দিতে চেয়েছিলেন। ভয়ে নয়, ঘৃণায়। ভাবতে পারেননি, যাদের তিনি দেবতা ভেবেছিলেন, তারা সোনার মতো তুচ্ছ জিনিষের বদলে বিশ্বস্ততার মতো মহৎ মূল্যকে হেলায় ভাসিয়ে দেবেন।······

"সম্রাট আতাহুয়াল্লাপাকে এখানে হত্যা করা হয়নি, কিন্তু কুজকোর আত্মাকে এখানে হত্যা করা হয়েছিলো। মানুষ আতাহুয়াল্লাপাকে কাজামার্কায় হত্যা করা হয়। এখানে হয় সূর্য-কন্যাদের ধর্ষণ, এখানে ইন্‌কা মাঙ্কোর স্ত্রীকে উলঙ্গ করে সাকসাহুয়ামানের দুর্গ থেকে হাঁটিয়ে আনা হয় এই সূর্য-মন্দিরের সামনে, ঐ যে পথ দিয়ে আমরা হেঁটে এলাম। সেদিন সে পথ নীরব চোখের জলে ভিজে গিয়েছিল। মঞ্চ গড়ে, তরুণী সেই নারীকে তুষের আগুনে এরা পোড়ায়। তার কোন অপরাধ ছিল না। শুধু তার স্বামী কোথায়, সেই মারাত্মক তথ্যটি তাঁর কাছ থেকে শত সহস্র অত্যাচারের পরেও না জানতে

পারার ব্যর্থতায়। তুষের আগুনে তরুণী হত্যা! ভাবুন!! অথচ ওরা সভ্য জগত থেকে এসে আমাদের সভ্য করে তোলার গুরুভার স্বেচ্ছায় বহন করেছে বলে দাবী করে।

"নিজেকে তুষের আগুনে পুড়ে মরার যন্ত্রণা থেকে বাঁচাবার জন্য আতাহুয়াল্লাপা শেষ মুহূর্তে খৃষ্টধর্ম নিয়ে 'গ্যারটিং'এ (গলায় ফাঁস টেনে) প্রাণ দিতে সম্মত হন। ইন্‌কার সেই সূর্য-কন্যা—সেই সম্রাজ্ঞী কিন্তু ঘৃণায় ফেলে দিয়েছিলেন সেই যাজক প্রদত্ত বাইবেল। একটি শব্দও না করে, এককোঁটা চোখের জল না ফেলে নীরব সাহসে দর্পিতা ইন্‌কার মতো তিনি ভস্ম হয়ে গিয়েছিলেন। মাঙ্কো কাপাক তখন মাচ্চু-পিচুতে। কিন্তু মাচ্চু-পিচু বলে একটা শহর আছে তা-ই তখন কেউ জানত না।...১৯১১ পর্যন্তই কেউ জানত না!

"সেদিন সেই নারীদেহ ভস্মীভূত হবার সঙ্গে সঙ্গে পেরুর আত্মাই ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল।...

"সূর্য-মন্দিরের পাশে ছিল মৃত রাজাদের শবের মমী-মন্দির। সেই মমীগুলোকে কি করেছে জানো? দেশ-বিদেশের মিউজিয়ামে বেচেছে। এখানেও একটি আছে। বলে ওরা, ওটা সম্রাটের মমী নয়। মিথ্যা বলে।

"কাল সকালে আসব। কিন্তু আজ রাত ন'টায় প্রস্তুত থেক। নাচ দেখাতে নিয়ে যাব।"

"বাচ্চারা? তাদের আনবে না?"

"আমার তিনটি বাচ্চা। সবার শেষের বড় বাচ্চাটাই তাদের দেখবে। ভয় নেই। আমার এই কাজ। অভ্যাস আছে।—তুমি টুরিষ্ট। চলন্ত দেবতা। ভরন্ত পার্স।"

সে এক বিচিত্র শো।—জানি কি? তাই দেখতে চলেছি।

মেপে মেপে পা ফেলে কুজকোয় চলন। আমাদের নই যেন আমরা। ঐ যে সব সময়ে গালে কোকো পাতা পুরে রাখে ও-ই সত্য। এ তো দেখছি কোকো-চা খেতে থাকলে খেতেই থাকলে। শেষ আর নেই।

যে বাড়িটা এলুম, সেটা বহুকালের বাড়ি। তলাটা সেই ইনকা কালের, ওপরটা কলোনী যুগের। দেয়াল ইত্যাদি সব দিব্যি মোটা।—ঠাণ্ডা বোলে ঠাণ্ডা! সামনে ষ্টেজ বলতে পর্দা টাঙ্গানো এক চিলতে উঁচু জায়গা। তা'র ওপরে নাচ।

'কোন্দোর' নামক একটা নাচ। বল্লে, কুইতোর সমুদ্র পারের নাচ। দু'টি নিগ্রো মেয়ে পাখির পালকে গা ঢেকে যা' নাচলো তা'র মধ্যে ঢোলই প্রধান। খুব সুন্দর বাজালো। এর পরে একজন ভায়োলীন বাজিয়ে সত্যিই অনেকক্ষণ মুগ্ধ করে রাখলো। পরের নাচটি চার জোড়াই ইনকা পোষাক পরিহিত। নাচের মধ্যে কোনো অর্থ না থাকলেও খুব একটা তন্ময়তা ছিল, ছন্দ ছিল। ঢোলক বাজলেও বাঁশীর সঙ্গে নাচ। এর পরে এলো নিগ্রো যুগল বন্দী। খুব স্বল্প ও লঘু বেশ। নাচটায় আদি রসের অশালীনতা বলবো, না স্রেফ ভাঁড়ামী। নাচের নাম 'আলকাত্রাজ'। দু'জনার হাতে

হু'খানা করে রুমাল। বারে বারে হারাচ্ছে। আর ওরা যত্রতত্র খুঁজছে। সবই চলছে নাচের মধ্যে। দর্শকদের মধ্যে একটি মহিলা বসে (আসলে ওদের দলেরই কেউ), তাঁরই বুকের মধ্য থেকে বেরুলো হারানো রুমাল। পরিশেষে, যে যখন যা'কে পাচ্ছে নব-দ্বারের যে কোনো দ্বার থেকে রুমাল বা'র করে আনছে। তবে দ্রুত তালে বাজনা বেজে চলেছে এবং গতির ছন্দ ব্যাহত হচ্ছে না।......এসবে না-কি মার্কিনীরা খুব খুশী হয়...... আমি ভাবি, হয়তো অবচেতনে এদের অশালীন, অসংস্কৃত ভেবে ভুঁড়ি বাজায়।

আর সহ্য হোলো না। বাইরে চলে এলাম। ইসাবেল বুঝলো। একটু একটু করে চলতে চলতে এলাম সেই প্লাজা আর্মাসেই। বিশাল একটা পাথরের চাই খাড়া করে রাখা আছে।—বলে, ইনকা সম্রাজ্ঞীকে এই পাথর খানার সঙ্গে বেঁধে বা এর ওপরে রেখে পোড়ানো হয়েছিল। হোক—না-হোক, পাথর খানাকে দিনান্তে কুজকোর মতো ছোটো শহরেও অন্ততঃ হাজার মানুষ ছুঁয়ে যায়। কেন যায়, কে বলবে। আমিও ছুঁই।

মধু বললো, "রোদ্রীগেজ আমাদের পেরুর ইতিহাসের শেষটুকু বলেনি। আপনি বলুন, শুনি। আতাহুয়াল্লাপার কথা বলুন। অমানুষিক গ্যারটিং? একজন সম্রাটের? য়োরোপে হলে পারতো?"

আমি বলি,—"সকালে মধুকে আপুরিমাকের তীরে নিয়ে গিয়েছিলাম। বলছিলাম, সম্রাট হুয়াস্কারকে সেনাপতি চালু কুচিমা কী ভাবে বন্দী করেছিল। হুয়াস্কারকে বন্দী করা হলেও কুজকোর বাইরে ইনকার সম্মানেই তাঁ'কে নজর-বন্দী রাখা হয়েছিল। কোনো অসম্মান তাঁ'কে দেখান হয়নি।"

—"তাই নাকি? প্রেস্কট কিন্তু—" বলছিল মধু।

—"থামো মধু।" বাধা দিয়ে বলছেন ইসাবেল,—"প্রেসকট ছিলেন সে কালের পুঁথি পড়া গবেষক। তদুপরি পয়লা নম্বর সাহেব, দোসরা নম্বর পিউরিটান এবং তেসরা নম্বর বড়ই 'মায়োপিক', মানে পশ্চিম ইউরোপের বাইরে পূর্ব য়োরোপও তাঁ'র কাছে ছিল বারবেরিয়ানদের দেশ। চীন, জাপান, ভারত, আরব, পারস্য তো ছেড়েই দাও। তাঁর লেখা ইতিহাস তা'রাই এখন পড়ছে যারা আরব্য উপন্যাসকে, সেক্সপীয়ারের ইংলণ্ডের ইতিহাসকে বা তোমাদের মহাভারতকে ইতিহাস বলে।

"আতাহুয়াল্লাপা বিশ্বাস করেনি তাঁ'র সৎ-মাকে, অর্থাৎ হুয়ানাকাপাকের সম্রাজ্ঞীকে। হুয়ানার অনেকগুলি বিবাহিত ও অবিবাহিত পত্নী ছিল। হুয়াস্কারের নিজের অনেক স্ত্রী ছাড়াও ছিল বহু উপপত্নী। হুয়াস্কারের শতাধিক সন্তান ছিল। সব মিলিয়ে তো সে এক ফৌজ। বিশেষ এর মধ্যে যদি তুমি ধরো, সেই সব বৌদের বাপ, মামা, ভাইয়েদের তাহলে তো কথাই নেই। এতোখানি বিপদ ঘাড়ে করে রাখার বান্দা তো আতাহুয়াল্লাপা নয়। যে কোনো সময়ে এই দলকে হাত করে ফিরিঙ্গীরা আতাহুয়াল্লাপার সর্বনাশ করতে পারতো। সে সম্ভাবনা ছিল।

"সুতরাং আতাহুয়াল্লাপাকে সাবধান হতে হোল। সে হুকুম জারী করলো, হুয়াস্কার ও তার পরিবার যারা ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে সমঝোতায় হাত বাড়িয়েছিল,

সবাইকে শেষ করে ফেলার। সম্রাটের হুকুমে এক কচি কচি মেয়ে, আর যুবতীদের মধ্যে যারা অন্তঃসত্বা নয়—এদের বাদ দিয়ে এই প্লাজা আর্মাস-এ সকলকে মেরে ফেলে শবদেহ পথে লটকে রাখা হয়েছিল। বেচারী হুয়াস্কারকে চোখে দেখতে হয়েছিল, তার পুত্র, কন্যা, মা, বোন, সৎমা প্রভৃতি সকলের মৃত্যু।—নিরুপায় নির্বোধ মৃত্যু। কিন্তু আতা-হুয়াল্লাপা দুই দিকে শত্রু নিয়ে থাকার যুক্তি পেলো না।

"ততদিন কাজামার্কায় বসে আতাহুয়াল্লাপা এসব খবরের সঙ্গে আরও দু'টি খবর পেয়েছে। এক, ফিরিঙ্গীরা এগিয়ে আসছে কাজামার্কার দিকে। দুই, বীরাকোচা বলেছিলেন আবার সশরীরে আসবেন পেরুতে। দেখতে হ'বে, এই যারা এলো, তারা সেই দেবতাই কিনা। নৈলে একশো' জন সৈন্য—সে আর কি! আতাহুয়াল্লাপা কোনো তোয়াক্কাই করলেন না। করার কারণও ছিল না,—যদি সত্যি যুদ্ধ হোত।

"ওদিকে পাচাকামাক পাট করে দেবার পর পিজারোর সাহস বেড়ে গেছে। জেনে গেছে বন্দুক, কামান, ঘোড়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো পেরুবাসীদের কিছু নেই। তার উপরে সে খবর রেখেছে এদের আত্মকলহের, হুয়াঙ্কারের পরাজয়ের। হুয়াঙ্কারের পরিজনদের হত্যার কথা।

"পিজারো কাজামার্কার দিকে এগিয়ে আসেন, বাধা তাকে কেউ দিল না। কাজামার্কায় সে বিনা যুদ্ধে বন্দী করলো সম্রাট আতাহুয়াল্লাপাকে। তিনি কিন্তু নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে বিশিষ্ট অতিথি জ্ঞানেই সেই নবাগতদের সম্বর্ধনা করেছিলেন। সে সম্বর্ধনার উদারতার সুযোগে এরা হঠাৎ ডাকাতি করতে পারে সে সন্দেহ করতে পারেনি কেউ। আতাহুয়াল্লাপা তো নয়ই।

কিন্তু পিজারো জানতো হুয়াঙ্কারকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী করে রেখেছে আতাহুয়াল্লাপা। এ অবস্থায় 'মধ্যস্থ' হবার মৌকা পিজারো ছাড়তে চাইলেন না। পিজারো আতা-হুয়াল্লাপাকে আদেশ করলো হুয়াস্কারকে কাজামার্কায় ডেকে পাঠানো হোক। মতলব, দু-ভায়ের গোলমালকে মূলধন করে দেশকে বিভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন করা।

"আতাহুয়াল্লাপা ঠিকই অনুমান করেছিলেন। ক্ষীণবুদ্ধি হুয়াঙ্কারকে ফিরিঙ্গীরা দলে টেনে নেবে। এর মধ্যে হুয়াস্কারের দল দৌত্যও করেছে। হুয়াস্কার আর ফিরিঙ্গীদের সমঝোতার ফাঁদে সে পড়বে, এই শঙ্কায় সে আদেশ দিল, হুয়াস্কারকে খতম করার। তখন ইন্‌কার বয়স চল্লিশ।

এই ঘটনার পরই আতাহুয়াল্লাপা বুঝলো সে ফিরিঙ্গীদের হাতে বন্দী। ফিরিঙ্গীরাও মানুষ; এবং তার মুক্তির মূল্য হিসাবে যখন তারা সোনা চাইল, তখন তাদের খানিকটা ছেলেমানুষও বোধ হল আতাহুয়াল্লাপার। এক ঘর সোনার জায়গায়, তিনঘর সোনা দেওয়া হোল। (ফিরিঙ্গী কড়চা বল্‌ছে—২৫×১৫, ২২×১৭, ৩৫×১৭ ফুটের ঘর। প্রত্যেকটারই উচ্চতা নয় থেকে দশ ফুট।)

হ্যাঁ, ইন্‌কা মুক্ত হলেও 'তাঁর নিজের নিরাপত্তার জন্য' তাঁকে সর্বদা ফিরিঙ্গী সৈন্য

পরিবৃত হয়ে থাকতে হবে !! কিন্তু নাকি ফিরিঙ্গী অনুচরেরা এই ফাঁপা সম্রাটকে বহন করার দায়িত্ব নিতে অরাজী। কাজেই রাজ্যে 'শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যই' কাজামার্কায় তাঁকে গ্যারটিং করে মারা হোল। এই মর্মে রিপোর্ট গেল মাদ্রিদে।

এজন্য স্পেনের দরবার, ইতিহাস ও বীরেরা পিজারোকে হত্যাকারী বলে যথেষ্ট নিন্দা করেছে। এবং ডাকাত পিজারো তাদের মুখ সোনা দিয়ে বন্ধ করেছে। সে তারিখটা? —হ্যাঁ, আমরা আজও এণ্ডীজের মাথায়, তিতিকাকার ধারে, পিউনোর জঙ্গলে সেই তিথি পালন করি। আতাহুয়াল্লাপা ছিলেন দস্তুর মতো বীর, স্বাবলম্বী, কৃতিমান, কীর্তিমান শাসক। তিনি সিংহাসনে কমই বসে থেকেছেন। তিনি কেবল দেখতেন চাষ-বাস ও শিল্পের উন্নতি, জনগণের স্বাস্থ্য ও আনন্দ। তাঁর ভুল,—তাঁর ধর্মসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস। লুঠেরাদের তিনি চিনতে না পেরে, দেবতা বলে মেনে নিয়েছিলেন। ভাল-মন্দর সংঘাতে ভাল যখন সাজা পায়, তখন তা'কে বলি ট্রাজেডি।"

এর পরের ইতিহাসও বলেছিলেন ইসাবেলা। সেটাও শেষ করা যাক এই সূত্রে। —"যে দিনটিতে আতাহুয়াল্লাপাকে বন্দী হতে হয়, সে দিনটি হোল আগস্টের উনত্রিশ তারিখ। আজ আগস্টের ষোল তারিখ। ঠিক চারশো পঞ্চাশ বছর ধরে কাজামার্কায়, সাকসাহুয়ামানে আর এই কুজকোয় আমরা সোনা এনে জলে ফেলি আর সূর্য-মন্দিরে প্রদীপ জ্বালি। এবারও তাই হবে। কুজকো থেকে প্রতি পাহাড়ের মাথায় মশাল জ্বলতে দেখা যাবে। আগষ্ট উনত্রিশ !! —না, পেরু ভোলেনি আতাহুয়াল্লাপাকে; ভোলেনি অতিথির মুখোস পরা হামলাবাজ লুঠেরাদের কথা।

"কতো সামান্য ছিল যে সে ফিরিঙ্গী ফৌজ, প্রমাণ করে দিয়েছিলেন মানকো কাপাক। তাঁর কথা বলছি। লোকে হিসেব লেখে, কতো লুঠ করেছে ফিরিঙ্গী। আমরা হাসি। আণ্ডীজ ভর্তি সোনা আর রূপো। আমরা দেয়াল গেঁথেছি সোনা-রূপোর মশালা দিয়ে, আর আজও তা গাঁথতে পারি। সে দৌলত আট-নয় মিলিয়ন ছেড়ে আট-নয় বিলিয়ন হলেও কিছু নয়। কিন্তু তার চেয়েও বেশী লুঠ হয়ে গেছে। লুঠ হয়ে গেছে ইনকা জাতির মর্যাদা, স্বকীয়তার গরিমাবোধ।

"যে দেশে মানুষ, রাজা, প্রজা, সামন্ত সব ছিল এক, যে দেশে ছিল না ভিক্ষা, দাসত্ব, বেগারী—সেই দেশে আজ ধনী-দরিদ্র, শাদা-কালা, ইনকা-ফিরিঙ্গী টুকরো টুকরো। ধর্মে টুকরো, ভাষায় টুকরো, রাজনীতিতে টুকরো, বিদেশী নীতিতে টুকরো। কী দশা! শাসক আর শাসিত দু'টো দল। একদল পীড়ন সহ্য করছে। অন্যদল বলছে, এদের উপকার করছি, দান করছি, ব্যবস্থা করছি।"

"কিন্তু এতোই দৌলত যদি বলবো, তো এই গরীবী কেন?"—মধু উদগ্রীব জানতে।

—"আমাদের দেশের চেয়ে ঢের বেশী দৌলত নব ভারতের। কিন্তু ভারত কী স্বাধীন? যে দেশে বিপ্লবকে আসতে হয় রক্তাক্ত হয়ে, যে মা-কে বিপ্লবের জন্ম দিতে হয় রক্তের মোক্ষণে, সে দেশই প্রকৃত স্বাধীন! কী বলো? পেরুর কটা ব্যাঙ্ক স্বাধীন? পেরুর ক'টা বন্দর পেরুর?"

আমি বল্লি,—"আমাদের পুরাণে বলে ঘোর দুর্দিনে কারাগারে মা বিপ্লবের জন্ম দিয়েছেন, অত্যাচারকে ছিন্ন-ভিন্ন করার জন্য।"

খপ্ করে আমার হাত ধরে ইসাবেলা বল্লো,—"ছিন্ন-ভিন্ন কি হয়েছে? হয়েছে কি? ভারতের পার্লামেণ্টে যা'রা বসে আছে, তা'রা কার 'ব্রীফ্' হাতে নিয়ে বসে আছে? 'থার্ডওয়ার্লড্' বলে, যে ওয়ার্লড্ আছে তা'র মধ্যে ক'জন ঋণের দায়ে বাঁধা পড়ে নেই? নাঃ! এ পথ নয়। এ পথ নয়।—এ—পথ—নয়!! নয়!!

"...সোনা!! এতো সোনা চেয়েছে, নিয়েছে, লুঠেছে এই বর্বরেরা যে, এদেশের অতি মূল্যবান শিল্প-কীর্তিগুলোকে—হাজার হাজার শিল্পীর রচনাকে ওরা গলিয়ে ফেলেছে। লক্ষ লক্ষ পুঁথী ওরা জ্বালিয়েছে। শুনেছি, রেড ইণ্ডিয়ানদের মেরে তাদের মেয়েদের যোনির চুলের গোছা চামড়া শুদ্ধু তুলে এনে সগৌরবে শাদারা টুপীতে পরতো...

"আমিও শুনেছি, পড়েছি। এ সত্য।"—বললো মধু।

"...শুনেছো। তবুও প্রেস্কট্ এদেরই বলেছে,—'সিভিলাইজড্'। আমাদের বলেছে 'বারবেরিয়ান্'। সেই আর্টিফেক্টের পাহাড়, কতো টায়েরা, কতো নেকলেস্, কতো কাপ—দেখেছ। একটা কাপ লীমার মিউজিয়ামে। এখানেও আছে একটা। —ওরা সব গলিয়ে ফেলেছে। সূর্য-মন্দিরের কাছে একটা বাগান ছিল, তাতে গাছ, পাখি, পশু, পরী সবই ছিল সোনার। দেখাতে নিয়ে যাব সে বাগান। এখন একটা ভস্মের স্তূপ।—তবু যাব। যাওয়া ভাল। টু হ্যাভ দী ফীল্। দি এ্যন্টি ফীল।... ভস্ম ভস্ম নয়। বৃদ্ধা জরতীও যেমন দেবীর প্রকাশ, শ্মশান যেমন মহাকালের পীঠ, ভস্মও তেমনি কাঁপে, কাঁদে, কথা কয়। নিয়ে যাব।

"সোনা আছে, স্বাধীনতা নেই। তার যোগফল দারিদ্র্য। এদেশের ইন্কা অধিবাসীরা এই যোগফল অনবরত করছে। আর মনে করছে ২৯শে আগষ্ট, ১৫৩৩! তাই ওরা ম্লান, বিমর্ষ, মুখ লুকিয়ে বসে থাকে। পেরুতে সূর্য-কন্যা ছিল, কিন্তু বেশ্যা ছিল না। কারণ পয়সা ছিলো না, দারিদ্র্য ছিল না; মেয়েরা শরীরের কোনো অঙ্গ ভাড়ায় খাটাতো না। এখন খাটায়। কাঁদে, রোগে ভোগে, কাৎরায়। কিন্তু খাটায়।...

"লক্ষ্য করেছ কি, এখানে যে পায়, গির্জার গায়ে প্রস্রাব করে? কী যে ওদের বংশগত রাগ! আজ যারা গির্জার দেয়াল, চত্বর ভাসাচ্ছে তারা হয়তো অভ্যাসের দাসত্ব করছে। কিন্তু আমাদের ইনকা রক্তে ওদের কৃষ্টি, ওদের দেবতা, ওদের অনুষ্ঠান, ওদের তিথি, ওদের পাঁজী, ওদের পুরুৎ কিচ্ছু মানিনে আমরা। আমরা আশী পার্সেণ্টই আজও আমরাই; কিন্তু একশো পার্সেণ্ট বন্দী।...

"...কিন্তু এ কী বলছি! তুমি তো শুনবে ইতিহাস। কুজকো বিশ্ববিদ্যালয়ের আমি ইতিহাসের এক ছাত্রী। এই নিয়েই আমাদের এখন পতি-পত্নির বাসর। এই কথাই আমাদের বাড়ির কথা।...এ কথা থাক্।

"বাকীটুকু শোনো।"

"কী যে হয়ে গেল মাত্র দু'মাসের মধ্যে, বেচারী পেরুবাসীরা বুঝতেই পারল না। আবহমানকাল পর্যন্ত কালের মধ্যে তারা কোনো এমন লড়াই-ঝগড়া জানত না, যার ফলে ইনকা সম্রাটকে কেউ গ্যারটিং করে হত্যা করতে পারে। পারা সম্ভব। তারা জানত না সেই সব ষড়যন্ত্র, বিষপ্রয়োগ, হত্যা, যার ইতিহাস প্রাচীন পৃথিবীর পাতাগুলোকে কলঙ্কিত করে রেখেছে। তারা জানত রাজায় রাজায় লড়াই হয়। লড়ায়ে জিত হার-এর নিষ্পত্তি হয়।

"অথচ দেখতে দেখতে দু'-দু'টো ইনকা সম্রাটকে একসঙ্গে হত্যা করা হোল। কুজকোর সূর্য-মন্দিরের পথ নারী ও শিশুর রক্তে লাল হয়ে গেল। একী সর্বনাশ! সহসা এক আতঙ্কিত মৃত্যু আতাহুয়াল্লাপাকে গ্রাস করবে বলেছিল গণৎকার। গণৎকার বলেছিল, হুয়াস্কারের পরমায়ু স্বল্প, ও পরিণতি রক্তাক্ত।

"খবর তখন ছড়াত দেরীতে। ছড়াতে ছড়াতে খবরের চেহারা বদলেও যেত। কিছু বিশ্বাসে, কিছু অবিশ্বাসে মানুষ কিছু বুঝত, কিছু বুঝত না।...

"কিন্তু হুয়াস্কারকে বলি দেওয়া হয়েছে, একথা কেউই বিশ্বাস করেনি। বীরাগ্রগণ্য আতাহুয়াল্লাপাকে গ্যারটিংয়ে ফাঁসী দিয়েছে, দিতে পারে এমনটি কেউ আছে,—একথাও বিশ্বাস করেনি।

"মরবার কথা, বিচারের কথা, সাজার কথা শোনার পর আতাহুয়াল্লাপা নিজেই নিজের কানকে বিশ্বাস করেননি। তাঁর শেষ কথাগুলোয় সরল সহজ আবেদনের মধ্যে যে তীব্র তিরস্কার ধ্বনিত হয়েছিলো, ইতিহাস থেকে সে তিরস্কার একদিন নানা চক্রান্তে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। এখন আমাদের প্রতিরোধে সরকার সেই শেষ কথাগুলো স্কুলের বাচ্চাদের শোনায়। শুনবে? আমার মুখস্থ সেই বাণী:—

'আমিই বা এমন কি করলাম, বন্ধু, কী করেছে
আমার সন্তানেরা, যে এই চরম দুর্ভাগ্যের
জালে আমরা বন্দী? আমার বলতে যারা,
আমার আত্মীয়, বন্ধু, প্রজারা—প্রত্যেকেই
তো তোমাদের দিয়েছে সম্ভ্রম, আতিথেয়তা,—
এমন কি বন্ধুতাও। আমার অন্ন, আমার বাস,
আমার ধনৈশ্বর্য সবই তো তোমাদের তৃপ্তির জন্য
অবাধে বিলিয়েছি বন্ধু। প্রতি ফিরিঙ্গীর জীবন, নিজেদের
নিরাপত্তা অগ্রাহ্য করে রক্ষা করেছি। আমার কন্যা
করেছে তোমার পরিচর্যা, সৎকার। তুমি যা'
চেয়েছো, তার দ্বিগুণ দিয়েছি।...আর কি দিতে
পারি? কী চাও? তবে এ নিগ্রহ কেন?'—

জবাব দিতে পারেনি পিজারো, চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। জল এসেছিল কি? ইতিহাস বলে এসেছিল। কেন? বিবেক বড়ো জালায়।

"কিন্তু প্রার্থনা বিফল জেনে, আতাহুয়াল্লাপা প্রার্থনা আর করেনি। তারপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কঠোর আত্ম সংযমের সঙ্গে নিজের গাম্ভীর্য, পদমর্যাদা, মনুষ্যত্বকে অবিচলিত সাহসে ধরে রেখেছিল।

"—কিন্তু ইতিহাস কি থামে? হুয়ানা কাপাকের অন্য এক বোনের (স্ত্রীর?) ছেলে ছিল মাঙ্কো ইন্‌কা। সেই ছেলে পিজারোর সঙ্গে দেখা করে নিজেকে 'ইনকা' বলে ঘোষণা করে এবং সাম্রাজ্যের অধিকার দাবি করে বসে।

"নিজের সুবিধার জন্য এবং ক্যাষ্টিলের দরবারে আতাহুয়াল্লাপাকে বিনা বিচারে হত্যা করার দোষ স্খালনের আশায়, তাড়াতাড়ি মাঙ্কোর ইন্‌কাত্ব পিজারো মেনে নিয়েছিল। দেখতাই একটা রাজা বা একটা সম্রাট থাকলে (মীরজাফরের ঘাড়ে ক্লাইভের মত) রাজ্য-শাসনটি ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়।

"কিন্তু মাঙ্কো ছিলেন খাঁটি ইন্‌কা। পিতৃপুরুষের সিংহাসন, ধর্ম, দেব-দেবী দায়-দায়িত্ব তাঁর মাথায় দপ্‌দপ্‌ করত। তিনি দেখেছেন যে, যে-সূর্যকন্যাদের ছায়া কখনও কেউ স্পর্শ করেনি, সেই-কন্যাদের লুঠ করে ফিরিঙ্গীরা ঘরে ঘরে নিয়ে গিয়েছে। হুয়াস্কারের কন্যাকে, আতাহুয়াল্লাপার কন্যাকে ফিরিঙ্গীরা অঙ্কশায়িনী করেছে(*)।...

"কাজে কাজেই মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েই তিনি পিজারোর কাছে পৈত্রিক সিংহাসন দাবি করে, বাইরে বাইরে তার বশম্বদ হয়ে রইলেন।...

"সুযোগ তিনি খুঁজছিলেন। একদিন সুযোগ এসেও গেল কুজকো শহরে বিপ্লবের আগুন জলে উঠল। প্রজারাই ক্ষেপে দাঁড়াল বিদেশীদের বিজাতীয় অনাচার অত্যাচার অধর্মের বিরুদ্ধে। সমগ্র জনতা এক জোট হয়ে দাঁড়াল। ভীষণ যুদ্ধ হল। বার বার তিনবার ফিরিঙ্গীরা মারের চোটে পালাল। কিন্তু তারপর কুজকোয় আগুন দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। সারা কুজকো তখন অবরুদ্ধ। ভিতরে আগুন। দুখানা বাড়ি ছাড়া সব পুড়েছে। মাঙ্কো তখন নিজে সাকসাহুয়ানের দুর্গে।

"সে দুর্গও ফিরিঙ্গীরা অধিকার করবে বলে, বার বার এসেছে। পারেনি। কোন রকমে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়েছে। ইতিমধ্যে খবর এসেছে পেরুর সমুদ্রতীরবাসী জনসাধারণ দুর্বৃত্তদের অত্যাচার, অমানুষিকতা এবং বর্বরতার খবর পেয়ে বিরাট সৈন্য সমাবেশ করেছে। সেই ফৌজ কুজকো রক্ষার জন্য এগিয়ে আসছে।

(*) এই কন্যার গর্ভে স্পেনে গিয়ে জন্মেছিল গার্সিলাসো-দ্য-লাস্‌-ভেগাস্‌। তার নামে কুজকোর পথ আছে। তাঁর লেখা পিজারোর কীর্তি-কলাপের ইতিহাস আজও প্রামাণ্য গ্রন্থ। আশ্চর্য সংযোগ ইতিহাসের! যেভাবে ফিরিঙ্গী মেক্সিকোকে বলাৎকার করেছিল, তারও ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন মেক্সিকান এক দোআঁশ্‌লা রাজকুমারই। নাম তাঁর ইক্‌স্‌তিল।

"এবার যুদ্ধ হল ওল্লান্তে-তাম্বোতে। সেই যুদ্ধের বিবরণ এবং শৌর্যগাথা এখন গান হয়ে গেছে। পাহাড়ে নদীর বাঁধ ভেঙে দিয়ে শত্রুকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভীষণ যুদ্ধ হল য়ুকের তীরেও। ফিরিঙ্গীরা যাকে বলে এক বস্ত্রে কোনগতিকে পালান। মাঙ্কোকে কিছুতেই ফিরিঙ্গী দাবাতে পারল না। কিন্তু শত্রু প্রবল। দেশীয়েরা মদদ দিচ্ছে। প্রস্তুতি দৃঢ় হওয়া চাই। দূর দূর থেকে ফৌজ আসছে—অপেক্ষা করা চাই।

"মাঙ্কো প্রজাদের বলল,—'এখন জেনেছি এরা কে। এখন জবাব দেবো আমরা কে। পেরুর জনতার প্রধান আমি। পেরুর সেবা আমার ধর্ম—আমার ইজ্জৎ। কোথায় পেরু। এসো। আমায় শক্তি জোগাও।

"মাঙ্কোর স্ত্রী বলল—সময় নাও। প্রস্তুতির জন্য সময় চাই। এখনকার মত পালাও। পাহাড়ে আশ্রয় নাও। পাহাড়ে তোমার দুর্গ। তোমার প্রজা, তোমার লোকবল। সেখান থেকে চালাও যুদ্ধ। এদিকে আমি আছি। আমি সামলাব। শত্রুকে পাহাড়ে নিয়ে যাও।

"স্ত্রীকে স্ত্রী, বোনকে বোন। ইন্‌কা রক্ত, হুয়ানা কাপাকের রক্ত দুজনারই। রক্তের মধ্যে আগুন জ্বলছে। এবারই হবে যাকে বলে যুদ্ধ।

"মাঙ্কো হারিয়ে গেলেন সসৈন্যে গিরিময় পৃথিবীর দুর্ভেদ্য জটা জালে। কিন্তু অতর্কিতে এসে হামলে পড়ে ইনকা সৈন্যরা। ফিরিঙ্গীদের চোট মারে, ভীষণ ক্ষতি করে। যতবার এই উৎপাত বন্ধ করার জন্য বড়ো বড়ো সেনাপতিদের পাঠিয়েছে পিজারো, প্রত্যেকে হার মেনেছে। পালিয়ে বেঁচেছে।

"বোঝা যায়, পাহাড়ে কোথাও দুর্ধর্ষ রাজত্ব ফেঁদেছেন মাঙ্কো। কিন্তু কোথায় সে দুর্গ, কোথায় সে রাজধানী, সে বিশাল জনপদই বা কোথায়? কোনো কিছুরই খোঁজ পাওয়া যায় না কোনোমতেই।

"কিন্তু এরা ফিরিঙ্গী। এরাই আবিষ্কার করেছিলো 'ইনকুইজিশান'। লিমার অন্যতম গির্জা সান্দোমিঙ্গোর এক অন্ধকার ঘরে আজও ট্যুরিষ্টকে এদের সেই ইনকুইজিশান কোর্ট দেখান হয়। সেথায় ইনকুইজিশনের বিচিত্র যন্ত্রণার জন্য সংগৃহিত বিচিত্র যন্ত্রপাতি।

"এদের ফিকির-ফন্দীর কী অভাব? শেষ অবধি এরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই রাণীর ওপর। তিনি জানতেন মাঙ্কো ইন্‌কার হদিস। তাঁকে বলতে বাধ্য করা হবে, মাঙ্কো কোথায়?

"সেই রাণী নীরব হলেন; কার সাধ্য মুখ খোলায়। সব রকম দৈহিক নিপীড়নের পরে রাণীকে সর্বজন সমক্ষে উলঙ্গ করা হল। শুধু তাই নয়, অসূর্যম্পশ্যা সেই রাজকন্যা সম্রাজ্ঞী পরিপূর্ণ যৌবনবতী রূপসীকে যে পথ দিয়ে আমরা সাকসাহুয়ামান থেকে নেমে এসেছিলাম সেই জনবহুল পথ বেয়ে পায়ে হেঁটে আসতে বাধ্য করেছিল। পথের ওপর সব দরজা জানালা বন্ধ করে মানুষ কেঁদেছিল। দু-ধারে দাঁড়িয়েছিল সারবন্দী ক্যাস্টিল সভ্যতার পোশাক আঁটা সশস্ত্র সান্ত্রীদল ফৌজী মহড়ার শৌকত জাহির করে। তারা সভ্য, বীর, পুরুষ, ধর্ম ও নারীর রক্ষক। লজ্জায় পরিতাপ তারাও চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

তাদের চোখ ভিজেছিল।…এ সব তথ্য ডায়েরী-তে কড়চায় পাই। মাত্র কাব্য নয়। চিত্র নয়।*

"তারপর সেই দুর্ভাগিনী তেজস্বিনী উলঙ্গিনীকে প্লাজা আর্মাসে কোরিকাঞ্চার মন্দিরের সামনে যূপে বেঁধে ভেজা কাঠের স্তূপের ওপর লটকানো হয়। সভ্য ইউরোপের ইতিহাসে এক অক্ষয় পঙ্‌ক্তি লেখা হল সেই নিস্তব্ধ মৃত প্রত্যুষে। একটু একটু করে সেই তনু পেলব দেহ জ্বলে ছাই হোল ভেজা আগুনের স্তিমিত শিখায়।

"সেই সূর্যরসে সিক্ত কন্যা সেদিন উলঙ্গতার স্বাক্ষরে প্রমাণ করল, লজ্জা বা গৌরব সামান্য বস্ত্রখণ্ডে ঢেকে রাখার আগুন নয়। (দ্রৌপদীকে মনে পড়ছিলো)। নারীর সত্যধর্ম প্রতিষ্ঠিত তার শপথে, তার মর্যাদাবোধে। সূর্য-সাক্ষী রেখে সে বীর্যবতী অগ্নিকন্যা হয়ে গেলেন; প্রমাণ করে গেলেন জীবনবেদের শ্রেষ্ঠ গান রচিত হয় অবিনশ্বর শৌর্যের পরিচয়ে।

"যুদ্ধ চলতে থাকল।

"স্বর্গের লোভ দেখিয়ে এই 'পে-গান-বর্বর'-টাকে দয়ার্দ্র ফিরিঙ্গী পুরোহিত খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নেবার 'সুযোগ' করে দিয়েছিলেন। হাতে দিয়েছিলেন একখানা বাইবেল। সেখানা ঘৃণাভরে সেই সম্রাজ্ঞী ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন।…আজও কুজকোর জনতা একখানা পাথরের বিশাল খণ্ডে হাত রেখে সেদিনের স্মৃতির তাপ স্পর্শ করতে চায়। পেরু ভোলেনি সভ্য ইউরোপের সেই নিরীহ ধর্ষণের কথা, সেই নারী ধর্ষণের কথা।

"যুদ্ধ চলতে থাকল।

"মাঙ্কো আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। যুদ্ধের পর যুদ্ধ করেও পিজারোকে বাগে পেল না। কিন্তু তার ভাই জুয়ান পিজারো সেই যুদ্ধে মোলো। আলমাগ্রোও ভীষণভাবে আহত হল। অবশেষে মিথ্যা রটিয়ে দেওয়া হল মাঙ্কো ধরা পড়েছে, এবং আলমাগ্রোই তার 'বিচার' করে তাকে খতম করে দিয়েছে।

"ইতিহাস কোনো প্রমাণ পায়নি মাঙ্কোর মৃত্যুর। ইতিহাস, মানে পাহাড়ী ইনকারা, গান গায়। দাবি করে পাহাড়ের ওপরে দুরধিগম্য স্থানে সম্রাটের রাজত্ব রয়েছে অটুট। যতদিন মাচ্চু-পিচ্চুর দুর্গের খবর মানুষ পায়নি, প্রেস্‌কট্ সাহেব পাননি—ভেবেছে মাঙ্কোর মৃত্যু সত্য। এখন মানুষ জেনেছে মাচ্চু-পিচ্চুতে রাজধানী বহুকাল ছিল। পরে রাজধানী আরও গভীরে অরণ্যে চলে গিয়েছিল। ইনকা সাম্রাজ্য বেঁচে ছিল; আজও অবিজিত ইনকারা, তাদের সমাজ, ধর্ম, কৃষ্টি নিয়ে পেরুর বিশাল অরণ্য-পর্বত অঞ্চলে ছড়িয়ে বাস করছে।

---

* এইখানে মনে পড়ছে নেদারল্যাণ্ড্‌স্ অধিকার করার পর ফিরিঙ্গী গভর্ণর ওলন্দাজ্ ডাকের পুত্রের বিবাহ ভোজে যোগদান করেছিলেন। ভোজের মধ্যপথে নববধূর স্বামীসহ সব কজন নিমন্ত্রিত ডাচকে, উভয় পরিবারের প্রত্যেককে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মেরে ফেলে নববধূকে উলঙ্গ করে পথে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তৎক্ষণাৎ সে অভাগিনী পাগল হয়ে গিয়েছিল। বহুকাল ঐ অবস্থায় আমষ্টার্ডামের পথে ঘুরে-ঘুরেই সে মারা যায়। ফিরিঙ্গীদের কি মানসিক ব্যাধি ছিলো নারী-দেহকে বিবসন করার?

"কিন্তু তারও পরে শোনা গেল সেই অরণ্যের গভীরে আছে এক ইনকা। তুপাক আমারু তার নাম। তাকে কেউ দেখেনি। তবু তুপাক আমারুর নাম করে ফিরিঙ্গীদের ওপর হামলা কি শেষ হয়েছে?—শেষ হয়নি।

"এই কুজকো শহরের কাছেই আছে তিন্তা। সময়টা ১৭৪২ খৃষ্টাব্দ; পিজারোর হামলার দু'শো বছরের পরের কথা। এই তিন্তায় জন্মেছিল এক অদ্ভুত-কর্মবীর, কোন্দোর বাঙ্কুই। ফিরিঙ্গীরা তার বুদ্ধি, দীপ্তি, বল, চেহারা দেখে তাকে প্রচুর শিক্ষা দিল। তার নাম পালটে দিয়ে দলিল রাখতে চাইল যে সে ফিরিঙ্গীর খয়ের-খাঁ। কিন্তু সেই ইনকা বীরের নাম ইতিহাস রাখল জোষে গাব্রিয়াল।"

"পড়া-শুনো করাই হলো তার কাল। সে একদিন পড়লো পেরুতে ফিরিঙ্গী হামলার কথা। ফিরিঙ্গীর লোভ, ডাকাতি, বিশ্বাসঘাতকতা, অত্যাচার আর নৃশংসতা। আর দেখল কিভাবে পেরুর মাটিতেই পেরুবাসীরা লুণ্ঠিত। তারা অবহেলিত, অবমানিত। বিনা শিক্ষায়, বলাৎকৃত ধর্মত্যাগে, সম্পূর্ণ দাসত্বতায়, বশ্যতায়, তারা দারিদ্র্যের চরমসীমায় অনাহারে, বিনা শিক্ষায়, বিনা চিকিৎসায় পথে বনে পাহাড়ে মরুভূমিতে পশু-পাখি-কীটের অধম হয়ে, অপাংক্তেয় হয়ে, নগণ্য হয়ে মরছে।

"সে গেল স্পেনে বিচার চাইতে। অনেক কালির আঁচড় কাটল অনেক কাগজে। আবেদন-নিবেদনের মোহ তার কেটে গেল। সে ফিরে এল পেরুর জঙ্গলে। নাম নিল তুপাক আমারু-দ্বিতীয়। সেই হোল এই বিপ্লবী ইন্‌কার নাম। সে জেনে ছিল, তার ধমনীতে রাজ-রক্ত। সে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল পাহাড়ে, বনে, জঙ্গলে, গুহায়। সেই তুপাক আমারু মাঙ্কো-ইন্‌কার নামে একে একে গ্রামের পর গ্রাম, এলাকার পর এলাকা আয়ত্তে এনে পেরুর দক্ষিণ অংশে বোলিভিয়া, তিতিকাকা, চিলি পর্যন্ত বিস্তার করে ফেল্‌লো তার ইনকা রাজত্ব। সে রাজত্ব বেলালগ্ন পেরু বা ফিরিঙ্গী উপদ্রুত পেরুর দ্বিগুণ আয়তন। পেরু বিজিত হোলো না।

"তুপাক আমারু যে ইনকার বংশধর স্পেনের দরবার তা' স্বীকার করল। তাকে 'মারকুইস অব্ ওরোপেসা' খেলাৎও দিলেন স্পেনের ফিলিপ দ্বিতীয়। খেলাৎ, স্পেনের আভিজাত্য, মান-মর্যাদা, এমন কি বিষয় সম্পত্তি সব কিছুই তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। ফিরে এলেন নিজের নামে, নিজের ধর্মে। স্পেনকে অস্বীকার করলেন।

"তাঁ'কে কুজকোয় ধরে আনতে স্পেন থেকে আলাদা করে ফৌজ আনতে হয়েছিল। ছয়মাসের অক্লান্ত চেষ্টায় স-পরিবার তাঁ'কে কুজকোয় আনা হোল, এই স্কয়ারে। এই ক্যাথীড্রালের সামনে তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পরিবারকে হত্যা করা হয়েছিল। এটা ১৭৮১-র ঘটনা। দুশো বছর আগের সভ্য য়োরোপ। রুশো, ভল্‌তেয়ার, রিচে্‌লুর য়োরোপ! তার হাত-পা একটি একটি করে কেটে এই স্কয়ারের চার ধারে 'ছুঁড়ে' ফেলা হয়েছিল। তখনোও হাত-পা-কাটা সেই জীবন্ত দেহটা পড়ে ছিল। কুকুরে চেটে খেয়েছে তাঁ'র রক্ত। মৃত্যুর আগে তিনি নিজের চোখেই তা চেয়ে চেয়ে দেখেছেন। কিন্তু তাঁ'র সেই রক্ত ১৭৮১ থেকে ১৮৫৫ পর্যন্ত বয়ে এসেছিল। আর

সেই রক্তে জন্ম নিয়েছিলেন সান্ মার্টিন, সাইমন্ বোলিভার, জেনারেল সুক্রে, জেঃ ভুর্দানেতা।

"এখনও চলছে সেই লড়াই। অন্য লড়াই। ক্যাষ্টিলের রাজবংশ হয়েছিল ফ্রাঙ্কোর গোলাম। সেই গোলামই এখন স্পেনের গদ্দীতে। কিন্তু পেরুতে এখনও দু'দল।

"শাদা ধনিকদের পুঁজিপাতির দল। তা'দের মনিটর উত্তর আমেরিকার ধনপতি তন্ত্র।

"আর আছি আমরা পেরুর ইন্‌কাদল পাহাড়ে বনে, অখ্যাত নির্জনে। চাষ করছি, বাগান করছি, মিলে—কারখানায়—বস্তীতে—লোজীতে—ব্যারাকে জন্মাচ্ছি, মরছি, খনিতে নামছি, সমুদ্রে ডুবছি। পাতালের তেল টেনে তুলছি—কার জন্য, প্রফেসর? সে কে? তারা আমাদের কে? এ অন্য লড়াই—চলছে—চলবে।"—দম নিতে থামলেন ইসাবেল্।

"কোথায় তারা? উপায় কি?"—অর্থহীন প্রশ্ন করি বিবিক্ত মনে।

"কেন? তারা সেই পাহাড়েই। স্ব-দেশে; স্ব-সমাজে। উপায়? উপায় হোশী মীন শিখিয়েছে, ক্যাস্ট্রো শিখিয়েছে। এরা হারেনি কখনও। এল্-সালভেদোর, নিকারাগুয়া, চিলি।—দেখবে! দেশে ফেরার আগে না হোক, ১৯৮৬-র আগে দেখবে। পৃথিবীতে যুদ্ধ লাগবে বলছে। লাগবে না? ল্যাজে আগুন লাগিয়ে কেউ সামনের দোরের ডাকাত সামলাতে যায়ও না, পারেও না।

"সে যাক। মাচ্‌চু-পিচ্‌চু যাচ্ছো। মাচ্‌চু—পিচ্‌চুর কথাটা শেষ করি।........

"......মাচ্‌চু-পিচ্‌চুর ওপরে হয়েছিল,—অতি পবিত্র সূর্য-কন্যাদের বাসস্থান। কুজকো থেকে, অন্যান্য নগরী থেকে সংগ্রহ করে আনা দেশের ইজ্জৎ, সেখান থেকে মাঙ্কো সরে গিয়েছিল তার অজ্ঞাত অরণ্য নগরে।—তোমরা তো নিশ্চয়ই যাবে মাচ্‌চু-পিচ্‌চুতে —তাই না? যেয়ো। চোখ খুলে যাবে।"

"তুমিও চলো না"—হঠাৎ বলে ফেলি।

—"আমি তিনটি শিশুর মা। বড় ভুলে যাও।......যাবে মাচ্‌চু-পিচ্‌চুতে। সেখানে যতো মমী, হাড়, সমাধিতে কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে শত শত—সবই মেয়েদের! বড়ো মেয়ে থেকে বুড়ী—আর, প্রত্যেকটাই কুমারীর কঙ্কাল।"

"কঙ্কাল দেখে তা বোঝা যায়?"—জিগ্যেস করে মধু।

—"হ্যাঁ যায়। তুমি বুঝি অবিবাহিত?"

মধু হাসে।

—"না, তবে এখনও বাপ হয়নি।"

একটু হাসালেন ইসাবেলা। তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বললেন,—"সেই পাহাড়ে লাগানো আগুন আজও জ্বলছে। মেৎসি, তুতুপাকা কতো আগ্নেগিরি সারি সারি। তারই একটার নাম 'ইসাবেলা' হয় না কেন?"

"পাছে এই অগ্নিক্ষরা ইতিহাস জানাজানি হয়ে যায়,—যেহেতু আলমাগ্রো প্রমাণ করতে পারলো না মাঙ্কোর মৃত্যু, অথচ সেই বাবদে বাহবা নিতে চাইল,—পিজারো আর

আলমাগ্রো হয়ে পড়লো দুর্ধর্ষ শত্রু। আলমাগ্রোকে পিজারো খুন করল, আর আল-মাগ্রোর অনুচরেরা খুন করলো পিজারোকে। ইন্‌কা সম্রাটের রক্ত শান্ত হোল।

"কিন্তু এরও পরে ইতিহাস পাতা ওল্টায়।

"সে কথা বলি।—

"তখনও মাঙ্কো-ইনকা রাজত্ব করছে মাচ্‌চু-পিচ্‌চু পেরিয়ে। মাঝে মাঝে পর্যটকরা ছিটকে এসে পড়ত আর গল্প বলত। আছে এক স্বর্ণ-সাম্রাজ্য এল্‌ডোরাডো; তাকে পেয়ে পাওনি, জয় করেও জয় করোনি; মেরেও মারতে পারোনি।... .."

হঠাৎ থেমে গেল কথা। চারধারে চেয়ে ইসাবেলা বলল,—"কথার তো শেষ নেই।...কিন্তু ঠাণ্ডা পড়তে সুরু করছে। দিনে হয়তো ত্রিশ ডিগ্রী থাকে, রাতে বিশ-বাইশও হয়ে যায়।

—"কাল সকালে আসব। ন'টায় সব দ্রষ্টব্য স্থানগুলো খুলবে।"

হোটেলে ফিরেই তার পেলাম। টিকিট এসে গেছে।.. কিন্তু সে জন্য আম্রালের সীমা দপ্তরে খবর নিতে হবে।

কিন্তু সেটাতো কুজকো থেকে সম্ভব নয়। উপায় কি?

ইসাবেলা বললেন—"ভাববেন না। সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।"

কিন্তু কী প্রচণ্ড শীত! খুব খানিক চেঁচামেচি করতে ঘরে আরও একটা হীটার দিল। কিন্তু সকালে বাথরুমে গরম জল নেই। টেলিফোনে যার সঙ্গে যোগাযোগ করব সে স্বদেশ ভক্তটি আবার অংরেজী জানেন না। অতঃপর শ্রীমান্ মধু তার এ্যাংলো-স্প্যানিশ ডিক্সনারী হাতড়ে বলতে যা আরম্ভ করলো তার মধ্যে থার্মস্, থার্মাল, আগুয়া, থার্মী-ট্যাপ-ফাউণ্টেন-ফুসে—এই সব শব্দগুলো পার্মুটেশান কম্বিনেশান করে লাগাতে লাগল।

রাগ হয়ে গেল আমার। সুব্‌হ্-সুব্‌হ্ বাথরুম, স্নান এসব পতঞ্জলীর যোগের ব্যাপার। এর সর্বনাশ করে কি ধর্ম খোয়াবো? বল্‌লাম—"দাও তো টেলিফোন আমায়, কেমন না বোঝে দেখি।"

টেলিফোন—না—তুলে এক্কেবারে বরিশালী ভাষায় বাপ-মা-ভাই-বোনের সঙ্গে গাধা-খচ্চর-ঘোড়া-ষাঁড়-(কুকুর—না, কুকুর আমি ভালবাসি)—যা মনে আসছে, মায় মাকড়সা পর্যন্ত সবার সঙ্গে বৈধ ও অবৈধ সংসর্গ ঘটিয়ে শান্তি পাঠ করছি, ইতিমধ্যে দরজায় করাঘাত।

মধুতো হাঁ!—"কী হল মশায়?"

—"জল গরম হয়েছে। বাথরুমে ঢোক!"

"ওদের প্লান্ট যে চালু ছিল না স্যার।

"এখন হতে হবে। বলে, বাংলা ভাষা নাকি ইণ্টারনেশন্যাল নয়। বলতে জানতে হয়।"

মধু জিগ্যেস করল,—"আজ সকালে বেরুলেন না ?"

আমি হেসে বলি,—"লজ্জার কথা মধু, আজ বড়ই পরিশ্রান্ত বোধ হচ্চে। দাঁতটাও বেজায় কষ্ট দিচ্ছে।"

—"অত গালাগাল। শুনেই তো আমার দাঁতও জবাব দেবে বলছে। চলুন ব্রেকফাস্টে আজ আপনাকে আর শিশু নয়, যাকে বলে, ভ্রূণের মাংস খাওয়াবো।"

—"নতুন কিছু নয়। চীনে গর্ভিণী পশুর গর্ভ কেটে মাংস খায় শুনেছি।"

সত্যিই মধুর বুদ্ধি আছে। প্যান্‌কেক উইথ মেপ্‌ল্‌ সিরাপ, পোচ এবং একবাটি ফল। ফাস্ট ব্রেক করলাম পেঁপের সরবত দিয়ে। তবুও কমলার রসটা চেয়ে নিলাম। তা' গুরুভোজনই হল। কিন্তু দরকারও ছিল। কারণ রাতের খাওয়া সুবিধের হয়নি।

আজ কোকা পাতা চিবিয়ে ঠোঁটের তলায় গুঁজলুম। বেয়ারা দেখে, বলে জিভের তলায় দিতে। একটি গুলি দিলো। জিভের তলায় দিলাম।

কোথায় আজ যাবো ? ম্যুনিসিপ্যাল—সিটি হলের পাশ দিয়েই বেরুলাম। পথে মানুষ সড়ক মেরামত করছে। আমাদের চেয়ে দেখছে। মধু বলে—"দেখছে আপনার টুপী। সিটি হলে গিয়ে পঞ্চাশ সোলেজ করে দেড়শো সোলেজ দিয়ে তিনখানা পাস কিনলাম। সেই টিকিট দেখালে সব ম্যুজিয়াম এবং চার্চেই ঢুকতে দেবে। দরজায় দরজায় আর কিনতে হবে না।

কিন্তু এই গোটা চত্বরের জন্য বালি এসেছিল সমুদ্রের ধার থেকে। প্রজারা মরুভূমি থেকেও তাদের দান পাঠিয়েছিল কুজকো সাজাতে। বাৎসরিক উৎসব ছিল কারিকাঞ্চার উৎসব। তখন ইনকার সিংহাসনের পাশে এনে বসিয়ে দিত সোনার আধারে রাখা যাবতীয় ইন্‌কা সম্রাটদের মমীর সারি। ইন্‌কা হুয়ানা কাপাকের পুরো মাপের মূর্তি ছিল ঠাস নিরেট বাইশ ক্যারেটের সোনার। মাঙ্কো ইনকার সময়ে পিজারোর প্রতিভূ আলমাগ্রো মূর্তির লোভে পড়েই মাঙ্কো ইন্‌কাকে ফসকে বেরিয়ে যেতে দিয়েছিল।—সেও ফেরেনি, মূর্তিও না। বলে, এ্যন্দীজের কোটি কোটি গিরি গুহার মধ্যে কোন নিভৃত গুহায়, লোকচক্ষুর অগোচরে সে মূর্তি আজও পেরু রক্ষা করছে। কেউ যে সেটা খুঁজে পায়নি, এটা পেরুর গর্ব। কম্প্যুটরের যুগে সে গর্ব থাকে কি না সন্দেহ।

সামনে আজও উঁচু উঁচু ইনকা-দেয়াল দিয়ে ঘেরা বেদী। বলা যায় ভিত, যদি ৯।১০ ফুটের পাথরে বাঁধানো ভিত হয়। কোনোটা ভীরাকোচার বাড়ি, কোনোটা পাচাকুতেকের বাড়ি, কোনটা তুপাক ইয়োপানকোয়ের, রোচার, হুয়ানা কাপাকের। প্রত্যেকটি প্রাসাদ আজও নিজের সিংহাসন পীঠে অনড় হয়ে আছে। শুধু ওপরটাই বদলে গেছে। দেয়ালগুলোর গড়ন, গাঁথুনি দেখলে মনে হয় আকাশে কোথাও কোনো একটি বিন্দুকে লক্ষ্য করে দেয়ালগুলো কাৎ হয়ে উঠেছে যেন সেই কেন্দ্রবিন্দুতে মিলবে বলে। যে সব দেয়ালের গড়নে গোলাই করতে হয়েছে সেই সব দেয়ালই চেয়ে চেয়ে দেখতে হয়।

তারও মধ্যে সেরা কাজ, বলে জগতের সেরা কাজ কয়েকটি পাথর। বলবে না কেন? পাথরগুলোও তো জগতের শ্রেষ্ঠ মোক্ষম গ্রানাইট! তাকে কেটে গোল করা কেবল কাঠের, আর পাথরের হাতুড়ি, আর পাথরেরই ছেনি দিয়ে, সহজ কি? লোহা তো ছিল না। তামা আর সীসা-রূপোর মিশেলে কতই বা শক্ত হত? (অবশ্য এখনকার যন্ত্রপাতির সাহায্যের বলে এ কিছুই নয়।) পোক্ত সেই ঐ সূর্য-মন্দিরের ভিত্তি।—কারিকাঞ্চার মন্দিরও এখন কনভেণ্ট হয়েছে।—কনভেণ্ট অফ্ সান্-দোমিঙ্গো।

"ঘণ্টা বাজছে। চল ঐ চার্চটায় যাই। খুলল। ভক্তদের ডাকছে, একটু বসি গিয়ে। এখুনি ন'টা বাজবে। আমি চার্চে বসে থাকব। তুমি ইসাবেলকে নিয়ে আসবে।"—বল্লাম মধুকে।

"কী সুন্দর আওয়াজ ঘণ্টাটির!"—বলল মধু।

"হাঁ, ঘণ্টাটির ইতিহাস আছে। পুরুৎরা কাহিনী গড়ার ওস্তাদ। সব কাহিনীর সার এই যে, যা আছে দাও, দাও, দাও।... ..

'মারিয়া-আঙ্গেলা'—ঐ ঘণ্টাটির নাম। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দ সেটা। এই ঘণ্টার ঢালাই হ'তেই ফেটে গেল। আবার ঢালাই, আবার ফাটা। কারিগররা রায় দিল—সোনা-রূপোর মেল বাড়াতে হ'বে। ব্রোঞ্জ এত তাত সহ্য করবে না। পড়তে লাগলো সোনা আর রূপো। যথেষ্ট হল না। তখন এক 'নিগ্রো' মেয়ে, অপাংক্তেয়া বরবাদী মেয়ে, এগিয়ে এসে তার যথাসর্বস্ব দিয়ে দিল এক সঙ্গে। তার মধ্যে শুধু সোনাই ছিল পঁচিশ পাউণ্ড। সেই মেয়ের নামে এই ঘণ্টার নাম 'মারিয়া আঙ্গেলা'। এই সাত ফুট লম্বা, সাড়ে ছ'ফুট বেড়ের ঘণ্টাটি দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম।

"ঘণ্টা বাজে আর বলে, 'নিগ্রো নিগ্রোই রইল। পাতে উঠল না।—ঢং-ঢং-ঢং। দিশী মেয়ে দিশীই রইল। পাতে উঠল না—ঢং-ঢং-ঢং। সোনা-রূপো যতো ঢালো, সে বেশ,—ঢালো, ঢালো, ঢালো—ঢং-ঢং-ঢং। তবু-ভবী ভোলবার নয়—ঢং-ঢং-ঢং। সোনার বেলায় আঁটি-শুঁটি, আর মেলা-মেশার বেলায় দাঁত-কপাটী—ঢং-ঢং-ঢং।"

ইসাবেলাকে নিয়ে মধুর আসতে দেরী হল। ইসাবেলা এয়ার এজেন্সী ঘুরে এসেছেন। ওরা টিকিট রেডি করে হোটেলে পৌঁছে দেবে। মধু খুশী।

সোজা ক্যাথীড্রালের ভিতরের একটা অংশে নিয়ে এল। আগা গোড়া সোনার কাজ। এমনটা তো মেক্সিকোয় দেখেছি, এখানে লীমায়ও দেখেছি। দেবতা এবং সোনা এক-সঙ্গে দেখে দেখে এ্যান্দীদ্-মানুষেরা অভ্যস্থ। কিন্তু চার্চ অফ্ বেথ্লেহেল্মের মধ্যে যেন অন্য সুর। প্রায় ছাদ অবধি উঁচু দেয়ালে থাকে থাকে দেবতা; সবার ওপরে যীশু। ক্রুশ-বিদ্ধ; আঁকা। তা'র তলায় মাতা মেরীর মূর্তি। ঠিক স্পেন রাজ্ঞীর পরিচ্ছদের পরিপাটী। ভগ্নী মেরী ও মেরী মাগদালার মূর্তি ঐ সারেই দু'দিকের দুই তাকে। কিন্তু ভাবছি, ছুতোরের গিন্নী এমন ঘটাময় পরিচ্ছদের বন্ধনে পড়ে কেমনটি বোধ করছেন! এখানেও সব সোনায়, জড়োয়ায়, তৈলচিত্রে জল্জ্বল্ করছে। সে সব এমন কিছু বলার মতো নয়। সোনা অনেক শোনা। এখন মামুলী হয়ে গেছে, তবু বলার মতো।

মাঝের কালিটি শুধু পিটে গড়া এক অপূর্ব রূপোর কাজ, সেই ছাদ অবধি! নিখুঁত কারিগরী।

তবু যে ভক্তি হয় না! এইতো মনের ব্যাদড়া-পনা! ইসাবেল নিয়ে এলো জেসুইট চার্চে। সাবধানে সিঁড়ি ক'টি উঠতে হলো। বহু লোক বসে আছে। একটু একটু করে সিঁড়ির ওপর বাজার বসছে। আর তার ওপরেই দেয়ালের গায়ে মানুষ বৈতরণী বইয়ে দিচ্ছে। গ্রাহ্যও নেই। এই চার্চটির সজ্জা আরও জমকালো। এখানে যত কারিগরী, সূক্ষ্ম কাঠের কাজ। ফার্নিচার, মায় বড়ো বড়ো ধার্মিক চিত্র—সব এখানকার শিল্পীদের রচনা। নাম জানতে চাইলাম। জেরোনিমো কুইস্পো, মার্কস্ জাপাতা, বার্ণার্দো দেমক্রিতো বিত্তি। এঁদের নাম শিল্পী মহলে কেউ গায় না।

আর কোনো চার্চে যেতে চাইলাম না। তবু হাঁটতে হাঁটতে নিয়ে গেল হাতহুরিমিস্তিক ষ্ট্রীটের চার্চ অব সান্ বাস্-এ। এটায় এসে সোনার জৌলুষে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। সেখানেই দেখলাম একটি সুন্দর কাঠের কাজ। একখানি কাঠ কেটে, কুঁদে একটি সম্পূর্ণ পুল্‌পিট (ধর্ম ব্যাখ্যার বেদী), এবং তার ছাতটি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম কাজে মণ্ডিত। এ পর্যন্ত যতো পুল্‌পিট্ দেখেছি, কায়রোর মহম্মদ আলি মসজিদের আর তেলেদার ক্যাথীড্রালের পুল্‌পিটই আর্টের (ঐ ধরনের আর্টের) সেরা নিদর্শন বলে মেনে নিয়েছিলাম। এটি যা দেখলাম সর্বশ্রেষ্ঠ। দু'শো বছরের পুরোনো কাজ। বল্‌লে—'রেড্ উড্ ব্যবহার করেছে।' মেহগনি বোধ হলো। তফাৎ যে খুব বুঝি তা' নয়। তবে রেড্ উড্‌টা একটু সরল এবং বেশী লাল।

ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম গার্সিলাসো-দ্য-লাস্-ভেগার বাড়িখানায়। বাড়িটার নামেই যেন সুর। এই চিম্পুওকলো, গার্সিলাসো আগেই বলেছি, ছিলেন ইন্‌কা রাজবংশের এক কন্যার গর্ভজাত। পিতা অবশ্য এক ফিরিঙ্গী সামন্ত। জন্মেছিলেন তিনি ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং দেশ-লুণ্ঠন, পিতৃ-পিতামহদের হত্যা, রাজ-রমণী ধর্ষণ, প্রজানির্যাতন—এই সব ঘটনার চিন্তা তখনও তাঁর মগজে সদ্য ধরা মাছের মতো ধড়ফড় করত। তিনি লিখে গেছেন ইতিহাস। মায়ের মুখে কাহিনী শুনেছেন; শুনেছেন প্রতিবেশীদের কাছে, পথের জনের কাছে, পাহাড়ী শ্রমিকদের কাছে। সব জীবন্ত দলিল-ই তাঁ'র দলিল। তাদের ওপরই নির্ভর করে লিখেছেন। পেরুর ইতিহাস গার্সিলাসোর কাছে ঋণী। শুধু কি তাই? যখন যেখানে যা পেয়েছেন, পেরেছেন—সে-দিনের স্মৃতি-পূত বহুজিনিষ সংগ্রহ করে বিচিত্র এক সংগ্রহ শালা রেখে গেছেন। আজ রিপাব্লিক অব পেরুতে সেটির নাম 'রীজন্যাল হিষ্টারিক্যাল ম্যুজিয়াম।' এই ম্যুজিয়াম, আর আর্কেওলজিক্যাল ম্যুজিয়াম দেখলেই কুজ্‌কো দেখা শেষ।

ম্যুজিয়াম দেখতে সময় লাগে। কিন্তু ইসাবেলাকে পেয়ে ম্যুজিয়াম যেন জীবন্ত হয়ে গেল। মনে পড়ে বিশেষ করে কয়েকটা জিনিষ। সোনার মূর্তির সংগ্রহ। দেখলে প্রকৃত প্রত্যয় হয় যে, ইন্‌কা সংস্কৃতিতে সোনার-রূপার কদর কেবল ঘর সাজানোর উপকরণ হিসেবেই ছিল। সোনার পশু-পাখি দিয়ে সাজানো বাগানের কথা আগেই

বলেছি। ছেলেদের খেলনার উপকরণও সেই নরম হলদে ধাতু। সোনা সুন্দর ধাতু। কিন্তু সেটা যে মহার্ঘ, তার জন্য যে মানুষ তার ধর্ম, সত্বা, মা-বাপ-স্ত্রী-পুত্রও বেচে দেয়,— এ কথা ইনকাদের কাছে হাস্যকর বোধ হোত।

সান্তোদোমিঙ্গো চার্চটাই তখন কোরিকাঞ্চা সূর্য-মন্দিরের তল্লাটের শ্রেষ্ঠ মন্দির ছিল। পাম্পা-দেল্-ক্যাষ্টিলো ষ্ট্রীট, বিখ্যাত লরেটো ষ্ট্রীট, ডানদিকে ঘুরে ত্রিয়ামকো ষ্ট্রীট। তার মাথায়ই রিলিজিয়স্ মৃ্যজিয়াম। ডানদিকে ম্যুজিয়াম রেখে বাঁয়ে মোড় নিলেই পূর্বের পথের সমান্তরাল পথ পাওয়া যায়। সেন্ট কাতালিনা ষ্ট্রীট পার করে সান অগষ্টিন ষ্ট্রীট। আবার এসে পড়েছে সূর্য-মন্দির। এটা সবই ছিল মন্দির বিভাগ। সূর্য-মন্দির, ইস্তি মন্দির, চন্দ্র মন্দির, নক্ষত্র মন্দির, অতি গৌরবের উষা মন্দির, বরুণ মন্দির, ভূমিকম্প মন্দির, ইন্দ্রধনু মন্দির। এ ছাড়া মন্দির সংলগ্ন মিলন কেন্দ্র, রঙ্গভূমি, বাজার, পার্ক, প্রমোদশালা, লাইব্রেরী, বিদ্যালয়, ছাত্রাবাস। কুজকো শহরের সম্পূর্ণ পূর্ব দিকটা এই নিয়েই গড়া। পথগুলো সোজা বলতে, খাড়া সোজা। এবং এই পুরো তল্লাটের পাথুরে ভিতের গাঁথুনি আজও বিশ্বের বিস্ময়।

সত্যি বলতে কি, দেখতে দেখতে চোখে জল আসে; মন কাঁপে। কেন? কেন? কেন? কোন্ সে দেবতা, যার নখর-বিস্তার এতো তীব্র, এতো মর্মহীন? এই মূঢ় অপচয়, অবিরাম এই রক্তক্ষয় —এ কী দৈবী সমাধান! মানুষের মৃত্যুর নিঃশ্বাসে দেবতার ধূপশিখা পায় কি কোনো বিশিষ্ট গূঢ় মধু-স্বাদ? স্বীকার করে না মন। মন বিমুখ হয়ে থাকে।

নাদিরশাহ দিল্লীকে ধ্বংস করেছে—সে এক কথা; কিন্তু পর পর বারাণসীকে ধ্বংস করেছে জৈনেরা, বৌদ্ধেরা, সিকন্দরলোদী, তুঘলক গিয়াসুদ্দীন, ফিরোজশা – কে নয়? আওরংজেব শুধু সেই ধ্বংস স্তূপ সরিয়ে দু'টি মসজিদ গড়ে দিলেন। আদৌ ধ্বংস তো তিনি করেননি। সে তো সাকি রাজিয়া বেগমও দিলেন বিশ্বেশ্বর মন্দিরের ওপর মসজিদ গড়ে। সে মসজিদ এখন দাল-কী-মণ্ডীর নর্তকী পাড়ায় শুখাচ্ছে। কিন্তু পেরুর এ ধ্বংসের মধ্যে কেবল দাবানল, হত্যা, লুণ্ঠন। অথচ, কোথায় বা গেল তারাই?

কেন যে মনে হচ্ছিলো ইন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, সোম, উষা, ইন্দ্রধ্বজ এ সবের পূজার সঙ্গে আমাদের মিল আছে। আমার ধর্ম মানব সংস্কৃতি।—সে ধর্মের কবিতা ঋগ্‌বেদ। ঋগ্‌বেদের দেবতারা এখানে কেন? তাঁদের 'মূর্তি'-ই বা কেন? বেদে তো মূর্তি, মন্দির কোনটাই নেই।

সব মিলিয়ে আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে দশটি কামরায় কুজকো, সাক্‌সাহুয়ামান্, ওলান্তেতাম্বো থেকে পাওয়া মূর্তি, বাসন, মমীগুলো সাজানো। একটা ঘরে শুধু ইন্‌কাদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্র। ফিরিঙ্গীদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আছে। সূর্য-মন্দিরের দেওয়াল থেকে ছেঁড়া রূপোর পাতও খানিকটা আছে! তামা-সোনা আর টিনের মেশান ধাতুকে বলতো 'লাক্‌সা।' সেই মেশাল ধাতুর গহনা হতো মজবুত আর উজ্জ্বল। তেমন গহনাও আছে বেশ কয়েকখানা।

এরা পালে-পর্বণে (আমাদের সিদ্ধির মতো) একটা পানীয় খেত—'আখা' তার নাম। এই আখা তৈরী করা সূর্য-কন্যাদের একটা বিশিষ্ট দায়িত্ব ছিল। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে মেলায় 'আখা'-পান ছিল একটা অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের আঙ্গিক হিসাবে বিশেষ বিশেষ পাত্র ছিল; যথা: বড়ো বড়ো (১) কাঠের চমস, (২) সোমরসের জন্য আজ্যস্থলী, (৩) সোমরসপান পাত্রের মতো স্থালী বা লম্বাকৃতি পাত্র, (৪) সবই কাঠের।

আজ্যস্থলী, বলে 'কোয়েরো', কাঠের পাত্র হিসাবে নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম। সূর্য-কন্যাদের দল সম্রাটের এবং তারপরে নিজেদের অবভৃথ-স্নান* (১) সেরে, এই পাত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে যজ্ঞের পানীয়টি নৃত্যগীতের মাধ্যমে নানা বাদ্য সহ বহন করে আনতেন। সম্রাট, পারিষদ বর্গ এবং সমবেত জনগণ প্রত্যেকে এই উল্লাস-দীপ্ত পানীয়কে সসম্মানে গ্রহণ করত। এর নাম ছিল 'আশা'-পান।

জীবন, সূচীকর্ম, বুননের বেশ কিছু নমুনা আছে। সোনা-রূপা মরকত পান্নার মূর্তিগুলি দেখতে পেলাম মাত্র ইসাবেলার সৌজন্যে। এগুলো 'সেফে' বন্ধ থাকে। অনুরোধে দেখানো হয় প্রচুর ব্যবস্থার পরে। অপূর্ব এবং বিস্ময়কর চল্লিশটি পুষ্পরাগমণি-কাটা নারী মূর্তির সার দেখলাম।

মনে এক ভাবনা জাগলো – মণি!—তাকে কাটতো কী দিয়ে? ব্যাখ্যাতা বলেন – হীরের ফলা, হীরের কলম। তা'ও যে ভাবনার কথা।

পারাকাস্ কৃষ্টির কথা আগে বলেছি। দুহাজার বছর রও বেশী পুরোনো। প্রায় আলেকজাণ্ডার, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়। সেই কৃষ্টিরই সংগ্রহটি ভাল সংগ্রহ। পেরুর রাখালদাস বাঁড়ুজ্যে ডক্টর জুলিও টেলো এগুলির আবিষ্কর্তা।

এছাড়া দাঁতের কাজ, পাখা, জামা-কাপড়, টুপীর টুকরো—এসবগুলো মোটামুটি দেখে প্লাতেরস্ স্ট্রীট ছেড়ে আর্ট মিউজিয়ামে এলাম। বলে,—'লা-মার্সেদ' (দয়াময়ী মা) মিউজিয়াম। এখানেই দেখলাম সেই 'লা-কাস্তেদিয়া' নামক 'রেমন্স্ স্ট্রান্স' কাপ্। আট-চল্লিশ পাউণ্ড ওজনের নিছক নিখালিষ সোনার পাত্র,—সন্ন্যাসী যীশুর রক্ত ও মাংস পান করার আধার। লা-মার্সেদ গির্জার কন্ভেণ্টের বাগান, ক্লয়ষ্টার খুব জাঁক করে দেখাবার জিনিষ। সিঁড়ির শোভা, ফোয়ারার শোভা—গির্জায় যাঁরা স্তুতিগান করেন, সেই সন্ন্যাসিনীদের চিত্তবিনোদনের জন্য! তাঁদের কোমল অঙ্গকে সাবধানে রাখার দায়ে লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করে যে আটান্নটি কারুময় দারুপীঠ 'দ্রষ্টব্য' বলে গির্জার এক দেয়াল টেনে গেঁথে বসানো আছে, আজ চোরাই বাজারে তার দাম কয়েক মিলিয়ন ডলার!! জয় জয়কার সন্ন্যাসী যীশুজী! জয়তু কোমলাঙ্গী সন্ন্যাসিনী!!

হঠাৎ সব থেমে গেল। খাবার সময় হল। তিন সন্তানের মা বললেন—"শুনুন,

[(১) চামচ। (২) বড়ো গামলা। (৩) বড়ো bowl বা কানবিহীন কাপ। (৪) গেলাস। এ নামগুলো ব্যবহার না করার কারণ, বোঝাতে চাই—আমাদের 'যজ্ঞের' সঙ্গে এদের ক্রিয়া কর্মের কতো আপাত দ্রষ্টব্য সমতা ছিল।]

* (১) অবভৃথ-স্নান=যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়ে গেলে সর্বাঙ্গীন স্নান ও অভিষেক।

—গিয়ে খেয়ে একটু বিশ্রাম নিন। ঠিক তিনটেয় আমি ডেকে তুলব। নিয়ে যাব লাল-মশাল পাড়ায়।

'লালবাতি' ইয়াংকী মুলুকে আর য়োরোপে। লাল-মশাল এশিয়া, আফ্রিকা আর দক্ষিণের আমেরিকায়। এই যে 'সাউথ্' বলে এখন একটা হুজুগে শব্দের হৈ-হৈ উঠেছে, এটা এক ধরনের লালে জল মিশিয়ে গোলাপী করার ফিকির।…" বললে মধু।

—"লালে জল মেশাও মধু,—ফিকে হবে, গোলাপী নয়।"

" -গোলাপী হয় কিসে স্যার?" —বলে মধু।

—"তার মধ্যে 'বডি' দিলে। সব ঘটেই আছে, এমন পাকা মিশেল। শাদা দিয়ে দেখ। জবর গোলাপী হবে। কিন্তু দেবী-জী, 'সাউথ-নর্থ' তো বুঝি না। লাল-বাতি পাড়ায় যাবার মতো রেস্তো, স্বাস্থ্য আর কলেজা যখন নেই তখন বুড়োকে নিয়ে চল লাল-মশাল পাড়ায়, ঘুরে আসি।"

"সেখান থেকে ফিরে কফি খেয়ে তোমরা ফিরবে হোটেলে। বিশ্রাম নেবে। ততক্ষণে, আমি সন্ধ্যার টিকিট করে রেখে এসেছি 'ইন্‌স্টিট্যুটো নাশিওনাল দ্য কুলটুরায়'। তুমি একটি ভাগ্যবান্‌-কুত্তা। জবর শো আজ। যেও।"

"শো হবে কেমন?"

—"কিছু না। সময় কাটবে ভাল। শো'র পরে ঘুম। সকাল সাড়ে ছ'টায় আমি গাড়ি নিয়ে আসব। শুধু তোমাদের স্টেশনে নিয়ে মাচ্‌চু-পিচ্‌চুর গাড়িতে চড়িয়ে আসব। ওখানেই খবর নেবে আলমাগ্রোর,- ডাকনাম জন্‌জন্‌। ওর গাড়ি আছে। মাচ্‌চু পিচ্‌চু হোটেলে রাত কাটিয়ে জন্‌জনের সঙ্গে চলে যাবে উরুবাম্বার একটা উৎসে। ঐ পথে ও তোমায় আমাজোন অঞ্চলেও নিয়ে যাবে। আবার রাত্রিবাসের পর কুজকোয় ফিরবে, যদি না উরুবাম্বা ভ্যালীতে যাও। যদি যাও জন্‌জনের কাছে 'কনটাক্‌ট' চেয়ে নেবে। তারপর কুজকোয় ফিরে এসে তখন যাবে আরেকুইপা, নৈলে প্লেনে কিন্তু সেখান থেকে কনট্যাক্ট নেই। কাল তখন দেখা হবে। সো লঙ্‌!"

'ইন্‌স্টিট্যুটো নাশিওনাল দ্য কুলটুরা বুদ্ধি করে শো'টার ব্যবস্থা প্লাজা দ্য আর্মাসেই করেছিল। প্রচুর বাতির খেল এবং বাদ্যের ঘটার সহযোগে যে শো-টা দেখাল বহুযুগ পূর্বে জাতীয় উৎসবের দিনে ইন্‌কা সম্রাটের বিজয় উৎসব পালিত হত এই ভাবেই।

দিল্লীতে আছে 'ফাইন আর্ট সোসাইটির' 'রামলীলা'র ঘটা। একালীন রিপাব্লিক-—ডে'র মিছিল নয় সেটা। সেটা চিরন্তনের নাট্যরূপ। তবু রামায়ণের সংবেদন যতই হোক, সমগ্র জাতির মানসিক পরিমণ্ডলকে উদ্দীপ্ত করতে পারে না। দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে ভারতবর্ষ এত ছিঁড়ে-খুঁড়ে গেছে যে, বাপ্‌পা, পৃথ্বীরাজ, শিবাজী, রাণা প্রতাপের পাশে নাম ভাসে ঘোরী, ঔরংজেব, আকবর, শের-শা। স্থির করা দুরূহ হয় এরা 'আমাদের' কে? হায়দর আলি, টিপু, মীর কাসিম, বাজীরাও, নানা ফড়নবীস, সর্ব ভারতের

হৃদস্পন্দন বা মানসপুরুষ নয়। হতে পারেনি ভারতে এমন 'হিতং মনোহারী চ' প্রতিবেদন। আছে লাল-কিলা, শালিমার, নেহেরু ম্যুজিয়ামে রাতের 'আলো-শব্দে' শো। কিন্তু এ ইনকা-শো জাতীয় শো।

এ পেরুর মানস-ছবি। বলিষ্ঠ, প্রত্যয়শীল, ঐতিহাসিক ভিত্তিতে পেরুর রাজকীয় সেনা বিভাগের দ্বারা আয়োজিত বাৎসরিক 'কারিকাঞ্চা' উৎসবের নিবেদন। পোষাকগুলিই দেখবার। খুব রংচংয়ে এবং সম্পূর্ণ স্বদেশী পোষাক। সিভিল সার্ভিস এবং করপোরেশন সার্ভিসের পোষাক আলাদা। পল্টনদের মধ্যে কারুর পায়েই জুতো বলতে কিছুই নেই। বেশীর ভাগ পোষাকই মোটা লাল বনাতের পোঞ্চো। মেয়েদের পোষাক গোড়ালি অবধি—ঐ একই কাপড়ের, কিন্তু কাজ করা। মেয়েদের পোষাকে কাটা রঙীন কাপড়ের চাকতি বসিয়ে কাজ আছে। পোষাক যাই হোক, খুব গুরুগম্ভীর, খুব ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত, মর্যাদাশীল। শৃঙ্খলা অপরূপ। মাঝে মাঝে তূর্যধ্বনি হচ্ছে। তারই সংকেতে সব কলের পুতুলের মত সমগ্র 'শো'-টা দেখাল।

কয়েক শতাব্দীর আগে নিভে যাওয়া একটি দীপের সলতে এক ঘণ্টার জন্য কে যেন উসকে দিল!

মাচ্‌চু-পিচ্‌চুর পথ

ঠিক সময়ে গাড়ি এল। আমরা এক অতি নোংরা স্টেশনে এক লিলিপুট গাড়িতে চড়লাম। মনে হল কালকা-সিমলা লাইন।

এখানকার ট্রেনই বলো, স্টেশনই বলো, ব্যবস্থাই বলো,—সব যেন সেই সেকালের হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে'র বৃত্তান্ত। আজকের ক'জন পাঠক সেই বিচিত্র আনন্দে অবগাহন করেছেন,—জানি না, কিন্তু আমি দেখেছি—গার্ড গাড়ি নিয়ে তাঁর গাঁয়ে পৌছে বাড়ি গিয়ে স্নান সেরে খেয়ে পান চিবুতে চিবুতে (হাতে ধরা পানের বৌটায় চুনটি ঠিক আছে।) বেরুচ্ছেন। এসে গাড়ির দেরী হচ্ছে বোলে হাঁক-পাক শুরু করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর মেয়ে এসে পোঁটলায় বাঁধা বিকেলের খাবারও পৌছে দিয়ে গেল।—দেরীর জন্য কসুর গার্ডের নয়, কিন্তু স্টেশন মাস্টার মাল-ওয়াগানে মাল নামানো-ওঠানোতে দেরী করছেন। কিন্তু তিনিই বা করেন কি! মালশুদ্ধ্‌ গরুর গাড়ি লাইনের ওপর উলটে পড়ে আছে। বলদ দুটো হাসছে। ওদের জিগ্যেস করলে, ওরা বলে দিতে পারত যে, গাড়িতে গুড়ের কলসী বা বস্তা বোঝাই জিনিস থাকলেই ওরা গাড়িকে লাইনের ওপর নিয়ে এসে কাৎ করে দেয়। কাঁধ থেকে জোয়াল ফেলে না দিলে ভাঙ্গা হাঁড়ীর গুড় চাটবে কে? আর গাড়োয়ানই বা এই পড়ে পাওয়া লাভে হস্তারক কেন হ'তে যাবে?

বলদয়া তো লেখক নয়, যেসব মন্ত্রগুপ্তি ধরিয়ে দেবে! ওরা ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।···
মাল উঠল, গাড়ি চলল।

তবু এ গাড়ির ভেতরটা সুস্থ। সীটগুলি গদী-আঁটা ছাড়াও সামনে টেবিল, ওটা আমাদের ডি-লুক্স এক্সপ্রেসের মতো। শুধু তফাৎ এই যে, তাজ এক্সপ্রেসের গদীতে হেলান দিলে, পিছনের প্রতিবেশী গা ন পাড়ে। সে যেন পিঠে পিঠে টাগ অফ ওয়ার। আর এখানে টেবিলগুলো, আমার দেশের চারপেয়ে তো, কেবল ট্যারেন্টুলা-ড্যান্স দেখাচ্ছে। সামলে কফির গ্লাস না রাখতে পারলে আপনার কফি প্রতিবেশীর গাউনে পড়া অনিবার্য। তার কফি আপনার প্যান্টে পড়লে যদিও আপনি দন্ত বিকশিত করবেন, কিন্তু আপনার কফি তার দামী আলপাকার ট্রোলে পড়লে সে আপনার দাঁতগুলো আস্ত থাকতে দেবে কি না সন্দেহ।

তবে হ্যাঁ, এ গাড়ি যাই হোক, খাঁ-চৌধুরীদের গাড়ির চেয়ে ভালই বলতে হবে। না বলা অন্যায়। টয়লেট ঘরে কেউ মাল বোঝাই করে রাখেনি। টয়লেট পেপার বহাল তবিয়তে ব্যবহারের জন্য মোটা গতরে বিদ্যমান। আর্শিটা প্রসন্ন মুখে চেয়ে, আমার মেজাজ একেবারে 'কেয়াবাৎ' করে ছেড়ে দেয়। হকার? হ্যাঁ, এ গাড়িতেও হকার এনে দিচ্ছে গরম গরম প্লেটে খাবার, আর টোস্ট, সেদ্ধ ডিম, কফি, চা—কোকা-র নির্যাস ছাড়া কাজু-বাদাম, চকোলেট, লজেন্স—'কেয়াবাৎ' ছবির প্যাক।

ভিখিরী?—চিনলে, আছে। না চিনলে, নেই। দেশে টুরিস্ট আসবে পকেটভর্তি টাকা নিয়ে, হৃদয়ভর্তি বেড়াবার অবকাশ ও উদারতা নিয়ে, আর ঝোপ বুঝে কোপ মারবার মতো শিকারীর অভাব হবে,—এ আবার কোন্ কথা? কিন্তু তারা না জানে ঘ্যান্-ঘ্যান্ করতে, না নাকের ডগায় মেলে ধরে কুষ্ঠের গলা হাত দুখানা, নাকে গোঁজা ন্যাকড়া, না পেশ করে ভগবৎ উচ্ছ্বাসের গীতি-ভাষ্য, বা আসন্ন মৃত্যু এবং জীবনের অলীকতার বিষণ্ণ আবেদন; না শোনা যায় বাউলদের কণ্ঠে 'দিন যে গেলো সন্ধ্যা হলো'র মতো প্রেরণাময় গানের যান্ত্রিক নির্ঘোষ।

কিন্তু এ কী! গাড়ি চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেল, যাক, মোদের দেশেও যায়। কিন্তু এ যে উলটো পথে চলতে লাগল, চলেছে তো চলেছেই!! এমনি এক ঘণ্টার মধ্যে বেশ বার চার-পাঁচেক হল। পরে বুঝলাম।

কি যে বুঝলাম, তা বোঝাতে গেলে অন্য এক ইতিহাসে গা ভাসাতে হবে।

হাইরাম বিংঘাম নামক ব্যক্তিটিকে মার্কিন বলা হলেও সে ডঃ খুরানা* বা ডঃ সালামের* মতো মার্কিন। মানুষটির জন্ম হলো হনোলুলুতে। সে ঐ দ্বীপেরই লোক। হার্ভার্ডে শিক্ষা পাবার ফলে, তার মনে সখ চাপল সাইমন-বোলিভারের সমর-প্রণালীর ও

---

* দু-জনাই নোবেল লরিএট পেয়েছেন, কিন্তু মার্কিন নাগরিকতা গ্রহণ করার পর।

রণক্ষেত্রের—বিশেষতঃ অভিযানগুলোর অনুসন্ধানে মন দেবে। এক একজন যুবককে এমনই এক একটা পাগলামীতে পেয়ে বসে। পরে তা থেকেই খ্যাতি হয়ে যায়।

বিংঘামের ধারণা যে, দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে সে নাকি খুবই ওয়াকিবহাল। তারই মতো হনোলুলু রক্তের রক্তবীজ এলিহু রুঠ ছিলেন তখন সেক্রেটারী অফ স্টেট্স্। দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুরাহা কী কৌশলে বেশ মুচমুচে, তেলালো হয়, তারই সন্ধান পাবার ফিকিরে প্রথম পাতায় এক প্যানামেরিকান সায়েন্টিফিক কংগ্রেস চিলিতে ডাকা হলো। তখন এই বিংঘামকে সব সুলুক সন্ধান হাসিল করার জন্য চিলিতে পাঠানো হয়।

বিংঘামের হাতে পড়ে যায় এক 'ভ্রমণ-কাহিনী'। তাতে খবর পান যে ইন্‌কাদের সময়ে আপুরিমাক নদীর ওপরে নাকি পাথরের সেতু ছিল। তার মানে, পেরুর ইনকারা তো সত্যিই অ-সভ্য ছিল না। এই ইনকাদের সম্পর্কে জানার জন্য হল তার উদগ্র বাসনা এবং যতই সে ইন্‌কা কৃষ্টি সম্বন্ধে জানতে লাগল, ততই সে গভীর থেকে আরও গভীরে ডুবে যেতে লাগল। ইন্‌কাদের অ-সভ্য বলার তাগদই সে পেল না। বরং তার ভেতরে এক বিশিষ্ট শ্রদ্ধা দানা বাঁধতে লাগল।

সে শুনলো, কুজকোর কোন এক ইন্‌কা সম্রাটের পরাজয় হলেও ইন্‌কা সাম্রাজ্য বহুকাল বহাল তবিয়তে শাসন করে গেছে পার্বত্য পেরুর গভীরে। সেই ভিল্‌কা-পাম্পা সাম্রাজ্য, মাঙ্কো ইন্‌কার সাম্রাজ্য, তুপাক আমারুর সাম্রাজ্য, কোন্দোর কাঙকুইর সাম্রাজ্য—সে সব কোথায়? মাত্র একটা অলীক ভিত্তিহীন কথিকার ওপর ভরসা রেখে কে নিজের চোখে দেখতে পারে নিজেরই স্ত্রী-পুত্র পরিবারের হত্যা? কে করতে চায় তিলে তিলে আত্মবলিদান? এদের মৃত্যু, বিশেষ করে ফিরিঙ্গী শাসক-দের বিপক্ষে জিদ করে রাজত্ব ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা তো অ-সভ্যতার পরিচয়লিপি বহন করেনা। এতখানি শৌর্য্য, এবং সেই গাথা—এসব তো অলীক নয়!

কোথায় সে সাম্রাজ্য? বিংঘামের ঘুম ছুটে গেল। জঙ্গলে জঙ্গলে যত ঘোরে, ধীরে ধীরে বুঝতে পারে—ছিল। ছিল এবং আছে সে নগরী, সে রাজধানী। কুজকোও যার কাছে সামান্য। কিন্তু কোথায়? কোথায় সেই অজ্ঞাত সাম্রাজ্যের অজ্ঞাত পুরী?

সেটা ১৯১১ খৃষ্টাব্দ। হঠাৎ এসে পড়লেন উরু-বাম্বার প্রখ্যাত উপত্যকায়। সেখানে এক বন্ধু পেলেন—মেলচর আর্তিয়াগা। একেবারেই 'বাঙ্গাল' ইন্‌কা বলতে যা' বোঝায়। আর্তিয়াগাই তাকে কী জানি কী পথ দিয়ে এনে ফেল্‌লো ঘুমন্ত নগরী মাচ্চু-পিচ্চুতে। যাবচ্চন্দ্র দিবাকর প্রথম 'অনিন্‌কা' (ন+ইন্‌কা) পদধূলি পড়ল মাচ্চু-পিচ্চুতে। বিংঘাম মানুষটা, বলেছি,—হনোলুলুর।

বিংঘাম ভিলকানোতা নদীর ওপরে এক সাঁকো গড়ে তুললে (সে সাঁকো আমিও ব্যবহার করেছি)। পাঁচ-ছ'শো স্থানীয় আদিবাসীদের সাহায্যে বন-বাদাড় কেটে সাফ করাল। একটু একটু করে রাস্তা গড়ে, না—গড়ে নয়, ছেঁচে-ছুলে বার করে, সেই আট

হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায় দাঁড়াতেই নজরে পড়ল খাড়া পাহাড়; তার গা-য়ে কেয়ারীর পর কেয়ারী। ইনকাদের বিস্মৃত নগরী তখন বিংঘামের সামনে। এই বা'র হল 'দ্য-লষ্ট-সিটি-অব্-দ্য-ইনকাজ্ (বিস্মৃত ইন্কা নগরী)।' ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শেষ মাচ্চু-পিচ্চু যান; ১৯৫৬তে মারা যান।

মানুষটা চিরকাল আন্দীয়ান (আণ্ডীজপাহাড়ের অধিবাসী) আদি-বাসীদের জন্য খেটে গেলেন। কারণ বিংঘাম ছিলেন হনোলুলুর। হনলুলুর 'মার্কিন' নিশ্চয় নিউ ইয়র্কের মার্কিনের চোখে 'বাঙাল', 'অকুলীন।' তাই 'নীচুতলার' মানুষের জন্য তাঁর তখনও দরদ ছিল।

বুঝতেন হাজার দেমক্রাসী সত্ত্বেও চামড়া-কৌলিন্যকে অতিক্রম করার মত মুক্ত-আত্মা মানব সমাজে দুর্লভ। তিনি নিজে অগ্রণী হয়ে আন্দীজ্-সমাজের প্রেতলোকের আবিষ্কার করলেন। মানুষ জানলো লীমার চাকচিক্য সত্ত্বেও পেরুর আত্মা এখনও বন্দী-জীবন, মুমূর্ষু-জীবন যাপন করলেও, বেঁচে আছে। বেঁচে যখন আছে উঠবেও ঠিক।

অথচ এ বিষয়ে যখন তিনি সোর-গোল সুরু করলেন, তখন তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট পদাধিকারী ক'রে দেওয়া হল? কুখ্যাত ভিয়েৎনাম পর্বে তিনি মহারথীদের অন্যতম হলেন। মানুষের আত্মাকে সম্পূর্ণভাবে খরিদ করে দান করার ফিকিরের নামই মেফিস্টো-ফেলিয়ান বৃত্তি। শয়তানের চরই তাঁরা। অশুভ। বিংঘাম·· টিকটিকি কুলে গিরগিটি হয়ে গেলেন। পরে বলছি।

বিংহামের পথ আজও একমাত্র পথ। পেরুতে পথই একমাত্র বন্ধন। বত্রিশ হাজার মাইল পথের সমারোহ সত্ত্বেও আন্দীজ ও বনভূমির বাধাকে অতিক্রম করে রেললাইন আজও বাড়তে পারেনি। কালাও বন্দর থেকে পাস্কোর রূপোর খনি পর্যন্ত মাত্র দু'শো পনের মাইল পথ অতিক্রম করতে গিয়ে রেল-লাইনকে ১৫,৮০৬ ফুট চড়াই ভাঙ্গতে হয়েছে, ৫৯টি সেতু অতিক্রম করতে হয়েছে, ৬৬টি টানেল কাটতে হয়েছে। তবু এ রেল-লাইন গড়ার প্রয়োজনীয়তা সে-কালেই হয়েছিল কেবল পাস্কোর রুপার খনি থেকে দৌলত-পাচার করার ষড়যন্ত্রে। পৃথিবীতে আজও কোন রেল-লাইনকে এতখানি পাহাড় চড়তে হয়নি।

লীমা থেকে মাচ্চু-পিচ্চু পর্যন্ত রেলপথ এই রেল-পথেরই অংশ। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরুর এই রেল-পথ প্রাচীনতম।

আমি ভারতবাসী। আমার দেশে আমরা গান গাইতাম, 'কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী'; গেয়েছি 'যস্যমন্নং ব্রিহী-যবৌ যস্যা ইমা সুফলাংপঞ্চ কৃষ্টয়ঃ; ভূম্যৈ পর্জন্য পত্ন্যৈ-নমোঽস্তু', গাইতাম 'চির কল্যাণময়ী তুমি মা ধন্য, দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,' 'সুজলাং সুফলাং মাতরম্'; গাইতাম 'ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা···সকল দেশের সেরা!' কিন্তু চোখ মেলে চেয়ে দেখতাম, সেই যে আমার দেশ—তার কঙ্কাল—আর চেহারা। ভারতের মতো এত গরীব দেশ দেখা যায় না। পরিসংখ্যানিক সংখ্যার ভাষায় সাংখ্যকারেরা এই বলেন।

কতো গরীব এই গরীবী। তবু সেই আমারও চোখ বিস্ফারিত হল পাহাড়ী এই জনবহুল গ্রামগুলির দারিদ্র্য দেখে। এরা কুজকোর ধারে ধারে মৌচাকে মাছির মত 'পকেট' গড়ে গড়ে ঝুলে রয়েছে। কোন কোন কুঁড়ে দেখে মনে হয়, পাহাড় থেকে পড়ে যায় বুঝি! তবু পড়ে না। ছাদে যা' খুশী, যা'-তা' করে আচ্ছাদন। লাল পোড়ান টালীই বেশী। কিন্তু কী দারিদ্র্য, আর কী অপরিসীম নিস্তব্ধতা। এরা শান্ত কিনা জানি না; কিন্তু এদের দুর্গতিই এদের মুখের ওপর বন্ধ করে দিয়েছে কালের কপাট।

গাড়ি এগিয়ে যায়। ভাবতে থাকি, হুয়াস্কারের যুদ্ধ, মাঙ্কো ইন্‌কার যুদ্ধ,—সেই অদ্ভুত কর্মা মহাপ্রাণ আদর্শ বীর তুপাক আমারুর যুদ্ধ—সেই সব স্মৃতির রঙে রাঙ্গা উপত্যকায় এসে পড়ছি। দু'ধারে তীব্র উচ্চ গভীর গিরি গহন। তার মাঝখানটায় বয়ে চলেছে তরতর্ করে নদী; বয়ে চলেছে উল্লাসিনী হয়ে, পূব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে, মিশেছে গিয়ে আমাজোনের শাখায়। চোখ জুড়োনো, সবুজে এলানো, ফুল ফোটানো, ফল ধরানো সে নদীর বুক জুড়ে তপনদেবের আলিঙ্গন। দেখেও চোখ জুড়োয়।

আমরা এখন যেখানে চড়েছি সে জায়গাটা বারো হাজার ফুটের ওপর! তবু দেখা যায় কুজকো। শহরটা তার প্রাচীন গরিমা নিয়ে প্রতিভাময়ীর মতো রোদে গা মেলে দিয়েছে। এবার গাড়ি নামবে। কুজকো-লীমা পথটা দেখা যাচ্ছে। এটা মিশবে গিয়ে প্যান-আমেরিকান হাই-ওয়েতে। ১১৬৪ কিলোমিটার পথ মোটরে প্রায় দু'-আড়াই দিন লাগে। জায়গাটার নাম পিচ্‌চু। ফিরিঙ্গীরা বলতো 'এল-আর্কো।' এখানে ছিল মস্ত বাঁধ। এখান থেকে জল-প্রণালী গড়ে খাবার জল যেত ইনকা রাজধানী কুজকোতে! এখান থেকে গাড়ি উৎরাইয়ের পথ ধরল। 'পুয়েন্তে রুইনাস' পর্যন্ত এই উৎরাই; থামবে কুজকোয়, ১৮০০ মিটার তলায়।

মস্ত মস্ত সবুজ মাঠ। মাঝে মাঝে বাড়ির বাণ্ডিল। স্পষ্টতঃই কৃষিপ্রধান গাঁ। গরু, ভেড়া, ছাগল চরছে। পুকুরে বিস্তর হাঁস। জায়গাটার নাম 'আন্তা',—কিনা 'তামার-মা।' কোয়েচুআ ভাষায় আন্‌তি মানে তামা। উপত্যকায় প্রবেশের আগে একটা টানেল পার হলাম। চমৎকার নদীটি। লাইনের ধারে নাম লেখা—'কাব্রেতেরা'। উরুবাম্বারই দিকে চলেছে জল বয়ে নিয়ে। এই ঐশ্বর্যে নদীটি গড়ে তুলেছে 'ইস্কুচাকা' নামে একটা জনপদ। সামনে আরো চৌদ্দ কিলোমিটার পরে আসছে 'হুয়ারো কঙ্গো'। সমৃদ্ধ শহরের মতো; কিন্তু এতোবড়ো বিরাট উপত্যকা এবং পর্বত-শিখরের প্রচ্ছদে মনে হয়, ফ্রেমে বাঁধানো ছবি। হুয়ারো কঙ্গো নামে নদীটিও চলেছে বাঁ-দিকে। তার ধারে ধারে চলেছে পয়ার ছন্দের মতো মোটর-পথ। বাসও যাচ্ছে দেখছি। মানুষজন মাঠে ব্যস্ত। দু'একটা ট্র্যাক্‌টর দেখা যাচ্ছে। তবু পথ আর নদী মিল রেখে চলেছে।

গাড়িতে একটি মার্কিন পরিবার আমাদের কপালেরই লাগা-লাগি বসেছেন। পুরো

দু'জোড়া ; এবং একটি দামড়া ফলশ্রুতি। ভদ্রলোকের নাম রেভারেণ্ড স্লাজুস্কি। কিন্তু মহিলাটি ওর তুলনায় বেশ অল্প বয়সের। ভদ্রলোক ছ'ফুটের মতো লম্বা। বিরাট দেহের মাপে বিরাট মুখমণ্ডল ভর্তি চাপ দাড়ি। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হয়, ব্যারিটোনের পক্ষে খুবই সঙ্গত। অন্য জোড়ার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ হ'বার চেষ্টা। সে ভদ্রলোক ক্ষীণকায়, ছ'ফুট পেরিয়ে। কিন্তু সঙ্গের মেয়েটি প্রায় টীন-এজার বললেই হয়। কী যে মিষ্টি মুখ তা'র। ঘন কালো চোখে ঘন কালো চাহনি। ভালোবেসে ফেললাম, কিন্তু কিছু বলার সাহস পেলাম না। দু-দুটো ষণ্ড ওর দুধারে।

কোথায় যেন মিল খাচ্ছে না। মধু ফলশ্রুতিটির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলেছিল। ফলে জানা গেল এঁরা ধর্মের চাকরী করেন। রেভারেণ্ড। ঐ টীন-এজারটির নাম মার্কা, ইন্‌কা পার্বত্য ট্রাইবাল। বৃদ্ধ রেভারেণ্ড হামফ্রি কী একটা এক্সপেরিমেণ্ট করার জন্য এই সুদর্শনা স্বাস্থ্যবতী কর্মকুশলিনী। একই দেহে উপত্যকা-অধিত্যকা শিখর কান্তারে স্নিগ্ধা পার্বতীকে বিবাহ করে লম্বা হারে পাহাড়ীদের খৃষ্টান করছেন।

আর মিসেস্ স্লাজুস্কি বোলে যে সপ্রতিভ মহিলাটি চলেছেন, তাঁরই পূর্বপক্ষের সন্তান ঐ দামড়া ফলশ্রুতিটি—হাইস্কুলের ছাত্র, নাম তার ইয়ান্। রেভারেণ্ড হামফ্রির প্রথম পক্ষের মেয়ে মিসেস্ স্লাজুস্কির দ্বিতীয় পক্ষের ফলশ্রুতি এই সন্তান। রেভারেণ্ড স্লাজুস্কি মিসেস্ স্লাজুস্কির সার্থক তৃতীয় পক্ষ। কিন্তু কোনো আপশোষ নেই। স্লাজুস্কিরও এটি তৃতীয় বিয়ে। (বেশ গোলমেলে সম্পর্ক, না? ব্যাপারটাই খুব গোলমেলে !)

আমি আর স্লাজুস্কি কথায় মেতে গেছি মধুর দৌলতে। সে তার হাঁড়ি ভেঙ্গে রস ছড়িয়েছে। ফলে, রেভারেণ্ড 'হিন্দু-প্রিমিটিভ ওয়ার্শিপ্যাল্ ফর্মস্' নিয়ে আলোচনায় মত্ত। মিসেস্ স্লাজুস্কি বার-বার প্রসঙ্গ বদলে দিয়ে স্বামীকে শ্বশুরের দিকে মন দিতে বলছে। বিদগ্ধ শ্বশুর বহু প্রকৃতি-পরায়ণ প্রচণ্ড জামাইকে সাবধান করছে। বলছে,—মার্কস্ থেকে হ্যারল্ড লাস্‌কি পর্যন্ত সবাই কবুল দিয়েছে যে, হিন্দোস্থানে ব্রাহমিন নামে এক ট্রাইবাল সেক্ট্ আছে। তাদের কর্মশক্তি যতোই ক্ষীণ হোক তর্কশক্তি অসাধারণ। আর ভেষ্টেড-ইণ্টেৃষ্ট বজায় রাখার ব্যাপারে তারা ছিনে জোঁক।

আমি তো হেসে খুন। খুব ভালো লাগছে। বলি, 'চালিয়ে যান ; চালিয়ে যান।' এদিকে মিসেস্ বিব্রত।

রেভারেণ্ড স্লাজুস্কি এক ধমক দিয়ে দৃঢ়স্বরে বল্লে, যে, সে নিজে জানে হিন্দোস্তানের বেশির ভাগ ব্রাহামিনেরা পলিটিক্‌সে ঢুকে পণ্ডিত টাইটেল নিয়ে রাজত্ব করছে। নেহরু অরিজিন্যালই ব্রাহমিন ছিলেন, না পলিটিক্যাল স্ট্রাটেজীর খাতিরে কনভার্টেড ব্রাহমিন—কথাটা জিগ্যেস অবধি করে ফেললেন।

মিসেস্ বললেন,—'মোড়ু বলছে, এই ভদ্রলোকও ব্রাহমিন। হাউ এমবারাসিং (কী অপ্রস্তুত !) স্টপ্ দিস্ হাউলিং মনষ্ট্রসিটি ! (এই বাঁদুরে কিচির মিচির থামাও তো !)

মিসেসের বাপ জিজ্ঞেস করেন, 'আপনিও কি কনভার্ট ? না, ওরিজিন্যাল ব্রামিন ?'

আমি বলি,—'আমি ওরিজিন্যাল হলেও কনভার্ট হবার চেষ্টা করছি।'

—'বাট হোয়াই? কেন? পলিটিক্যাল ইণ্টে্রষ্ট? ব্রাহমিন্ হ'বার তো বহুত এ্যাডভাণ্টেজ্।'

আমি বল্লাম—'তা' ঠিক। ইণ্টে্রষ্ট-ও আছে। নেই, তা' নয়। তবে পলিটিক্যাল নয়। আজকাল হিন্দোস্থানে ব্রাহমিনরা খুব সুবিধা করতে পারছে না। নন ব্রাহমিন্ মাইনরিটি শেডুল্ড্ কাষ্ট্ হয়ে গেলে খুবই ব্রাইট প্রসপেক্ট্স্। ব্রাহমিন্ শেডুল্ড্ কাষ্ট্ হলে তো কথাই নেই। সবচেয়ে ভাল।"

"ও-ও! কিন্তু আপনারা কি পালিয়াণ্ড্রিতে বিশ্বাস করেন?"—জিজ্ঞেস করলেন রেঃ হামফ্রী।

মিসেস্ স্লাজুস্কি উচ্চকিত স্বাগত ভাষণে বল্লেন—'হাউ ইণ্টে্রষ্টিং! পলিয়াণ্ড্রী! এ ড্রীম!"

হেসে বলি,—"জার্মানদের মতো আমরাও পলিগ্যামীতেও বিশ্বাস করি। বার বার চার্চে—'টিল্ ডেথ্ ডথ্ আস্ পার্ট' বলে, মিথ্যা শপথ না নিয়ে যা করার এক সঙ্গেই করি। পলিগ্যামি ও পলিয়াণ্ড্রীর এ্যাডভাণ্টেজ প্রচুর। কিন্তু প্রবলেম্ হলো পপুলেশন্।"

মিসেস্—"কি করে ম্যানেজ করেন?"

—"সেটা সাইকলিজক্যাল ট্রাপিজ। বার বার ভাঙ্গা আর জোড়ার চেয়ে একসঙ্গে গোয়ালে অনেকগুলো ভরে রাখায় অনেক লাভ। রেখে দেখবেন। আমেরিকারই এক রেভারেণ্ড উটা-য় করেছিলেন।"

মিসেস্ বলেন—"আমাদের পার্মিশন নেই। তারা ছিলো মর্মোন্স্।"

ইয়ান্ বলল—"হাউ ইণ্টে্রষ্টিং মামী!"

কিন্তু সুন্দর মুখ দেশী মেয়েটির বিষন্ন দৃষ্টি বাইরে মেলা।

হঠাৎ সে বৃদ্ধকে ঠেলে দিয়ে বলে উঠল,—"এখানে, এই ময়দানে হয়েছিল সেই ভীষণ যুদ্ধ। যখনই এদিক দিয়ে যাই, আমার গা শিউরে ওঠে।"

"কী? কী ব্যাপার?"—মিসেস্ স্লাজুস্কি হামলে পড়লেন।

রেভারেণ্ড হামফ্রী বল্লেন,—'ও কিছু নয়। মার্কা আসলে ট্রু ব্লু ব্লাড কিনা। ওদের হোলো চিয়াঙ্কা বংশ। এই চিয়াঙ্কারা ছিলো দুর্ধর্ষ পাহাড়ী কৌম। ইন্কা রিপাকের হ'য়ে এরা ভীষণ যুদ্ধ করেছিল। তাই এই পথ দিয়ে গেলেই ও দিবা-স্বপ্ন দেখে। ওর মন খুব স্পর্শকাতর।'

মধু ধরল আমায়,—"জানেন স্যর? সে যুদ্ধ কোন্ যুদ্ধ?"

আমি বলি,—"মার্কা বলুক। শুনতে ভালো লাগবে।"

—মার্কা যেন গর্বভরে বলতে লাগল,—

—"তখন ইন্কারা সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে। তারা তো পরদেশী। পরায়া ধর্ম, পরায়া ভাষা। আমরাই (চিয়াঙ্কা) ছিলাম এই দেবভুমির আদিবাসী। হঠাৎ ইন্কারা হামলা করল। সে হোল পাচাকুডি ইন্কা য়ুপাঙ্কারই বাপের কাল। এই ১৪২০-২২

খৃষ্টাব্দ হবে। তার নাম ছিলো ইনকা রিপাক। ইনিই সম্রাট হয়ে নতুন নাম নেন ভীরাকোচা। ভীরাকোচা চিয়াঙ্কাদের কুজকো থেকে তাড়িয়ে দেবার পরে, তারা এই উপত্যকায় থানা গাড়ে। কিন্তু ভীরাকোচার সৈন্যরা ধাওয়া করে আসে। ভীষণ যুদ্ধ হলো। আন্তা থেকে হুয়ারাকোন্দো, নদীর ধারে ধারে ভীষণ যুদ্ধ। দিনের পর দিন। ভীরাকোচার দল হেরে পালাতে লাগল।

হঠাৎ—......

......হঠাৎ পাহাড়, মাটি, পাথরের ঢিবি ফেড়ে বেরিয়ে এলো রাশি রাশি সৈন্য। কচুকাটা হলো চিয়াঙ্কারা।

—"সেকি! সত্যি?"

—"হ্যাঁ, সত্যি। কথা নয়। ইতিহাস। ভীরাকোচার ছিল অদ্ভুত ক্ষমতা সৈন্য চালনার। সারা মাঠে ছড়িয়ে রেখেছিলেন সৈন্য। তারা মাটির সঙ্গে মিশে পড়েছিল। তাদের গায়ে-মাথায় ছিল মাটি চাপা। তাদের ছিল হাজার হাজার পাথুরে ঢিবির আড়। যখন জয় হয়ে গিয়েছে ভেবে, চিয়াঙ্কারা তাড়া করেছিল ইনকাদের, তখন সেই মাটি পাহাড় ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল হাজার হাজার সৈন্য।

"ইয়াঙ্কারা হারল। এই দেবভূমির নাম হোল, 'সম্রাটের আপন ভূঁই'। তারপর ফিরিঙ্গীরা নাম দিলো 'ভ্যালী অফ কিংগস্'। এই তল্লাটের নাম 'য়াহুয়ার পাম্পা,'—মানে 'রক্তে সেঁচা ভূঁই'।

"সত্যিই রক্তের পিপাসা এ মাটির। এই মাটিতে বীর সেনাপতি, আমার পূর্ব-পুরুষ—পেদ্রো-দ্য-লা-গাস্কা-র হাতে পিজারোর দল জাকুই-জাওয়ানা-র তৃষ্ণার্ত ময়দানে দারুণ ভাবে হেরে গিয়েছিল। কুজকোর ওপরে ফিরিঙ্গীরা আর ওঠার চেষ্টাই করল না।

আমি জিজ্ঞেস করি,—"কিন্তু ইনকারা তো এই ময়দানেই গড়েছিলেন গাঁথুনি বেঁধে সেতু?"

—"হ্যাঁ। ঐতো পার হয়ে এলাম ইজকুচাকা ষ্টেশন। ঐ সেতুটাই। এখনও ব্যবহার চলছে। 'ইজকুচাকা' মানেই হোলো—'চুণে গাঁথা সেতু'। চুণে গেঁথেছে ফিরিঙ্গীরা, কারণ ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আমারুকাপাক সে সেতু ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু আরও এগিয়ে ইনকা-সেতু, গ্রানাইট মেগালিথিক সেতু পাবেন।"

গাড়ি থামল হুয়ারা কোন্দো ষ্টেশনে। কী যে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে এ দেশ। হাল্কা নরম বাতাস। অক্ষরতঃ, কবিত্ব করে নয়—ঝাঁকে ঝাঁকে নানা বর্ণের পাখি। মাঠ, পাহাড়, ক্ষেত, বাড়ি, পুকুর, হাঁস, ফলবান বৃক্ষ, কর্ষণ-চঞ্চল মাঠ, মানুষজনের চলাচল নিয়ে সব যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মনে ভাসছে গান—'শান্তা দ্যৌঃ, শান্তা পৃথিবী, শান্তমিদং অন্তরিক্ষং, শান্তা উদন্বতীরাপঃ। শান্তাঃ নঃ সন্ত ওষধীম্॥'

পম্পাতালেস্ একটি চারুমতী স্নিগ্ধ পার্বতী নদী। মৃদু চলনে শঙ্কিত গতিতে গিয়ে

মিশে যাচ্ছে উরুবাম্বাতে। সে নিয়ে যাবে আমাজোনে। পম্পাতালেস্ আন্দিজ পেরিয়ে ঝাঁপ দেবে সেই পূব সাগরে অতলান্তিকে।

একদার লোক এল। নানান খাদ্য। ব্যারিটোনিক স্লাভাস্কি তার (বি) পুত্র ইয়ানকে হঠাৎ বলেন—'..... এবং দাম কতো?' ইয়ান যখন বললো, 'দু'ডলার'—ব্যারিটোন আড়চোখে চেয়ে দেখলেন তাঁর মিসেস গলার হার কেনায় ব্যস্ত। চট্ করে ইয়ানকে তিনি বললেন—'আই ডোণ্ট্ থিঙ্ক্ আই ক্যান ম্যানেজ্ দ্যাট্।'

ইংরিজী ভাষার (বোধ করি পাশ্চাত্য য়োরোপীয় সব ভাষারই) পরম গুণ এই যে, জীবন্ত ভাষাকে ওরা শব্দে চয়নে, শব্দ বয়নে এবং কণ্ঠস্বরের আরোহ-অবরোহের সার্কাসে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং বিলকুল নৈর্ব্যক্তিক করে তুলতে পারে। আমাদের দেশের বনেদী সিভিলিয়নরা 'সাহেব-সাহেব' খেলতে খেলতে বাংলা ভাষাকেও মাঝে মাঝে এমনি ভরা সংসারে বিধবার মতো পেশ করতে পটু ছিলেন। তবে, সেটা প্রায়ই বাংলা বলে বোধ হোতো না। 'আই থিঙ্ক্ আই ক্যাণ্ট্ ম্যানেজ্ দ্যাটের' প্রকৃত বাংলা দিতে পারব না। কারণ ঐ রকমের হাতুড়ির এক ঘায়ে ইয়েনের দশা 'ওয়াটার গেটে' ধরা পড়া বেচারী নিকসনের মতো একেবারে যাকে বলে 'রিজাইন্‌ড্'।

মধু। সদাশিব স্বামী আনন্দবর্ধন মধু। নতুন ধ্বন্যালোকের* রসে তার ভাষা চুবিয়ে বলল—"হঠাৎ চকোলেট্‌টা আমি ম্যানেজ করতে পারছি না, ইয়ান। তুমি ভাই একটু মদদ দেবে?"

'ওমা! ওমা! কী হবে গো!' —ব্যারিটোন ঘপাৎ করে থাবা মেরে বল্‌লে—"আমরা প্রফেশনাল মিশনারী। মদদ পাব না মানে? এণ্ডীজের চকোলেট কি মদদের অভাবে মারা যায়?'

মধুর হাত ফাঁকা। চকোলেট খণ্ডিত হয়ে সকলের হাতের শোভা বাড়াল, জিভের রস ঝরাল। আমি আর একখানা মাঝারি বার কিনে ইয়ানকে দিয়ে বলি—"আধখানা আমার, বড়ো আধখানা তোমার।"

ইয়ান কী খুশী!

উরুবাম্বা নাম বদলেছে। এখানে নাম 'ভিলকানোতা'। আমাজোনের বহু অংশের বহুনাম। আপুরিমাক, এনো, কোটাগান, সোলিমোজ। কিন্তু রেল-লাইন চলেছে—রায়ে হুয়ারো কোন্দোর পাড়ে পাড়ে। এসে গেলো পাচার। মস্ত স্টেশন। সেতু পার হবে। সবই ছোটো মাপের বলে, খুব মজা লাগছে। জিভের তলায় কোকা। দাঁত গোলমাল করছে না। মাথায় ঝিম্ নেই। পাচার 'আট হাজার চার-শো' ফুটের মাথায় শিল্প বাণিজ্যের শহর। দূরে দূরে পাইন ঢাকা পাহাড়। তার ওপর বরফে ঢাকা পরপর তিনটি শিখরের সারি। মাউণ্ট চিকন ষোল হাজার ছ'শো ফুট! কিন্তু যৌবনবিভ্রমে সে সত্যিই বিলাসিনী কাঞ্চনজঙ্ঘা।

* কাশ্মিরী বৈদগ্ধ্যের পরকাষ্ঠা আনন্দবর্ধনের অলঙ্কার-গ্রন্থ।

পাচার থেকে গাড়ি বেঁকে ভিলাকোন্তার স্রোতের বিপরীতে বাঁধের ধার ধরে পশ্চিমে চললো। ডাইনে পড়ে রইল বিশাল ইনকা শহর উরুবাম্বা। এই সেতুটা কিন্তু পাথর দিয়ে গড়া। যে পাথরের কাজের জন্য পেরু প্রখ্যাত, সেই বিশালকায় গ্রানাইট মেগা-লিথিক পাথর 'সাজিয়ে' ব্রীজ্।

ভিলকানোতাকে ইনকারা ভয় পেতো। বর্ষায় ভিলকানোতার রুদ্র-রোষ-ভাসিয়ে উজাড় করে দিতো দেশ-গাঁ। পুনো-র হ্রদ থেকে (রায়া-র মুখ) জল এনে এ নদী আমাজোনকে ঢেলে দেয়। কিন্তু কাপাক আমারুকে ধরতে এসে ভিলকানোতার বন্যায়ই বিব্রত হয়ে ফিরিঙ্গীরা পালাতে পথ পায়নি।

হঠাৎ দেখি জানলার ধারে ইনকা সুন্দরী চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। খুব কল্‌কল্ করছেন। বুড়ো হামফ্রী মার্কার সঙ্গে চিয়াঙ্ক ভাষায় চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্বেজিত সংলাপ। আমি উৎসুক। প্রশ্ন করি "ওলান্তে তাম্বোর দুর্গতো এসে গেলো মার্কা? কিছু বলবে না?

মার্কা কী সুন্দর হাসে। সে হাসি দেখে মনে হয়, ওর বোধ করি বুড়োই পছন্দ। প্রত্নতত্ত্ব ভালবাসে বলেই হয়ত ওর এমন সুস্থ নিরাপদ রুচি।

বাকী তত্ত্ব মার্কার মুখেই শুনি। সামনে আসছে ওলান্তেতাম্বো। কুজকো রাজধানীকে যে তিনটি বিখ্যাত দুর্গ রক্ষা করত ওলান্তেতাম্বো তারই একটি। সাকসাহুয়ামান আর তার সংলগ্ন দুর্গটি বাকী দু'টি। শুধু মেগালিথিক পাথর দিয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণের কীর্তিতে অবিনশ্বর করে রেখেছে মাচু-পিচু নিজে, কুজকো, সাকসাহুয়ামান—আর ওলান্তেতাম্বো।

"জানেন, আজও আছে ওলান্তেতাম্বোর ধ্বংসাবশেষ। যেটুকু আছে তা বহু দুর্গের সঙ্গে মিলিয়ে, তারিখ মিলিয়ে দেখলে অবাক হতে হয়। আমরা তো সত্যিই এদেশের নই, বাইরে থেকে এসেছি। সাউথ সীর পলিনেশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ভিতরে বহু দ্বীপপুঞ্জের ভিতরে বহু দ্বীপেই এই মেগালিথিক কৃষ্টির সৃষ্টি আমরাই ফেলে এসেছি।… …

"এই দেবায়তন-উপত্যকা উরুবাম্বা, উর্কে, পিসাক এবং ওলান্তেতাম্বোর কৃষির দক্ষতা, উৎকর্ষ আর প্রণালী দেখলে মনে পড়তে বাধ্য জাভা, মালায়া। ঐযে সিঁড়ি বেঁধে কেয়ারী করে—দেখুন, চেয়ে দেখুন—মনে হবে, জাভা, সোরেবায়া, ফিলিপিন।" [কী উৎসাহ সেই তরুণীর কণ্ঠে !!]

কিন্তু কি দেখি! পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে দিকে তাকাই, কেবল সিঁড়ি কাটা। ওপর পাহাড়ে বিশাল বিশাল পাইন। ঘন সবুজ। গাঢ় সবুজ। শ্যামন্তমালদ্রুমৈঃ। তলায় সারা পাদদেশের বনভূমিতে দীর্ঘ তন্বী ইউক্যালিপটাসের মেলা। মেলা বকের, সারসের, টিয়া পাখির। আর দূরে দূরে শুভ্র-তুষার কিরিটিনী চূড়ার সারি। সারি ডাইনে, সারি বাঁয়ে। নীল অঞ্জন ঘনপুঞ্জ ছায়ায় সম্বৃত অম্বর।

—"ওগুলোর নাম আছে?"

'নিশ্চয়ই আছে। বাঁয়ে হুয়েনে (১৬,৩৯২ ফুট), তার পাশেই ঐযে ছুঁচলো মাথা দেখছেন ১৮, ৮১৩ ফুটের উনি—আমাদের গৌরব সালকান্তে। ডানদিকে চিকন তো

দেখে এলেন, দেখুন ঐ উত্তর দিকে ঘেঁষে—দুই বোন, নেগবল্লা আর ডিঙকা। এরা বলে ভিরোনিকা।

রেল-লাইন থেকে ডাহিনে দেখা যাচ্ছে বিখ্যাত ওলান্তেতাম্বো দুর্গ-শহর। আর শহরের বাইরে বিশাল বিশাল পাথরের প্রাচীরের অতিকায় বাধা। সাতভাগে পাথরগুলো আজও দাঁড়ানো। পুরো শহরটাই একদিন পাথরে ঘেরা ছিল।

"জানেন, ঐ পাথরের তলায় কী লড়াই যে হয়েছিল কুজকোর পতনের পর যখন ইন্‌কা মাঙ্কো এইখানে এসে থানা গাড়লেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পাঁচটি মমী। দুটি ছিলো রাজ-মাতাদের। আর বাকি তিনটি মহান সম্রাটদের :—ভীরাকোচার তুপাক-য়ুপাঙ্কোঈর আর হুয়ানা কাপাকের। বছরে একবার এঁদের শোভাযাত্রা করে বার করা হতো। আজ যেমন ভূমিকম্পের ঠাকুরের শোভাযাত্রার সময়ে সকলে মালা, ফুল, নৈবেদ্য দিয়ে মাটিতে লুটোয়; তেমনি সেই পুরাকালেও তারা সম্রাটদের সামনে মাথা খুঁড়তো। ভাবাবেগে পরিপূর্ণ ছিল সেই সব ক্ষণ। ফিরিঙ্গী দলিলেও বলে যে, বহু বহু ফিরিঙ্গী মাথার টুপী খুলে সম্মান দেখাত। খ্রীষ্টীয় পোষাকে সাজিয়ে সেই সব শোভা-যাত্রার আবেগই ঢেলে দিই একালের আকাশ-মাটিতে।

"সে মমীগুলো ছিলো জীবন্ত। লীমায় পিজারোর মতো আশুলো মেরে যায়নি। বিরাট পুরুষের মমীকে ইনকারা সম্মান দেখায়; এইভাবেই পিজারোর দেহকেও মমী করে রাখা হয়। কিন্তু ইনকারা জানত মমী রাখতে হয় কি করে। সেই মমী মাঙ্কো এখানে বয়ে এনেছিলেন ফিরিঙ্গীদের স্পর্শ থেকে বাঁচাবার আশায়। কিন্তু পারেননি।

বীর চালকুচিমা-কে মনে পড়ে? আতাহুয়াল্লাপার নৃশংস হত্যার পর দেশকে তিনিই নেতৃত্ব দেন। অবশেষে তিনিও ফিরিঙ্গীর মিথ্যা বিচারের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন। এই-খানেই তাঁকে জীবন্ত পোড়ানো হয়।

"কিন্তু বার বার রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। বার বার ফিরিঙ্গীরা তাঁর কাছে মার খেয়েছিল। বারবার সরে গিয়েছিল। বারবার ফিরে এসেছিল। কুজকো থেকে এই অবধি কতো বারই যুদ্ধ চলল। মাঙ্কোর সেই গতি ফিরিঙ্গীরা রোধ করতে পারেনি। এই উপত্যকায় এসে তারা নদীর ওপর ভেলা বেঁধে নদী পার করে আক্রমণ করার ফিকির করেছিল। তখন মাঙ্কো হুকুম দিলেন বাঁধ ভাঙার। ফিরিঙ্গী সমাবেশ ভেসে গিয়ে-ছিল। এখানেই আবার ফিরিঙ্গী লড়াই করেছে ফিরিঙ্গীরই সঙ্গে। এই ময়দানের বড় বেশী পিপাসা।......"

—'মাঙ্কোর কি হোল? সেই যুদ্ধেরই বা কি হোল? আর সেই বাঁধ ভাঙ্গার?'

"...সারাদিন যুদ্ধের পর প্রচুর ক্ষতি সহ্য করে ফিরিঙ্গীরা যখন রাতে বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন এল বাঁধভাঙ্গা তুমুল বন্যা। সেই হঠাৎ বন্যায় ভেসে গেল সে বিক্রম। এর পর তারা যখন আবার এল, তখন সসৈন্যে মাঙ্কো হাওয়ায় মিশে গেছে। আর সাহস হয়নি ফিরিঙ্গীদের যে, তারা আরোও এগোয়। তখন তারা বিধ্বস্ত। কুজকোয় ফিরে গেলো। মাঙ্কোকে ধরা লাটে উঠল।...

"…কাজেই এই গাড়ি চলেছে ইনকা-তীর্থে। এদেশ কখনও বিজিত হয়নি। তবু এদেশ একমাত্র সাইমন বেলিভারের নেতৃত্বে পেরুর অংশ হয়েই ফিরে এল। লীমা তার রাজধানী রয়ে গেলেও কুজকো আজও তীর্থ; আর এই ভূমি। এটা তীর্থ। হ্যাঁ, তীর্থ। সাইট সি-ইং প্রমোদ নয়। টু ফীল্ ইজ্ টু সিভ্! —ফীলিং! ফীলিং!"

কোয়িহুয়ে-রাচিনার কাছে পাহাড় চেঁচে রেলপথ। নীচে জলধারা। সে এক অপার্থিব ত্বরিত সৌন্দর্যের লীলার আভঙ্গ। পম্পাকাহুয়ার গিরিবর্ত্ম পার হবার পরেই দেশটার চেহারা যেন আজব সোনার এক কাটির ছোঁয়ায় বদলে গেল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে দেখা যাচ্ছে বিশাল জনপদের, দুর্গের ভগ্নাবশেষ। অদ্ভুত লাগছে। স্তব্ধ। শতাব্দীর সীমাগুলোকে কারা এমন মন্দির প্রান্তরে খাড়া করে রেখেছে। বাতাসে সূর্য কন্যাদের সৌগন্ধ। আকাশে কিরিকাঞ্চার চোখের নীলমণির দ্যুতি। মাটিতে শুয়ে আছে ইনকা-আত্মার আতপ্ত নিঃশ্বাস।

ট্রেনের গতি খুব মন্থর।—খুব মন্থর। আমরাও স্তব্ধ। কিন্তু এরই মধ্যে মনে হচ্ছে মার্কা যেন নীরবে কাঁদছে।—না ভুল বলেছি; গুণ গুণ করে গাইছে। কী গাইছে এমন করুণ সুরে? কী?

—"Would some one tell me, what she sings?
Perhaps the plaintive numbers flow
For old unhappy far off things
Or battles long ago?"

রোমান্স কাগজের ফুল নয়। স্মৃতির সুবাস। আমার পক্ষে ভ্রমণ—ভ্রমণ বিন্যাস। মার্কার পক্ষে সেই একই ভ্রমণ রক্তের রিনি রিনি। সত্য। প্রত্যক্ষ। জীবন্ত ইতিহাস। নাড়ীতে নাড়ীতে চঞ্চলের পদধ্বনি। মনে মনে গাই পুরোনো দিনের পংক্তিগুলো :

ছুটে আসে ঝড়; উথল পুথল দোলা।
সে দোলে জেগেছে শোণিত জ্বালানো শিখা।
ঝড় বয়ে যায়; তুমি বনকুন্তলা।
হেসে খল খল লিখেছো বহ্নিশিখা।

হঠাৎ ঝড়ের মাতনে মার্কা সোল্লাসে বলে ওঠে,…'ঐ দেখুন গোল ঐ ভগ্নস্তূপ। ওটা রুস্কু-রাকে। ওটা ছিল ইনকা 'ওয়াচ্-পোষ্ট'। ওখানে আজও দেখা যায় ওপর থেকে জল আনার নালি। এরপরে যে গভীর খাদটা—এর মধ্যে গোটা তিনেক হ্রদ আছে। জল কিন্তু বিষ। শুধু তামার নির্যাস।…"

গাড়ি ঘুরে ঘুরে হয়রান। পাহাড়গুলো প্রায় ঘাড়ে চাপে আর কি। জলে কাটা পাহাড়, তাই একেবারে সোজা খাড়া কাটা। পর-পর, পর-পর, পাহাড়ের পর পাহাড় কেবল এই খাড়া চূড়ার মতো। পেরুর এসব পাহাড় যেন পাহাড়ই নয়, কেবলই চূড়া।

মনে হয়, নৈবেদ্যের ওপরে কে যেন চিনির মঠ (মন্দির) সাজিয়ে রেখেছে। আর তার গায়ে গায়ে তীব্রগতি জলধারা। মাথায় ধরা দধিভাণ্ডের মতো তুষার কিরীট।

কিন্তু পাহাড়ের গায়ে গায়ে কেয়ারী কাটা ধাপ। চাষ চলছে। সায়ামামার্কার বিরাট স্তূপ একটু দেখা যায়। এসে পড়ে থার্মাল-পাওয়ার স্টেশনটা। অনেকেই এখানে নেমে পায়ে হেঁটে হাইকিং করে দেখে আসে লুইয়া, পাতা মার্কার গুপ্তস্মৃতি; হুয়ানে হুয়ানার বিচিত্র গোল মন্দিরের অবশেষ, আর পাম্পা কাউয়া নামক নকল শহর যেটা আসল মাচ্‌চু-পিচুকে আবডালে রাখত। ওটা দেখেই দম ফুরিয়ে যেত। আসল মাচ্‌চু-পিচু ব'লে যে, অন্য শহর আছে, তার খোঁজও কেউ রাখত না। নকল গ'ড়ে আসলকে ঢাকার এই ফিকির এই গভীরে খুবই কাজে দিত। বিভ্রম উৎপাদন করা 'দুর্গ' রচনার একটি কৌশল।

অবশেষে ৫৯৭০ ফুটের মাথায় মাচ্‌চু-পিচু স্টেশনে গাড়ি থামলো। পুরো আরো দু'হাজার ফুটের মাথায় উঠে তবে, প্রথম (ও শেষ) একটু আস্তানা; 'চা-স্তানা' বলাই যুক্তিযুক্ত। এখানে ইয়াঙ্কী কায়দায় এক নৈর্বক্তিক রেস্তরাঁ। চা, কফি পাওয়া যাচ্ছে। এখনও দু'হাজার ফুট চড়াই চড়তে হবে। অথচ দাঁড়িয়েই আছি ছ'হাজার ফুটের মাথায়।

হায় দুর্দৈব! কেন বাহাত্তুরের এ শখ? কেবল দেখি সেই গহিন চূড়াটির দিকে। চূড়া যতো উঁচু, মন ততো ডুবে যায়, মানে, 'সিঙ্ক্' করে।

বাইরে থেকে বোঝার আদৌ কোনো জো নেই যে, এই নদী, এই গিরিবর্ত্ম, এই গভীর অরণ্যানী, এসব ছেড়ে পাহাড় নামক ঐ মই চড়া যায়, বা চড়া যাবে। লোকে কিন্তু যেত একটি মহিমাময় শহরে। কোন পথে? এটা সে পথ হ'তেই পারে না। এ পথ পিঁপড়ে যা'বার পথ।

না, এ পথ প্রাচীন পথ নয়। এ পথে কেউ যেত না। সে ছিল অন্য পথ। উত্তরে এনু নদীর অববাহিকার ভীষণ স্পর্ধা; দক্ষিণে বরফ ঢাকা তিতিকাকা হ্রদের অরণ্যানী। এর ভিতরে শতশত গিরিনদী। হাজার হাজার গ্রাম। এই দুর্গম ভেদ করে পথ আসত। মিথ্যা পথ ছিল পাকায়-মায়ো, উরুবাম্বা, ইয়ানা কোচ্‌চা নদীগুলোর অববাহিকা। প্রত্যেকটি নদী পথিককে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে বাস্তহীন, খাদ্যহীন, জলহীন অরণ্যে, যার চারিধারে পর্বত প্রাচীর। সেই খাড়া পর্বত, যে পর্বত পার হবার কথা সারসপাখি, হিরণও ভাবে না। গিরগিটি, গোসাপ, শামুকের পথ মানুষের পথ নয়।

ছোটোতম ষ্টেশন। গাড়ি থামলো। এক গাড়ি আসে; এক গাড়ি যায়। এর বেশী ব্যবস্থা নেই।

নেমেই সবাই ছুটতে লাগল। নৈলে বাসগুলো ছেড়ে যাবে। তিনখানা বাস (মিনিবাস) ছাড়ছে; তিনখানা নামছে। পথ সেই বিংঘামের চাঁছা পথ। সব চেয়ে চওড়া জায়গা হবে ছ'ফুট। প্রচণ্ড ধুলো পথের ধারে ধারে। 'ধার' বলে এ পাহাড়ে

কিছু নেই। 'ওপর' বা 'নীচ'। পাহাড়কে আঁকড়ে আছে শক্ত শক্ত গাছ। সেই গাছের ভরসায় গড়া কাঁচা ইটের দেয়ালের মাথায় ঘাস ঢাকা বাড়ি। উই ঢিবির মতো এরা গড়ে নিয়েছে নিজের বাসস্থান ট্যুরিষ্টদের ফেলে দেওয়া করুণার উচ্ছিষ্টর সংগ্রহের সহজ প্রত্যাশে।

বাসভাড়া ট্রেনের টিকিটের সঙ্গে নেওয়া। বাস চলছে ট্রেন কর্তৃপক্ষেরই তত্ত্বাবধানে। শেষ বাস নেমে আসবে রাত আটটায়; তখন শেষ ট্রেন চলে গেছে। রাত কাটাবার জন্য তখন থাকবে শুধু স্টেশন।

কিন্তু যেমনই হোক, বাস যেমনই হোক, আমি যে এখন পাক্কা দু'হাজার ফুট চড়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেলাম, এ গুরুবল। মধুকে বললাম—"এই সুযোগ। ওই রেভারেণ্ডের ভেরেণ্ডার আণ্ডিলগুলো সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাক। আমরা অন্য বাসে যাব। রাতে যখন ফিরছি না, তখন তাড়া কি? ওদের চলে যেতে দাও। ঘাড় হাল্কা হোক।"

কেন যেন মধু মুষড়ে গেল।

আমার ভ্রূ কোঁচকাল।····· তাই নাকি? হ্যাঁ তাইতো—

মনে পড়ছে বটে মধু আর সেই মার্কা শেষ আধাঘণ্টাকাল খুব গল্প করছিল। মার্কাকে হাসতেও দেখেছিলাম।

'কিনা হতে পারে? আর কেনই বা হবে না?

···'যে পথে পাখিরা যায় গো কুলায়,

যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,

যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে।'

···সে পথের ঠিকানা সেই কবে অর্ধ শতাব্দী আগে ফেলে এসেছি। জীবন, তুমি চরৈবেতি। এগিয়ে যাও।

ওম্মা! দৌড়ে এসেছে মার্কা!

বলে,—"যাবে না? বাস যে ছাড়ে। আমি সীট রেখেছি।"

মধু আমার দিকে চাইছে।

আমি মধুর দিকে চাইছি না। দেখছি পার্বতী সেই কন্যার ভীরু কজ্জল আঁখি; 'ফীল্' করছি, সেই মৃদু কম্পিত হিয়া। বললাম,—"তুমি যাও মধু। তোমাদের সঙ্গে ঘুরছি বলেই বয়সটাকে তো মহাকাল মাফ করে দিলেন না। এ স্পোর্টে হ্যাণ্ডিক্যাপ নেই। আমি ধীরে সুস্থে আসছি।"

মধু গেলো না। 'ন যযৌ না তস্থৌ।'

মার্কা হাত তুলে বলল—"সো লং! ওপরে দেখা হবে।"

মধুকে টেনে পাশে বসিয়ে বললাম—"হ্যাঁ, হবে।"

বাস গিয়ে দাঁড়াল একটা বিরাট চালার ধারে। উঁচু করে গড়া বেদীর চারধারে কাঠের সারি করা থামের মাথায় টাইলের ছাদ। তলায় দু'শো লোক বসার মতো টেবিল চেয়ার। সবই ইয়াঙ্কী মার্কা। লাঞ্চের লিস্ট টাঙ্গানো আছে। যা ইচ্ছে

নাও। হাতে ধরা ডিশ থেকে পয়সা নিলে তবে আগড় পার করে খাবার নিয়ে বেঞ্চিতে বসতে পারবে।

এ্যাস্পারেগাস-স্যুপ, ভাজা স্বাদু কড্ মাছের ফিলেট, সেদ্ধ বীন্‌স্, ভুট্টা, বীটের ক্যুব্‌সের ওপর গুঁড়ো চীজ। রুটি নিলাম না। তার বদলে এক প্লেট তরমুজ নিলাম।

মাচ্‌চু-পিচ্‌চু

সমস্ত জিনিষপত্র জমা রেখে কেবল ক্যামেরার ব্যাগ নিয়ে আমরা যখন মাচ্‌চু--পিচ্‌চু নামক মহান্ আশ্চর্যের পেটে ঢুকতে যাব, সেই মুহূর্তে সামনের নোটিশ বোর্ডে পড়লাম, 'মাচ্‌চু-পিচ্‌চু চড়তে তিন হাজার সিঁড়ি পার হতে হয়।

অক্সিজেনের নিদারুণ অভাব; আচ্ছন্ন আকাশ; আরও আচ্ছন্ন হয়ে গেল মন। স্নিগ্ধ মধুর বাতাস সত্ত্বেও কপালে ঘাম জমছে এবং মুখটা 'হাঁ' করে হাপর টানছে। তদুপরি তিন হাজার ঐ দারুণ সিঁড়ি!

"না মধু। হোল না। আমি পারব না। তুমি দেখোগে সেই মার্কা কোথায়। সে-ই সব তোমায় দেখিয়ে দেবে। আমি পারব না।"

মধু তো থ'। বলল—ধীরে ধীরে যাব স্যর। রাত আটটা পর্যন্ত আমাদের হাতে। ছশো মিনিট সময় আছে। মিনিটে ছটা সিঁড়ি কিছুই নয়। মিনিটে বারোটা সিঁড়িও পারবেন। দল ছেড়ে চলব।'

হেসে ফেললাম।

আমার চোখের চমকের ভাষা মধু পড়ল। লাল হোল। কিন্তু সত্যিই কি আমি ওকে মার্কা অবধি পৌঁছে দেবার জন্য একটা ফন্দী এঁটেছি? না।

ও পায়ে পায়ে চলে গেল। আমি মনে মনে খুশী হলাম, হাসলাম।

উঠে পড়লাম। দু-দশ পায়ের মধ্যেই একটি কুটীর। সেটাই নাকি প্রবেশ পথ; এবং এই নিরীহ কুঁড়েটি পাহারাদেবার ঘর বিশেষ। এ ঘরটি প্রাচীন। প্রচীনকালেও এটি পাহারাদারের আস্তানাই ছিল।

কিন্তু সেটি পার হয়েই এক অপূর্ব দৃশ্য। হঠাৎ যেন কোন ইন্দ্রজালে এক যক্ষপুরীর দ্বার খুলে গেল। পাহাড়ের ধার কেটে একটু পথ। তিন ফুটেরও কম চওড়া; লম্বা প্রায় একশো ষাট ফুট। ওপরে তাকাই; পাহাড়টির গা বেয়ে বেয়ে থাকে থাকে সিঁড়ি। চাষ হোত। নীচে বলতে সিঁড়ি থামছে খোলা প্রশস্ত মাঠের মতো এক প্লাজায়। সে মাঠটাও (এখান থেকে হাজার দেড় হাজার ফুট নীচে) শেষ হয়েই যেন লাফ খেয়ে

অতলে নেমে গেছে। পার্বতী স্রোতস্বিনী ভিলকানোতার কলস্বর শোনা যাচ্ছে। সে নদীর ওপার আছে। সেই ওপারের ঘন অরণ্য আকীর্ণ খাড়া পাহাড়ী ভীষণতা দুর্গমতা, ভয় পাইয়ে দেবার মতো। আমাদের গতি পূর্ব থেকে পশ্চিমে। পশ্চিমের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে খাড়া ছুঁচলো গিরিশিখর। আগাগোড়া সবুজে ঢাকা এক রহস্যময় উপস্থিতি। অনিবার্য তার নীরব ডাক, অনির্দেশ্য তার অভ্রভেদনের স্পর্ধা; অনবহেলনীয় সকল সীমান্তকে তুচ্ছ করা ভঙ্গী। এ যেন একটি মূর্তিমান 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' মন্ত্রের শারীরিক প্রার্থনা।

কতোই তো পাহাড় দেখেছি, শুনেছি, পড়েছি, ও জানি।

পাহাড় জানিনা একী একটা কথা? কিন্তু ক্যারাবিয়ান সাগরের সেণ্ট লুশ্যা দ্বীপের বহু কীর্তিত সেই যুগল পিলোন-এর রূপ না দেখা পর্যন্ত পর্বত না থেকেও পর্বত চূড়ার বোধ যে কি তা' জানা যায় না। কিন্তু আমাকে চারিধার থেকে পর্বতমালা ঘিরে রেখেছে। শুধু ঘিরেই নেই; যেন গায়ে এসে পড়েছে,—যেন দেয়াল। যেন ছুঁলেই হয়। পাখিটা এই বরাস গাছটির ডাল থেকে ঐ বরাস গাছের ডালটায় বসল। বরাস ফুলও দেখছি। পাখিও দেখছি। কিন্তু ঐ গাছটির কাছে যেতে আমার কম করেও তিনদিন খরচ করতে হবে। দু'হাজার ফুট নামতে হবে; নদী পার হতে হবে; তিন হাজার ফুট চড়তে হবে। পার হতে হ'বে কম হলেও চল্লিশ মাইল,—যার আঠাশ মাইল ব্রেক্ চড়াই,—সত্তর ডিগ্রীর চড়াই। ততক্ষণে পাখি উড়ে যাবে।

অথচ সব সবুজ। দিগন্ত জড়ো হয়েছে সবুজের কিনারায়। আকাশ ভরে রয়েছে একটি সবুজের বাটি।

শৃঙ্গটির নাম 'হুয়ানা-পিচ্‌চু'। দেখা যাচ্ছে হুয়ানা পিচ্‌চু'র গায়ে বেড়ের পর বেড় দিয়ে চাষের কেয়ারী। ওটা ছিলো খাস সম্রাটের-(১) প্রমোদ উদ্যান, (২) বিলাস ভবন, (৩) পিতৃপুরুষদের দেহ-রক্ষার তীর্থ, (৪) দেবী চন্দ্রের প্রসিদ্ধ মন্দির। যাবার পথ গুহ্য, সঙ্কীর্ণ, সুরক্ষিত আর অতি দুর্গম। (পথকে দুর্গম বলা ভ্রমণ-বাগীশদের একটা ভয়-পাওয়ানো কায়দা। জানি। তা হোক। কিন্তু ভয় পাওয়ানো পথও তো আছে!)

হুয়ানা পিচ্‌চুর ঠিক দক্ষিণে আরও এক পিচ্‌চু, নামকরণের বাইরে। আমি দাঁড়িয়ে মুগ্ধের মতো, মন্ত্র-স্পৃষ্টের মতো, ন যযৌ ন তস্থৌ। মাচ্‌চু-পিচ্‌চুর ওপরে দাঁড়িয়ে বিস্ময়ে অভিভূত।

ডান হাতে ধাপে ধাপে চাষের কেয়ারী নেমে গিয়ে থেমেছে একটা বিরাট অবকাশে। তার পূবটায় চাষের ব্যবস্থা; আর পশ্চিমটায়—সে যে কী, বলা যায় না! যেন, সবুজ সমুদ্রের তলা থেকে একটা গোটা কলকাতা না হলেও, সেকালের সুতানুটি আর গোবিন্দপুর ভেসে উঠেছে। তার শত শত হর্ম্য, প্রাসাদ, মন্দির, স্নামও যেমন, তার খেলার মাঠ, এসপ্লানেড, বিদ্যালয় হাসপাতালও তেমন;-একটি সমগ্র নগরী এক সঙ্গে হুপ্ করে যেন ভেসে উঠলো, এবং আশে-পাশে ওপরে নীচে, যে দিকে চাই—সেদিকেই অবাক করা সব দানবীয় স্থাপত্যকীর্তি। সৌখীন তাজ নয়, সুষমিত

ইৎমিদ্দৌলা নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মণ্ডিত হালেবিদ, বেলুর নয়, বিশাল বিরাট গোলকোণ্ডা, বা গোয়ালিয়র দুর্গ নয়। রুক্ষ আদিম, কর্কশ, ভয়ানক বিজয়নগর হাম্পী নয়। এ অন্য রূপ। ভুল হবার জো নেই, এ পেরু—এ ইন্‌কা এ মেগালিথিক স্থাপত্যের একটি চরম উদাত্ত সৃষ্টি। অতুলনীয়, অনতিক্রম্য।

নির্ঝরের মতো স্নিগ্ধ বাতাস। শরীর ও মনের জীবন-যৌবন। ঝক্‌-ঝকে রোদ; কী অসীম কৃপার মতো ঝরে পড়ছে এ রোদ। এই তপনের নাম বিকর্তন (যার তেজ—'কর্তন' করে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে); এরই নাম দেব সবিতা, মনন-চিন্তন-ধীকে যিনি পুষ্ট করেন; ইনিই 'পূষণ,' যাঁর স্নিগ্ধ কিরণে রসের, প্রাণের, সৃষ্টির দাক্ষিণ্য। ভেসে যায় পথিকের মনোহারী, সদা শুভদায়ী ভাসা মেঘের গুচ্ছ গুচ্ছ মহিমা। ইনি রুদ্র, ভগ, অর্যমা, আদিত্য, বিষ্ণু।

কেউ নেই। মধু চলে গেছে তা'র তালে। আমি বলেছি,—'তিন হাজার সিঁড়ি আমি আমার তালে পেরুব। না পারি, পেরুব না। তুমি উদ্ধত, উদ্দাম যৌবন তোমার। তুমি যাও। পদে পদে পাবে গাইড। বোঝার কষ্ট নেই। চেয়ে দেখ, থিক-থিক করছে দেশ-বিদেশের যাত্রীদল, মার্কিন মুলুকের হাম্বড়া ধড়া-চূড়াধারী থেকে কৃশ পেরুর ছাত্র-ছাত্রীর দল। ভিড়ে যাও।'

তাই গেছে।

আমি একা। বড়ো প্রার্থিত এই 'সহস্র-বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' মুক্তি। পাণ্ডিত্য দেখাতে হচ্ছে না, মননে মগনে অথৈ হয়ে গেলেও কারুর ডাকের আতঙ্কে শেকল দিতে হচ্ছে না। এ মজা, খুব মজা। যারা একা হ'তে জানে না, তা'রা মিলনের রসে বঞ্চিত। যা'রা নিজেকে খোঁজে না, তা'রা সমাজে, সংসদে হারিয়ে যাবেই।

দূরে পথের পাথরে সাজিয়ে গোল করে টাওয়ারের মতো করে গড়েতোলা কুঁড়েটির মাথায় খড়ের টোপর। পাহাড়ী-গায়ের সঙ্গে ঠেকিয়ে ওপরে ওঠার পথ। তিন দিকে জানলার মতো। পাহারা দিতো পথ। এখনও দেয়। সারাটা মাচ্‌চু-পিচ্‌চুর ধ্বংসস্তূপে এই একটির ওপরে চাল আছে। বলে, তখনকার দিনে ছাদ কিভাবে গড়া হোতো; তা'রই নমুনা রাখা।

এই কৃষিভূমিতে দু'শোর বেশী রকম ভেষজের চাষ হোত। খাদ্যশস্য, ফল, আনন্দের ফুল ও পাতা, ঔষধের বাকল, শিকড়, পাতা, ফুল—কী নয়! আলু, ভুট্টা, কুমড়ো, লাউ, কচু, মুলো—নানাবিধ। লুকুমা, নিস্পেরো, তাম্বো, পাকে, চিরি মোয়া—এ ফলগুলো লুকাট, সফেদা, আম, পেঁপে, শাঁক-আলু, তরমুজ ও শশারই কেউ। অনুবাদ জানি না। রণ-পা'র মতো লম্বা ডাণ্ডার মুখে ধারালো চাকতি গুঁজে পায়ের চাপে চাষ করত। সেই হালের নাম ছিলো 'চাকুই-তাক্‌কলা'। চাষের হালে বলদ জুটেছে, ট্রাকটারও এসেছে; কিন্তু চাকুই-তাক্‌কলা যেদিন যাবে, সেদিন পাহাড়ের গায়ের এই কেয়ারী চাষও যাবে। পাখির বিষ্ঠা, মাছের সার ছাড়া পাতার সারও এরা ব্যবহার করত।

চলার দেয়াল ফুরিয়ে গেল। ফুরিয়ে গেল চাষ—বাসের তল্লাট। এখন আসছে শহর। নগরীর উপান্ত। সিঁড়ি পড়েছে। নামতে হ'বে। ঐ বিস্তীর্ণ অবকাশ ডাকছে। যেমন নামা যায়, দেখা যায় ওপর থেকে জল প্রণালী নীচে বইয়ে নিয়ে যাবার সুব্যবস্থা।

এ জল আসছে ও পারের ঝর্ণা থেকে। বলে, 'ঝর্ণা-মহাল'। বলবেই, একটি দুটি নয়; ষোলোটি ধারায় জল বেরুচ্ছে পাহাড় থেকে। এই ধারাগুলো একত্র করে ইচ্ছামতো নানা দিশায়, নানা কর্মে নিয়ন্ত্রিত করার 'ওয়াটার ওয়ার্কস্' ছিল বলেই এটা ঝর্ণা মহল। এইখানেই জল এঞ্জীনীয়ারের মোকাম, জল-রক্ষীর বাড়ি। চব্বিশ ঘণ্টা, অহরহঃ, জলের পবিত্রতা রক্ষা করা ছিলো প্রাণ-সঁপা কাজ। সে কাজে গাফিলতির কোনো নালিশ, তর্ক, শুনানী ছিল না। জল অশুদ্ধ কোন কারণে হলে, আর যা'রই শাস্তি হোক, পাহারাদারদের হোতই। আর সে শাস্তি পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দেওয়া। (ভাবছি, এ-কালে এ ব্যবস্থা করতে পারলে ভারতের নগরে নগরে কামলা (জণ্ডিস্) রোগের আতঙ্ক বন্ধ হোত কি-না!)

এই যে এত সিঁড়ি, বেশির ভাগই পাহাড়ের গায়েই কাটা। তবু পাথরের চাঁই দিয়েও গড়তে হোত। গ্রানাইটের পাহাড় আশে-পাশে আজও আছে। সেখানে গেলে—কাটা, আধাকাটা পাথর এখনও দেখা যায়। কিন্তু পাহাড় থেকে পাহাড়ে তা' আনতো কি উপায়ে? বিশ্বাস করা খুবই কঠিন যে, লতা-পাতা-বেত এবং চামড়ার দড়ি পাকিয়ে, 'কেব্‌ল্'-কার তৈরী করে মাত্র মানুষের পেশীর বলেই তা' নীচে থেকে ওপরে, ওপর থেকে নীচে, এ পাহাড় থেকে ওপারে, খাচায়, জালে বেঁধে ঝুলিয়ে পাচার করা হোতো। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভাষ্য।

এ ছাড়াও ভাষ্য আছে। কিম্বদন্তীর গাথা বলে,—সূর্যদেব ইন্‌কা সম্রাটকে সাহায্য করার জন্য মানুষদেরই পাথর (অন্য কিম্বদন্তীতে—পাথরকেই মানুষ) করে দিলেন। তা'রা হেঁটে চলে এলো এই মহৎ কাজ সিদ্ধ করার জন্য।

পুরাণের গল্প, কিম্বদন্তী ভারী মিষ্টি লাগে। যুক্তির বেড়ী কেমন অনায়াসে সারল্যের সাহসে ভেঙ্গে ফেলে এগিয়ে যায়! যেন ইতিহাসের শিশুকাল!

তবু তা ইতিহাস।

মিথ্-মিথলজী না থাকলে ইতিহাসের ভ্রূণে জলের 'কুশন' থাকত না। জল ফেলে দিয়ে প্রাণকে রক্ষা করা ভালো ঐতিহাসিকের সিদ্ধাই।

জলের ধারে এসে বসেছি। ঝির্-ঝির করে জল পড়ছে। কিম্বদন্তীর পাখি এসে বলছে—'আমি সূর্যের পাখি। ওরা মন্দির গড়বে, আমি ওদের শিখিয়ে দিলাম কাদা কী করে পাথর হয়, আর পাথর হয় কাদা। তাই তো এসব দেখছো।'

তখন জিগ্যেস করি,—'ও পাখি! তবে সেই সূর্যদেবের জন্য কেন বন্দিনী করে রাখলে শ'য়ে শ'য়ে রাজকন্যা? নিবিয়ে দিলে শ'য়ে শ'য়ে আশার প্রদীপ? পায়ের তলায়

চেপে দিলে শ'য়ে শ'য়ে কমল-কলি চাঁপার দল ? যখন এ নগর ছেড়ে তুপাক আমারু চলে গেল, তখন ত ছিল শুধু সেই কন্যারা। কোথায় গেল—তারা ? কোথায় ? ও পাখি! কিম্বদন্তীর পাখি! কেন কথা কও না ?

জলের ধারে বাড়ি। এটা নাকি পুরুৎমশায়ের বাড়ি· 'প্লাজা সাগ্রাদা'। অর্থাৎ সেক্রেড্ প্লেস—পবিত্র ভূমি। তীর্থক্ষেত্র। দোতালা বাড়িখানা কেবল পাথর সাজিয়ে সাজিয়ে তোলা। দোতালার মেঝেও পাথরের। অট্টভাবে,—বলতে যাচ্ছিলাম গাঁথুনী, কিন্তু না ; শুধু সাজানো।

নয়ধাপ সিঁড়ি বেয়ে এলাম গোল একটা ঘরে। দেয়ালগুলির পাথরে গোলাই যে কী করে এনেছিলো সে এক বিস্ময় ! দরজায় খিল দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। কাছেই জল ; পুরোহিতের প্রাসাদ। এটা সূর্য মন্দির।

এই মন্দিরের পরে খানিক গিয়ে বাঁয়ে তুবার মোড় নিলে, কয়েক ধাপ উঠলেই চমৎকার বাড়ি। উৎসর্গিতা সূর্য-কন্যাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা প্রধানা গুণবতী রূপসীর বিশিষ্ট বাস হয়তো। দেয়ালে তাক করা আছে। জিনিষপত্র ঝোলাবার ব্যবস্থাও আছে।

এগুলি বিশেষ করে বক্তব্য এই কারণে যে, সবটি গ্রানাইটের। একটি ফুটো করা মানে, একমাসেরও বেশী পরিশ্রম।

যথারীতি ছাদ নেই। কাঠ, বাঁশ, খড় কি থাকে ?

হোঁচট খেয়ে হঠাৎ পড়ে গেলাম। হঠাৎ কোথা থেকে এসে একটি মেয়ে ধরে ফেলল। ওর ভাষা বুঝি না। ও কিন্তু এদেশেরই মেয়ে, তবে শহুরে মেয়ে। একটু বিশ্রাম নেবো বলে বসতে যাব, ও কিন্তু আমায় বসতে দিল না। বলল, একটু পরে বসতে।

সরিয়ে এনে যে জায়গাটাতে বসাল, সেখান থেকে মন্দিরের জানালা দিয়ে মাচ্‌চু-পিচ্‌চুর পুরো দৃশ্য আর হুয়ানা পিচ্‌চুর প্রচ্ছদ অপার্থিব সুন্দর ; অলৌকিক মায়ালোক। এ শহরের কল্পনা যিনি করেছিলেন, তাঁর শিল্পমানসে বাঁধানো ছিল ভারসাম্য। পারিপার্শ্বিক প্রচ্ছদজ্ঞান এবং নিসর্গের সংস্থানের মনোময়তা। আকাশ, পর্বত, বনানী, নদী, খাড়ী, আরোহ, অবরোহ সব একটি সিম্ফনীতে এসে রূপ নিয়েছে, যেন বেটোফেনিক অর্কেষ্ট্রায়, একটি 'প্যারাডাইস্ লস্ট্'এ। এ যেন কবির 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের সামগ্রিক ভাবমূর্তি। বোঝাতে পারছি না সেই সু-সম সুষমা।

মেয়েটি আমার জুতো খুলে বুড়ো আঙ্গুলটা দেখলো। নখের কোণটা ফেটে গিয়েছে। রক্ত ! খুশী হলাম। মনে পড়ল, এককালে মন্দিরে রক্তদান করা হত। ওর ব্যাগ থেকে ফার্স্ট এ-ড্ প্লাস্টার বার করে জড়িয়ে দিল। তারপর সে জুতোটা আবার পরিয়ে দিল। হাত আর কনুই ছড়ে গিয়েছে। ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে দু'টো মার্কিন বৈবমিষিক চ্যাংড়া হাজির। তারা হেসে বাঁচে না। 'বুড়োটাকে মনে ধরেছে !' আবার হাসি। মেয়েটা স্প্যানিশ ভাষায় জবাব দিতেই, ওরা খুব হাসতে লাগল।

আমি বলি, "ও নিশ্চয়ই এই মন্দিরের সূর্য-কন্যা। আমায় সাহায্য করছে।" বোধকরি, ওরাও ওকে অমনি একটা কিছু বলল।" ভার্জিন বা ভার্গো কথাটার সুর কানে এল।

মেয়েটির মুখ লাল। হঠাৎ জড়িয়ে ধরলো পিঠের দিকে। মাথা নাড়তে লাগল। 'ঠিক বলেছো।' (হায়, যদি ভাষা বুঝতাম! কিন্তু তা' হলে কি উচ্ছ্বাস ভরে অমন কবিতার সুরের মতো জড়াতো?)

ছেলে দুটো চলে গেল। একদল টুরিস্ট ঢুকলো। মেয়েটি আমায় ধরে বসিয়ে দিল একটা গুহার মতো জায়গায়। এরই ওপরটায় গোল মন্দির। চারধারে চারটি জানলা। ঠিক যেন সূর্যের আলোক আসার পথ। কিন্তু এ গুহার তিন দিকে ঠোস্ নিরেট পাহাড়। ভিতরে একটা বেদীমতো। বলে, এখানে রাজন্যবর্গের বা রাজবংশের মমী রাখা হোত। হত হয়তো। অনেকগুলো কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল।

আমি বসে রইলাম। একজন গাইড এসে কী যেন বোঝাতে লাগল ফরাসী ভাষায়। সবাই ওপরে চায়, ছবি নেয়। তারা সরে যেতেই আমি বাইরে এসে দেখলাম। ওপরটায় ঠিক যেন বিরাট এক কণ্ডোর পাখি থানা দিয়ে বসে। তলায় —একী !!

তাজ্জব !!

এখানেও!

এই সমস্ত পাহাড়টাকে (ছোট বলেই হয়ত) একটি অতিকায় পাখির আকার দিয়েছে। পাখিটা কণ্ডোর। কৃষি-প্রধান সভ্যতার চির আদরের জীব। শিল্পী একে প্রাণ দিয়েছিল একজোড়া উড্‌ডীয়মান বিস্তীর্ণ পাখায়। পাখা দু'টি কালের প্রকোপে ভেঙ্গে গেলেও পাখিটির বিশাল এবং প্রলম্ব গ্রীবার পারে আকাশগামী দৃষ্টি—মনে করিয়ে দিল দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সেই কাক,—নিসর্গসত্ত্বার কায়িক প্রিমিটিভিজম্; মনে করিয়ে দিলো—রামকিঙ্কর বাইজের পৌরুষভরা বাটালির ঘায়ে কর্কশ বন্ধুর সঙ্গীত সৃষ্টি।

আর তার নীচেই মসৃণ এক বেদীর তলায় নিখুঁতভাবে কেটে গড়ে রাখা চিরন্তনী জননীর মাতৃকা-যন্ত্র। সেই ত্রিকোণ, সেই মুক্ত পল্লবের মাঝে সতী ফলকের অন্তরে "সেন্দু-বামাক্ষিযুক্তং' ( ) স্ফীত গর্ভাঙ্কুর! আর তাকে ধারণ করে আছে একটি অঞ্জলিত স্থালী। ওপরের বেদীতে বলি হলে, বা বলির সদ্যচ্ছিন্ন অংশ রাখলে সেই শোণিত ধারায় অভিষিক্ত হত জননীর জনন-তীর্থ, এবং সে ধারা স্থালীর ঝুলন্ত কোণের ফাঁকে সুড়ঙ্গ বেয়ে ধরণীর গভীর গর্ভে অদৃশ্য হয়ে যেত।

আমার চেয়ে থাকা দেখে গিরিকন্যা (নাম যে জানি না) থ' হয়ে দেখছে,—আমায়, —কণ্ডোরকে, মাতৃপীঠকে আর বেদীকে।

জুতো আমার খোলাই ছিল। মোজাও। পাশে নালি দিয়ে জল বইছিল। জল ছিটুলাম মাথায়। আচমন সারলাম। টুপী ভরে জল নিয়ে মায়ের চিহ্নে ঢাললাম। বেদীতে বসে মালা নিয়ে বসে গেলাম।—(আমি মানুষটা একটু প্রিমিটিভই বটি)।

—"ওঁ ধর্মাধর্ম হবির্দীপ্তি আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্নাবর্ত্মনা নিত্যমক্ষ-বৃত্তির্জুহোম্যহম্ ॥
মধ্যে বর্ত্মসমীরণদ্বয়মিথঃ সংঘট্ট সংক্ষোভজং
শব্দস্তোমমতীত্য তেজসি তড়িৎকোটি প্রভাভাস্বরে।
উদ্যান্তীং সমুপাস্মহে নবজবা-সিন্দূর সন্ধ্যারুণাং
সান্দ্রানন্দ সুধাময়ীং পরশিবং প্রাপ্তাং পরাং দেবতাম্ ॥—

কতক্ষণ বসেছিলাম, জানি না। কিন্তু বসেছিলাম। স্নিগ্ধ এক আবেশে তনুমন চিত্ত যেন সদ্য-সমুদ্র স্নান নিবৃত্ত বৃত্তির মত একাধারে অশান্তে শান্ত, শান্তে অশান্ত।...

...এবং কী আশ্চর্য! আমার ঠিক পিছনে সেই স্বতোৎসারিতা নন্দিনী তরুণীটিও আমারই মত আসন করে বসে! তখনও সে চোখ খোলেনি; কিন্তু তা'র দু'গাল বেয়ে জলধারা বইছে।

[পরে এই ঘটনাটি রোড্রিগেজকে নিবেদন করি।

সে বল্‌লো—"হবে পিউনোর কোন মেয়ে। কি-জানো, তিতিকাকায় ছোট ছোট দ্বীপ আছে। তার মধ্যে বিশেষ করে মেয়েরা এখনও সূর্য-পূজা করে। তুমি যদি ইঙ্গিত করতে ও ওই বেদীতে বা একান্তে নিরাবরণাও হতে পারত। তোমার মাতৃতীর্থ পূজা ঐ তরুণী বস্তুতঃ করারই সুযোগ দিত। পিউনোর মেয়েদের আমরা যজ্ঞকুণ্ড বলি।"

আমি বলি, "আর আমাদের শ্রুতি যজ্ঞকুণ্ডকেই 'মা' বলেন। একবার এক যজ্ঞ-কুণ্ডের নারীকে কামার্ত পশুরা উলঙ্গ করেছিল। তারা সবংশে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।"

রোড্রিগেজ বলেছিল, "আর সব ঘাঁটাও। নারীর লজ্জা ঘেঁটো না।"]

কি করে আর তাকে বিরক্ত করি! সরে এসে, মোজা-জুতো পরে জলে হাত ধুয়ে আবার মাথায় জল ছিটিয়ে ফিরে আসি; দেখি, মেয়েটি নেই! সামনের দিকে চেয়ে দেখি, ধীরে ধীরে সে সূর্য-মন্দিরের গলি ধরে চলে যাচ্ছে!

ওকে ধরতে গেলে, ডাকতে গেলে যে, আমায় শেষ হওয়া গানের সুরকেও ডেকে আনতে হয়।

হাত জোড় করে প্রণাম করলাম। বললাম, 'যাও মা; আবার এসো।'

এবার যখন মধু এল সঙ্গে সেই মার্কা। একগাল হেসে মধু বল্‌লো—"ও ছাড়লো না।"

—"ওর বুড়ো কোথায় গেল?"

—"সে অনেক কথা। মার্কা আর ইয়ানের মধ্যে এক ব্যাপার নিয়ে এদের গোলমাল চলছিলই। মধ্যে মার্কার ট্রাইবের কিছু বন্ধুর সঙ্গে মার্কার দেখা হয়ে গেছে। মানে বিপদ। ফলে রেঃ হামফ্রীকে স্বেচ্ছায় শুধু আত্মরক্ষার জন্যই মার্কার সঙ্গে ফারাক হয়ে

থাকতে হচ্ছে। সে অনেক ব্যাপার। মোটামুটি এখন ওদের গ্রুপ আলাদা; আমাদের গ্রুপ আলাদা।"

বলছে, আর হাসছে মধু। ও পেয়েছে মজা। (আমি বুঝেছি মজাটির রং)। মধুর 'আমাদের' শব্দটির ব্যবহার বেশ মধুর ঠেকলো। এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, "এখন আমরা ওপরে সূর্য স্তম্ভে যাচ্ছি। ধীরে ধীরে হলেও, আপনি কিন্তু আসবেন। কিন্তু কী হয়েছে আপনার? চোখ এত ঘোলাটে কেন? কাঁদছেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন? আপনি যেন অন্য রকম হয়ে গেছেন।"

কোন কথা না বলে এগিয়ে গিয়ে আমি মার্কার হাতখানা ধরে আমার বুকের ওপর চেপে ধরে বলি,—

Thou O woman, art the all mighty resplendant
Power of the sun of Infinite Strength.
Thou woman, art the primal seedling
of the Universe ;—
The Paramount Mystry of all creation.' —

[ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা। বিশ্বস্য বীজং। পরমাসি মায়া।]

মেয়েটি—সেই মার্কা, আমার পিঠে হাত রাখে। বলে, "কিন্তু বাবা আপনি রীতিমত কাঁপছেন। কী হয়েছে আপনার? ডাক্তার ডাকবো?"

হেসে ফেলি। "ডাক্তার? না। বিবর্তন একটা ঘটেছে। ঠিকই বটে, কিন্তু এমন বিবর্তনের প্রসাদ না পেলে আমি কি হতাম, মা?"

"মা! আপনি আমায় মা বলছেন? কেন?"

আবার হাসি। বলি, "মা-ই যে তুমি। জননী (The Universal Creative Power). যাও সূর্য-স্তম্ভে তোমরা অপেক্ষা কর। আমি এখন তোমাদের পেটে ঢুকতে চাই না।"

—"পেটে?"

—"হ্যাঁ গো পেটে।...চারিদিকে চেয়ে দেখ তো! এই সমগ্র গোপন নিভৃত ভূমিটির রূপ কি তোমায় মহামাতৃকার গর্ভভঙ্গীর শাশ্বত রূপটিকে মনে করাচ্ছে না? চেয়ে দেখো ঐ পূর্ব দিকের দুই মন্দির চন্দ্র-সূর্য, ঐ দুই বিন্দুর দুই কোণ। সেই বিস্তারের পশ্চিমে সমগ্র ইন্কা জীবনের দেহ-বিস্তৃতি, ধনে-সম্পদে, প্রাণে, গতিতে অব্যাহত, অফুরন্ত, চির দেদীপ্যমান অপরূপকান্তি। আর নিভৃত হতে নিভৃত, অজ্ঞাতের আবরণে ঢাকা— ঐ দেখ পশ্চিমের ক্রমশঃ ক্ষীণায়মান তৃতীয় কোণ; সেখানে অগ্নির শিলীভূত লিঙ্গ-রূপী ঐ হুয়ানা পিচ্চুর শিখর—উদ্যত হয়ে আছে। এই ত্রিকোণাত্মিক ত্রিভুজ শক্তিপীঠ কী ইন্কা রহস্যের মহাগর্ভ নয়? দেখ, এর দ্বিদলের মাঝে প্রবহমানা নদীকে। দেখ চেয়ে চারিধারে, বন-বনানীর সমারোহ। দেখ তোমার মন, দেখ মধুর চিত্তে প্রবহমান রসমাধুরীর তরঙ্গভঙ্গ। এ-তো স্বয়ং মহামায়ার লীলা-ক্ষেত্র, লীলন-রঙ্গভূমি। এখানে শুধু

ধাও, দৌড়াও, বিপুল বেগে হারিয়ে যাও। আকাশে, বাতাসে, সূর্যালোকে তরঙ্গ তোলো। মন এক কণ্ডোর পাখি। ডানামেলে চলে যাক সূর্যের পড়োশী হয়ে। যাও। আমি আমার কাল-স্তিমিত পদ সঞ্চারে ধীরে ধীরে চলি। ধীর ও দ্রুত, লয় ও প্রলয়, গতি ও স্থিতি—এ ভ্রূণের মায়ায় প্রাণ ও মৃত্যু এক হয়ে আছে। এটাই মহা-শ্মশান।

* * *

সত্যই তাই। পরে জেনেছিলাম, এই মৃত্যু-গুহায় পাওয়া গিয়েছিল বহু কঙ্কাল। তারা ছিল রাজবংশের মৃতক। সে-তখন এটা ছিল রাজধানী। কিন্তু ইন্‌কা মান্কোকে হত্যা করা যখন শেষ হল, তখন তার পরের স্ফুলিঙ্গ কামাক আমারু স্থির করলেন, এই নব-কুজ্‌কোও (মাচ্‌চু-পিচ্‌চুকে গাইডরা বর্ণনা করে 'রিপাব্লিকা অব কুজকো) পরিত্যাগ করে ইন্‌কা মর্যাদাকে গভীরের অন্তস্তলে নিয়ে যাবেন।

তাই গেলেন।

কিন্তু মন্দির? দেবতা? উপাসনা?

সে সব কি স্তব্ধ হয়ে যাবে? কেন?

সূর্য-কন্যারা তখন রুখলেন। 'আমরা উৎসর্গীকৃতা এই বেদীর যজ্ঞে। আমরা যাব না। যাচ্ছি না।' তাই শুধু তাঁরাই রয়ে গেলেন।

সংবাদ গোপনে গোপনে সরীসৃপের মতো ঘুরে বেড়ায়। কুজ্‌কোকে কেন্দ্র করে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সব মন্দিরের নিবেদিতারা ধীরে ধীরে সবার অলক্ষ্যে এসে জড়ো হয়েছিল এই দুর্গমে। এখানে চাষ করার জন্যও কোন পুরুষ থাকতে পেতো না—ছিল না। সুতরাং চাষও করত মেয়েরা। কিন্তু কত কাল? একটি প্রজন্মে, দুটি প্রজন্মে শেষ হয়ে গেল। সেই অক্ষত যোনি সূর্য-কন্যারা জীবন্ত কেউ আর নেমে যায়নি। সকলেই কৈশোর, তারুণ্য, যৌবনের অর্ঘ্যদান শেষে জরার কোলে ঢলে পড়েছিলেন। আর চিহ্ন রেখে গেছেন কঙ্কাললিপিতে। সেই সব কঙ্কাল,—সবই স্ত্রী কঙ্কাল,—আজ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা দেখেন, আর অবাক হন। এই বিস্মৃত নগরীতে শুধু ছিল নারী? কেন? কেন? কেন এতো কুমারীর অপচয়?

"হ্যাঁ কন্যা, ওগো পিউনো-তিতিকাকা কন্যা,—হ্যাঁ। এটা সত্যই মহাশ্মশান। এর অধিনায়িকা, উত্তরসাধিকা,—তুমি, তুমি—তুমিই বটে!"

ওরা কী সব বলতে বলতে চলে গেল ওপরের পথ ধরে। বুঝতে কষ্ট হয় না যে আমার কথাই বলছে। আমি আমার পথ ধরলাম।

* * *

একটি দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ সোপান-শ্রেণী নেমে গেছে 'শহরের' বুকে, যার নাম এখন এস্‌প্লানেড্‌। আমি নামলাম না এখন। বাঁয়ে উঠে গেলাম। একটি বারান্দা মতো। তা পার হয়ে মেঠো মাটির পথটা এসে থেমেছে পাহাড়ের 'খনি'-তে। মাচ্‌চু-পিচ্‌চুতে যে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে, তার বেশীর ভাগই এখান থেকেই আহৃত। বোঝা যায়,

পাহাড়ের গা তাতিয়ে সেই তাতানো পাথরের গায়ে হঠাৎ বরফ-হিম জল ঢেলে দিয়ে ইনকারা পাথর ফাটাত।

এই পাথুরে 'জঙ্গলের' গহ্বরেই বিংঘাম পেয়েছিল কঙ্কাল। তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই ছিল মেয়ে-কঙ্কাল। সোজা চলতে চলতে বাধা পেলাম। একটা দেয়াল। বিশাল দেয়াল। বিশাল বিশাল পাথরের তৈ'রী। দেয়ালের মর্ম স্পষ্ট। এর পায়েই ছিল মন্দির-তলা। এখন কিছু নেই। আছে মসৃণ পাথরের বেদী। শবকে এখানে এনে অন্ত্যেষ্টির কৃত্য করা হত। কারু কারু মতে—পুরোহিতরা এখানে বলির জন্য পশু (মানুষ?) বাঁধতেন। এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বলি দিয়ে দেবতার প্রতীক 'কণ্ডোর'কে ভোগ দিতেন।

কাছেই বিচিত্র, কিন্তু খুব যত্নে কাটা পাথরে গড়া ঘর। তিনটি জানালার মধ্য দিয়ে হুয়ানা-পিচ্চুর মহান রূপ উপভোগ করা যায়। অনেকক্ষণ বিমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। যে দেয়ালের অবলম্বনে ঘরের প্রধান কড়িখানা পাতা থাকতো, পিরামিড আকারে গড়া সেই দেয়ালটি নীরবে দাঁড়িয়ে। সামনে উঠোনে বিশাল একটা গোল পাথর। বসতো? নাইতো? গাল-গল্প করার আসর বসতো? 'ধারা-যন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে'? সবই ঠিক আছে। শুধু মাথার ওপর একটা চাল লাগিয়ে দিলেই তাজা ঘর একটা হয়ে যায়।

এবার মন্দির। সূর্য-মন্দির। কোরিঞ্চা? ইন্তী? ভীরাকোচা? ইল্লাপা? পাকামাম্মা? মামা কোচা? মাম্মা কুইলা? ইকাম্মা? (*) কার মন্দির?

কতোই তো দেব-দেবীর মন্দির সেই পাচাকামাকের ধ্বংস থেকে কুজ্কো, সাক্সাহুয়ামানের ধ্বংস পর্যন্ত ফিরিঙ্গীরা ধর্মের দোহাই পেড়ে ভেঙ্গেছে। কিন্তু পেরুবাসীরা জেনেছে মন্দিরে স্বর্ণ-ভাণ্ডার ছিল বলেই মন্দির ধ্বংসে ফিরিঙ্গীদের ছিল এত উৎসাহ। ধর্ম ছিল ভান। (কাজেই, এই টিপ্পনীর ফলশ্রুতি হিসেবে গির্জার গায়ে ওরা আজও অপকর্মের ধারা বইয়ে দেয়—দিয়ে শতাব্দীর পোষা সিনিসিজম্-এর তৃপ্তি খোঁজে।)

একটা গল্প এ বিষয়ে খুবই চলে। কুজ্কোয় কোরি-কাঞ্চার সূর্য-মন্দির লুঠ হল। মন্দিরে মণ মণ সোনার সজ্জা, মূর্তি, উপকরণ, বাসন। তা'র মধ্যে ছিল বিশাল একটি গোল পরাতের মতো মুখোষ। সেই মুখের ছাঁচের চারধারে অপূর্ব ছটা। সেটা ছিল সূর্যেরই প্রতীক। এটি ভাগে পড়ে এক সেনানীর। হোক তা সূর্য-মূর্তি, সে রাতেই মাত্র জুয়া খেলেই সেই সেনানী, সেই বিশাল স্বর্ণ-প্রতীকটি হারায়। আর স্পেনের ভাষাকে দিয়ে যায়, একটি প্রবাদ বাক্য:—'উদয়ের আগেই সূর্যকে বাজীতে হেরে যাওয়া।' (**)

(*) কোরিকাঞ্চা=ভাস্কর / তপন; ইন্তী=পূষণ; ভীরাকোচা=বিশ্ব-নাথ / বিরাট; ব্রহ্ম। ইল্লাপ =পর্জন্য (মেঘ); পাকামাম্মা=বসুমতী; মামা কোচা=বরুণা, সমুদ্রদেবী; মাম্মা কুইলা=চন্দ্রা; ইকাম্মা=উষা, শুকতারা।

(**) —"Jugar el sol antes que amanezca."

কুজ্কোর মন্দির গেল। দেশের বাছা বাছা সুন্দরী অভিজাত সূর্য-কন্যারা সাক্সা-হুয়ামান থেকে, কুজ্কো থেকে, কাজা-মার্কা থেকে আর কুইপা থেকে ছুটে এসেছিল এই পুণ্য নগরে! এখানে কোরিকাঞ্চার মন্দিরের পরেই ছিল ইন্তী এবং ভীরাকোচার মন্দির। মায়ের মন্দির, চন্দ্রার (মম্মাকুইলা) মন্দিরটি ছিল কিন্তু আরও গোপনে হুয়ানা-পিচ্চুর রহস্য ঘন অন্ধকারে। সঙ্গীত, পুষ্প, বর্ণ, মদিরা-প্রিয়াদেবী ছিলেন ইস্কাম্মা,—প্রত্যুষের শুকতারা, বড়ই সংবেদনশীল; যাঁর গতি-স্থিতির চালে স্থির করা হত পাঁজী, গণনা, হল কর্ষণ, বীজ বপন। সেই সঙ্গে পূজা হত মেঘ, জল, বিদ্যুৎ, ঝড়ের দেবতা ইল্লাপার, আর দেবী বসুমতী পাকামাম্মার।

এ দিকটা মন্দিরের তল্লাট।

অনেকগুলি লামা ঘুরছে। যাত্রীরা লামাকে আদর করছে। অনেকে ছবি নিচ্ছে। নীচে প্লাজায় একদল মানুষ দেশী সাজ-পোষাকে নাচছেও। পুরুষদের সাজে বলিষ্ঠ একটা স্বদেশিকতা আছে। মেয়েদের সাজ খুব সুন্দর। লাল রংয়ের প্রাচুর্য। শিরস্ত্রাণগুলির শোভা আছে।

খুব বেশী শোভা এই চৌকো ছাঁদের পাহাড়ী স্ল্যাবের মতো সুগঠিত সুষ্ঠু মেয়েগুলির। পায়ের গোছ আর পাতা কী সুডৌল সবল পুষ্ট। নিতম্ব দেশ চওড়া হলেও দৃঢ়। চোখের চাহনি কৌতুকে জ্বলজ্বল্ করছে। পয়সার জন্যই নাচছে বটে; কিন্তু ভোগও করছে নিজেদের যৌবন মাধুরী। ছোটো ধাঁচের খাঁচা বলে, যৌবন জ্যোতি ধরে রাখতে পারে অনেকদিন।

বাজনা দেশী। লম্বা বাঁশী, খাটো বাঁশী, ব্যাগ পাইপের ধাঁচে ছোটো ব্যাগ লাগানো বাঁশী। তাসা এবং লম্বা মাদল। পাহাড়ের গায়ে শব্দ লেগে খুব তীব্র একটা অনুরণন উঠছে।

সবাই চেয়ে কি যেন দেখছে একটা রেলিং থেকে। বহু নীচে এক ফালি জল রহস্যঘন জঙ্গলের শ্যামল জরায়ুর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। জলের ওপরে একটা সেতু। শুনলাম, ওই নগণ্য ধারাটিই আমাজোনের একটি উৎস। উরুবাম্বার নাভি। এই উরুবাম্বাই পরে আমাজোন। এটা তীর্থ; কারণ এটা আমাজোনের উৎস।

যাওয়া যায়?

খুব উৎসাহ হলো। ওটাই প্রাচীন পথ। ঐ পথেই বাস যাবে। আমরা যা'রা এখান থেকে যাবো হুয়ানকায়ো, আয়াকুচো—এই তো পথ। জীবনে কখনও চিন্তাও করিনি আমাজোন দেখবো। দেখবো পিউনো, তিতিকাকা।—মেরুদণ্ড দিয়ে যেন এক বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেল। মনে ভেসে উঠলো মহাকবির উদার স্বীকৃতি, 'দিকে দিকে তুমিই লিখিলে রূপের তুলিকা কলিকা করি রসের মূরতি!'

ফিরে গেলাম মন্দির তল্লাটে। তাড়াতাড়ি সবটা দেখে নিতে হ'বে। কিন্তু এই

প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরে মস্ত এক বেদী, অনেকগুলি তাক। ঝর ঝর করে জল বয়ে যাচ্ছে দেয়াল ঘেঁষে। এই মন্দিরে একাধারে পঞ্চদেবতার পূজা হতো।

বাঁয়ে মুড়ে মন্দিরের পিছনে গেলেই বিশাল অথচ চারদিকে প্রাচীর ও ছাদহীন একটি ঘর। না, কখনই এ ঘরে ছাদ ছিলো না। ঘরের মাঝে বিশাল এক পাথর। বলে, পুরোহিতের ব্যক্তিগত সাধনার স্থান। এখানে স্নান সেরে তিনি পোষাক পরতেন। পোষাক রাখার স্থানও আছে। আর প্রয়োজন মত বিশিষ্ট রাজবংশীয়ের শবদেহকে মমী করার ব্যবস্থাও এইখানেই করা হোত।

এরই একপাশে রান্নাঘর। রান্না আকাশের তলায় হলেও এখানে ভাঁড়ার, মসলা-বাটা, মাংস বা কুটনো কোটা চলতো। শিলগুলি, পাথরের গর্তে খোদাই খোরাগুলি এখনও খালিবুকে চেয়ে আছে।

আরও এগোই। কতো সিঁড়ি যে এর মধ্যে পার হলাম! কিন্তু স'য়ে স'য়ে। দেড় হাজার সিঁড়ি নাকি শেষ করেছি। কিন্তু দেখছি ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছি। যেখানে যাই— যেন আমি একা; বিশ্বভুবন ফাঁকা। কেউ নেই। কেবল মাঝে মাঝে ওপরের দিকে চাইলে দেখি, তরুণ-তরুণী গা ঢেকে ভারী জামা খুলে বসে আছে। কী গল্প করে ওরা? আমরাও কি ঐ বয়সে অমনি গল্প করতাম? তার ভাষা কি? ভাষার তো অর্থ হয়। ওদের এই মর্মালাপের ভাষা আছে কি?

হঠাৎ একটা ডাক।

ওপর পানে চাই। অনেক ক'টা সিঁড়ির পারে ওই টোঙ্গের মাথায় মধু আর মার্কা। ডাকছে আমায়। ওরা খুশী। আমি যে 'পেরে গেছি' এই খুশীতেই ওরা উচ্ছল। চুয়াত্তরটি উত্তরায়ন পার করে আমি এই সূর্য নিকেতনে এসে পড়েছি।

ইন্তীহুয়াতানা—সূর্য স্তম্ভ—প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের অপার বিস্ময়,—আর, জ্যোতিষের গবেষণার বস্তু। এই ইন্তীহুয়াতানা কি? এর পাশে দাঁড়িয়েছি।

কি তা কেউ জানে না। শুধু জানে, সারা মাচ্‌চু-পিচ্‌চুর মধ্যে এমন স্পষ্টতঃ সুন্দর, গৌরবিত ধারণার স্তব্ধ প্রতীক, সাধনার বেদী আর নেই। সসম্ভ্রমে পাহাড়ের শিখর কেটে বার করা সোপান, বেদী, কুণ্ড, স্তম্ভ এই গ্রানাইট চত্বরটিরই ভ্রূণ থেকে কুরে বা'র করা; কোনো জোড় নেই। আশে-পাশে কিছু নেই। ওপরে আকাশ। চারিধারে নিস্তব্ধ পর্বত-প্রাচীর। এই এককতা, এই সমাহিত নির্লিপ্ততা—এ কেন?

স্তম্ভটি গোল নয়; চতুষ্কোণ। ওপরে নেই কোনো প্রতীক। মাত্র পাঁচ ফুট উঁচু; ছায়া ফেলছে তলার মসৃণ বেদীর বুকে। এই ছায়া ধরে কি পঞ্জিকা গণনা করা হতো? কর্কট-মকর-ক্রান্তি ভেদ কি এই ছায়া পড়ে করা যেতো। একালীন কম্পাস বলছে,—স্তম্ভের চারটি কোণ চারটি মূল দিশাকে অতি শুদ্ধভাবে নির্ণীত করছে। 'ইন্তিহুয়াতানা'র অর্থ 'যেখানে সূর্য বাঁধা পড়েছে'!

এই পরিচ্ছন্ন অবাধ বেদীর ওপর স্তম্ভ, তার ওপর আকাশ। মাচ্‌চু-পীচ্‌চুর শীর্ষদেশ। পবিত্র, শ্রেষ্ঠ, গরিষ্ঠ দেশ। যেদিকে চাই, সমগ্র মাচ্‌চু-পিচ্‌চু তার বিস্তীর্ণ

জননাত্মিকা প্রজনন-মূর্তি মেলে পড়ে আছে। স্নিগ্ধ, শ্যামল, সমৃদ্ধ নির্জন। উত্তরে বেশ বড়ো একটি বসতি চিরে পথ চলে গেছে হুয়ানা-পিচ্‌চুর দিকে। জঙ্গল সেখানে গভীর। হরিণ, পুমা, অজগর, কণ্ডোর, আর ভালুকের ভয়েরও বড়ো ভয়। কিম্বদন্তীর ভয়: মৃতের নিঃশ্বাস, কঙ্কালের চলে বেড়ানোর তৃষ্ণা। বহু গুহা, বহু কঙ্কাল। কিন্তু বলে, আজ যেখানে একটা গুহায় কঙ্কালগুলি গুছিয়ে রেখে গেলে, কাল এসে দেখবে, তারা অন্যত্র নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে বসে আছে! এ কেন? কে কার? পশুরা নিয়ে গেছে? তাদের পদচিহ্ন নেই, গন্ধ নেই, বিষ্ঠা নেই, কঙ্কালের কোনো টুকরো কোথাও পড়ে নেই। সন্দেহ, সমস্যা, রহস্য! কেউ হাসে, কেউ সরে যায়; কেউ বিস্ফারিত চোখে সমস্যাটি শুধু গিলে ফেলে। (এমনি একটি কিম্বদন্তী লেপটে আছে বার্বাডোজ দ্বীপের সেণ্ট জর্জ গির্জার তলায় সমাধি ঘরের অন্ধকারের গায়ে)।

নীচে চাইলে পূবে দেখা যায়—সারি সারি বহু বাড়ি। ওগুলো ছিল বিদ্যালয়, পুস্তকালয়, শিক্ষকাবাস, আর ছাত্রাবাস। পণ্ডিতদের আর মনিষীদের মহাস। তার নীচে সাধারণ লোকালয়, বৈশ্যদের বাস; শিল্পী, মিস্ত্রী, খেটে খাবার মানুষদের বাস। খুব ঘিঞ্জী। এরই কাছে থাকত চাষবাসের পণ্ডিত আর শ্রমিকরা। কিন্তু চাষ তো সকলকেই করতে হত।

এই সব বসতির মাঝে মাঝে মুক্তাঙ্গন। বহু মুক্তাঙ্গনের মধ্যে আবার বিশাল এক মুক্তাঙ্গন—প্রায় অর্ধেক গড়ের মাঠ। এই মাঠ ধরে পশ্চিমটায় ধাপে ধাপে কৃষিভূমি নেমে গেছে কল্লোলিনী উরুবাম্বা নদীর কিনারা পর্যন্ত।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে উরুবাম্বা রেজার্ভয়ার, এবং সংলগ্ন পাওয়ার হাউস। এই বিদ্যুতই কুজ্‌কো এবং কুজ্‌কোর পথে চার-পাঁচটা শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে।

নামতে হবে। মধু আমায় একা থাকতে দিয়ে নেমে গেছে। আমি ফিরতি পথে আর গেলাম না। অসম সাহসিক তরুণ-মিথুনরা ধরেছে পাহাড়ী পাগদণ্ডী, যেখান থেকে স্খলন মানে 'দুই চিতে পাতালে পতন।' এখানে দুই-ও লাগবে না, এক চিতই যথেষ্ট।

কিন্তু এ পথ ধরলে সহজেই প্লাজায় গিয়ে পড়া ছাড়াও হুয়ানা-পিচ্‌চু যাবার পথ পাবার সম্ভাবনা আছে।

প্লাজা ছাড়া ইনকারা নগর স্থাপত্য চিন্তাও করতে পারত না। এই কারণেই প্রতি ফেরঙ্গ নগরের নাভিকেন্দ্র একটি প্লাজা-দ্য-আর্মাস্‌; প্রধান চৌক। এই প্লাজার পাশ দিয়ে গেলে দু'টি সাংঘাতিক স্থান দেখায় গাইডেরা। একটিকে বলেছে জেল। বোঝা-ই যায়, সুশাসনের ফলে জেলে বেশী লোককে থাকতে হতো না। অন্যটি ভীষণ,—টর্চার চেম্বার; যেখানে অপরাধী বা অপরাধিনীকে 'যন্ত্রণা'র কলে নির্যাতন করা হতো, কথা আদায়ের জন্য। ষড়যন্ত্রীদের নরক ছিল এটি। মেয়েদের জন্য উপুড় হয়ে মেঝেতে শুয়ে

মাথাটি রাখার খাঁজ কাটা। পুরুষদের ঠেসে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো দেয়ালের মধ্যে গড়া ফাটলে। উদ্দেশ্য, উভয়ক্ষেত্রেই হাত-পা বেশী না ছুঁড়তে পারে।

রহস্য করে যাত্রীরা বলছে শুনলাম,—'আমা সুআ, আমাকেলা, আমালুলিয়া (এটাই ছিলো এই জগতের মুখ্য ন্যায়ঃ ঠগ নয়, আলস্য নয়, মিথ্যা নয়)। ইনকা জগতে এটাই ছিল প্রতি সাক্ষাতে 'বন্দেগী, 'নমস্কার', 'গুডমর্নিং'। প্রতি নমস্কারে বলতে হোতো,—'আমাতোক'। তথাস্তু। সেম্-টু-য়ু। যে দেশের নৈতিক ভিত্তিতেই নিত্য দিনের এই চেতাওনী,—ঠগাবো না, কুঁড়েমী করবো না, – মিথ্যা বলবো না,— সে দেশের জেলখানা ছোটো হবে, আর জেলখানা ছোটো যদি হয়,—তবে এ সব সত্ত্বেও যা' অপরাধ সেজন্য যন্ত্রণা দিয়ে সত্য আদায়ের ব্যবস্থা থাক ব, তাতে আর আশ্চর্য কী?

'যৌন অপরাধ? ছিলো কি?'—জিগ্যেস করলাম, সেই লোকাল গাইডকে।

'কেন থাকবে? কেন থাকবে না?'—বলে হেসে উঠতেই তার দলটাও হেসে উঠলো।

যে দেশে দেহ নিয়ে ছুঁৎ ছিলো না,—অনেক বেশী ছুৎ ছিলো মিথ্যা ভাষণে, কুঁড়েমীতে – সে দেশে যৌন অপরাধ অর্থেই মিথ্যার আশ্রয় নেবার অপরাধ। একাধিক মেয়ে যখন পুরুষের সাথে বিহার করতো, তখন একাধিক পুরুষ নিয়ে হৈ-চৈ ছিল না। ও সব ভণ্ডামী ক্যাথলিকরাই আমদানী করেছে। কিন্তু শুনতে পাই,—'চ্যাষ্টিটি বেল্ট' ইন্‌কুইজিশন আর কনফেশন্ চেম্বার সত্ত্বেও ফিরিঙ্গী সমাজে বেশ্যালয়ও ছিল যতো, যৌন অপরাধও গুণতিতে ততো। ইন্‌কা সমাজে দেহগত মিলন নিয়ে কাঁদা-কাটা অবশ্যই হোত, কিন্তু 'অপরাধীকে?'—সেটা সাব্যস্ত করে তাকে জেলে আনা হোত না। সে জন্য ছিলো পঞ্চায়েৎ।

ভীড়ের মধ্য থেকে এক ছোকরা বলে উঠল, 'এখানে এসেই থাকব।'

একটি মেয়ে বলে ওঠে,—'থাকতে দিচ্ছে কে? আমরা যে ক্যাথলিক নই? ভুলে গেলে?'

হাসির হুল্লোর বয়ে গেল।

শ্মশানটা খুবই উঁচুতে। শবকে পোঁতা হোত, বা মমী করে ঢাকা দিয়ে রাখা হোত। শ্মশানের খবরদারী ছিল। পাহারাদারের ঘরখানা এখন-ও অটুট দাঁড়িয়ে আছে।

যে পথ দিয়ে মাচ্‌চু-পিচ্‌চু প্রবেশ করা গিয়েছিলো সেই পথের উৎরাই দিয়ে দীর্ঘ এক সোপানশ্রেণী। এই সোপানশ্রেণী যেখানে শেষ সেখানে একটি গেট। কুজ্‌কো থেকে যে ইনকা পথ গোপন দিশা ধরে এখানে আসত, সে পথ এই গেটে থেমেছে। গেটের ওপরের একখানা পাথরই "চৌকাঠে"র মাথা। সে পাথরের ওজন দেখলে কোণারক মনে পড়ে যায়।

গেটের ধার দিয়ে পথ—সিঁড়ি ধরে, গিয়ে থেমেছে বিশাল এক পাথরের চাঁইয়ে। খুব নিভৃতে যা'রা পোড়াতে চাইতো শবদেহ, এটা তাদের জায়গা।

আমি চলেইছি। এবার খুব সঙ্কীর্ণ পথ। পাগদণ্ডী। কিন্তু কম হলেও লোক চলছে। 'হুয়ানা-পিচ্‌চু'—খুব ছোটো একটা পাহাড আমায় টানছে।

হুয়ানা-পিচ্‌চু

হুয়ানা-পিচ্‌চু !! নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ভাবছি,—যাবো কি ? পারব কি ? সুন্দর ঝির্‌-ঝিরে বাতাস। যারা পাশে এসে বসল, তারা আমার জানা ভাষা জানে না। মেয়েটি ইঙ্গিতে জিগ্যেস করল, ওপরে যাচ্ছি কি-না।

চুপ করে রইলাম।

পুরুষ বল্‌লে—'তুমি কি একা ?'

মাথা নাড়ি - 'হ্যাঁ'

তীব্র মাথা নেড়ে পুরুষ বলে, 'না - না—না, অমন কাজটি কোর না। খাড়াই। স্লিপ করেছো কি—

মেয়েটি ছেলেটার হাত চেপে ধরে লাগাল এক ধমক। বুঝলাম, যুবক হয়ে বুড়োকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে ; এই অপরাধে শক্তিময়ী মাতৃ-মূর্তিটি তাকে বকছে। ঝোলা নেড়ে সেই মেয়েটা আমায় একটি কমলা দিল আর দিল একটি বড় টুকরো চকোলেট। আরও দিল। মোক্ষম সে দান, দু'টো কোকা পাতার গুলি।

—'চলে যাও ; ধীরে ধীরে যাও। মনে রেখ, চলতে গিয়ে মাঝ পথে পাক ঘুরে ফিরে আসতে পারবে না। ঘোরার মতো পরিসরই নেই। চলেই যেতে হবে। থামতেও পাবে না ! —সাবধান ! পারবে। পারবে। চলে যাও।'

কী ভাষায় তা'রা কথা বলেছিল ?

ভাষা ? মনের ভাষাই ভাষা। ভালোবাসা সবার সেরা ভালো ভাষা। পথ একটাই। সেকালে সিমলা থেকে তারাদেবী গিয়েছিলাম। সে যাওয়া ছিল সাংঘাতিক। কারুর সঙ্গে হাত ধরে যাওয়া দূরে থাক্। নিজের ছায়াটিকেও পাশে রাখার জায়গা নেই। তারাদেবী শুকনো খট্‌খটে পাহাড়। এ পাহাড় স্নিগ্ধ, মিষ্টি, সুবাসিত। বিরাট জলধারা পড়ছে পনের শো' ফুট ওপর থেকে। হুইনে-হুয়ানা। কিন্তু সে অনেক দূর। কিন্তু এ পাহাড়ে আছে দু'টি জলপ্রপাত। ক্ষীর ধারা ; কিন্তু পাহাড়ে পাহাড়ে এমনি সব শহর। একটির নাম 'ফুয়ো-পাতা-মার্কা'। পাহাড়ের গায়ে কেয়ারী স্পষ্ট দেখা যায়। দূরবীনে মানুষও দেখা যায়। কিন্তু পায়ে হেঁটে দু-দিন লেগে যায়। 'ফুয়ো-পাতা-মার্কা,' 'সায়াক মার্কা' সবই আকাশী নাম। 'মেঘের সওয়ার শহর', 'চাগিয়ে তোলা শহর'—নামের এই সব অর্থ।

কুজ্‌কো থেকে সোজা বা স্পষ্টতঃ কোনো পথই তো ছিল না। মাচ্‌চু-পিচ্‌চু

আসতে গেলে সে সব দিনে এই সব দুর্গম পথ বেয়েই আসতে হোত। কাজেই কেউ জানত না মাচ্ চু-পিচ্ চুকে।

আমার পথ খুব বেঁকে-বেঁকে হাঁড়ির গায়ে জোঁকের মতো চলেছে। তবে যেখানে সেখানে ঝর্ণা। ছায়া, রোদ। ভালোই লাগছে। আর প্রতি দশ পায়ে জিরুচ্ছি। দশ পাও নয় বোধ হয়।

আচ্ছা, কেন যাচ্ছি?

প্রশ্নটার জবাবে জীবনের একটি ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। একদা একটি প্রকৃতি সকালে আমায় ডাগর চোখ মেলে বলেছিল,—'আচ্ছা, তখন তোমায় কী চোখেই দেখেছিলাম! কী উদ্দাম সে বেগ! কী ভালোই বাসতাম!—এখনো বাসি। কিন্তু কোথায় গেলো সেই দিকচক্রবাল বিহীন দুরন্ত ঘূর্ণির টান? কেন এলো সে টান? কেন বলো তো? তুমি তো নির্বিকার থাকতে। আমি কী পাগল হয়ে গিয়েছিলাম? বিনা টিকিটে ট্রেনে ধাওয়া করেছি; বিনা নিমন্ত্রণে সভায় গিয়েছি। দুরুহ, দুর্গম তুচ্ছ বোধ···হয়েছে শুধু তোমায় দেখার আশায়। —কেন? শুধু কি পাগলামী? শুধু কি ফক্কা?

সেদিন তার প্রশ্নের কোনো উত্তর ছিল না। আজই কি এ নির্বোধ প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি?

মনে হয় সত্যিকার প্রেম এক পাগলামী। বলে, প্রেমোন্মাদ। এই যে আমার তাড়না, হুয়ানা-পিচ্ চু যেতে হবে, এও তো এক অন্য স্বাদের প্রেমোন্মত্ততা।

> 'কতো যে মরু, কতো যে নদীতীরে
> বেড়ালে বহি' ছোটো এ বাঁশীটিরে······
> কেন? কেন যে বেড়ালে? কেন?······
> ······উত্তর ঐ; 'কেমনে তাহা কব'।

সব পথ শেষ হয়। কোনো কোনো পথ আবার শেষ করে দেয়। বোঝা যাচ্ছে, বাঁ ধারের পাহাড়ের গা কে বা কারা বহু চেষ্টায়, বহু বৎসরে, বহু মৃত্যুর বিনিময়ে কেটে বার করেছে, পাহাড়ের নির্মম ভ্রূকুটি চেয়ে আছে তুচ্ছ মানুষের এই স্পর্ধিত বিষম—খেলার দিকে। খসে পড়েছে চাবড়া। দেখা যাচ্ছে তামার শিরা, তুঁত রঙের ব্লেদ, গ্রাফাইট্স, সালফারের নীল, হলদেটে, গেরুয়া রং। কোন রকমে পা ফেলে যেতে পারো,—গেলে। কিন্তু ফিরতে পারো না, ফেরার মত চওড়া অবকাশ কৈ? এক পা আগে, এক পা পিছে—এই চলা। হাতে লাঠি থাকলে ভাল হোত। নেই। ডানধারে অবিনশ্বর, নির্বোধ, ত্বরিত মৃত্যু। কিন্তু সে পথও হারিয়ে গেল। এর পরেই এ পাহাড় থেকে অন্য পাহাড় মাঝে অন্ততঃ দু'হাজার ফুটের গভীর খাদ। নদী দেখা যাচ্ছে না। তিনটি গাছের চাঁছা গুঁড়ি বেছানো আছে এ পাহাড়ের গভীর খাদ-নামা ভাঁজে। সেটাও পার হই। ভাবি, বোঝা পিঠে নিয়ে ইনকারা এ পথও পার হয়ে গেছে। এই পথ যখন চেঁচেছে, তখন কোথায় দাঁড়িয়ে চেঁচেছে?

হঠাৎ পথটি ঢুকে গেছে দু'-ভাঁজ পাহাড়ের মাঝে। দেখা যাচ্ছে আবার কেয়ারী ; কেয়ারীর পর কেয়ারী। চাষ হোত। এখনও ফলের চাষ হয়। হঠাৎ কয়েকটা গুহা : এফোঁড় ওফোঁড় গুহা। টানেল বলা যায়। তবে মানুষের গড়া নয়। গুহার গায়ে বিচিত্র চিত্র ; বিচিত্র লেখ।

এটা পার হয়ে এলে বেশ খানিকটা নেমে আবার এক গুহা। মস্তগুহা। সমুখে বিস্তীর্ণ অবকাশ। বসবার বেদী। এটিই হোল চন্দ্রাদেবীর মন্দির,—বীর সাধনের, তন্ত্র সাধনের তীর্থ। এতে এককালে দেবী মূর্তি ছিল। কিন্তু যখন মাচ্ চু-পিচ্ চু খালি করে কাপাক আমারু অজ্ঞাতের গূঢ় সমুদ্রে হারিয়ে গিয়েছিলেন, সঙ্গে তার পিতৃ পুরুষদের দেব-দেবী নিয়ে যেতে ভোলেননি। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এখানে কোনো দেব-দেবীর মূর্তি খুঁজে পান নি। পড়ে আছে শূন্য বেদী। সে মূর্তি কোথায় ? খোঁজ এখনও চলছে। বলে, সে দেবতার খোঁজ পেলে কাপাক আমারুর গুপ্ত-রাজত্ব ও রাজধানীর খবরও পাওয়া যাবে।

জল পড়ছে পাহাড়ের গা বেয়ে। বেশ করে মুখ-হাত-পা ধুয়ে যখন বেদীর ওপরে বসলাম, তখন বেলা তিনটে পার হয়ে গেছে। যখন উঠলাম, তখন চারটে। পাঁচটার পর মাচ্ চু-পিচ্ চুতে ঢোকা নিষেধ। রাতে এই ভগ্ন-স্তূপে কেউ কাটায় না। বলে, ডাকাতের উৎপাত। বিশ্বাস করি না। আসলে এই দেবী ক্ষেত্রকে ওরা নোংরা করতে দেয় না।

ঠিক ছ'টা তখন। পাহাড়ে অন্ধকার নেমে এসেছে। আমিও নেমে এসেছি। রেস্টুরাণ্টে সামান্য লোকজন। আমি পেঁপে আর ডিম সেদ্ধ নিয়ে বসলাম। এক জাগ কফি। পয়সা দেবার ফাটকে টার্ণপাইকের কন্যাটি আমায় জানাল মধু এবং মার্কা হোটেলে সীট্ বুক করে, অপেক্ষা করছে।

হোটেলে ? সীটবুক ? মধু এবং মার্কা ? সে কি ? কেন ?

'পঞ্চশরে দগ্ধ কোরে করিলে একী সন্ন্যাসী ?'

শেষ বাসটা আমায় নামিয়ে নিয়ে এল। সূর্য উদয়, সূর্য অস্ত—ওসব দেখতে হলে, সেই ইন্তিহুয়াতানা স্তম্ভের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। নৈলে নিষেধ-নিরুদ্ধ এই কণ্ডোরের ভয়াবহ প্রাচীর। ধুলো উড়িয়ে বাস চলেছে। পথের গায়ে গায়ে কায়-ক্লেশে ঝুলে আছে দশটি-বারোটি করে কুঁড়ে। বাস বাঁক নিচ্ছে, বাঁকের পর বাঁক—আর ওপরে নীচে,—এই ঝুলন্ত কুঁড়েগুলি। আবর্জনার স্তূপের আশে-পাশে যেমন কুকুর ঘোরে, আপনার উদর পূর্তির আশায়—তেমন, মাচ্ চু-পিচ্ চুর মতো ভুবন-বিদিত বিস্মৃত নগরীর ঝুলন্ত জিজ্ঞাসার আঁকশী আঁকড়ে এই সব অন্ত্যেবাসীর বাস। সেই স্টেশন পর্যন্ত পাহাড়ের গায়ে দগ্ দগে ঘায়ের মতো এই কুঁড়ে মণ্ডল।

একটা চমকানো ব্যাপার ঘটে গেল। বাসটাকে সর্ব সমেত তেরটা বাঁক নিতে হয়। এর মধ্যে প্রথম দুটো বাঁক ফুরুতেই বিরাট একটা 'ওয়াক্' শব্দ করে একটা বছর

বারোর প্রায় উলঙ্গ ধুলিকীর্ণ বালক (মনে থাকে যেন মাচ্চু-পিচ্চুর শীত) বাসের সামনে পড়েই 'হুস্' করে নীচের জঙ্গলে অদৃশ্য হ'য়ে গেল!

ব্যাপারটা কি - বোঝবার আগেই বাস বাঁক নিয়েছে আবার। পুনশ্চ সেই 'ওয়াক্',—লম্ফ, এবং অদৃশ্য হয়ে নীচে ছুটে যাওয়া। এতক্ষণ লাগছে বাসটাকে একটা বাঁক নিতে। পথও অনেকখানি। এরই মধ্যে ছেলেটা এতোটা পথ কী ভাবে অতিক্রম করলো? কেন এমন করছে? ওকি মনুষ্য দেহে হরিণ, না কোন শাখা-মৃগ?

সমাধান আসতে না আসতে, আবার বাঁক নিয়েছে। আবার 'ওয়াক', ছেলেটা আবার পড়েছে। উঠেছে। জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সবাই আশ্চর্য। মাত্র বারো বছর হয়তো বয়স হবে। এতো ক্ষিপ্র, তৎপর ও হয় কি করে? মোট অতোগুলো (১৩টি) বাঁকের মধ্যে নয় বার ও বাসের সামনে লাফিয়ে পড়েছে। শেষ দুটোতে তার দেখা না পেলেও স্টেশনে সে দাঁত বার করে হাত পেতে হাজির। দেখলাম বেশ কিছু রোজগার করলো। দিনে বাস নামে অন্ততঃ আটবার। আট বারই ছেলেটা এই কীর্তি করে। তার রোজগার ভালোই।

ওকেই ধরলাম। ও আলমাগ্রোকে চেনে কিনা। ও নেহাৎ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। তখন গাড়ী চালাবার মুদ্রায় বলি—জন্জন্। তার মুখটা সহসা সাদা হয়ে গেল। সে পাশ কাটিয়ে পালাল। কিচির মিচির করে ও পথের ধারের কয়েকটা পসারিণীর সঙ্গে উত্তেজিত কথাবার্তায় যোগ দিল। হতাশ হয়ে আমি রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে ওঠার সিঁড়িগুলো বেয়ে উঠছি, হঠাৎ উস্কো-খুস্কো চুল এক যুবক এসে বল্লো—"তোমার সঙ্গী মধু 'হোটেল-মাচ্চু পিচ্চু'তে আছে। তোমায় খবরটা দিতে বলেছে। হোটেলে হেঁটেই যেতে পারবে। এই পথে নেমে যাও। একটাই পথ।"

সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেলো লোকটা। আমি সেই পথ ধরলাম। মিনিট দশ হেঁটেছি। সন্ধ্যার ঘন ছায়া ঘনিষ্ঠ হয়ে চেপে ধরেছে; জঙ্গলের ঝিঁঝির শব্দ উচ্চকিত হচ্ছে। ঠাণ্ডাটা ক্রমশঃ শীত হয়ে হাড়ের মধ্যে দস্তুর আক্রমণ চালাচ্ছে। দূরে হোটেলের আলো দেখতে পাচ্ছি। শুনছি উরুবাম্বার নির্জন নির্ঝরের ঝঙ্কার।

চমকে উঠি একটা ঝোপ থেকে ঝুপ করে সেই যুবকটি যখন এসে পাশে দাঁড়ালো, বেশ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলো—"তুমি কে? জনজন্কে কি করে জানলে? কি কাজ তার সঙ্গে?"

অনেকগুলি প্রশ্ন; এবং জিজ্ঞাসার ধরনটিও খুব রূঢ়। কিন্তু এটা বিদেশ। জঙ্গল। "পথ বিজন, তিমির সঘন, কানন কণ্টকতরু-গহন, আঁধার ধরণী"—সবগুলো সত্য সত্য মিলে যাচ্ছে। শান্ত মেজাজে বলি,—"কুজ্কোয় আমাদের বাসের গাইড ওর ট্যাক্সিটির সুপারিশ করেছিলো।"

—"কে গাইড? মেয়ে না ছেলে?"

"নাম তো জানি না। কুজকো হোটেলের লাউঞ্জে দেখা একটি পুরুষ। বয়স চল্লিশ হবে। এদেশে বয়স বুঝতে পারি না।"...একটু হাসবার চেষ্টা করি।

নদীর দিকে নামতে নামতে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লো—"হোটেলে অনেক ট্যাক্সি পাবে।"...

অর্থাৎ জন্‌জনকে পাবো না। জন্‌জন্ সবারই জানা নাম। সম্প্রতি সেটা খুবই সম্প্রতি হতে বাধ্য। আজই হ'তে পারে। জন্‌জনের কিছু একটা হয়েছে। সে নেই,—সে আছে; সে দৃশ্যে অদৃশ্য, অদৃশ্যে দৃশ্য...ব্যাপারটা পুরো মগজে প্রবেশ করবার আগেই দেখি হোটেলের সামনেই মধু; আর পাশেই মার্কা।

হাসতে হাসতে মধু আমার কাঁধ থেকে ক্যামেরাটা নিতে নিতে বল্‌লো। 'আপনাকে ছুটো দুঃসংবাদ দিতে পারি; কিন্তু একটি সুসংবাদও আছে।'

—"কোন্‌টি? মার্কাকে সাথী পেয়েছো?"

—"সেটি যদি ধরেন তিনটি দুঃসংবাদ।"

—"একসঙ্গে সহ্য হ'বে না। লাউঞ্জে চলো। কফি হোক; তারপর।"

"প্রথম দুঃসংবাদ—কাল সাক্সাহুয়ানে এবং কুজকোয় যে ছবিগুলো তুললেন—সেগুলো সব নষ্ট।"

—"কেন?"— চম্‌কে উঠলাম। সর্বনাশ!

—"আমারই দোষ যথারীতি। ঐ রোলটা নষ্ট হোল ঐ ভাবে। মনের দুঃখে ক্যামেরা লোড্ করতেই ভুলে গিয়েছিলাম, তা মনে ছিলো না। অবশ্য লোড্—অলোড আপনার জানার কথা নয়। সে ভার তো চিরকাল আমারই।

—"মনে পড়লো কখন?"

—"ট্রেনে। তখন অবশ্য লোড্ করে দিলাম। কিন্তু সাহস পাইনি বলতে। রেভারেণ্ড স্লাজুস্কী অবশ্য বলেছেন। তিনি ছবি অনেক তুলেছেন। কপি পাঠাবেন। ভাববেন না।"

—"তিনি পাঠাবেন না। মধু"—গম্ভীর মুখে বলি।

—"কেন?" মধুর মুখ সত্যিই কাচু মাচু।

—"আমিও হিন্দু রেভারেণ্ড। রেভারেণ্ডদের হাড়ে হাড়ে চিনি।"

হঠাৎ মার্কা খুব হেসে উঠল।

আমি বলি,—"দ্বিতীয় দুঃসংবাদ কি?"

—"জন্‌জন্‌কে কাল কারা ধরে নিয়ে গেছে। এখানে জনপ্রবাদ যে তাকে আর পাওয়া যাবে না।...কিন্তু স্যর, এটি একদিন পরে হলে আমরাও ঐ দঙ্গলে পড়ে যেতে পারতাম। আমরা নিরাপদ। প্রত্যেক ঘনঘটার আঁচলে ঝিল্‌মিল্ করে রূপুলী ঝালর।"—(কথাটা জুৎসই লাগাতে পেয়ে মধু খুবই খুশী)।

—"সুসংবাদটি কি?"

—"জন্‌জন্ বিনাই টাক্সি হয়েছে। এবং তারই মধ্যস্থতায় হোটেলের ঘর পেয়েছি।—খুশী?"

'হ্যাঁ' মুখখানা আমার গোমড়াই হয়েছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বলি—"এবার বলো মার্কার কথা। শাস্ত্রে, বিশেষ ভ্রমণ শাস্ত্রে নারী সঙ্গকে বর্জিত করে রেখেছে। ও কাঁটা গলায় ধারণ করলে কোন্ সারসের চঞ্চুর প্রত্যাশায়?—জ্বালাবে দেখছি।" মার্কার হাত আমার হাতে ধরা!

মধু খানিক বললো; মার্কা খানিক। পরিস্থিতি বাস্তবিকই খুব উত্তেজনাময়। কে কতো বলবে তা'রই যেন প্রতিযোগিতা। মধুর কণ্ঠে যতোই প্রশাস্তি এবং বিস্ময়; মার্কার কণ্ঠে ততোই বিদ্বেষ, বিষ, আর ব্যঙ্গ। পরিস্থিতি নাটকীয় এবং সঙ্কুল। প্রকৃতি ঘাটাঘাঁটিতে সেটা হতে বাধ্য।

রেভারেণ্ড হামফ্রী (চিরটা কাল 'বুনো' নিয়ে কারবার) হঠাৎ তাঁ'র বন্য আশ্রমে বুনো সমাজে নিজেকে নিয়ে খুবই বিব্রত হয়ে পড়েন। কারণটি তাঁ'র মতে 'দৈব'। তাঁ'রই চার্চের একটি বুনো নান্ অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ অন্তর্বত্নী হয়ে পড়ার ফলে বার্তা ছড়িয়ে পড়ে যে, তাঁ'র গর্ভে দেবশিশুর আবির্ভাব হয়েছে। পুলপিট থেকে এ বিষয়ে কয়েকটি ভাষণের পর সেই 'নান্'টির মর্যাদা প্রায় আকাশের কাছাকাছি। কিন্তু মার্কা হামফ্রীকে ওরই মধ্যে একটু আব্রুঢাকা একাকীত্বের নিবিড়ে বলতে বাধ্য হয়েছে যে, মার্কা ঐ দেব-শিশুর জননীর কাছ থেকেই হামফ্রীর দৈবী ছোঁয়াচ সম্বন্ধে কিছু সরস তথ্য সংগ্রহ করেছে। তাঁ'র নয় বছরের প্রচার-কালের মধ্যে বন-মহালের নানাস্থানে ষোলটি দেবশিশু ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং নিতান্ত মানবী কুমারী মার্কা দেবী কোনো নতুন দেবশিশুর পরিচর্যার জন্য সেবাদাসী হয়ে থাকতে নারাজ। দেবতা নিয়ে খেলাকরা তার বড় আসে না। মানুষের খেলাই তা'র মনোমত খেলা।

মার্কার বাণী খুব দৈবী বাণীর মতো শোনায়নি। মার্কার দাবী কিন্তু দৈবী দাবীর মতো সঙ্গে সঙ্গে পালিত হোল। অগত্যা রেঃ হামফ্রী মার্কাকে মিসেস হামফ্রী করে ফেললেন। এজন্য চার্চ বদলা-বদলির একটু ঝামেলা অবশ্য পোয়াতে হোল। কিন্তু মার্কা নিজের কোট ছাড়লো না। তবে হামফ্রী মার্কাকে কেন ছাড়লো না এটি সত্যিই একটা দৈবী রহস্য হয়ে রৈল, যদিও এখন রেভারেণ্ডের বয়স হয়েছে। কিন্তু পনেরো-বিশ বছর আগে রেঃ হামফ্রী তো এতো বুড়ো ছিলেন না। স্পর্শ শক্তি তখন বেশ সজাগই ছিল। দেবলোকের সঙ্গে যোগাযোগ হামেশাই হ'তে পারতো। এখন রিসিভার ঠিক থাকলেও ট্রান্সমিটারের কজা ঢিলে হয়ে গিয়েছিল, তাই শেষের দানটা মার্কা তুরূপ করে নিল।

মার্কা এসব কথা বলতে বলতে বারবার থুতু ফেলেছে। ফেলুক। ওটা যে ইন্‌কাদের কোকা-অভ্যাসের মুদ্রাদোষ, এটাই মেনে নেওয়া ভদ্রতা রক্ষা করার পক্ষে সমীচীন।

ইতোমধ্যে খবর এলো, রেভারেণ্ডের দুহিতা ও দৌহিত্র আসছে, সঙ্গে ত্রি-পাক্ষিক নতুন জামাই। রেঃ হামফ্রির কন্যা মিসেস্ স্লাজুস্কিও তা'র নতুন কচি মা-কে দেখার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু এই দৈবী-লোকের মধ্যে মেয়ে-জামাই এসে পড়লে তা'রা দেবতার বিভূতি সম্পর্কে পুরোদস্তুর আস্থা রাখায় সমর্থ না-ও হতে পারে। রেঃ হামফ্রী দূরদর্শী। দু'-পা

এগিয়ে গিয়ে মেয়ে-জামাইকে সোজা কুজ্‌কোয় এসে সম্বর্ধিত করলেন। তরুণী মিসেস্‌ হামফ্রী ইতিমধ্যে ইয়ানের মতো তরতরে তরুণটিকে দেখেও মুগ্ধ হলেন।—হায়, কন্দর্প! কিন্তু কথাটা চাপতে মার্কাকে খুবই হাবু-ডুবু খেতে হোল। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। দেবতার সাক্ষাতে মানবীর মন বিকল হতেই পারে। হলেও সাতখুন মাপ। হোলোও।

ফলে, বনের টিয়ে হামফ্রী সোনার টোপর মাথায় দিয়ে বন থেকে বেরিয়ে পড়ে মেয়ে-জামাই-নাতি নিয়ে 'ভ্রমণে' বেরিয়েছেন! মার্কাকে সঙ্গে নিয়ে আমাজোন অববাহিকা ছেড়ে কুজ্‌কোয় আসতে পেয়ে তিনি তাঁ'র দেব-লোকে অর্জিত পুণ্যফলগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বনমহালের অন্ধকারে ফেলে আসতে পেরেছেন। মেয়ে-জামাইয়ের ছুটির অবসানে তারা নিশ্চয় ফিরে যাবে যুক্তরাষ্ট্রে; আর উনিও মার্কাসহ দেবস্থানে ফিরে যাবেন। শুধু এই কটা দিন 'ম্যানেজ' (Man-age) করা চাই। মাত্র 'God-age'-এ কুল পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যবস্থা খুবই পরিচ্ছন্ন। জামাই, নাতি—বিশেষ করে মেয়েকে ওই সব গুজবভরা তল্লাট থেকে আলাদা করে রাখার এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর হতেই পারতো না।

ইতিমধ্যে অতনু সন্নিপাত। দু'-চারটে ভাসা-ভাসা ঘটনার মধ্যদিয়ে মার্কা যা' অনুমান করেছিল, সেটা একদিন প্রত্যক্ষ হয়েই আবির্ভূত হোল। মার্কার ঘরে, বিছানায়, দেবলোকের আলোর মতো আবির্ভূত ইয়ানকে কোনোমতেই সরাতে না পেরে, এ কয়দিনের মিন্‌মিনে গুপ্‌চুপ্‌ কেলি-কলাকে মার্কা—বিরক্তা মার্কা, একেবারে মেঝেয় আছড়ানো কাঁচের পুতুলের মতো বিরাট শব্দে চুর-চুর করে দিলো। সেই তরুণ, উদ্দীপ্ত, করিৎকর্মা বলিষ্ঠ ইয়ান্‌কে আদিবাসী ইন্‌কা প্রথায় একটি বিশাল চড় কষিয়ে দিয়ে ঘরের বা'র করে দেয় মার্কা। সে এক বিষম ফাঁড়া। বেচারী ইয়ান বুঝতেই পারলো না তার অপরাধ কী। নিসর্গ কন্যার নৈসর্গিক ব্যবহারে এতো আপত্তির কারণ কী!

মিসেস্‌ স্লাজুস্‌কির বাধা কিন্তু অন্য। দৈবী নয়; নিতান্তই জৈবিক বাধা। যুক্তরাষ্ট্রীয় গালে ইন্‌কা হস্তের অবলেপ অসহ্য। রেঃ স্লাজুস্‌কি ভ্রূ ওপরে তুলে বার বার তৃতীয় পাক্ষিক উত্তরসাধিকাকে বলেন যে, ইয়ানের রক্তে সংযম ও সাম্যের অভাব চরিত্রগত, বংশগত—ইত্যাদি।

রেভারেণ্ড হামফ্রী অগত্যা তাঁর বন্যা কিশোরীটিকে প্রত্যন্তে নিয়ে গিয়ে উন্নত খৃষ্ট-কোটীর টলারেন্স্‌, এক্সেপ্‌ট্যান্স, পার্স্‌এশান্‌, ফর্গিভ্‌নেস ইত্যাদির একটা মর্মস্পর্শী সাবলীল ব্যাখ্যার ধূয়া ধরতেই মার্কা তার দিশী ভাষায় অশাস্ত্রীয় বাগ্‌বচনের বন্যাতরঙ্গ এমন ছোটালো যে, সেই ষষ্ঠ্যুত্তর (৬০-এর বেশী) ভাগবতাচার্যের কান, পা, মাথা সব ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে লাগল। মনে হোল এ আগুনকে সামাল দেওয়াই এক ধরনের নিপুণ বিলাস। বাঃ!

এক্ষেত্রে ঐ তরুণ আর এই মার্কাকে পুনশ্চ এক ঝোলে ছাড়লে ঝোল যে বিস্বাদ হয়ে যাবে, (further togetherness might yet further spoil an a lready bitter soup) এমন সম্ভাবনা ছিল। এখন পৃথককরণই সর্বথা বাঞ্ছনীয়।

কিন্তু করা কি যায়। কী ক'রে কটা দিন এদের আলাদা রাখা যায়। মেয়ে-জামাইকে ছেড়ে তরুণী 'অর্ধোন্মাদ' (ওরা বাৎসল্যরসে সিক্ত মনে ঐ ব্যাখ্যাই মনকে বুঝিয়ে খালাস) ঐ বন্যা-কে নিয়ে সভ্য শিক্ষিত ধার্মিক পিতা বনবাসী হবেন এটাই কি বিধেয়? চিন্তা উভয়তঃ। মাঝখানে পুত্র ইয়ান্, এবং 'একস্‌পেরিমেণ্ট' প্রিয় পতি স্লাজুস্কী। আর রেঃ হামফ্রীর ভয়, মার্কার স্বজাতিদের উৎকণ্ঠিত উদগ্র আগ্রহ যদি তার দেবানাম্ প্রিয় অদ্ভুতকর্মা পতি দেবতাকে নারকীয় পরিস্থিতিতে ঠেলে দেয়।

অসভ্য আর কাকে বলে! একস্‌পেরিমেণ্টের ভ্যালু বোঝে না!

কী করা যায়?……

এই অবস্থার ওজন ঘাড়ে (এবং মনে) নিয়েই ওরা ফিরতি ট্রেনে চেপেছিল। এই জন্যই মার্কা 'মোড়ু'র কাছে ঘেঁষে ওদের 'বর্জন' করার আড়াল খুঁজছিল।

মধু ভাষ্য করলো—মার্কাও একটু বিব্রত ছিলো। মাচ্‌চু-পিচ্‌চু দেখতে বহু আদি-বাসীরাও এসেছে। স্টেশনে বার দুই চেনা চোখের চাওয়া থেকে মার্কা নিজেকে সরিয়েও এনেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত রেভারেণ্ডকে নিয়ে যদি একটা গোল জমে ওঠে, (উঠতে পারতো। সম্ভাবনা দেখাও দিয়েছিল) তার ফলে ওদের যাত্রা তো একেবারে রসাতলে যাবে। —শত 'আভা-মারিয়া' চিৎকারে, মালা-জপে, বা ক্রুশের মুদ্রা এঁকে তা' থেকে কোনোরকমেই পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।

[এর-পরের নাটকীয় ঘটনাগুলি মধুর কাছে শোনা। বিন্যাসের দায় লেখকের।]

মাচ্‌চু-পিচ্‌চুতেই দু'-জোড়া দম্পতী বিলাসিনী মার্কাকে যেভাবে সনাক্ত করেছিল তা দেখে মধু নিজেই বেশ শঙ্কিত হয়েছিল। একবার মার্কা স্পষ্টতঃ বলেছিল—'মোড়ু, ডিয়ার! চলো অন্যধারে যাই।' আর সেই প্রার্থনা অনভ্যস্ত মধু ভুলও বুঝেছিল। মার্কাকে সঙ্গে সঙ্গে তা'র আত্যন্তিক আগ্রহের ফ্যাকাশে ভাষ্যও করতে হয়েছিল;—'ওদের দৃষ্টি-পথ থেকে সরে যাও, প্লীজ। শুধু আমায় আড়াল দাও।'

এর মধ্যেই আবার একজোড়া বন্যদম্পতী, বিশেষ করে হামফ্রীর দেব-শিশু সম্পর্কীয় অঘটন ঘটিত বার্তা নিয়ে একটু নাড়াচাড়াও করেছিল, মার্কার সঙ্গেই। অতীতে পলিনেশিয়ায় হামফ্রী মনুষ্য-ভ্রূণ থেকে দেবশিশুর আগমন সুগম করতে গিয়ে নিজেই জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অগত্যা সরে এসে আমাজোনে ঢুকেছেন—এ তত্ত্বও তারা মাচ্‌চু-পিচ্‌চুর শান্ত রোদে মেলে দিয়েছিল ভিজে পুরোনো কাঁথার মত; সেই মাচ্‌চু-পিচ্‌চুর এসপ্লানেডে এ ধরনের হিসেব নিকেশ কন্যা-জামাতার পক্ষে দুষ্পাচ্য হবারই কথা। পৃথিবীর সমাজে মদনলীলার কুশীলবেরা শুধু পচা ডিমের তাড়াই পেলো।

কী করবে, তা স্থির করতে পারার আগেই সেই দম্পতীর মধ্যে যেটি মেয়ে সে মার্কাকে একটা সিগারেট দিতে দিতে প্রশ্ন করেছিল—"তুমি তো ইকোয়াডোর-কোকাম্ কৌমের সেই মেয়েটি নয়? তাহ'লে শেষ পর্যন্ত বুড়ো রেভারেণ্ডটাকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছিলে? বেশ করেছিলে। আমরা সবাই তোমার বাহবা দিই। কে তোমার স্বামী? ঐ বেঁটে শাদা মেয়েটাকে নিয়ে যে আদিখ্যেতা করছে; ঐ দাড়ি-ওয়ালা পাহাড়টা বুঝি? জিগ্যেস

সম্রাটদের শেষকৃত্য হোত সামনের বেদীতে

সার্পেন্টস্ লেন (কুজকো)

ইনকা ব্যাণ্ড কুস্কো

ইনকা মৎস্যজীবী
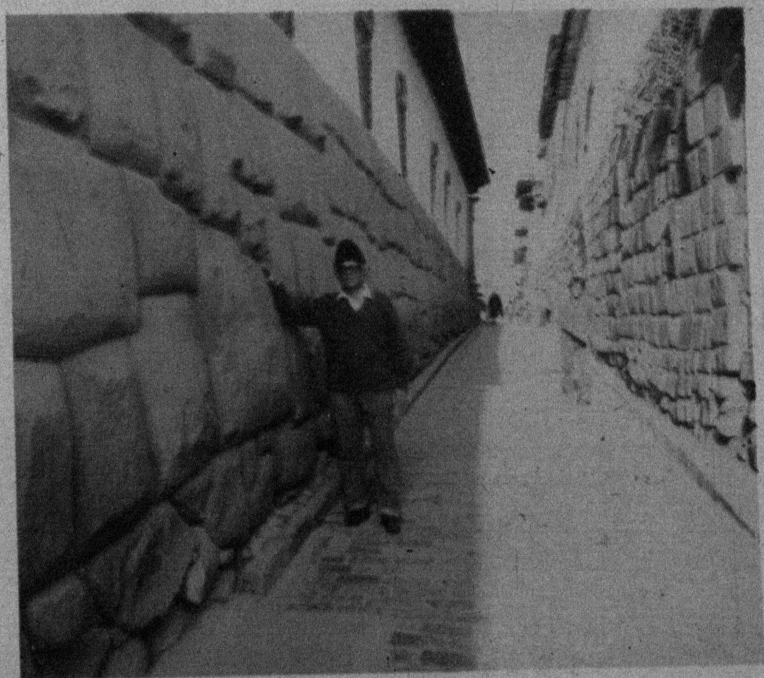
করো তো ও কখনও পলিনেশিয়ায় ছিল কি-না? সেখানেও অনেক বেথ্‌লেহেম্‌ খুলে এসেছে বলে জানি।"

মার্কা কোনক্রমে পালিয়ে বাঁচে। রেভারেণ্ড হামফ্রীকে বলে, ও কিছুতেই এই ছড়ানো বিজ্ঞাপন মাথায় চড়িয়ে বেড়াবে না। হামফ্রী সব শুনে বলেছিল - মধুকে কোনমতে রাজী করিয়ে কুজ্‌কো অবধি ও একা থাকতে পারবে কি-না। পরিস্থিতি সঙ্গীন

হামফ্রী আবার বলেন, দু'-তিনটি দিন গা-ঢাকা দিয়ে কুজ্‌কোয় পুনর্মিলিত হলেই ফাঁড়া কেটে যাবে। কিন্তু মার্কা বেঁকে দাঁড়ায়। মোড়ুকে সে কেন বলবে? সুইট্‌ মোড়ু একজন ভদ্র যুবক, এবং ভারতীয়। যা-বলার রেভারেণ্ড বলুক। হিন্দুরা প্যাগান ধর্মযাজক। ওঁদের মনের দোরে শরণাপন্ন হলে ওঁরা নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবেন। প্যাগানরা দেয়। পেরুও প্যাগান ছিল। কিন্তু···মধু যে বড় মিষ্টি!

রেঃ হামফ্রী মধুর দিকে চেয়েছিল করুণ নয়নে। মার্কা সেই দৃষ্টি দেখে বলেছিল— "দেখি ভেবে। তুমি যাও। ওদের একা ফেলে রেখে বেশীক্ষণ থেক না। কিন্তু আমি ওই ফচ্‌কে ফাজিল, আধ-পাকা মাংসভুক্‌ ইয়েনটার পাল্লায় থাকবো না। ওটা যারই বাচ্‌চা হোক, একটা মনষ্টার।"···এই তর্জনের ফলে, পরে কোমল পায়রা কণ্ঠে মধুকে হেসে বলেছিল মার্কা—"দেখেছো, আদিবাসী মেয়েটা হয়েছে যেন ওদের পচা প্রেমের-পোচের ওপর ঘুরঘুরে মাছি। এরা আবার ধর্ম-যাজক!···তুমি 'না' কর না। আমি তোমাদের সঙ্গেই যাচ্ছি।—আমার ভার আমিই নেব।"

হঠাৎ মধু আর মার্কার পাশে মিসেস্‌ স্লাজুস্‌কী এসে পড়লেন। ওরা তখন পাহাড়ের ওপর থেকে গভীর খাদের মধ্যে আমাজোনের উৎসটি দেখছে। মিসেস্‌ স্লাজুস্‌কী বল্‌লেন,—"ওটাই কি আমাজোনের উৎস!"

মধু বলে—"হ্যা। বাবা না আনলে আমার পক্ষে কখনও এখানে আসা সম্ভব হত না।··বাবা-তো বলেছেন এই নদী ধরে আমাজোন জঙ্গলে যাবেন।"

—"যাবেন? হাউ-লাভলি! ইট্‌স্‌ এ পিটি···আমাদের সময় নেই। আঃ! যদি থাকতো সময়, নিশ্চয়ই যেতাম। এইতো জীবন!"

মধু আবার বলেছিল,—"বাবা যাচ্ছেন। রাতে আমরা হোটেলে থাকছি। গাড়ি ঠিক করা আছে। তবে বাবার জন্য আমার ভাবনা আছে। মানুষটা চুয়াত্তর পেরিয়ে গেছে।"

এই নাটকীয় মুহূর্তেই মার্কা বলেছিল, "আমি যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে। (আদিবাসী মেয়েরাও মেয়ে। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী। ওর সমস্যাকে এককোপে ও 'দুখান করিল কাটিয়া'!) কী মোড়ু, রাজী? তোমার বাবার বাধা হবে? ইজ হী ছাট্‌ ডিফিকাল্ট্‌? বুড়ো কি বাগড়া দেবে ভাবছো? হী লুক্‌স্‌—দেখতে তো বুদ্ধিমানই মনে হয়।"

মধু হেসে বলেছিল,—"কে? আমার বাবা? উনি হলেন সত্যিকার লাইভ্‌লী! তুমি-আমি, মেয়ে-ছেলে, বয়স-জাত এসব ভাবেনই না। ওনার হল—যতোই বাড়ে,

ততই মজা! (হ্ব মোর, হ্ব মেরীয়ার্!) ভাবছি,—তুমি, বালিকা বধূ, তুমি আমাদের —সঙ্গে ফিট্ করবে কোথায় ?"

তখনই রেভারেণ্ড স্বর্গের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন। বলেন—"আহা, বেচারী! আমার হেভী ডিউটি থাকে। শুর বেড়ানোই হয় না। তোমরা তো কুঞ্জকোয় ফিরছো। সে ক'দিন—ইফ্ য়ু ডোণ্ট্ মাইণ্ড,—ওকে একটু মনের আনন্দে ঘুরতে দাও। তা, ছাড়া ও-তো সত্যিই বনের পাখি। জঙ্গলে ঘুরতে পেলে ও হয়তো গান গেয়ে উঠবে। কি ভাবছো? ঘাড়ে চাপাচ্ছি, মনে ভাবছো না নিশ্চয়।"

মধু চুপ করেই ছিল। সেই গোমরা পরিস্থিতি ভেঙ্গে ফেলে মার্কা-ই পাকা সিদ্ধান্ত করেছিল।—"আমি যাচ্ছি মোড়ু। তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। আমি বুড়ো ম্যানেজ করার স্পেশালিস্ট। বাবাকে ঠিক মানিয়ে নেব।"

ঠিক যেন গান গেয়ে উঠল। অন্ততঃ মধুর তাই মনে হয়েছিল।

সব শুনে হেসে বলি, "তা', বলতে নেই মধু,—মানতে হচ্ছে, ঠিক মানিয়ে নিয়েছ। কিন্তু এদিকে এক ঘনা বিপদ বেধেছে। জন্‌জন্ তো 'মিসিং লিস্টে' পড়ে গেল। অতঃপর এই জঙ্গলে ব্যবস্থা—কি? আমাজোন হবে না?"

—"হবে, বললাম তো শুর। অন্য একটা ট্যাক্সি ঠিক করেছি। সে অবশ্য ইংরেজী জানে না। কিন্তু মার্কা তো আছে।"

আমি মার্কার দিকে চেয়ে চোখ মটকে বলি—"সন্দেহ হচ্ছে, তুমিই পুলিসকে অনুরোধ করে বেচারী জন্‌জন্‌কে ধরিয়ে দাওনি তো? মধুর কিন্তু দেব-শিশুর ব্যবস্থা ত্রিনিদাদে মন্ত্রপূত হয়ে পড়ে আছে।"

মধু তো লালে লাল! মার্কাও বিহ্বল একটি চাপড়ি আমার কাঁধে রেখে বললো,—"বুড়ো সারসটি তো দেখছি ভারী দুষ্টু!..."

ও যেন আমার কাছের মানুষ হয়ে গেল।

আমি হুয়ানা-পিচ্‌চুতে চন্দ্রাদেবীর মন্দিরে গেছি শুনে ওরা 'হায়—হায়' করে উঠল।

—"ছবি নিলেন শুর?"

—"তখন কি জানি, ওখানে যেতে পারব? মাচ্‌চু-পিচ্‌চুই যে যেতে পারব তাই কি জানি? একটি মেয়েকে পেলাম দেবী মন্দিরের পীঠে, যেখানে বলি হত। তিনি আমায় খুব জোর দিলেন। সাহায্য করলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে মার্কার চোখ দু'টি ছোটতর, ভ্রূ না থাকলেও কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

"পাচামামা? সেই মিষ্টিক কোম?...সেখানে?...মেয়ে?"

আমি অবাধ উদার দৃষ্টি মেলে দেই সেই মাতৃমূর্তির দিকে। বলি,—"আমি খুব জোরে পড়ে গেলাম সেখানে। পায়ে আমার প্লাস্টার। নখের কোণ ফেটে রক্ত পড়ছে।..."

কট্ কট্ করে চেয়ে থাকে মার্কা। বলে—"জুতো? জুতো কি হল?"

—"সেটা আমি বলতে পারি"—বলল মধু। "বাবা কোন ভাবময় মূর্তি দেখেছেন—..."

মার্কা ঘোর আতঙ্ক-বিহ্বল কণ্ঠে জিগ্যেস করলো—"ঐখানে বসেছিলেন কি? ও তো বলির জায়গা। পাচামামা নিখাদ জীব জননের প্রতীক। ওই অদ্ভুত যন্ত্রটির আতঙ্ক সমস্ত ইনকা কৃষ্টিকে ছেয়ে থাকত। জননী-মণ্ডলে সবার বড় তৃপ্তি-অতৃপ্তির মালা এই যন্ত্রটিকে রক্তে স্নাত করিয়ে দেওয়ার স্বপ্নে গাঁথা থাকত। ওখানে মেয়েরা অনাবৃতা। দিগম্বরী সাধনা। নরবলিও হত; কেবল আজতেকদের মত মাংসটি খেত না। পিউনোর মেয়েরা এখনও এই সাধনা করেন।.."

মধু খানিক বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। তারপর ঢোঁক গিলে বলল—"ঐ ধরনের ঘটনা একটা মেক্সিকোর জঙ্গলে আপনার হয়েছিল না? আমি আপনার বুড়ির মুখে শুনেছি।"

আমি কোন জবাব দিলাম না। শুধু বললাম—"জন্‌জনের ব্যাপার কি?"

ওরা যা শুনেছে, সব কথা শোনার পর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু মেনে নিলাম ওদের ব্যবস্থা। ছবি নিতে পারিনি চন্দ্রাদেবীর যাত্রার। কেন না-—যাব না, যেতে পারব না বোধে সব কটা শট্-ই শেষ করেছিলাম মাচ্‌চু পিচ্‌চুর ওপর। আর ফিল্মও যদি থাকতও, সে পথে দাঁড়িয়ে আমি ছবি নিতে পারতামও না। কিছুতেই পারতাম না।

মার্কা বলে, "ভালই করেছেন। অনর্থক জীবনের 'রিক্‌স্' নেওয়া কোন কাজের কথা নয়। ও আমি ভালবাসি না।"

"আর জন্‌জন্?"

মার্কার গলা ভারী। তার নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।—"ভুল, ভুল। এদের ধরতে চাওয়া আর জঙ্গলের নিঃশ্বাস বন্ধ করার প্রয়াস এক কথা।...ও হয় না।...হবে না। এ জঙ্গলের মোড়ে মোড়ে জন্‌জন্।"

—"তুমি এই সব বলো, মার্কা! তুমি না মার্কিন রেভারেণ্ডের ঘরণী (বেটার হাফ্?)।"

—"ঘরণী! না আমার ইয়ে (বেটার হাফ্ মাই ফুট!)। একটা ভণ্ড পাপী। আমি ওদের সব খবর রাখি, দিই। আমার মতো শ'য়ে, শ'য়ে এ জঙ্গলে ঠাসা। কতো রুখবে? কতো ধরবে? ওঃ, কী হস্তী-মূর্খ এই মস্তান মার্কিনগুলো! ডলার আর বন্দুক দিয়ে দুনিয়াকে দলা করে মুখে ভরতে চায়! এখন পারবে। কিছু পারবে। সব সময় পারবে না। সবটা পারবে না।"

—"রেগে যাচ্ছো মার্কা। অত রাগ ভাল নয়। শান্ত হ'য়ে এখন তোমরা সকাল সকাল ডিনার খেয়ে শুতে চলে যাও। ছ'টায় উঠতে হবে, আমি একটু স্যুপ আর ফ্রেক্‌স্ খাব। আর একমাত্র চকোলেট। সেটা এখানে বসেই খাব। বেয়ারাকে বলে দিও। এ্যাণ্ড—প্লীজ—গুড নাইট্।"

মধু ইশারা করে মার্কাকে সরিয়ে নিয়ে গেল। আমার সামনে দক্ষিণ আমেরিকার দিগন্ত ব্যাপী রহস্য একটি যবনিকার মতো আড়াল করা। ওটা তুলতে পারলেই মঞ্চের বেদীতে ঝলমল করে উঠবে কতো কথা, কতো রূপ।…তোমায় আমি ভালোবাসি পৃথিবী—বড়ো ভালোবাসি। এতো ভালো কাউকে বাসিনি। তোমার স্পর্শেই আমি পাই আদি শৃঙ্গার কামের তৃপ্তি। সেই অরূপ তৃপ্তিই যেন আমার রোমে রোমে স্পন্দিত। আমার চোখ, নাক, কানই যেন আমার, সত্বার আকর্ষণ, সম্মোহন, আভোগ, সৃজনের চক্রমাণ ছায়াপথ। গান গান গান। এ সময়ে আর কোনো কথা নয়; সব ফেলে দিয়ে। এসো তুমি প্রিয়ে, মহাকবির মহতী সৃষ্টি—কবিতাকল্পনা লতা।—গান।……

এবার অবগুণ্ঠন খোলো……

'ঘুঁঘুট কা পট খোলরে……তোঁহে পিয়া মিলেঙ্গে……', কিসে যেন, কোথায় যেন ডুবে গেলাম। গান গাইলাম—'আমি রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন আশা করে।'

তোমার কি নাম নদী? অন্ধকারে বয়ে যাও সদা-বাগ্‌বাদিনী, কল্লোলিনী;—কি নাম তোমার? রায়ো কারাতেরা? রায়ো উরুবাম্বা? রায়ো কুসীচাকা? রায়ো পাতাবাঙ্কা? রায়ো ভিলাকানোতো? কতোই নামের কতো সঙ্গিনী পদে পদে তোমার হাতে হাত মিলিয়ে চলে যাচ্ছে উরুবাম্বায়, আপুরিমাকে, এনোয়, হুয়াল্লাগায়, মেনোন-এ। কতো বিচিত্রা এ কন্যা? কতো রকমই রঙ্গ? এমনই যখন স্বভাব এ নদীর তখন তাকে 'একটি নামে ডাকা কি হয় সঙ্গত?'

তাই ঠিক। আমাজোনকে তখন আমাজোন বলা হয়েছে, যখন তার দৈর্ঘ্যের অর্ধেক —হাজার মাইলের ওপর সে শেষ করে চলে এসেছে। অলকানন্দা, মন্দাকিনী, গঙ্গা, ভাগীরথী, হুগলী যেমন। হুগলী আর কতোটুকুই বা গঙ্গার? গঙ্গা ছুঁলেই গঙ্গা। হোক সে যমুনা, ঘর্ঘরা, কোশী, শোন, তিস্তা, পদ্মা, সবই গঙ্গা। এক হাজার কিঃ মিটারের শাখা নদীই আমাজোনে পড়েছে অন্ততঃ সতেরোটি।

হোটেল থেকে দশ মিনিট হেঁটে গেলেই সেই ইন্‌কাকালের সেতুটি দুটি পাহাড়ের খাঁজে নীরব কুঞ্জ সহচরীর মতো, সংকেত শয়নের বাইরে দূতীর মতো, ব্যাকুলতার পাশে নিবিড়তার মতো, উচ্ছ্বাস উত্তেজনার নিবৃত্তিতে ব্রতের মতো, নীরব সেবাধর্মের সাধনে একা বুকটি পেতে রেখে শুয়ে আছে।

এই নদীতে জল ঢেলেছে এগারশো' নদী। এ নদীর অবাধ বিস্তারের রস পান করে যে অরণ্য-মণ্ডল নিজেকে দিগন্তস্পর্শি সম্মানে ভূষিত করেছে, সেই ভৈরব ভয়ঙ্কর মণ্ডল অধিকার করে আছে দক্ষিণ আমেরিকার দুই-পঞ্চমাংশ! এর একাধিপত্যের গ্রাসকে লোকে সভয়ে আখ্যা দিয়েছে "শ্যামল-মরু", "রস-মজ্জিত শ্মশান"। সমুদ্রের সাড়ে-ছ'শ ফুট ওপরে এই রসাল মরুভূমির বিস্তার পঁচিশ লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ! এর মধ্যে মানুষের বাস মাত্র এক লক্ষ বর্গ কিঃ মিঃ ভেতরে। এরই মধ্যে তারা ফসল তোলে, বাঁচে, মরে। এ ভীষণ মরুভূমি জলের মরুভূমি। এর প্রকৃতি রাক্ষসী, তামসী, ক্লেদময়ী অঙ্কজরা। প্রশান্ত মহাসাগরের তীর ঘেঁসে এ্যণ্ডীজ-কার্ডিলেরার কোন অখ্যাত পঞ্জর ভেদ করে বার হয়েছে তিরতিরে একটি স্রোত—উরুবাম্বা। দীর্ঘ—সুদীর্ঘ দুই হাজার কিঃ মিঃ অরণ্য-গিরি, কান্তার গহন, গহ্বর, খাদ, জলা ভেদ করে চলার পর, সেই জল পরম আনুগত্যে, সম্রাটের দরবারে বাৎসরিক খাজনার মতো, ঢেলে দিচ্ছে তার সম্পদ অতলান্তিকের বুকে। এরই মধ্যে নানা নাম ভেসে ওঠে ক্ষণিক বুদ্বুদের মতো।—মাকাপা, মরোপানিম্, বেলেম্। কে শুনেছে এ সব বন্দরের নাম? কে জানে, কোথায় আছে জানাপু, কাভিয়ানা, মেইয়ানা দ্বীপ? দ্বীপ বলতে দ্বীপ? অস্ট্রেলিয়াও দ্বীপ; ইংলণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, গ্রীনল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ডও দ্বীপই বটে। কিন্তু নদীর মুখে দ্বীপ মারাজো;—তার আয়তন পুরো সুইজারল্যাণ্ড। এই নদীর জল আটকা পড়ে আছে যে বাটীতে, সে বাটীর মধ্যে পুরো ফ্রান্স দেশটাকে দুধে আমসত্ত্বর মতো ভিজিয়ে রাখা যায়!! ভুল বল্লাম। দশ খানা ফ্রান্সকে ডুবিয়ে রাখা যায়। বিশ্বাস করতে যেন অবিশ্বাসকে জয় করতে হয়।

১৫০০ খৃষ্টাব্দের লাগভাগ সময় সেটা। ফিরিঙ্গী কাপ্তেন ভিনসেন্তে ইয়ানেজ জাহাজ নিয়ে ফিরে চলেছেন দেশে। সমুদ্রকুল থেকে প্রায় একশ' কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূর দিয়ে চলেছেন। বালতি নামিয়ে জল ভরে মুখ-হাত-পা ধুতে গিয়ে দেখেন—এ ক্যা বাত? জল তো নদীর জলের মতো মিষ্টি!

এ জল কোথায়? কেন? কি করে? কা'র? অসংলগ্ন এলোপাতাড়ি প্রশ্নে ব্যাকুল হলেন কাপ্তেন ভিনসেন্তে ইয়ানেজ। তখনও কাপ্তেন জানেন না আমাজোনকে। জানেন না যে, এক বছরে থেমস্ নদী যতো জল ঢালে সমুদ্রে, আমাজোন নামক এক নদী ততো জল ঢালে মাত্র একদিনে। শুধু কি তা'ই, সারা পৃথিবীর সব ক'টা নদীর যতো জল পড়ছে সমুদ্রে তার সব মিলিয়ে যদি হয় পাঁচ বালতি; একা আমাজোনই ঢালছে এক বালতি, অর্থাৎ তাদের মিলিত শক্তির এক-পঞ্চমাংশ!

না—না—না!! 'নদী' নামটা বলতে যে ছবি, যে ভাবমূর্তিতে আমরা অভ্যস্ত, আমাজোন তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি উপস্থিতি। এ যেন প্রাণী জগতের ইয়েতী, মৎস্য জগতের লক্নেস-মনষ্টার, পক্ষী জগতের গরুড়।

জানতেনই না, ভাবতেই পারেননি কাপ্তেন ইয়ানেজ যে, এ জল নদীর জল। সাগর ভেবে নাম দিলেন 'মিষ্টি জলের সমুদ্র' (লা-মের্-দুল্চে)। কিন্তু তিনিই প্রথম আমাদের পৃথিবীতে খবর এনেছিলেন এই নদীর।

আর, খবর এনেছিলেন 'পিরাহো' মাছের ; ছোটো মাছ, ওজনে এক-দেড় কিলোর মতো। জলে ঘোরে হাজার-দুহাজারের, দশ হাজারের ঝাঁকে। নিরন্তর ক্ষুধার তাড়নে সেই এক-দেড় কিলোর প্রাণী ব্যতিব্যস্ত। একটি ঝাঁকের পক্ষে একটি আস্ত মোষ খেতে লাগবে পনেরো-বিশ মিনিট। একটা মানুষ, 'আরে করিস কি' করিস কি বলার আগেই পাঁচে পাচ মিলিয়ে দেবে।

এই আমাজোনের জলের এক কাঁটা-ওয়ালা ক্ষুদে-সে-ক্ষুদে মাছ 'ক্যাণ্ডিরু' জলের সঙ্গে ঢুকে বাসা বাঁধে মানুষের মূত্রস্থলীতে। মূত্রের উষ্ণ-জলধারাই এদের বাসের পক্ষে তোফা মৌরসী সিমলা-দার্জিলিং। কাঁটাটি বাধিয়ে দিব্যি বংশ বৃদ্ধি করে যান। 'অপারেশন' করে বার করা ছাড়া এই স্কোয়াটারটির জোর দখলী থেকে পরিত্রাণ নেই।

বড় মাছ? হ্যাঁ, তা'ও আছে। দু-তিনশো পাউণ্ডের ওজনের রাঠে বা ঈটে মাছ জাতের 'ক্যাট্-ফিশ্', খেয়েছি, খুব মিষ্টি এবং নরম মাংস। ছালটা ছাড়িয়ে ফেলে দিতে হয়। মাথাটা তার কুকুরে বা শকুনেও খায় না।......একটি গীতা বাদী কুকুর বাদে।) সেটি আমাদের ডোবারম্যান,—বাঘা। তার পক্ষে ওই ক্যাট-ফিশের মাথায় সুপ ছিল যেন তপ্‌সে মাছের সঙ্গে শ্যাম্পেন।

সেই সব বেচারী ক্যাট্-ফিশ ভুল করে গোটা মানুষের অর্ধেকটাই মুখে সেঁদিয়ে যাবার পর ভুল বুঝতে পেরে বলে, 'সরি'। (তা'হ'লে গরুড় যে ভ্রমাৎ বালখিল্য ঋষির দলকে দল গিলে ফেলে 'সরি' বলেছিল—ত' গলপো না-ও হতে পারে।)

ঝক্ ঝক্ করছে বনপট। জোনাকী বল্‌লে এ পতঙ্গকে বোঝা যায় না। এ যেন আগুনের,—না, না,—আলোর বল লাফালাফি করছে। হঠাৎ দেখলে বোধ হয় এরাই যখন তখন গল্পের পাতায় এসে বসে। নাম হয় ভূত, বেতাল, আলেয়া;—প্রেতিনীর নাচ, শঙ্খিনির হাসি।

......আমায় যেন প্রেতিনী আমাজোন গ্রাস করছে। একা একা বসে আছি পোঞ্চো গায়ে দিয়ে সোফা চেয়ারের আমেজের মধ্যে। আকাশে কোথাও নিশ্চয় চাঁদ উঠেছে। এই বনানী মণ্ডলের চন্দ্রাতপ ভেদ করে আকাশ দেখা, ভারত-সরকারের চন্দ্রাতপ ভেদ করে ১৯১৯-এর কংগ্রেসের জ্যোতি-রূপ দেখার মতো। ইচ্ছা করে, লোভ হয়। পারি না, পাই না।...ভাবছি,—আফ্রিকার কঙ্গোর নদীর কী বড়াই। অথচ, আমাজোনের পদনখতলে তার পড়ে 'কতগুলা'! নেগ্রো, মদীরা, তোপাজাস্, জিঙ্গু—এই সব উপনদীরই এক একটা ঐ কঙ্গো। নেগ্রো নদীর মহিমা যে দেখেনি সে জানে না 'কালো-নদী-জল'—তার কী মায়া। কালিন্দী নামেই কালিন্দী। রায়ো নেগ্রো কালো নদী; এসিকুইবো শাদা; ডেমেরারা চায়ের পাতা ভেজা খয়েরী; নীলনদ যেন গঙ্গা। শোণিত নদী লাল নয়; পীত-গঙ্গা হোয়াংহো দেখিনি। এগুলো চোখে দেখা, স্নানের লীলায় লোল হবার অভিজ্ঞতায় জীবন্ত ভূগোলের জ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়ের দোরে এসে হানা দেয়, তখন বলতে ইচ্ছে করে সেই রসালো পংক্তিগুলো,—

"বীথিষু বীথিষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি।
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্য ভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ॥ (*)

ইন্দ্রিয়ের দরজায় দরজায় প্রকৃতির লাবণ্য যেন, হাত পেতে বলে; 'কে নিবিগো কিনে আমায়—কে নিবিগো কিনে…।'

সমুদ্রতীর থেকে হাজার মাইল ভেতরে চলে যাও,—

তখনও এ নদীর বিস্তার অন্ততঃ সাত মাইল। সমুদ্রগামী জাহাজ এর ভেতরে ২৩০০ মাইলও চলে গেছে। (মানে কন্যাকুমারী থেকে কাবুল!)

না—না,—'নদী' নামের কোনো ধারণাই আমাজোনের ধারণাকে ধরতে পারে না। 'আমাজোন' নামে যে বাটীটিতে জল ধরা আছে, ভাবতে অবাক লাগে—তার মধ্যেই সারা পৃথিবীর সব নদী মিলিয়ে যতো জল, তার ⅙ অংশ শুধু মজুদই থাকে। এ যেন জলের মরুভূমিতে বালুকণার বদলে বিন্দু বিন্দু জলের কণা। গোনো কতো গুণতে পার।

হ্যাঁ, মরুভূমি, চাষ নেই, হয় না। বাস নেই, করা যায় না। পথ নেই, তাই সেই বিভীষিকা সবাই এড়ায়। প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রায় দুই হাজার মিলিয়ন বছরের আগের জীবসত্ত্বার পাশে পাশে ফুটে আছে বিবর্তনের সঙ্গে লড়াই করে জিতে যাওয়া লিবানা। অর্কিড, ক্যাক্‌টাস, পাম, গ্রীনহার্ট, ম্যানগ্রোভ, বানাটা প্রভৃতি বনরাজি সমারোহ।

আমাজোন! সে কোন্ নদীর নাম? সে নাম তো এই নদীর মাত্র এক-তৃতীয়াংশে চালু। নৈলে কতোই যে নাম তোমার আমাজোন। এ রিভার উইথ্ মেনি নেম্‌স্। কতো নাম! তুমিই সালিমোস্, তুমিই হুয়ালাগা। তার আগেও জন্মের পর নাম বদলেছো তুমি ছ'বার। 'এমন জনে একটি নামে ডাকা কি হয় সঙ্গত?'

তোমার তীরে তীরে নাকি শহর আছে! মানচিত্রে তো তাই লেখে। —বাজে কথা। ও গুলো ফিরিঙ্গিদের লুঠ করার সিঁদ-কাঠীতে তৈরী দরজা। যারা আসে যায়, কেবল লুঠ করে। কথা কওনা কেন আমাজোন? কেন সব কথা ফাঁস করে দাও না? ইকুইতোস্, মানাউস্, সান্তারেম্, বেলেম্—আহাঃ! কী সব জলতরঙ্গী নামের ঝঙ্কার! আসলে ওরা স্থূলকায়, প্রাণতরঙ্গ, জানতরঙ্গ, রক্ততরঙ্গ। ছারপোকা, জোঁক, মশাও তো শরীরের কোন অংশে মুখটা সেঁটে দিয়ে চোষে। আমাজোন,—তোমার শরীরেও ফিরিঙ্গী

* কুঞ্জ পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,'
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি' ফিরে সে জাগিয়া,
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।—রবীন্দ্রনাথ

মুখ সেঁটে চুষেছে, তারই নাম ওরা দিয়েছে শহর।—যতো মিষ্টিই তার নাম হোক—মানাউস, ইকুইতোস, বেলেম্, ওবাইদো,-আসলে ওই পর্বে মুখ সেঁটে দিয়ে সফেদ-দস্যু চুষছে আর শুষছে।

আহা মানাউস! নগরী-বন্দর মানাউস্। তুমি কি মানাউস্? জঙ্গলের মধ্যে কোথায় আছে স্বপ্ন-নগরী স্বর্ণ পুরী এল্ ডোরাডো! তারই সন্ধানে তো এই মানাউস্, —এখানে নাকি ইন্‌কা মাঙ্কো মাচ্‌চু-পিচ্‌চু থেকে সরে এসেছিলেন। কিন্তু এমানাউস্ কি সেই মানাউস্? এল্ ডোরাডো? না! এ জঙ্গল। সবুজ নরক! শ্যামলী রাক্ষসীর দাঁতে, নখে, জটায়, লোল চামড়ায় এক মহামারীর বীভৎসতা।

তখনও বারান্দায় বসে। জোনাকীদের খেল থেকে মন সরে গিয়ে কেমন একটা ভয়ের সুড়সুড়ি লাগছে। সহসা মনে হোলো চারিদিকে চেয়ে দেখবার সময় হয়েছে। বারান্দা থেকে লাউঞ্জ দূরে। লাউঞ্জ থেকে খানাঘর আরও দূরে। খুব শীত। দরজা বন্ধ। আমার গায়ে একটা পোঞ্চো। সেটা সুবিধে করে গ য়ে জড়াতে গিয়ে চোখ আটকে যায় এক ভয়ঙ্করে। শাদা পাঞ্চোটার কোণা বেয়ে উঠে আসছে থাবার চেয়েও বড়ো একটা মাকড়সা। কালো, রোমশ—সহসা দেখলেই সমগ্র সত্তা বিপক্ষবাদী হয়ে ওঠে। এ মহাশয়ের সঙ্গে ত্রিনিদাদে দু'বার আমার পরিচয় ঘটেছে। কোরালের ছোবল. এবং ট্যারান্টুলার কামড়ের মধ্যে বেছে নিতে হলে, কোরালকেই নেব। কোরাল অতিসুন্দর দেহধারী। আর এ মাকড়সার করালরূপ মৃত্যুকে মৃত্যুর আগেই ভয়াল করে তোলে।

ভয় পেলে এর গা থেকে লোম খসে পড়ে। সে লোমের প্রতি অনু বিষাক্ত। পোঞ্চোটিকে গলা গলিয়ে বা'র করা আমার সাহসে কুলায় না। একদৃষ্টে কতক্ষণ চেয়ে আছি জানি না। অন্ধকারে তা'র গতির মাপও করতে পারছি না। ঘাম ছুটে যাচ্ছে সারা গা দিয়ে।

সহসা একটি কাঁচি আমার পোঞ্চোর পিছনের অংশ সোজা তলা থেকে গলা পর্যন্ত কেটে ফেল্‌লো হাওয়াই হাতে। পোঞ্চো দূরে পড়ে রইল।.........

.........মার্কা বলে, 'তোমায় খুঁজতে বেরুলাম। দূর থেকে অমন পাথরের মত বসে থাকতে দেখেই ঘাবড়ে গেলাম। তোমার চোখের দৃষ্টিকে লক্ষ্য করেই 'মিষ্টার'-কে দেখতে পাই।......এমন করে একা ঘোরা বন্ধ করে দাও। এ অরণ্যে তোমার পৃথিবীর জানা মাপের কিছু পাবে না। এ অরণ্যে যতো না বাষ্পকুণ্ডলী পাকায়, তার ঢের বেশী কুণ্ডলী পাকায় কিংবদন্তী। আমাজোন মেয়ে। খুব বড়ো, খুব দীঘল, রহস্যময়ী মেয়ে। কিন্তু এ দেশের মাটির মেয়েরা বেঁটে-খাটো ছোটো বহরের। এ সব মেয়ের তুলনায় আফ্রিকার মেয়ে গরিলাগুলোও বড়ো। এখানে মেয়েদের প্রথম ও শেষ ধান্দা খাদ্য। যৌনজীবন? না, এদের তা নেই। সখ বলে কিছু নেই। যৌন জীবনও সখের নয়। আনন্দ? সে যদি বলতেই হয়, শুধু ঋতুতে ঋতুতে শিশু জন্ম দেবার তাগিদে কিছু হাসি মজা। না তা-ও যৌন তাগিদে নয়। আমাদের মতো খাঁটি ইনকা ট্রাইব,

আর এই আমাজোনবাসী,—এরা আলাদা। এ দুই আলাদা। বীজ পেলেই বাচ্চা হ'বে। হ'লে যে বাঁচতেই হবে, এমন কোনো সংস্কারে ওরা বদ্ধ নয়। মানুষ দেখলে আজও ওরা পালায়। 'সাহেব' দেখলে অবশ্য আজকাল ওরা কিছু 'রোজগার' করতে চায়। যেখানে যা ভাঙ্গা হাঁড়িকুড়ি পায়, জমা রাখে। জানে সাহেবরা কিনবে।······ সাহেবদের ওরা ভাবে বোকা, হাঁদা, কেবল বোঝাই করে। ভাবে পাগল, উন্মাদ। সব জিনিষই জড়ো করতে ভালোবাসে—হাঁড়ি, ভাঙ্গা বাসন, হাড়, গাছের পাতা, বালি প্রভৃতি। সাহেবরাও এ সব মেয়েদের ছোঁয় না। এরাও জানে না বেচার মতো ওদের দেহেই কিছু আছে। শুধু হাঁড়ি, হাড়, বাসন। কি দিয়ে কেনে? ডলারে?

না। ছুরী, বন্দুক, ওষুধ টর্চ, দুধের টিন, বিস্কুট, বিশেষতঃ চিনি আর নুন—পুঁতির মালা ইত্যাদি এখানে গল্প। গল্প এই জন্য যে 'সখ' নেই। সখই যার নেই, তার পুঁতির মালা কী? মেয়ে আর পুরুষে কোনো ভেদ নেই। শুধু যে টুকু ভেদ না থাকলে নয়। বুকই নেই, তার দুধ। বুক যে একটা যৌন এলাকা, মিলনে যে, ঠোঁটেরও কিছু অংশ আছে,—থাকা উচিত। ওরা ত' বোঝে না। শাদারা যখন নৌকোয় করে ঘোরে বা ক্যাম্প করে থাকে, তখন ওরা আপোষে হাসে সাহেবী মেয়েদের অঙ্গে অতো আবরণ দেখে; বুকের ওপর অমন বিসদৃশ পিণ্ড দেখে, আর বিশেষ করে ঘন ঘন ঐ ঠোঁট ও গালের চক-চাকের ঘটা দেখে। ওরা মনে মনে ধ্রুব জানে যে, ওদের গায়ে কোনো কদর্যতা আছে বলেই ওরা গা ঢাকতে চায়।

—"শুনেছি ওরা খুব শান্ত। তবে 'আমাজোনিয়ান' কি?"

—"জানি না কি! হোমারের গল্পের বাইরে এই আমি একজন আমাজোনিয়ান। বরং বলবো ভীতু। ওদের বড়ো ভয় শাদাদের। ওদের ভয়, শাদারা পেলেই ধরে নিয়ে যাবে। জঙ্গল থেকে রাবার, মধু, কাঠ, বিশেষ রাবার,—মাথায় বইয়ে নিয়ে যাবে শতশত মাইল—মাস, দু'-মাসের পথ।"

—"দাসত্ব?"

—"লিখিত-পড়িত নয়। খাতায় লেখা চাকরি, মজদুরি। কিন্তু······কি বলবে? দাস নয়? তবে এদিকে নেই। সে পাবে রায়ো নেগ্রো রায়ো ব্রাঙ্কোর বিশাল সমুদ্রের মতো জলের ধারে। ওঠো······উঠবে না?"

—"চলো। রাত হয়েওছে, আবার হয়ওনি। মাত্র দশটা। সকালে স্নানের জল পাবে তো?"

—"খুব ভালো ব্যবস্থা।"

—"মধু কি করছে?"

—"তোমার ঘরে বসে কি লিখছে। অপেক্ষা করছে তোমায় মালিশ করে দেবে।"

—"ওকে ভালো লেগেছে তোমার!"

—"তার চেয়েও ভালো লেগেছে তোমায়।"

—"আমায় কেন?"

—"তুমি কি জানো না, কতোই ভালো লাগার তুমি। নিরাপদ। সমর্থ। ভারসহন।"

—"প্রয়োজনীয় বলতে চাও? বেশ! মধুকে ভালো লাগে না?"

—"লাগে। কিন্তু আমাদের বয়সে ভালো লাগার বিচার কৈ? তোমায় ভালো লাগে যেটা সেটাই ভালো।"

—"এতো যখন প্রশংসা, মধুর মালিশ তখন আর দরকার না হলেও হতে পারে। কি বলো?"

—"চলো, চলো। তুমি সত্যি ভারী দুষ্টু।"

সকালে উঠে দেখি, মহা বিভ্রাট। যাকে বলে, আপ্ সাইড্ ডাউন। আর সেই চক্রব্যূহের মণ্ডলেশ্বরী স্বয়ং মার্কা। অল্পভাষী, মৃদুভাষী এই মানুষগুলোকে সহসা মহা উত্তেজনাসহ তাদের 'মাতৃভাষা'র প্রায় ব্যঞ্জন বর্ণহীন, যুক্তাক্ষর বর্জিত ভাষায় হৈ-চৈ করতে দেখে (বলা উচিত হচ্ছে না: কটু উপমা; কিন্তু হক্কের কথা: বলতেই হবে!) পশুশালায় বাঁদরের খাঁচায় সাপ পড়ার মতো অবস্থা। খুব শব্দ। কিস্সু বুঝতে পারছি না।

মার্কা আমার পোঞ্চোটা বার করে ওদের দেখাচ্ছে। সেটা তখনও কাটা। আমি উল্টে কাটা অংশটা সামনে করে পরেছি।

হোটেলের ম্যান-এজার, ম্যু-এজার, টীন-এজার সব এসে একত্রে আমার পোঞ্চোর 'মুয়ায়না ফর্মা-লো' (পরীক্ষা করল)।

মার্কা আমার হাত ধরে কাঠের রেলিং দেওয়া সেই বারান্দায় টেনে নিয়ে গেল। সবার চোখে আতঙ্কের চুণকাম দেখতে পাচ্ছি। আমি যে বেঁচে আছি, এ ওদের বিশ্বাসই হচ্ছে না।··· আমার হাসি দেখে ওদের গা যেন বিনা শিখায়ই জ্বলছে।

গিয়ে দেখি সেই ট্যারাণ্টুলা। মরে পড়ে আছে, অথচ পিঁপড়ে বা অন্য কোনও প্রাণীজগতের মুদ্দোফরাস মৃতদেহটিকে স্পর্শও করেনি। পাশেই পড়ে আছে একটি অতিকায় ব্যাঙ। হ্যাঁ, অতিকায়! অন্ততঃ দুই থেকে তিন পাউণ্ড! তিনিও মৃত।

এই ধরনের অতিকায় আমাজোনিয়ান ব্যাঙের খবর কেতাবে-পত্তরে জানা ছিল। ভেট-মোলাকাৎ হয়নি। জানতাম, আত্মরক্ষার জন্য এদের গা থেকে যে নির্যাস বার হয়, তার ভয়ে সাপেরাও এদের ছোঁয় না। বিশাল আনাকোণ্ডা, কায়েনী বা গোসাপ, গিরগিটী, বিশেষ সবুজ রংয়ের ইগুয়ানারাই এটিকে দুর্ভিক্ষের তাড়নে ভোজ্য করে গিলে ফেলে।

ব্যাপারটা বোঝা গেল। ব্যাঙটা ট্যারাণ্টুলার উপস্থিতি টের না পেয়েই এখানে উঠে এসেছিলো, আলোর ধারের পোকা-মাকড়ের লোভে। কিন্তু এদের লাফিয়ে চলার শব্দটি অত্যন্ত সজাগ সপ্রতিভ সেই মাকড়সার নজর এড়ায়নি। সহজ প্রাকৃতিক জীবন ধর্মের বশেই তৎক্ষণাৎ সে পোঞ্চোর আশ্রয় ত্যাগ করে মণ্ডুক সম্রাটকে আক্রমণ করে বসলো। একেবারে তিনি তার ঘাড়ে চেপে বসেন। তিনি মোক্ষম কামড় দেন যে চামড়ায়, সে চামড়া তখন আঠালো বিষে ক্লেদাক্ত। 'কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে।' ফলে দুইজনেই পাঁচে-পাঁচ মিলিয়ে দিল। বিষে বিষে বিষক্ষয় না হয়ে, জীবন ক্ষয় হলো।

ফলশ্রুতি, আমি বেঁচে গেলাম। ট্যারাণ্টুলার কামড় খেয়ে অক্কা পেল ভেক, হারাধনের তিনের মাঝে বেঁচে রইলাম এক। সে—একও তখন ভেউ ভেউ করে কাঁদার বদলে হেসেই ব্যাকুল। "আস্ত পোঙ্কোটাকে বৃথাই কাটলে", বল্লাম মার্কাকে।

মার্কা বলে, "বাব্বাঃ! আশ্চর্য হচ্ছিলাম। কাঁচির শব্দ তো থাকুক দূরে, কাঁচির শব্দের গন্ধ পেলেও ট্যারাণ্টুলা অন্ততঃ পাঁচশো রোয়া পরিত্যাগ করে তোমার পোঙ্কোকে চিরদিনের মতো অব্যবহার্য করে রাখতো। অথচ তুমি দিব্যি পোঙ্কো গায়ে দিয়ে বেড়াচ্ছ। ···না হেসো না। এ দেশের ঘটনা একটা বলি, শোনো। শুনে তার পর হেসো। এক গ্রামে পর পর চারজন মরদ সে মরদ যখন সাপ ছাড়াই সাপের বিষে মারা গেল, গাঁয়ে হৈ হৈ। ওঝা ডাকে আর কি! দেখা গেল চার জনের ক্ষেত্রেই যে-একটি ব্যাপার সাধারণ, তা মাত্র এক জোড়া করে মাঠে যাবার রাবারের জুতো। জুতো জোড়া প্রত্যেকেই পরেছিল। তখন চললো সন্ধান। সেই রাবারের জুতোর গায়ে, ভেতর পানে উঁচিয়ে ছিলো সাপের ভাঙ্গা দাঁতের একটি খণ্ড। সেটি যার যার পায়ে ফুটেছে—।"

—"কী সাপ?"

—"লাবারিয়া, ফ্লর-ড্য-ফ্রাঁ, মাপিপি—অনেক নাম তার।"

—'জানি, ব্রিটিশ গায়নাতেও এমন ঘটনা শুনেছি। ···এখন বুঝেছি, ঐ ভেকে আর মাকড়সায় যখন বোঝাপড়া লেগে গেছে, তখন সেই মুহূর্তেই তুমি আমার পোঙ্কো কেটে তারিফ নিচ্ছিলে।"

—"নিচ্ছিলাম কি? অবাক হয়ে ভাবছিলাম—ট্যারেণ্টুলা আমায় তেড়ে আসেনি কেন? এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে।"

আবার সবার কিচির মিচির। মার্কা যে "কী বলছিলো, তা খোদারই মালুম। —মাঝে মাঝে অবশ্য ও বলছিলো—রূপাচামামা—পাচামামা।" মরুক গে, বলুক গে। ওরা ঘাবড়েছে। ঘন ঘন আমায় 'ড্যাব ড্যাব' করে দেখছে সবাই। বোধ করি ভাবছে, এবার আমি ওদের ছুঁলেই ওরাও পাঁচে পাঁচ মিলিয়ে দেবে।

মার্কা সহ ওদের সবার ধারণা আমার মতো জবর খলিফা তান্ত্রিক 'পাচামামা' দেবীর 'থানে' রক্ত মোক্ষণ করার ফলেই এই অঘটন ঘটনায় জীবন লাভ করলাম।

ও-দেশে 'আশ্রম' ফেঁদে বসলে বেশ টু পাইস হতো।

জন্জনের বদলি এলেন টুমে পাব্লো। ওকে স্বর্গে দেখলে, আমি নির্ঘাৎ দুর্বাসা ভাবতাম; নরকে দেখলে, সোজাসুজি বে-দখলি স্বয়ং যমরাজ ভাবতাম। ওর গায়ের চামড়া কতো পুরোনো জানি না; কিন্তু তার ঢের বেশী পুরোনো ও যে অদ্ভুত শার্ট পোঙ্কো, পাজামা, ওম্ব্রেরো মিশ্রিত এক অপেয় পাঞ্চ-পোষাক পরেছে সেইটি। ঝরঝরে গাড়িটা কিন্তু চলছে তোফা। আমি তো সামনের সীটেই বসি সব সময়ে। অথচ পায়ের কাছে মেঝে, অলীক মেঝে, মিটে গিয়েছে। লীক-বহুল মেঝের পাঁজর ভেদ করে নীচে অপসৃয়মান পৃথিবীর রং দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথের ধুলো, বালি কাঁকর, পাতা এসে উড়েও পড়ছে

গায়ে। কিন্তু বলবন্ত ইঞ্জিন সমানে প্রাণায়ামে পূরক-কুম্ভক-রেচক করেই চলেছে। কোনো ব্যতিক্রম বা প্রত্যবায় বোধ নেই। মনে মনে যেন বিশ্বাস দানা বাঁধছে বস্তুতঃ মোটরের ছাদ বা তলা না থাকলেই টুমে যেন গাড়ি ভালো চালায়।

টুমের মেজাজ 'টুরিষ্ট' শুনলেই ভেজা ঘুড়ির মতো ছিঁড়ে ফর্দা ফাঁই। নেতিয়ে পড়ে। না খেয়ে ম'লেও ও মার্কিনী মাল নেয় না। কেন? তা'রা ওকে মানুষ বলে গণ্য করে না তাই। উপরন্তু ওব গাড়ি নিয়ে হাসাহাসি করে। কতো ক্যাডিলাক্, ডাট্সন্, ডি-সোটো এই পথে কুপোকাৎ; অথচ ওর এই কোমর তোলা ফোর্ড কখনও কারুকৃথে ধোঁখা দেয়নি। 'স্মৃথ্'—চলেছে। আর, ওর নামও, সেই পূত—পবিত্র 'টুম', ইন্কা পুরোহিতের হাতের বলি দেবার সোনার ছুরি। সেই নাম ওরা পাল্টে দিয়ে টম্, ঠম্ প্রভৃতি যা খুশী বলবে? অসভ্য ওরা। খুবই অসভ্য। খোলোষ চেয়ে ফেরে। ভেতরটা দেখে না।

মার্কা বলে,—'জমবে ভাল।'

গাড়ি উরুবাম্বার তীর ধরে দক্ষিণে খানিকটা গিয়ে যে সেতুটা পার হলো, সেটাই মাচ্চু পিচ্চুর ওপর থেকে দেখা গিয়েছিল। সেতুটার পর চড়াই। বাঁদিকে বরফে ঢাকা উইনেওয়ান পাহাড় রেখে ডান দিকের জঙ্গলে ঢুকলাম। ভীষণ জঙ্গল বলে। কিন্তু এর চেয়ে বড় এবং ভয় জাগানো অরণ্য বলতে অরণ্য আমি দেখেছি পাকা রাইমার পথে (গায়ানায়); বা হিমালয়ে খাত্রালা পাহাড়ের পেছনের পশ্চিমের ঢালুতে। এ জায়গাটার নামই ইস্তিপাতা, যার মানে বাঘ-বন। বাঘ নেই তা'বলে। এ সব অরণ্যে বাঘ নেই, গণ্ডার নেই, হাতী নেই। ভয়ঙ্করের মধ্যে আছে অজগর, আনাকোণ্ডা, শূয়ার, পুমা, কুমীর, কাপিবারা বা তাপীর;—তাড়া করলেও ভীষণ কিছু নয়।

কিন্তু ভীষণ এই জলা। লোকে সাধারণতঃ এই শ্যামলতা দেখে ভাবে, কতই না জানি উর্বর এই দেশ। ভাবে, নিশ্চয় এরা ভীষণ কুঁড়ে; নৈলে বেশ চাষ-বাস ক'রে সুখে থাকতে পারে। কিন্তু এখানে সর্বদা জল। সর্বদা বৃষ্টি, যখন আধা বছর আন্দীজের এপারে বৃষ্টি, তখনও জল আসছে এই বাটীতে। আবার যখন ওপারে বৃষ্টি, জল তখনও আসছে এই বাটীতেই।

হঠাৎ যেন সব নির্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। আকাশ ঘন নীল না হলেও লীমার তুলনায় সূর্যের আলো বেশ তরল। বহু পাখি উড়ছে, কখনও একসার ব্যতিব্যস্ত বক, কখনও হাজার খানেক আগুন লাগ-পাখার ঝাপট মেরে একদঙ্গল মাক্কাও। কখনও,—সে এক অভিনব বিচিত্র চিত্র; মৃদু-তির্যক সঞ্চারে মালা গেঁথে চলেছে রক্তবর্ণ সারস, পেলিকান, আইবিস।

এ স্তব্ধতার হদিস পেতে গিয়ে দেখি, টুমে অতি সন্তর্পণে তার বিবাগী ফোর্ডখানাকে চালাচ্ছে। প্রায় দল-দলের ওপর দিয়ে। সামনে এক অতিকায় পাম পড়ে আছে। গাড়িটা গুঁড়ির ওপর দিয়েই চালিয়ে নিয়ে গেলো। বুঝলাম ওটা ছিল পচা, অন্তঃসার-

শূন্য। এমন শত শত পচা গাছ দলে-মলে, শতশত পাহাড়ের গা চোয়া ফর্নে ঢাকা জলের প্রস্রবণকে হেলায় ফেলে রেখে আমাদের। ফোর্ড চলেছে যেন, জর্মন-ট্যাঙ্ক। টুমে ড্রাইভার যেন মার্শাল রোমেল।

এ জঙ্গলে গভীরে যাবার জন্য সরকারী অনুমতি আবশ্যক। এ তল্লাটে চাকরির নাম করে জড়ো করা মানুষ বেচে বেনামীতে। 'দাস' প্রথা চালু। দাসেদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা ব'ল, যে তারা মজদুর। বুভুক্ষায় মিথ্যা বলার দোষ নেই—বলেছেন বিশ্বামিত্র। আমি ভাবি, শত্রু 'প্রথা' নয় ; শত্রু বুভুক্ষা। ক্ষুধাকে জিইয়ে রাখাই হচ্ছে ক্যাপিটালিজ্‌মের একখানা মোক্ষম সিদ্ধান্ত।

দম নেবার জন্য ফোর্ড-রথ থামলো একটু ফাঁকার মধ্যে। শুধু ডাল-পাতা, তক্তা দিয়ে গড়া দুই-তিনটি ঘরের মতো। আমরা বসলাম পোঁতা ডালের ডগায় সাজিয়ে বাঁধা অনেকগুলো ছোঁচা ডাল আর বেত দিয়ে গড়া একটা বেঞ্চি মতো মাচানে। ঘরে কেউ নেই। কুকুরও নেই। মার্কা ভেতরে চ'লে গেল। বেরিয়ে এসে বল্‌লে—"এরা ইয়াগুয়া কৌমের লোক। এরা পোষাক পরেই না ; কিন্তু খুবই পরিচ্ছন্ন। মূলতঃ মাছ খায়। হাটবারে বেচার জন্য বেত বা ঘাসের টুপী, ঝোড়া ইত্যাদি বোনে। ভেসজ, ওষুধ-বাকলও সংগ্রহ করে। আমাদের মতো অসভ্য দেখলে ঘাসের ঘাগরা পরে। নৈলে কিছুই পরে না। আমি এলে এরা স্বাভাবিক ভাবেই থাকে।"

"তুমি ?"—সন্তর্পণে শুধাই।

"আমিও পরি না"—সরল হেসে মার্কা জবাব দিলে।…"পুরুষেরা অবশ্য একটা ফালি ঝোলায়, বা এক গোছা ঘাস বা খড় বেঁধে রাখে। আসলে গায়ে কিছু লেগে থাকলে অনিবার্যভাবে চামড়া হেজে যাবে। এই ভয়। না-পরাটা শুধু স্বাস্থ্যকরই নয়, একান্ত প্রয়োজনও।"

খুব জোরে সিটী দেবার মতো পর পর কয়েকবার ডাক। হাসলো টুমে, হাসলো মার্কা। প্রেতলোকের জানালা খুলে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ডাকছে।… পাখিটা বড়ো, কালো, গলায় নীল রং ঝকঝক করছে সবুজের সঙ্গে মিশে। পাখিটার নাম তুঙ্কি। এ তল্লাটের ধারণা ওরা (পাখিগুলো) আসলে আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মা।"

হঠাৎ মুখে আঙুল ঢুকিয়ে তীব্র এক ডাক তুললো অঘোর সন্ন্যাসী টুমে। বার কতক ডাকার পর একটি দম্পতী দু'টি শিশুসহ ঘাসেরই এক নৌকায় চড়ে তীরে এল। একটুও কিন্তু শব্দ হোল না। মেয়েটি একেবারেই উলঙ্গিনী, কিন্তু খুব সাবলীল। হাসতে হাসতে নামলো। কে-বা জানে কে উলঙ্গ, কে অসভ্য, কে সরল, কে জবর-জং। অদ্ভুত ভালো লাগার শিহরণ বয়ে যায়, যেন রোদ লাগা আমলকীর ডালে বাতাসের খেলা।

ঠিক হোল, ঐ ঘরে টুমে আর ইয়াগুয়া পুরুষটি কিছু খাবার ব্যবস্থা করবে। আমরা নৌকো করে একটা, অন্ততঃ একটা দ্বীপ ঘুরে আসব। নৌকোয় তিন জনের বেশী যাওয়া চলবে না। ইয়াগুয়া মেয়েটি নৌকো চালাতে লাগল।

কিন্তু ঘুরব কি? কোথায়? থক থকে জল, শ্যাওলা, আর এক ধরনের কুচো-কুচো পাতার সর বলবো না, কার্পেটের মতো। কোনো শেকড় নেই। পাতার ধারগুলো করাতের মতো। তাই দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এমনি পরিবেশ যতদূর দৃষ্টি যায়। লগি নিয়ে জলে ডোবালাম। জল,—না,—কাদা কিছুই বোঝার জো নেই। বলে, আমাজোনেরই বাড়তি জল উপচে এসে বর্ষায় ঢুকেছে, আর নামবার নাম নেই।

সেই অন্ধকার অরণ্যের কোনো পরিচয় নেই। পাশাপাশি গাছ যারা উঠেছে কারুর কারুর সর্বাঙ্গ ঘিরে কুরুশ-কাঠীর (বা সজারুর কাঁটার) মতো লম্বা কাঁটা। একটা একানে গাছ জল থেকে মাথা বা'র করে দাঁড়িয়ে আছে—যেন, গাছের ধব্‌ধবে সাদা কঙ্কাল। চারি-ধারে ডাল তার ছড়ানো। না পাতা, না ফুল, না রং। আবার তা'রই আশ্রয়ে একটি উবড়ো খাবড়া পাখির বাসা।

কালো জলটা ক্রমশঃ তুঁতে নীল হতে না হতে জলের মধ্যে জেগে উঠলো বহু গাছ, ডাল, ঝোঁপ, কিন্তু কি আশ্চর্য এতোখানি সজল-শ্যামল অবকাশে না কোনো ফুল, না পাখি। মরুভূমি, নিশ্চিত মরুভূমি। জলের মরুভূমি!

এই সময়ে দেখি, দু'টো বিশ্রী মুখ জলের ওপরে বিশাল নাকের ছেঁদা ভাসিয়ে ভেসে চলেছে। শুশুক নয়। এদিককার নাম 'ম্যানিটি' (মেনাতী)। কাছে যেতেই ডুবে গেল; ভয়ে নয়, ভয় জানে না, অভ্যাসে। মার্কা বল্‌লো—"মানাতীরা খুব দুধ দেয়। মাঝে মাঝে ধরে এরা দুধ দুয়েও নেয়।" আমি বলি, "দুধ খুব ভালোবাসি; কিন্তু তা বলে, ওই হিপোপটেমাসের দুধ খেতে লারবো।"

সকলে হাসতে থাকে।

অক্লেশে নিঃসঙ্কোচে সেই ইয়াগুয়া ললনাটি নিজের অতি বিনীত স্তনমণ্ডল দেখিয়ে বল্‌লে—"আমাদের দেখছো তো, নেই কিছু, দুধ হবে কি? তাই 'ওই দুধই আমাদের দরকার।" (বুঝিয়ে দিলে মার্কা)।

দ্বীপ দেখে তো চক্ষু স্থির। অন্ততঃ বিশ হাত পথ তুলতুলে কাদা। বাকী সব বালি। চার-পাঁচটা কুঁড়ে আছে। জন-মনিষ্যি নেই। খুব হতাশ হ'লাম। ফিরে চলার কথা বল্‌লাম। কুজকোর গাড়ি ছাড়বে তিনটেয়।

এ ভাবে আমাজোন দেখা যায় না। অন্ততঃ দেড়মাস সময়, খাদ্য আর মোটর লঞ্চের ব্যবস্থা ক'রে যারা এই জলের বিশাল মরুভূমিতে ঘোরে, তারা আমাজোন খানিকটা বুঝতে পারে। নৈলে এই যাকে মনে হচ্ছে লিয়ানায়, মোরায়, পাযে, সীডারে,—আরও শত শত নাম-না-জানা গাছের গড্‌ডলিকায় মগ্ন, আমাজোন এরই গূঢ়, গাঢ়, নিরবচ্ছিন্ন বিস্তার। কাল এবং দেশকে আচ্ছন্ন করা এক নাগাড়ে চরিত্রহীন বোদা, বোবা বিস্তার। অনড়, অপরিবর্তনীয়, অন্তমনের চোখের ধূলি।

হঠাৎ জলের ওপরে দু'-তিন জায়গায় থোকা থোকা অতি সুন্দর ফুল। রং বলে কোন বিরাম তো এতক্ষণ সবুজ ধোয়া চোখে পাইনি। হঠাৎ এই অপ্সর-বিভ্রম, এই গন্ধর্ব-মণ্ডন

পীত, শ্যামলে, নীলে, শাদায় মন বিভোল করা ফুল। মন দুলে উঠলো। বললাম—“ওদিকে একটু চলো না ; দেখি কি ফুল।”

ওরা জানে, তাই হাসল। পুরো কাছে যেতেও হোল না, হাজার-হাজার প্রজাপতি সারা আকাশময় জলের ওপর যেন ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে পড়ল। ফুলেদের পাখা হলে যে প্রজাপতি হয়ে যায় সেটা বোঝা গেল। মাঝে মাঝে সারস জাতীয় পাখি দেখছিলাম। বেশ কয়েক-শ' ফ্লামিঙ্গোর মতো লাল আইবিস্ জলার একটা ঝুঁকে পড়া উইলো গাছের স্তবকের গায়ে লাল ফুল ধরিয়ে রেখেছিল। সূর্যের আলোয় চমকাচ্ছে।

কোন মতে গাড়ি ধরতে পেরেছিলাম।

অবশ্যই কুজ্‌কোয় নেমেই রেভারেণ্ড হামফ্রী আর ইয়ান্‌কে দেখলাম। কিন্তু এবারই বাধলো বিপদ। মার্কা তখন সঙ্গ ছাড়বে না। 'বাবা'-র সঙ্গে থাকবে এবং লিমায় না হলেও কুজ্‌কোয় ফিরে তবে সে এ সঙ্গ ছাড়বে।

হামফ্রীর যে একটা খুব আপত্তি ছিল, তা নয়। কিন্তু বল্‌লো,—“ফিরে কুজ্‌কোতে এসে চার্চে খোঁজ নিও।”

মার্কার খুশী দেখে কে!

হোটেলে আশাই করেছিলাম তিন-ছেলের মা ইসাবেলা থাকবেন। তাঁরই স্নিগ্ধ হাসি আমাদের অভ্যর্থনা করলো। আমাদের আরেকুইপা—পিউনো যাবার ব্যবস্থাও ঠিক। সকাল সাতটায় প্লেন। ফিরতি প্লেন সাতটায়। কুজ্‌কোয় ফিরছি ন'টায়।

—“তবে একদিনে পারবেন কি? বড়ো কষ্ট হবে। যাই হোক রিজার্ভেশনকে জানাবেন।”

আরেকুইপা

আরেকুইপায় যাবার আমার উদ্দেশ্য শুধু তিনটে জিনিব দেখা। মধু এ সব জানে না, ভাবে না। বাবার ওপর ছেড়ে দিয়ে ও নিশ্চিন্ত। আমি প্রথমে দেখতে চাই সান্তা-কাতালিনার সন্ন্যাসিনী আশ্রম। এ আশ্রমের বার্তা ক্যাথলিক দুনিয়ায়—প্রায় কিম্বদন্তী। বিশেষ বিশেষ কারণেই। দ্বিতীয় কারণ, আরেকুইপা নামক শহরটির ঐতিহ্য এবং রূপ। তৃতীয় কারণ, এই পথে যেতে হবে পিউনো,—তিতিকাকা হ্রদের ধারের একটি শহর।……

এই পিউনো থেকেই, ভাগ্যে থাকলে,—হয়তো আমি সেই পুণ্য-ক্ষেত্রের মাটির তিলক ধারণ করতে পারবো (আমাদের হাড়ের ঘুণের মধ্যে পৌত্তলিকতা। বল্‌লে কি হবে?)—

যেখানে বোলিভারের দুর্মদ সৈন্যেরা সেনাপতি সুক্রের নেতৃত্বে চিরদিনের মতো হারিয়ে দিয়েছিল ফিরিঙ্গী-ঔপনিবেশিকদের। সেই আয়াকুচোর ময়দান। দক্ষিণ আমেরিকার সেই সুবিপুল ফিরিঙ্গী সাম্রাজ্য গেরিলা সর্দার বোলিভার খান খান করে দিয়েছিল আয়াকুচোর ময়দানে। সেই 'ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রের' মহিমায় দীপ্ত আরেকুইপা, তিতিকাকা, আয়াকুচোর মাটি ;—যে মাটির ওপরে, ভারতের কৈলাস বা গৌরীশঙ্করের মতো, আণ্ডীজ পর্বত-সাম্রাজ্যের মহানায়কের মতো চেয়ে আছে বিশাল অগ্নি-পর্বতের তুষার ধবল চূড়া—'মিস্তি' (৫৮২২ মীটার)।

আমার কাছে এ ইতিহাস শুধু কোন বিশেষ দেশ বা জাতির ইতিহাস নয়। বিশেষ কোনো পাণ্ডিত্য বা বিদ্যা-বৈদগ্ধ্যের শীলমোহর নয়,—আমার কাছে এ কথা এক আশ্চর্য জীবনের, আশ্চর্য আদর্শের, আশ্চর্য উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ সর্বস্ব সমর্পিত এক মহান আত্মত্যাগের গান। সেই আদর্শমণ্ডিত কল্পলোক-বিহারী চির সংগ্রাম-মনা জীবটির নাম মানুষ। মানুষ যেখানে অতীতকে অবলম্বন করে, ভবিষ্যতের সূর্য পিপাসায় প্রমত্ত হয়ে পাঁজর জ্বালানো মশাল হাতে নিয়ে ছুটে যায়,—সেই মাটি, সেই দেশ, সেই আকাশ-বাতাস পরিমণ্ডল আমার মনের পুণ্য তীর্থ।

তা'ই তো আমি পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে যখন যেখানে গিয়েছি ঘুরেছি শুধু মানুষের সন্ধানে ; ঠিক এমন এমন মানুষের সন্ধানে ফিরেছি, এমন এমন মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছি ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জীর ছক বাঁধা পথে যাদের হদিস মেলে না। সে সব ছক বাঁধা পথ আমি সজ্ঞান-বিচারে সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছি।

আমার 'দেশ দেখা তাই জীবন-বিলাসী, অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন ট্যুরিষ্টের ফ্যাশনেবল্ আত্মচোষ নয়। আমি সতর্কভাবে জানি নিজের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার, পালিয়ে থাকার একটা ব্যয়সাপেক্ষ উপায় সৌখীন ভ্রমণ। সেই ভ্রমণ, 'দেখবো'—এই মোহ, —আমায় কোনো প্রেরণা কখনও দেয়নি। এই মানুষ জানার প্রেরণা, উদ্দীপনাই আমার উৎসাহ জুগিয়েছে বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি মানুষের মর্ম-যাতনার সন্ধানে ঘোরার। দেশে দেশে, সমাজে সমাজে সংগ্রামী মানুষের অশ্রু-স্বেদ-শোণিত কর্দমে পথ হাতড়ানোর ইতিহাস এক বিচিত্র মহাভারত, রক্তাক্ত অভিনী। সেই ইতিহাসেই আমার 'চরণ-বিচরণ'। এমন অনুভূতির স্বাদ আমরণ জমা হয়ে থাকে সুধা-স্মৃতির চাকে ; আমরণ সম্পদ হয়ে থাকে সেই অভিজ্ঞতা জীবনের সঞ্চয়ে ; মশাল হয়ে পথ দেখায় ভবিষ্যতের অন্ধকারে ; সাহস জোগায় ; সংঘাতের শক্তি জোগায় ; মানুষ নামের জীবের সাধনায় জীবনে সূর্যের মতো প্রাণ-তরঙ্গ এনে দেয়।

আমরা কিছুদিন আগে চান্-চান্ শহরে গিয়েছিলাম। সেই শহরের আশ্চর্য শুভ্রতার কথা আমরা লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু আরেকুইপার শুভ্রতা অবিশ্বসনীয় শুভ্রতা। বার্বাডোজের গ্রামাঞ্চলে, বার্মুদায় গ্রামে গ্রামে কেবল শাদা পাথরের বাড়ি দেখা যায়। কিন্তু সে সব বাড়ি শাদা হলেও পাথরের নয়। বার্মুদা, বা বার্বাডোজ উভয়েই কোরাল দ্বীপ। বার্বাডোজ সেই কোরাল কেটে, গুঁড়িয়ে বাড়ি করলেও বার্মুদা সোজাসুজি সেই কোরাল

তিতিকাকা হ্রদে পানসী নৌকা

ডাইনে নিনা মাঝে মার্কন, তৃতীয়া মার্কার বন্ধু (লীমা)

তিতিকাকার মেয়ে মাঝি
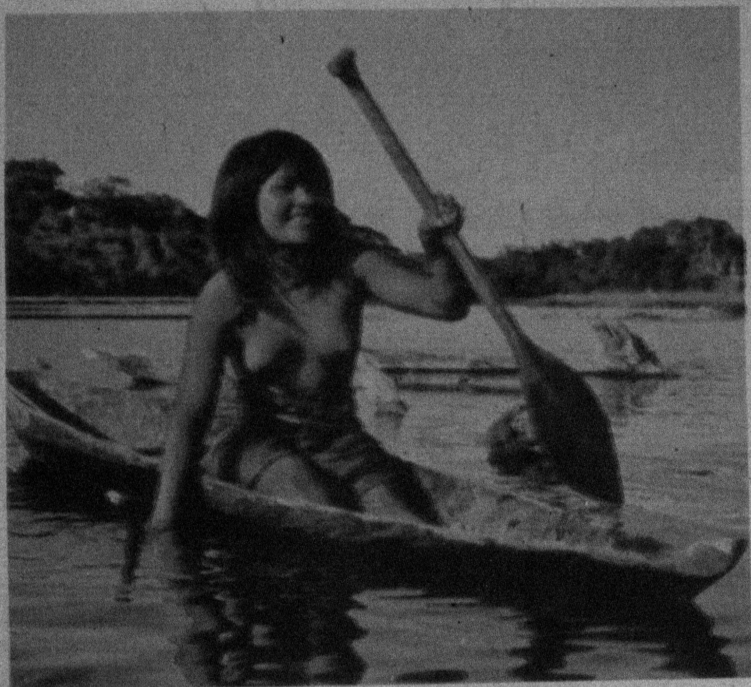
আমাজোন নদীর শৈশব

পাহাড়কেই কেটে, কুরে, চেঁছে, ছুলে বাড়ির আকার দেয়। বহু বাড়িতে জোড় অবধি থাকে না।···এ সাদায় এক সম্পূর্ণ অতীন্দ্রিয় স্বাদ !

এরা তো পাথরের নয়। আরেকুইপার পাথর সাদা মার্বেলের নয়। আরেকুইপার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে দাঁড়িয়ে 'মিস্তি'। মিস্তি ছাড়াও এ খণ্ডটাই অগ্নি পর্বতের লাভার আওতায় পড়ে। ফলে এখানকার প্রকৃতিতে এক ভস্মাঙ্গরাগ কর্পূর ধবলিত মাহেশ্বর সুষমা যেন পার্বতী গৌরীর বাহুবন্ধনে রজতগিরিনিভ মহেশের মতো চির দেদীপ্যমান। কল্পান্ত-ব্যাপী মহাদহনের ফলশ্রুতি এই শ্বেতকণার পিণ্ডরূপ যেন, ভস্ম বিভূতির মৃড়ত্ব, স্থাণুত্ব। এ তল্লাট ভর্তি এই শাদা পাথর দেখে বহু প্রাচীনকালে ইন্‌কা সম্রাট মায়েতো কাপাকের মনে এই মিস্তি-খণ্ডে এক নগর বসাবার সঙ্কল্প জেগেছিল। এই জলদশুভ্রনিভ পাথরের রূপ দেখে সম্রাট মুগ্ধ।···আজ আমিও মুগ্ধ।

আমাদের মনে আছে কি যে, ইন্‌কা ভূমি-শাসনের একটি বড়ো নিয়ম ছিল—প্রজাদের বসতি ভেঙ্গে বারে বারে দিকে দিকে নব নব বসতির প্রতিষ্ঠা করা ? এতে দেশও যেমন হবে সমৃদ্ধতর, তেমনি প্রজাদের মধ্যে মৌরসী দখলের বিষ ছড়াবে না। সমগ্র দেশকে তারা নিজের বলে ভাবতে শিখবে। আর ছড়াবে না প্রাদেশিকতা ভাষার জ্ঞান বা অজ্ঞান দেশাত্মবোধের বাধা হবে না।

ইনকো মায়েতা কাপাক এই অপূর্ব অধিত্যকাটিতে মনুষ্য বসতি করান। সমুদ্র থেকে ২৩৫৯ মীটরের ওপরে এই অধিত্যকাকে ঘিরে আছে অসংখ্য তুষারাবৃত গিরিমণ্ডল। ইনকা সাম্রাজ্যের মহত্তর গৌরব যে-উত্তর-দক্ষিণের সোজা পথ, তাই আজ প্যানামেরিকান হাইওয়ে নামে এখানেও উপস্থিত। চিলি নদীর এই অববাহিকায় যতদূর দেখা যায় কেবল ফলন্ত ফলের বাগান ; জলপাই, তুলা, ভূট্টা আর আখ। চিম্বা এবং সুকাহুয়াইয়া নামে দুটি গ্রামের পত্তন থেকে আজ আরেকুইপা পেরুর এক সমৃদ্ধ শহর। এখন সে গ্রাম দু'টির নাম বদলেছে। যেমন সুতানটী হয়েছে বাগবাজার, চিৎপুর। তেমনি একটির নাম ইয়ানাহুয়ান্কা, আর অন্যটি সোকাবায়া।

কোয়েচুয়া ভাষায় 'আরেকুইপা' নামের অর্থ, 'স্বাগতম্', 'আসুন বসুন', বা 'আসতে আজ্ঞা হোক্'। কিন্তু আয়মারা ভাষায় এর আবার অন্য অর্থ আছে—'তূর্য ধ্বনি'। এই অধিত্যকা থেকে লম্বা লম্বা তূরী বাজিয়ে নানা দিকে খবর পাঠানো হোতো।

আলমাগ্রো চিলি জয় করে ফেরার পথে এই গ্রাম এবং এর সমৃদ্ধি দেখেন। পিজারো তার কাছ থেকে জানতে পেরে এখানে নগর স্থাপনা করেন। ১৫৪০-এর আগষ্ট মাসে কাবাজাল ঠিক মতো প্লানে শহরটি গড়ে, এর প্রান্তে পুঁতে দেন এক বিশাল ক্রস্। আজও ঐ দিনটিতে ঐ ক্রস্ স্থাপনের উৎসব প্রতিপালিত হয়।

এয়ার পোর্টটি ছোট হলেও ইন্‌কা। কোনো হোটেলে থাকার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তাই মার্কা একা বেরিয়ে গেল ট্যাক্সির খোঁজে। সব ক'টি সন্ন্যাস-আশ্রম ও বাজার দেখতে হবে। সন্ধ্যায় পিউনোয় যাব। মুখ-হাত ধুয়ে রেডি হ'লাম, এয়ারপোর্টেই।

ট্যাক্সী-চালক টমাস আমাদের চমৎকার একটি রেষ্টুরান্টে নিয়ে এলো। আমি খেলাম বন্য-খাদ্য। মাত্র দু'টি চিকু (সফেদা)—ক্রিকেটের বলের সাইজ। ভেতরটা লাল।—এক গ্লাস পেঁপের রস ও টাটকা ছানা। ওরা টোষ্ট-ডিম ইত্যাদি বনেদী খানা খেলো।

আজ আরেকুইপার যা বোলবালা সবটাই ট্যুরিষ্টদের কৃপায়। এবং সে কৃপা বর্ষণের প্রধান কারণ সান্তা কাতালিনা মনাস্ট্রী। এ এক বিচিত্র প্রতিষ্ঠান।

প্রায় এক শতাব্দীর কাছাকাছি আরেকুইপা 'তীর্থ'-এর নাম মানুষ ভুলে গিয়েছিল। এর মধ্যে পেরুকে যখন ট্যুরিজ্ম্ গোগ্রাসে গিলে ফেল্ল, এদের অর্থনীতি তখন কৃশতায় ভুগছে। মর্টগেজ্ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এই 'নগর পালিকা'র প্রধানেরা শহরটার ভোল ফিরিয়ে দিলেন এয়ার পোর্ট, বাস-আড্ডা, রেলষ্টেশনের শ্রীবৃদ্ধি করে। শহরে যা'রা হোটেল, রেস্তর্াঁ করতে এলেন, তাঁরাও ব্যাঙ্কের সাহায্য পেলেন। এর মধ্যে UNESCO নিজেই থলে খুলে দিল। ট্যুরিজ্ম্ মাত্র ব্যবসা হিসেবেই যে কতো সার্থক পয়স্বিনী সেটা এই সব আমানতী ধনের প্রয়োগে বোঝা যায়।

ভারতে আজও অমরাবতী থেকে নিয়ে কুশীনগর পর্যন্ত শত শত আরেকুইপা মুখ ঢেকে বসে আছে। তার হিসেব কে করে? পশ্চিম বাংলার মধ্যেই কতো মহামূল্যবান ঐতিহ্য অজস্র গণ্ড গ্রাম-কসবা-নগরে অখ্যাতির গহ্বরে পড়ে আছে কে তার খোঁজ নেয়! যারা কেঁদুলী, বক্রেশ্বর, এমন কি শান্তিনিকেতনে যাবারও উদ্যম করেন, তাঁদের যে কি জাতীয় নিগ্রহের মধ্য দিয়ে এই অসাধ্য সাধন করতে হয়, তা, একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। অথচ এ দেশে কতো ব্যাঙ্ক, কতো উদ্যোগ। এবং হোতে পারতো কতো কি! এখানে যে কোনো আন্তর্জিলা, আন্তঃ-প্রাদেশিক বাস-আড্ডায়।

যে কোনো দিনে গেলে যাত্রীদের দুর্গতির ছবি পরিষ্কার দেখা যায়। প্রতিকার যাঁদের হাতে, তাঁদের পা মাটিতে পড়ে না—তাঁরা খেচর। ভাবতে লজ্জা বোধ হয় সারা ভারতে সারা বছরে বিদেশী 'যাত্রী', যাত্রী-হিসেবে আসার সংখ্যা আজও তেরো লক্ষের বেশী নয়। এক লণ্ডনেই এর দ্বিগুণ যাত্রী যায়।

পথগুলির নাম স্পেন মনে করিয়ে দেয়। গ্রানাদা, তলেদো, সেভিল্, বার্গোস্।

আশ্চর্য হয়ে মার্কাকে জিজ্ঞেস করি—"এতো স্প্যানিশ নামের ঘটা কেন গো?"

—"সে-কি? এখন তো আপনি স্পেনে। এ-তো সান্তাকাতলিনা মনাষ্ট্রি।"

—"বলো কি? স্পেনে? এলাম কখন?"

—"এয়ার-পোর্টের পরে প্রথম যে দেয়ালটা দেখলেন, তার মধ্যে-ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে। সান্তাকাতলিনা মনাষ্ট্রী একটা 'বাড়ি' বা 'প্রাসাদ' নয়। তা যদি হোতো, কেউ দেখতে আসতো না। এ-ও এক বিশাল ব্যাপার। এরও ইতিহাস আছে"……।

……"এ হোল আসলে সূর্য কন্যার দেশ। সূর্য-কন্যা, কুমারী-দান ইত্যাদি কথা শুনি। সঙ্গে সঙ্গে মন কুঁকড়ে যায়। স্বাভাবিক। মনে হয় এই সব ধার্মিক প্রথার মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা জুলুম, এবং সেই জুলুমের ফলে স্বাভাবিক বৃত্তির বিকার ছিল। বাইরে

থেকে দেখলে তাই বোধ হ'তে পারে বটে। কিন্তু ভেবে দেখলে, ঠিক কি তাই? নাক-কানে ছেঁদা করা, শিশ্নচ্ছেদ করা, বা আফ্রিকান সভ্যতায় গাল-মুখ চিরে নজর লাগার বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া—এ-গুলোকে অপর কৃষ্টিতে 'জুলুম' বলে মনে হলেও, কান বেঁধানো, উল্কী পরার জন্য কিশোরীদের বাহানা লাগাতেও তো দেখেছি। এখনও উত্তর/মধ্যপ্রদেশে ছেম্বী, নাকছেদী, কানছেদী প্রভৃতি নাম সন্তানকে মা আদর করেই দিয়ে থাকেন। ব্রাহ্মণদের কর্ণবেধ? টিকি? তীর্থে বা মৃতাশৌচে মাথা কামানো। বিধবার পক্ষে পোষাক নিয়ে ধর কাট? এ সবই তো প্রথা। ধার্মিক প্রথা।

"শুধু কি তাই? বিকারকে স্বভাব বা স্বাভাবিক বলে মনে করার হদিস পেতে গেলে ধর্মের ক্ষেত্রে ঘোষ-পাড়া সম্প্রদায়ে, কর্তাভজা সম্প্রদায়ে, বা তথাকথিত বামদেব পন্থী ভৈরবীয় আখড়ায় খোঁজ রাখা দরকার। যে প্রবৃত্তি এক পুরুষ সত্ত্বেও বহু পুরুষগামী হয়ে জীবনটাকে নিজের হাতে পোড়ায়, আর তারই প্রতিবেদন স্বরূপ একটি স্ত্রী-যোনির মালিকানা সত্ত্বেও (প্রেমের কথা বলার স্থান বা পৌর্বাপর্য এখানে নেই) শুধু বহু-যোনির মালিকানা অধিকারের জন্যই হন্যে হয়ে থাকে, এমন বিকারকেও তো আমরা সমাজ-জীবনে অহরহঃ পোষণ (বহুক্ষেত্রে সসম্মানে পোষণ) করি। কুলীনেরা বহু বিবাহ করত। এখন কুলীন নেই। তা' বলে কি বহু যোনির তৃষ্ণা চলে গেছে? সমাজে লক্ষের পর আরও এক লক্ষের তৃষা, বাড়ির পর বাড়ির তৃষা, গাড়ির পর গাড়ির তৃষাকে আমরা বিদ্বেষপুষ্ট হ'লেও ভীরু সম্মানেই ভূষিত করি। বাহুল্যকে সম্মান করি। মনের বিকারকে সমাজের অধিকার বলে মান্য-গণ্য করি। এ সব তো চলছে। ধর্মেও চলছে। স্বভাব ধর্মেও চলছে।"

"কিন্তু এ প্রবৃত্তি কি স্বাভাবিক? স্বভাব ধর্মেই কি উন্মাদিনী চল্লিশোত্তরা বিহ্বলা বালা কোন তরুণ যুবককে তাঁর দেহের তৃপ্তির উপকরণ করেন? যোনির অধিকার বা মালিকানার দাপটে পুরুষ যখন অবলাকে সবলে পীড়ন করে, তখন সে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অন্য একটি সংসার, অন্য কোনো জীবন-শৃঙ্খলাকে জ্বালিয়ে দেয়। দিয়েও সাব্যস্ত করতে হন্যে হয় যে পুরুষ ব'লেই তার এই অধিকার আছে। সেও কি স্বভাব ধর্ম? বিকৃতিকে পোষণ করতে করতে বিকৃতি যে সমাজ-জীবন ও ধর্ম-জীবনকেই বিকৃত করে দেয়, —সেই বোধ আমরা হারিয়েছি। স্বচ্ছন্দ সুযোগ-সুবিধা পেলে কতজন আমরা তৃষ্ণার বিকারের সুইমীং পুলে ঝাঁপ না খেয়ে পারি? এটা একটা পরীক্ষা ক'রে দেখবার মতো এক্সপেরিমেণ্ট।"

"উদ্দাম জীবনের আগুনকে উস্কে জ্বালামুখী করে দেবার জন্যই ভোগ, সম্ভোগ এবং নেশার মধ্যে এতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আমরা সত্যি কী চাই,—কি বলতে, খেতে, পেতে চাই,—সে সব (রুদ্ধ) ইচ্ছার অসামাজিক রূপ হুস্ হুস্ করে ফ্লিট-গান মারা ঘর থেকে মশার মতো বেরিয়ে পড়ে—জাহির হয়ে পড়ে ঐসব মাদকের তাড়নায়।"

"সুতরাং প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিতে সংঘাত মানুষের ক্ষেত্রে প্রায় বীজগত। বিশেষ বিশেষ ধার্মিক বা সামাজিক ব্যবস্থা এই প্রবৃত্তিকে সার্কাসের হাতি-ঘোড়া, বাঘ-সিংহীর মতো বেঁধে পোষ মানিয়ে রেখেছে। মেষের পালের সঙ্গে বেড়ে ওঠা বাঘের বাচ্চার মতো মাংসভুক

প্রবৃত্তিগুলো যা'তে ভ্যা-ভ্যা ডাক ডেকে সামাজিক হয়ে উঠতে পারে, সেই বি-প্রাকৃতিক মিথ্যা ব্যবস্থাকে পোখ্‌তো করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত করেছি ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, শ্রমণ, শ্রমণী, বিবাহপ্রথা—এমন কি বেশ্যালয়ও। হ্যাঁ, নগর ব্যবস্থায় ড্রেনের মতো সমাজ ব্যবস্থায় বেশ্যালয়ও সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষার একটা বাঁধ। কতো বড় যে এ বাঁধ তা' বেশ্যালয়হীন সমাজ তৈরী করতে গিয়ে বহুবার বহু সরকার যুগে যুগে বহুদেশে বহু কৃষ্টিতে দেখেছেন। দেখে থ' হয়ে পুনর্মূষিক হতে হয়েছে। ব্যক্তির চরিত্র বেশ্যালয় হনন করলেও, সমাজের চরিত্র রক্ষায় বেশ্যালয়ের দান আছে বৈকি!"

"এই সব শ্রমণ-শ্রমণী প্রথা, সূর্য-কন্যা প্রথা, সন্ন্যাস, ইত্যাদি কখনও কখনও যে অন্তরেরই এক গূঢ় সত্তার পিপাসার প্রকাশ এ-ও যেমন সত্য, বহুক্ষেত্রে বহু কারণে জীবন-হোমের জ্বলন থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় মানুষ একক জীবনকে স্বেচ্ছায় বেছে নেয়, এটাও তেমনি সত্য। নঞর্থক হলেও সত্য। এই জীবনের মধ্যে, ফলে পোকার মতো, বহুরস-বিঘ্নকারী বিষ-বিকীরণকারী সংঘাত, বেদনা, অপচয় এসে পড়েছে। ঠিকই, তবু সত্য এই সন্ন্যাসাশ্রমের বাগান (ঠিক বেশ্যালয়ের মতোই) সমাজ জীবনে ব্যবস্থাপিত না থাকলে বিষন্ন মানসিকতায় অভিভূত বহু মূল্যবান প্রাণ অকালে নষ্ট হয়ে যেত। পোকার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ফলের বাগান করা স্বাস্থ্যকর উদ্যম। মানুষের স্বভাব বৃত্তিগুলো ঘৃণ্য বলেই মানুষকে ঘৃণা করা ন্যায়সঙ্গত নয়।"

ক্যাথলিক ধর্ম ব্যবস্থায় এক বিবাহকে চরম আদর্শ মানার দরুণ ব্যর্থ-বিবাহের সমস্যাকে মিষ্টি কথায় ঢেকে রাখা হয়েছে। এ যেন বন্দীকে মুক্তি দেবার পরও তার হাতে-পায়ের শেকলের বোঝা পরিয়ে রাখা। অর্থের সৌভাগ্যে সে শেকল সোনায় মণ্ডিত করে নিলেও শেকল যে গুরুভার। ধর্ম ব্যবস্থার মাধ্যমে তাই বিবেকের যাতনা থেকে পরিত্রাণ পাবার একটা বেড়া দেওয়া খাঁচা তৈ'রী করা হয়েছে। সাদা বহমান সংসার-জীবনে বাসের সুবিধার পক্ষে এই নানারি আর মোনাষ্টারি (এই সন্ন্যাস আশ্রমগুলো) যেন এক একটা এ্যাসবেস্টসের পোষাক। সাঁতার যে জানে না তার পক্ষে লাইফ বেল্ট—পরিত্রাণের পন্থা। সাঁতার শিখে গেলে ঐসব বাঁধন মিথ্যে ভার।

"কিন্তু সবটাই এই জুজুর হাত থেকে পালানোর নঞ্‌-বাচক বুদ্ধিপ্রসূত নয়। বহু ক্ষেত্রেই সদসৎ বিবেচনার সার ফলশ্রুতি হিসাবে, জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল লাভের একমাত্র উপায় হিসাবে,—এমন একাকীত্বকে মানুষ সাগ্রহে সর্বস্বপণ করেও আলিঙ্গন করেছে। (গীতায় এই একাকী 'যত-চিত্ত'কে জোর দিয়ে বলেছে 'বিবিক্তসেবী' হও। একা থাকার সৌখীন হও। ('আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ দেখিব কবে', 'রেখোনা আঁধারে আমায় দেখতে দাও',—এসব আর্ত্তি নঞার্থক জীবনের ফলশ্রুতি বলে নিতে পারা যায় না।) ব্যর্থ জীবন ও সার্থক জীবনের অন্তিম বিচার প্রত্যগাত্মা, গূঢ়াত্মা, জীবন-দেবতা,—বা আমার 'আমিকে' করতে হয়, ও হয়েছে। জীবনের মূল্যপ্রাপ্তি সমাজের ব্যাঙ্কের কাউণ্টার পার করে আসে না। সেটা পাওয়া যায় অন্তরধনের কাছে।"

"কাজেই বৌদ্ধ দুনিয়ায় শ্রমণ-শ্রমণীর ডাকে যাঁরা ছিলেন, সেই অমিতাভ, আনন্দ,

শীলভদ্র, পদ্মসম্ভব, অতীশ, ফা-হিয়েন, সিদ্ধাচার্যদের পরেও শঙ্করের ডাক ধ্বনিত হোল। তার সাথে এলো যীশু, ঠমাস্‌, সেন্ট ফ্রান্সিস্‌, সেন্ট জেরোমের ডাক। যদি এ ডাকে বোধির সত্ত্ব, জীবনের বীর্য, প্রাণের স্পন্দন, নক্ষত্রের আহ্বান না থাকতো ধুলোর এই পৃথিবীর এক অজ্ঞাত প্রান্তে, অনবহিত শতাব্দীর অন্ধকারের ছায়া সূর্য-কন্যাদের স্বভাবের সঙ্গে তাল রেখে গড়ে উঠতো না বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, শঙ্কর সন্ন্যাসাশ্রম, দশনামী সংগঠন, খ্রীষ্টিয় সন্ন্যাস সন্ন্যাসিনী সঙ্ঘ। আজও সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এই একা থাকার ডাক মানুষকে বিহ্বল করে, ডেকে আনে আশ্রমের লোভনীয় পরিবেশে।

"বক্তব্য এই যে,—কামের তাড়নের ডাঙ্গস খেয়ে মানুষের মাংসল সত্ত্বা যেমন বিকল হয়ে পড়ে, সে দুর্ঘটনা যেমন সত্য, এই 'devotion to something afar' মানুষকে সর্বস্ব তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে প্রেরণা দিয়েছে এটাও সত্য। পাপ সত্য; কিন্তু পুণ্যও সত্য। মৃত্যু সত্য; তবু অমৃতও সত্য।"

কবির বাণী শুনিয়ে দিলাম। না শুনিয়ে নিস্তার নেই। (অবশ্য ইংরেজী করে)।

…"দুঃখেরে দেখেছি নিত্য পাপেরে দেখেছি নানা ছলে
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের প্রতি পলে পলে"……এ সত্য;
তারও বড়ো সত্য……
…"মৃত্যুর অন্তরে পশি' অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
অহঙ্কার নাহি মরে যায় আপনার প্রকাশ লজ্জায়,……
……তবে ঘর ছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।"—

এই শহরটায় পুরোপুরি নান্‌-সন্ন্যাসিনীরা থাকতেন এটাই এর মাহাত্ম্য, মহিমা যাই বলা যাক। আমি বলি—মাধুর্য। শুধুই ব্রহ্মচারিণীরা আছেন, থাকেন, থাকতেন এমন প্রতিষ্ঠান তো বহু। সূর্য-কন্যাদের প্রাসাদ ইন্‌কা মন্দিরের অংশ ছিল। কিন্তু মাত্র ব্রহ্মচারিণীদেরই থাকার জন্য পুরো নগর,—এটা নতুন বটে।

স্পেনে ঘোরার সময়ে একটি পাহাড়ের ওপর এমন একটি আশ্রম ফৈলাও ভাবে বিস্তৃত দেখলেও তাকে নগর বলবো না। স্পেনেই এক পরিত্যক্ত মধ্যযুগীয় নগর দেখেছিলাম (এখন যা' টুরিষ্টদের দেখাবার 'আইটেম')। খুবই শান্ত, নিভৃত সুব্যবস্থাপিত—এবং নগরই,—কিন্তু তবু আরেকুইপার সেন্ট ক্যাটালিনার মতো নয়।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বহু কলেজের সমষ্টিভূত প্রতিষ্ঠান, এই সান্তা কাতালিনাও তেমনি কালে কালে বহু প্রতিষ্ঠানকেই অঙ্গীভূত করে নিয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছিল।

লা-মার্সেদ্, সান্ ফ্রান্সিস্কো, সান্তা রোজা—এসব বড়ো বড়ো গির্জা সংলগ্ন সন্ন্যাসিনী আশ্রমের জন্য সুবিখ্যাত। কিন্তু সহসা পেরুর মানচিত্রে সান্তা কাতালিনার মতো মনোরম একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হোলো কেন? কীভাবে?

মার্কা আমাদের মনকে টেনে ১৫৫৯-র জানুয়ারী মাসে নিয়ে গেল। বল্লো—"সূর্য-কন্যার আত্মত্যাগের ধর্মীয় ধারা পেরু কন্যার মনে কবিতার মতো গুনগুন করত। সবার হয়তো কবিতা ভালো লাগে না। কিন্তু কারুর ভালো না লাগলেও কবিতা বেঁচে আসছে কেমন করে?

পেরুর মেয়েদের গায়ে রোদ-বাতাস লাগতো। তাদের দেহের তটে যৌবনের জোয়ার বান ডাকিয়ে যেত। আর তা'রা চেয়ে চেয়ে দেখত আকাশ পানে; ভাবত—উদিত সূর্যের সঙ্গে তাদের কত মিলিয়ন শতাব্দীর সম্পর্ক। বড়ো বড়ো উদাহরণিক নামের মালা তাদের স্পর্শ-মেদুর মনের গলায় দুলতো। তারা সূর্য-ঘরণী হ'তে চাইত। রাজ-নৈতিক পালা বদলে প্রাণভিত্তিক স্বপ্ন সাধ পাল্টে যায় না।

দেশ ব্যাকুল হয়ে উঠল। মিসেস্ গ্যালিগুলোসের কন্যা সন্ন্যাসিনী হ'বার জন্য ব্যস্ত। ধনীর দুলালী। মা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। ঠিক করলেন সমস্ত সম্পত্তি মাত্র ২৫০০ পেসোর বিনিময়ে দান করবেন একটি সন্ন্যাসিনী আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য। একটি সর্ত থাকল যে, হুয়ানা গ্যালীগুলোসকে, অর্থাৎ তাঁর কন্যাকে, যাবজ্জীবন আশ্রমে থাকতে দেওয়া হ'বে।

এই আরম্ভ হোল আশ্রম। এর পরে দেশব্যাপী ধনী কন্যারা, ধনাঢ্য বিগত যৌবনারাও ক্রমে ক্রমে এসে এই ছন্দে যোগ দেন। নিজেরাই ঘর-দুয়ার বাড়িয়ে নেন।···

······এখন সবই প্রায় শূন্য। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সান্তা কাতালিনা তথা আরেকুইপা নগরই মানুষ ভুলতে বসেছিল। এখন সেই বিশাল সন্ন্যাসিনী আশ্রম পুনর্বসন না হ'লেও আশে-পাশে বহু আশ্রম আছে। এই অপূর্ব স্নিগ্ধ বিন্যাসটি সত্যই স্তরে স্তরে দেখার মতো। সম্পূর্ণ ষোড়শ শতাব্দীটি যেন গাঁথা হয়ে আছে, এই বিস্তৃত প্রাসাদ-গ্রাম-বসতির অন্তরে বাহিরে।

পথ, গলি, জানালা, ঘাট, পার্ক চৌক, উঠোন, বারান্দা, কাপড় ধোবার ঘাট, গরু-ঘোড়া-হাস-মুর্গী থাকার ব্যবস্থা—সবই যেন গোছানো সাজানো। নিদ্রিত পুরী। চির-কন্যাদের পুরী। মাচ্‌চু-পিচ্‌র ঐতিহ্য গায়ে মেখে এই শ্বেতশুভ্র নগরের মধ্যে পেলাম গৈরিক রঞ্জিত এক অপ্রত্যাশিত আশা, অপ্রত্যয়ের প্রত্যয়। নারী স্বেচ্ছায় জীবন-যৌবন দান করে পরমা শান্তির কোলে নিজেকে যে বিলিয়ে দিতে পারে, এ স্তব্ধ নগরী তারই দলিল।

কতো মহিয়সী নারী এই প্রতিষ্ঠানে আত্মাহুতি দিয়েছেন। ডোনা মারিয়া আলভারেজ, কার্মোনা গুজ্‌ম্যান—তখনকার সমাজে সব 'রাঘব-বোয়াল' বংশের মেয়েরা। সে এক মন মাতানো মেলা।

অবশেষে স্পেনের দরবার এবং পোপের দরবার মেনে নিলেন এই আশ্রমের ধার্মিক স্থিতি। যেন, স্কুলের কলেজের রিকগনিশন পাওয়া। আনা গুয়েতিরেজ্ তাঁর বিশালসম্পত্তি এই প্রতিষ্ঠানকে দান করলেন। পর পর দানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে লাগলো এই প্রতিষ্ঠান।

এই আশ্রমের বিস্তৃতির জন্যই এর মধ্যে বহু পাড়া, বহু পথ, বহু নাম। ম্যাপ ধরে ধরে এই জনহীন পুরীতে ঘুরতে হয়। যেমন রোম্যান প্যাসেজ। জেস্যুইট ধর্মাবলম্বিনীরা নিজেদের অধ্যবসায়ে কী চমৎকার ঘর বাড়ি বারান্দা-খিলান-ফাটক (আর্চ) সৃষ্টি করে সাজিয়েছিলেন। সবই যেতে বসেছিল; কেন, গিয়েই ছিল। পেরু ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এটাকে পুনর্গঠন করে দিয়েছে। তাই এটা আছে; আমরা দেখছি।

ক্যাথীড্রাল প্যাসেজে নাকি মাথা কাটা কোন পুরুষের কবন্ধ আজও ঘুরে বেড়ায়। সে পুরুষ আরেকুইপাতে থাকতো। এখনও মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ায় সেখানে; কিন্তু মাঝে মাঝেই সে এই ক্যাথীড্রাল প্যাসেজে আসে। নিস্তব্ধ অতিদীর্ঘ জনহীন প্যাসেজটি দেখে মনে হয়, মাথা কেটে যাবার পরেও যদি কোনো পুরুষের বেড়াবার সখ চেগে ওঠে তার পক্ষে এই নীরব ব্রহ্মচারিণীদের ভূমিতে একান্ত-চারণ উপাদেয় হতেই পারে।

চমৎকার একটি সাদা পাথরের ক্যুব কেটে বাড়ি। কিন্তু বাড়ি বা মন্দির নয়, বেশ বোঝা যায়। সরল রেখা আর বৃত্ত দিয়ে যেন ছিমছাম একটি গ্রীক-কালের স্থাপত্য। শুনলাম, সে কালে বাতাসের পাখা চালিয়ে গম পেষানো হোত এখানে। আরেকুইপার সাবান্দিয়া উইণ্ড মিল। এ বাড়িটির গড়ন, চোখ বোঁজা। ঈষৎ ঢালু পিরামিডিক দেয়াল, আর বাড়ির তলায় ঢোকার আর্চকাটা পথগুলো সব মিলিয়ে যেন স্থাপত্যটি নিজেই একটি কর্মব্রতিনী নান্। আতিশয্য নির্মমভাবে বাদ গেছে।

আগ বাড়িয়ে মার্কা ক্যাথীড্রালটি দেখালো। এখানে দক্ষিণে কোন শহরে না-কি ক্যাথীড্রাল নির্মাণের জন্য আইফেল টাওয়ারের এঞ্জীনিয়র স্বয়ং আইফেলকে ডাকা হয়েছিল।

মার্কা বল্লে—"সে ক্যাথীড্রাল এটা নয়। এটা ফিরিঙ্গীরা করে গেছে। সে ক্যাথীড্রাল টাক্‌নায়।"

—"টাক্‌না? বিখ্যাত টাক্‌না? ফিরিঙ্গী শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহের ঝাণ্ডা তুলেছিলো টাক্‌না। সমুদ্রতীরের নগর।"

হেসে মার্কা বলে,—"কি করে জানলেন?"

—"আমি যে বোলিভারকে ভালোবাসি; তাই বিপ্লবের খবরগুলো ক্যাথীড্রালের চেয়ে বেশী জানি।"

—"কিন্তু, এ ক্যাথীড্রালের সুবিশাল অর্গানটির বাদ্য শুনলে আপনি মুগ্ধ হবেন। যীশু গীতপ্রিয় ছিলেন না। গির্জায় গান পছন্দ করতেনও না, কারণ গির্জাই পছন্দ করতেন না। কিন্তু রোম্যানরা স্তব গাইতো। গাক্, যা খুশী করুক। স্তব-স্তুতির মহিমা আসল সুর সৃষ্টির মায়াজালে পড়ে মনকে আবিষ্ট করে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর্যেরাও তো সাম গাইতো শুনেছি।"

সত্যই সেই ধ্বনির গাম্ভীর্য অতুলনীয়। টেপ করা বাজনা। বাজছে সর্বদাই।

সেণ্ট ফ্রান্সিসের একটি মূর্তি সান্‌ফ্রান্‌সিসকো চার্চের বাইরে উঁচু পাদ-পীঠে দু'হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে চেয়ে আছে।

মার্কাকে জিগ্যেস করলাম—"সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে এতো ঘটা-পটা বাড়ির সার কেন গো ?"

জবাবে শুনলাম, এই সব ব্রতচারিণীদের সঙ্গে বহু দাসী থাকতো। তাদের ঘর, ভাঁড়ার, রান্নার জায়গা, ডিনার হল। সূর্য-কন্যাদের মতোই এঁরা সাজ-সজ্জা, বেশ-ভূষা করতেন, তাঁদের প্রাণ পতির সন্তোষের জন্য, যেমন করে থাকেন আমাদের বৈষ্ণবীরা। গরীব দেশের সোহাগ তিলক, রসকলি, একতারা, তুলসী মালাতেই শেষ। এ হোলো স্পেনের খানদানী রোয়াবের ফতোয়াধারী রোয়াব। আলদা তো হবেই।

যুগে যুগে কতো সন্ন্যাসিনীই তো এসেছেন। সবাই নিজের নিজের বাড়ি করে থাকতেন। কাজেই তাঁদের মৃত্যুর পর খোলস পড়েই থাকতো।

আমি যতোই বর্ণনা করি না কেন, বোঝানো যাবে না। দীর্ঘ, প্রশস্ত আর্চে—থামে ঢাকা সেই সব বারান্দার রহস্য—পটাবৃত স্তব্ধ সৌন্দর্যের গভীর সংবেদনশীলতা। বাংলায় বলি, 'গা কাঁপে'; মন স্তব্ধ হয়, চোখ যেন সহস্র চোখ হয়ে দেখে; আর প্রতিপর্বে মনে হয়, কে যেন আমায় দরজায় ফাঁক দিয়ে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে।—গা ছম্-ছম্ করেও, করেও না। পেছিয়ে যেতে ইচ্ছা করে না। কেবল এগিয়ে যেতে চাই,—যেন কোন প্রত্যাশায়। এ যেন কোন আলেয়ার ইশারা, নিশির ডাক, দানোয় পাওয়া। অলৌকিক আকর্ষণ।

'দে-লা-কোম্পানীয়া জেনারেল মোয়ান্' এবং 'এজেসিসিওস্ স্ট্রীট' দুটির ক্রসিংয়ে একটি জেস্যুইট চার্চ কন্‌ভেন্ট। এটা এখনও চালু। সামনেটা ফিরিঙ্গী পোষাক, কিন্তু ভেরতটা দেখলেই মনে হয়—এ দেশে ইনকার দেশ। য়োরোপ এর কোথাও নেই।

স্নানের জায়গাটা খোলা উঠোন হলেও বেশ কয়েকটি জলপাই গাছের ছায়ায় ঢাকা। পুরো উঠোনটায় টালি। কোমর অবধি উঁচু বাঁধানো পাঁচিলের মাঝখানে আধখানা গোল পোড়ামাটির নালি বসানো। তর্-তর্ করে জল বইছে। আজও বইছে। সেই পুরোনো ইন্‌কা প্রথায় পাহাড়ী জল বইয়ে দেওয়া। কাপড় ধোয়ার জন্য পোড়া মাটির বিশাল গামলা। জল ধরে রাখার সুবিশাল জালা। আর বহমান স্রোতের জলকে গামলায় ঢালার জন্য মাটির তৈরী বিচিত্র চোঙের সার। এই জালাগুলো সেন্ট কাতালিনা কন্‌ভেন্টের বিশেষত্ব। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই নানা স্থানে, নানা ব্যবহারে এর দু'-চারটে পড়ে আছে। অনাবশ্যক স্থানেও, শুধু শোভন বস্তুর উদাহরণ হিসাবেও রেখে দেওয়া এখানকার রুচির পরিচায়ক।

রোদের ছটায় বাড়িগুলোর আধা শাদা আধা হলদে মেশানো গেরুয়ার প্রলেপ দেখতে চমক লাগে। আমাদের দেশের রামরজ আর গিরিমাটির মতো এদের পাহাড়েও রঙীন মাটি পাওয়া যায়। তারই মিশেলে অতি চাক-চিক্যময় এই প্রলেপ। সুর্ রিয়ালিস্টিক আমেজে ভরা এ প্রলেপ আধুনিক দৃষ্টিতে মূল্যবহ বলেই বোধ হয়।

নিঃশব্দতার সঙ্গে শুচিতার গভীর সম্পর্ক আছে। শুধু দেবস্থান বলেই নয়, যে কোনো বিষয়ে মনকে অন্তর্মুখী করার বাসনা নিয়ে যদি কোনো স্থান নির্বাচিত করতে হয়,

সেই স্থানটি এবং তার পরিবেশটিও বাহেন্দ্রিয়ের সমস্ত অভিঘাত থেকে আড়ালে বা দূরে রাখতে হয়। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রত্যেকটিরই মনকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার উপাদান আছে। মন্দির, আশ্রম, শিল্প সৃষ্টির আসন, শুধু একা একা বসে মনন, চিন্তন—এর প্রত্যেকটিরই উদ্দেশ্য মনকে বাহিরের বহু থেকে অন্তরের একাগ্রতায় সন্নিবিষ্ট করা। তাই শব্দে নীরবতা, স্পর্শে শুচিতা, রূপে ধ্যান মগনতা, রসে অন্তঃস্রোততা, গন্ধে সাত্বিক সৌম্যতা প্রভৃতি ধর্মগুলিই একান্ত নিভৃত নিলয়ে ভক্তের প্রার্থিত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এই টাইল বাঁধানো বারান্দা, সিঁড়ি, ঘর-দুয়ার, অঙ্গন একের পর এক পার হচ্ছি। এর মধ্যে এই শুচি স্পর্শই আমায় অভিভূত করছে। এখানেও আছে পঞ্চভূত। কিন্তু এ পঞ্চভূত যেন পবিত্র রজোগুণে মণ্ডিত, অভিভূত। যদি এ মণ্ডল আশ্রমিক মণ্ডল হয়ে কখনও প্রাণবন্ত জীবন যাপন করে থাকে, আজও সেই প্রাণ-স্পন্দন এখানে লভ্য,—সে লাভ যদি কারুর প্রাণের পাত্রে প্রসাদ হয়ে ঝরে পড়ে! সে জন্য যোগ্য পাত্র হওয়া দরকার।

বাইরে আরেকুইপার সুপ্রসিদ্ধ বিভোল বাতাস। যে বাতাসের নাম প্রাণ। এখানে আকাশ নীল; সূর্য উজ্জল, চারিদিকে বর্ণের সমারোহ। যেদিকে চাই, মহামহিম পর্বত শিখরের তুষারমণ্ডিত বলয়। আকাশে শাদা ক্যুমুলাসের রথ ওঠা-নামা করছে; কে থাও বা রাজহাঁসের মতো ভেসে যাচ্ছে শাদা মেঘের ভেলা। চারদিকে শুভ্রতুষার কিরীট পরে দিগঙ্গনারা নৃত্য করছে। পৃথিবীর ধুলো ঢেকে আছে সারি সারি শাদা ধবধবে বাড়ি। ঐ দূরে নিখুঁত কোণ তুলে জেগে আছে গিরিশিখর মিস্তি। তার পাশে দক্ষিণে চোক্কোরোণী, আর বাঁ-দিকের কোণে ঐ শিখরটি পিচু-পিচু। অসংখ্য আরও গিরিশ্রেণী, যেন তুষার বলয়।

এ সবুজের রং শুধু সবুজ নয়। এ সবুজের ওপর কে যেন সোনায় ডোবানো ব্রাশ বুলিয়ে দিয়েছে। চিক্‌-চিক্‌ করছে। যেখানে যেখানে গ্রাম্য মানুষ। সেজে গুজে কেউ করছে নৃত্য, কেউ লাগিয়েছে ছোটো একটি কথিকা-লীলা। কতোই তো কথা, কাব্য, ঘটনা আরেকুইপার কুমারী-নগরীকে আশ্রয় করে। আরেকুইপা ক্লাব, ইণ্টারন্যাশনাল ক্লাব, গোলফ্‌ ক্লাব—কতো যে ক্লাব! বড়ো বড়ো পেঁপের বাগান। লাল রংয়ের পেঁপে, বীজ প্রায় নেই। খুব সুস্বাদু। টল্‌টসে লাল ফাটা ফাটা-ডুমুর, আমাদের দেশের পঞ্জাবী আঞ্জীর।

একটা জায়গায় হঠাৎ ভীড়। কিন্তু সাজ-গোজ করা ভীড়। মার্কার ইঙ্গিতে গাড়ি থামলো। মার্কা প্রশ্ন করলো—"বুল-ফাইট দেখবে?"

শুনেই সারা গা রী রী করে উঠলো। আবার বুল-ফাইট? "না-না-না।"

"কেন?" —মার্কার স্বরে ততো প্রশ্ন নেই, যতো বিনতি।

—"ওঃ! নৃশংস, নৃশংস। একটা ষাঁড়কে ক্ষেপিয়ে বিশ জন মিলে তার ওপর অত্যাচার

করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারা! ওঃ! মাদ্রিদে আমি রিং সাইডে বসে ছবি নিয়েছি। একটা ষাঁড় প্রথম গোটা তুই খোঁচা খেয়ে এমনভাবে চেয়ে ছিলো, আমার মনে হোলো ও যেন তাবৎ পৃথিবীকে প্রশ্ন করছে—কেন? এ কেন? আমি কী করেছি? বিষণ্ণ নিঃসহায় সেই দৃষ্টি ভোলার নয়। আমি সে দৃষ্টির ছবি নিয়েছি।

হাসতে হাসতে মার্কা বলে—"চলো, চলো। এ ষাঁড় সে কথা বলবে না। এ ষাঁড় —বীর ষাঁড়। মৃত্যু জানে না।"

সত্যিই তাই। সামান্য সার্কাস ভর্তি রংয়ে হাসিতে জড়িয়ে অনেক লোক। বেশির ভাগই ট্যুরিষ্ট হলেও স্থানীয় সমাগমও কম নয়। সার্কাসের মধ্যে বালি পাতা। তু-দিকের তুই দরজা দিয়ে তুই বিশাল—কেন, সুবিশাল ষাঁড় প্রতিপক্ষ হয়ে এলো। শুধু ষাঁড় তু'টিই দেখবার মতো। সে এক তুলক্লাম লড়াই। মাঝে মাঝে শিংয়ে শিং আটকে দিয়ে সে ভীষণ রোখ। আবার ছেড়ে যায়; খানিক ঘোরাঘুরি, দৌড় ঝাঁপের পর আবার শিংয়ে শিং ভেড়ানো। ···দেখছি পাশাপাশি সব বাজী ধরছে। প্রবল উত্তেজনা। লড়াই চল্‌লো একটি ঘণ্টার ওপর। যতোই লড়াই চলে, ততোই ষাঁড় তুটোর রোখ চেপে যায়—রাগ বেড়ে যায়। এর মধ্যে তুটোই চুনিয়েছে, নেদেছেও। ওদের ঘামের গন্ধে বাতাস ভারী। ···শেষ পর্যন্ত একটা ষাঁড় আর দাঁড়াতে পারছে না। অন্যটা সরোষে এবং সবলে পিছিয়ে ঠেলে দিচ্ছে তাকে। সে বেচারী পা আর জমিয়ে রাখতে পারছে না। ···হঠাৎ তার চোখে পড়েছে খোলা গেটটা। সে সুট করে তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গেট বন্ধ। বিজয়ী বৃষভ তখন ককুদ স্পন্দন করছে, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়ছে, আর হুঙ্কার করছে। ক্ষুরের তাড়নায় বালি ছড়াচ্ছে, লেজ লট্ পট্ করছে। তার মালিক অন্য দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা শব্দ করতেই সে যেন একেবারে শশক। মাথা নীচু করে গেটে ঢোকার মুখে দাঁড়ালো। মালিক তার কম্পমান ঘর্মাক্ত ককুদে হাত বোলালো। (অবশ্য আমাদের দেশের মহেঞ্জোদরোর শীলের ষাঁড়ের ককুদের মতো ককুদ এদের নেই। না থাকলেও ককুদ ককুদই। ল্যেপচার নাক নেই বলেই কি ল্যেপচাদের নাক নেই? সে কি চশমা পরে না?) হাতভরা সুগার ক্যুব। পরম পরিতোষে বিজয়ী বৃষভ সেই অভিনন্দন গ্রহণ করলো। (Ego আবার কার নেই?) সেই বৃষ জয়ধ্বনির মধ্যে গেটে ঢুকে যাবার আগে শিংয়ে নীল রিবন বেঁধে মালিকের দড়িতে গ্রন্থিত হয়ে রিং-এ এক চক্কর লাগিয়ে গেল।

বেরিয়ে গাড়ি চল্‌লো দ্রুত। পথ নির্মল। স্বয়ং সাভেদ্রো মিগেল্ ত্থ সার্ভেন্তেস্ ('ডন-কি-হোতে'র লেখক) এ পথের গান গেয়ে গেছেন। চির বসন্তের দেশ। কলকল করে বয়ে যায় নদী। নাম চিল্লী। এর ধারে ধারে পাহাড়। আগুন-পাহাড়। মিস্তি, চাচানী, পিচু-পিচু। আর কাছাকাছি 'তরাই'-দেশের তলা দিয়ে উষ্ণ প্রস্রবণের মেলা. না মালা। পোদো-নিগ্রো, লা য়েদিয়াঁ, লুনা, কাটারি—সবগুলো প্রস্রবণই না-কি বিশল্যকরণী,

মৃত সঞ্জীবনী, জানিনা। এই গোচারণ সমৃদ্ধ আ্যাল্ফা-আল্ফা* ঘাসে ঢাকা মাঠের বাতাস, দলে দলে আলপাকা, লামা আর পাকাভিকুনার স্বচ্ছন্দ বিহার—এই পাকা সোনার রংয়ে মোড়া ভুট্টার বিস্তারের পাশে উইলো-পপলারের মিহি করুণ সুর বার বার আমায় মনে করিয়ে দেয় ক্যানাডা, সুইজারল্যাণ্ড, এ্যাল্প্স্, কাশ্মীর।

সমুদ্রতীর দূরে নয়। টাক্নাও পাল্লার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু আমাদের যে প্রধান গন্তব্য উত্তরে, এ পাহাড়ের পর অন্য পাহাড়। অন্য পাহাড়ের ওপরে—তিতিকাকা।

এখন বেলা বারোটা হয়নি। লাঞ্চ খাওয়ার পক্ষে খুব অপক সময়। কিন্তু মার্কার ভয়, পথে খাবার জায়গা পাওয়া যাবে কি-না। আমি ম্যাপ দেখি, আর শান্ত করি। বলি, প্রকৃতি খাদ্য-পানীয় প্রায় সর্বত্রই রেখে দিয়েছেন। তাছাড়া উপোষে মারা যাবে না; হয়তো কিছু মেদ ক্ষয় সম্ভব। সেটা ভালোই হবে। তুমি আরও সুন্দরী হবে। মধু যুবক-তর হবে; আমায় হয়তো কোনো অন্য সুরসিকা মার্কা প্রপোজ ই করে বসবে। বেশ হবে।

কিছুই হোলো না। মোটর পথ এখনও সেই আদ্যি যুগের ইনকা পথ। ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে পাহাড়ী পথ ধরে। মিস্তির চূড়া বাঁ দিকে মিলিয়ে গেলো। আমরা ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছি তাম্বো নদীর অববাহিকায়। এ দিকটায় খুব চাষ। ফলের তো কথাই নেই। জলাপাইয়ের বন। তেল হয় জলপাই থেকে, আর আছে জলপাইয়ের 'আচার' —অর্থাৎ আস্ত জলপাই ভিনিগারের বোতলে বন্ধ করা। কোনো কোনোটার বীজ বার করে বীজের খালি জায়গায় টম্যাটো-পেষ্ট ভরে দেওয়া। টম্যাটো—ভারী ভারী, সত্যি সত্যি মিষ্টি টম্যাটো। বেশ কিছু টম্যাটো আর পাকা জলপাই সংগ্রহ করলাম। ইনকা চাষী। পয়সা কিছুতেই নিলো না। আঙুল দিয়ে দেখালো, গাছের তলায় পড়ে কতো পচছে।

ওদের কিন্তু লাভ নেই। ওরা ঝুড়ি ভরবে। ঝুড়িগুলো পাশেই পরপর সাত-আটটা ফ্যাক্টরিতে যাবে। টাক্না (শহর) থেকে গাড়ি বোঝাই বোতলের ক্রেট্ আসছে। বোতলে ভরবে। নানা সাইজের বোতল। যুক্তরাষ্ট্রে, ক্যানাডায়, জাপানে, য়োরোপেও যাবে; খানার টেবিল আলো করে বসবে। এই চাষীরা আয়মারা উপজাতি। ভারি শান্ত ও সদাশয়।

আমায় মার্কা খুব মিহি করে জলপাই কেটে দিলো একটা পাতার ডোঙ্গায়। জলপাই যে এতো মিষ্টি হয়, জানতাম না। কিন্তু প্রায় নিরেট টম্যাটোর টুকরোগুলো যাকে বলে ফল, মিষ্টি।

খাচ্ছি, আর বলছি—"পেরুর আদিম অধিবাসীরা জমি পেলে সোনা ফলাতে পারতো বলেই, সোনায় তাদের এতো অরুচি ছিল। জমির বুক থেকে সুধারস টেনে আনার কৃতিত্বের একটা গল্প শোনো।

---

*এই ঘাসের হোমিওপ্যাথী নির্যাস বিখ্যাত টনিক বা রসায়ন। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় টনিক ছিল 'আল্ফাল্ফা'।

"তখন বোলিভার কুইতো-তে। খুব অসুখ। তার আগেই চিঠি দিয়ে মানুএলাকে জানিয়েছেন, যেন না তিনি এসে উপস্থিত হন। নানান গুজব এবং ম্যানুএলার বিপ্লবী মেজাজ নিয়ে সাইমন তখন বিব্রত। এর মধ্যে তাঁর খুব রক্তবমি হলো। ও'লীরী—মিলিটারী সেক্রেটারী; খুব ঘাবড়ে গেলেন। বোলিভারের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী জোষে প্রালাসিওসের কাছে মানুএলা ছিলেন আরাধ্য দেবী বিশেষ। সে-ই গোপনে খবর দিয়ে ডেকে পাঠালো মানুএলাকে। রুষ্ট বোলিভারের কাছ থেকে খুব একচোট বকুনী হজম করে মানুএলা নানাবিধ ঔষধ-পথ্য দিয়ে বোলিভারকে চাঙ্গা করে তুলেছেন।

বোলিভার একদিন স্যালাদ্ খেতে খেতে মানুএলাকে বল্লেন—'এই যে লেটুশ আর গাজর খাচ্ছি এর স্বাদ মনে করিয়ে দেয় আমার ছেলেবেলার গাঁ.—ভেনেজুয়েলার সান্‌মাতিও। এমন সব্জী সেখানেই হতো। আমাদের বাগানের দেখাশোনার ভার ছিল আমার বাল্যকালের 'দাদা' বলে ডাকতুম, নিগ্রোমালী, পেরেজ ইম্মানুয়েল-এর উপর। তার হাতই ছিল আলাদা। সেই-ই আমায় ছেলেবেলায় ঘোড়ায় চড়া শিখিয়েছিল—জিন না লাগানো ঘোড়া। বালক বয়সেও তেমনি ঘোড়ায় চড়েছি।...

সন্ধ্যাবেলা রোজকার মতো বাগানের পাহাড়ী দিকে ম্যানুএলা ধীরে ধীরে বোলিভারকে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ বাগানের মালীটা এক গোছা প্যান্সী আর কার্নেশন ভেট চড়ালো ম্যানুএলাকে, কিন্তু বোলিভারের হাতে দিলো ডালশুদ্ধ এক স্তবক কাঠ-গোলাপ।

বোলিভার তো অবাক। এমন কাঠ-গোলাপের স্তবক তিনি চেয়ে চেয়ে একজন মালীর কাছ থেকেই বাল্যকালে আদায় করতেন। এ মালী কে? ভ্রূ কুঁচকে থমকে চাইতেই বোলিভারের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—কে? পেরেজ দাদা না?"

—"হ্যাঁ, পেতি ডন্! (খোকাবাবু, ক্ষুদে কর্তা)। চিনতে পেরেছো তা হলে।" হাতে ধরা টুপী মাটি ছোঁয় ছোঁয়। মাথা নীচু।

—"তাই বলি, খানার টেবিলে সান্‌মাতিওর বাগানের শসা, টম্যাটো, লেটুশ, গাজর কি করে পৈদা হয়। কবে এলে?"

—"মাদাম লিখলেন, আমার ক্ষুদে কর্তার অসুখ। ভালো সব্জী চাই।"

—"ও! কন্‌স্‌পিরেসির ফসল? ও তো মিষ্টি হবেই। কিন্তু পেরেজ, ঘরের মধ্যের কন্‌স্‌পিরেসিতে বিষ ফলও জন্মায়। সাবধান।"...

মার্কা জিগ্যেস করলো—"সাইমন বোলিভারকে আপনি ভালবাসেন খুব। তাই না?"

মধু বল্লো—'ভালোবাসা বলছো। ওঁর ত্রিনিদাদের লাইব্রেরীর ঘরে ঢুকলে দেখতাম গাদা গাদা বই শুধু বোলিভারকেই নিয়ে। বোলিভারের ছ' ভল্যুম চিঠি-পত্র পর্যন্ত। বোলিভারের স্পীচেস্, বোলিভারের ডিপ্লমেটিক করেস্‌পণ্ডেন্স। ঐ খোঁজে ভেনেজুয়েলায় ঘুরে গেলেন তিনবার।"

—"ওঁর খোঁজে নয় মধু। খোঁজ ছিল ঐ মানুএলার। খোঁজ থাকে ঐ মালীদের। এই যে মালীটা আমাদের আদর করে খেতে দিলো, এদের কথা কি ইতিহাস লেখে বা

লিখবে? রুশ বিপ্লব, স্পেন বিপ্লব, চীন বিপ্লব—কোথায় থাকবে এরা ইতিহাসে? আজও, আজও পেরুর রিপাব্লিকের কোন্ সার্থক অংশ এরা? কী পেলো এরা এই রক্তে অভিষিক্ত বিপ্লব থেকে?

"Let me put voice in the throats of these dud,
sad, silenced mutes.
Let me inspire ringing hopes in these tired,
dried, broken souls,
Let me send out the call : Arise ; stand erect,
all as one.
Find, that the tyrrany of which
You are so afraid, is indeed more timid
than you would expect,
As you rise and take a stand it shall
make it escape faster
than you would imagine."—

"কার কথা এগুলো?" —মার্কা জিগ্যেস করে সাগ্রহে।

—"আমার দেশের এক টলষ্টয়, ক্রপট্কিন্ যা বলো। তাঁর নাম ট্যাগোর। তাঁর অপরাধ তিনি নোবিলিটির নীল রক্তের ঝাঁকের মাছ। এখনকার প্রগতিবাদী তাঁকে নাকের ময়লার মতো ঝেড়ে ফেলে দিতে ব্যস্ত। বলে উনি বুর্জোয়া কবি। প্রলেতারিয়েতের কেউ নয়।"

—"ট্যাগোর? নেরুদার প্রিয় কবি। ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। ওর তামাম কাব্য আমাদের দেশের বুকষ্টলে, লাইব্রেরীতে স্প্যানিশে পড়ি আমরা। আপনার দেশে পড়ে না? ট্যাগোর ক্লাব নেই? এখানে ওকাম্পো ক্লাব, নেরুদা ক্লাব আছে। কবিতা আবৃত্তি করা যেন আমাদের রাজনৈতিক স্বাস্থ্যের জন্যে, মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য মাতৃস্তন্য পান।"…

ও বলতে লাগলো আপন মনে—

—"কুইয়েন হা মাস্তিদো? এল্ পার্জ স্থ লা এক্স্যুসেনা
রোতো, ইনসোন্দাব্লে, ওস্কিউরে সিদো, তোদো
শ্লেনো দে হেরিদা ই রেস্প্লান্দোর ওসকিউরো!
তোদো, লা নোর্মা দেওলা এন্ ওলা এস্ওলা
এল্ এক্স্প্রেসিসো তিউ মুলো দেল্ আম্বর
ইলাস্ এস্পেয়াস্ গোতাস্ স্থ লা এস্পিসা!
ফুন্দে মি পেচো এন্ এস্তো, এ স্কুচে তোদা
লা সাল ফ্যুনেস্তা : দে নোচে
ফুই এ প্লান্তার মিস্ রেইসেস্ :
এভোরি গুএ লো আমারগো দে লা তিয়েরা :
তোদো ফ্যু পারা মাই নোচে ও-রেলাম্প গো :
সেরা সিক্রেতা ক্যাপে এন্ মি কাবেজা·
ইদের'মো সেনিজাস্ এন্ মিস্ হুয়েল্লাস্।"*

গাড়ি বেশ সন্তর্পণে চলেছে নদীর বাঁক ধরে ধরে। গভীর একটা জঙ্গলের ভীড়ে নদী হারিয়ে গেল। নদী এবং আমরা প্রায় এক চত্বরে এসে পড়েছি। জায়গাটি রমণীয়, যেমন সাধারণতঃ পাহাড়ী নদীর অরণ্য গর্ভে হারিয়ে যাওয়ার মুখটি হয়। পাহাড় দু'ধারে এতো উঁচু যে ঘাড় তুলে আকাশ দেখতে হয়। নদীটা সাঁকোর ফেরে পড়েছে। পাথুরে চাঁই ঠেলে তার ওপরে ইন্‌কা পোথতো সাঁকো। এটা পার হতেই গাড়ি থামলো, আমরা যে যার নেমে পড়লাম।

ধীরে ধীরে পা ফেলে ফেলে প্রায় দশ ফুট নীচে প্রবহমানা তাম্বোর জল স্পর্শ করলাম। জলের ভেতরে বিচিত্র বর্ণের বহু মাছ সত্যিই খেলেই বেড়াচ্ছে। এরা শত্রু জানে না। পাখির ডাকের শেষ নেই, কিন্তু পক্ষীতত্ত্বের কিছুই জানি না। ডাক শুনে পাখি চিনি না। যা চিনি তা তাউকান (ধনেশ), রঙীন তোতা—ঢাউস, ঢাউস উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো রঙ। ওপরে হাসির উচ্ছ্বাস। চেয়ে দেখি, মধুর হাত থেকে ছোঁ মেরে গাজরটা নিয়ে গেছে এক রসিক তোতা। মধুর তর্জনীটা নখরাঘাতে রক্তাক্ত। ওরা নেমে এসে জলে হাত ধুলো। ফেজান্টগুলো খুবই মুখ চোরা জানতাম; কিন্তু ওরা বোধ করি আমাদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করছে না। দিব্যি 'কুঁকর ক্‌ঁ কোঁক্‌' করছে; আর এ-ডাল থেকে ও-ডাল নির্লজ্জ বেহায়া এক গজ লম্বা লেজের বেণী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বোধহয় হাসছেও; ঠাট্টাও করছে। বহুদিন স্বচ্ছন্দ বিহারী ফেজান্ট দেখিনি। দেখে বড়ো ভাল লাগল। স্বাভাবিক প্রচ্ছদে কামাতুর ফেজান্টের মতো সতেজ পাখি দেখা যায় না বড়ো।

হঠাৎ বনপথ যেন সজাগ হয়ে উঠল। এক জোড়া আবরণহীন স্বেচ্ছাবৃত্তিচারী আদিবাসী পিঠে বেতের বোঝা নিয়ে বাঁক ঘুরেই একটু থামল। পুরুষটার আড়ালে ঢাউস পেট মেয়েটি চলে গেল। স্থির হয়ে গেল। নদ্‌নদে স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি পিছনটি পাহাড়ে ঠেকিয়ে সুমুখ হয়ে থেমে গেল। ছেলেটি কিন্তু পিছন ফিরল। আমরা যেন কিছুই দেখিনি। নদীর জলই নাড়া চাড়া করছি। ওরা পথ ছেড়ে ঘন অরণ্যের মধ্যে ঢুকে গেল; কিন্তু আমাদের দিকে পিছন একবারও করল না মেয়েটি। ছেলেটি পাশ ফিরিয়েই গেল।

মার্কা বল্‌ল—'জঙ্গলে কিছু প'রে কাজ করা খুবই কষ্টের। আর বহু রোগের আকর। অস্বাস্থ্যকর। মেয়েরা ভাবে, ও জানে. পেছন ফেরা বড় অশ্লীলতা। সামনেটায় অরূপ বা কদর্য কিছু নেই। ওদের মনের দৃষ্টি অন্য পথে হাঁটে। সমস্যাটা আসলে রূপ অরূপের, সুন্দর-অসুন্দরের। চলার ভঙ্গীটি তো নিতম্বেই বেশী উছলে ওঠে, তাই নিতম্বের ভাষা কাউকে পড়তে দেওয়া ভাল নয়। কথাটা দেহাংশ আবৃত করার নয়, দেহের ভাষাকে অনাবৃত করার চিন্তাটাই বড়ো।

কিন্তু লক্ষ্য করলাম দু'টি জিনিষ: এক, মার্কা ওদের কী বল্‌ল। ওরা সাহস পেয়ে চলে গেল। দুই, কাঠের বোঝার ওপর পোক্কো রাখা ছিল।

—"এতো ঠাণ্ডা অথচ ওদের গা খালি, মার্কা।"

—"দেখলেন না, ওরা ঘামছিল ? ওরা এই পুরো পাহাড়টা চড়বে।"

এখানে সর্বত্র পাহাড়ী শাদা গোলাপ লতার সঙ্গে দুটো অন্য লতা এসে ভীড় করেছে। একটায় খুব গন্ধ, শাদা কুঁদফুলের মতো। প্রচুর মৌমাছিকে ডেকে এনেছে ভোজে। অন্যটার উপস্থিতি খুবই চমকদার। গভীর লাল বুগনভিলার যেন জঙ্গল। এ ফুল তো পেরুর জঙ্গলে স্বাভাবিক নয়।

মার্কা বল্‌লো—'আরেকুইপা, হুয়ামাকো, পিউনো অঞ্চলে বুগনভিলার বড় সমাদর। এ গাছটা কী শীতে, কী বর্ষায়, কী গরমে সবসময়েই রং চং চড়িয়েই থাকতে ভালোবাসে। পেরুর পাহাড়ী মেয়েরাও তাই।...... যেমন আমি !" —বলেই খিল্ খিল্ করে হাসে। কী মিষ্টিই হতে জানে এই মায়াবিনীরা !

গাড়ি জঙ্গল পার হচ্ছে। গভীর জঙ্গল। নদী ছেড়ে আমরা পুবে চলেছি। পুবে চড়ছি। ফানেলের মতো বাতাস আসছে হাড় কাঁপানো। গাড়ির দরজা বন্ধ করতে হোল। সীডার, মেহগনি, আখরোট, গোলাপ। কাগজের মণ্ড তৈরী করার জন্য যে সব নরম কাঠের দরকার সেই ধরনের চীড়, পাইন, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি এ জঙ্গলে বড়ো একটা ছিল না'। এখন সরকার মন দিয়েছে ইউক্যালিপটাসের দিকে। খুব আয়, মস্ত গাছ ; —বাড়ে দেখতে দেখতে, গঁদটি বড়ো দামী, কাগজ হয় উত্তম। তবে আগুন একবার লাগলে, আর কথা নেই। মোরা অসংখ্য। গ্রীণ হার্ট, রেডউড খুব। আমি সেগুন কাঠের কথা বলতেই বল্‌ল—'পেরুতে সেগুন কাঠের চাষ এখন জম-জমাট। কিন্তু আমাদের সিলিবাল্লীও সেগুনের মতো। তার রং শাদা।

পিউনো

পিউনোয় পৌছালাম বেলা দেড়টায়।

পিউনোয় আসার আমার মাত্র একটি উদ্দেশ্য। লেক তিতিকাকার জল স্পর্শ করা, আর তিতিকাকায় সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দেখা। আর সম্ভব হ'ল আয়াকুচোর ময়দানটি দেখা। হবে কি ? আয়াকুচো পিউনো থেকে দূরে।

আমাদের চালক দুর্বাসা ঠম্ বল্‌লে—"সবই হতে পারবে, তবে রাতটা থাকতে হবে।"

মধু বল্‌লো ."সে-তো হবেই। থাকবোই। সন্ধ্যেবেলায় তো সূর্যোদয় দেখা যাবে না।"

মার্কা বুঝিয়ে বল্‌লো—"তা অবশ্য দেখা যাবে না, গ্রেট সায়েন্টিষ্ট মধু ! কিন্তু পিউনোয়

রাত্রিবাস মানে, রেফ্রিজারেটারে শোয়া। ভোর বেলায় ডিহাইড্রেটেড্ না হওয়া পর্যন্ত গ্রন্থীগুলো সচল হবে না।"

মধু ঝগড়াটে গলায় বল্‌ল,—"এমন কি? যেভাবে থেকেছি কুজ্‌কোয়। নেহাৎ বাবা বাংলা জানতেন তাই হোটেলের ওরা সহযোগিতা না করে পারলো না।"

ঘটনাটা শুনে মার্কা আমায় জড়িয়ে ধরে গালে দুটো চুমো খেয়ে বল্‌লো,—"বুড়ো হতে হয় তো এমনি যুবক বুড়ো। রসে ভর্তি।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি—"ফিরিঙ্গীদের কাছে আমি এক বিষয়ে ঋণী কিন্তু। তারা তোমাদের ঠোঁট দিয়ে উপহার দেবার কায়দাটা শিখিয়ে দিয়েছে।"

হেসে গড়িয়ে পড়ে মার্কা আবার চুমো দিলে। বেচারী মধু! বুড়ো নয়। এ আনন্দের বেশরীকী প্রতিবেশী।

হোটেলে যাওয়া এখন বাতিল হোল। যদি হ্রদে ঘুরতে হয় তো এখনই। সকালে হবে না। হোটেলে গিয়ে ফিরে আসতে আসতে নৌকো না-ও পাওয়া যেতে পারে।

বেচারী মধু ওয়েষ্ট ইণ্ডীজের বসন্ত-হেমন্তের সওদাগর। ওদের আকাশে মার্কারি চিরাচরিত ষাট সত্তর নিয়ে দোল খায়। নাম করতে যদি বা নব্বুই ওঠে, তৎক্ষণাৎ বর্ষা। তা ছাড়া চিরকালের দক্ষিণা বাতাস, ট্রেড উইণ্ড, যেন সিল্কের শাড়ি ছুঁইয়ে যায় গায়ে।

গা থেকে আমার সোয়েটারটা খুলে দিলাম মধুকে। ব্যাগে বাড়তি মোজাও থাকে, মোজাও দিলাম।

"শীত হবে না মোড়ু?" বললো মার্কা। "এই যে জল দেখছো এর পরিধি কতো জানো? ত্রিনিদাদ বলেছিলে ৩৬০০ বর্গ কিঃমিঃ। এটি তার দ্বিগুণ—প্রায় তিনগুণ। ৮১০০ বর্গ কিঃ মিঃ। এত বড়ো হ্রদ সমুদ্রতীর থেকে ৩৮১২ মিটার উপরে আর নেই। এই হ্রদে ভাগ আছে বোলিভিয়ারও। এই হ্রদে জাহাজ চলে। এর গভীরতা ২৩০ মিটারেরও ওপর। এমনিতে হ্রদ শান্ত। এই হ্রদের বুকে লোকে চাষ অবধি করে। তিনটি ত্রিনিদাদের জোলো কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, আর ট্রেড উইণ্ডে একটু তফাৎ পাবে বৈকি। সাধে কি আমরা বুড়োদের বুড়ো বলি না? বোঝো।"

—"বুঝলাম। কিন্তু হ্রদের বুকে চাষ?"

—"হ্যাঁ গো! শুধু চাষ? নিজের হাতে দ্বীপ রচনন করে বসবাস করে আজও 'যুরোষ' নামক বহু প্রাচীন আদিবাসীরা। সেইরকম একটা দ্বীপেই তো ইন্‌কা পিতামহের জন্ম।"

—"সত্যি? বলছে কি শুর? মার্কা যে এরপর বলবে পরাশর ঋষি এখানকার যুরোষদেরই কেউ!"

মার্কা বুঝতে না পেরে আমার দিকে চায়।

আমি ধীবর কন্যার রূপে মুগ্ধ ব্রাহ্মণের কথা শোনালাম, এবং শোনালাম, তিনি দ্বীপ সৃষ্টি করে কুজ্ঝটিকাও সৃষ্টি করেছিলেন। দরকার হয়েছিল।

মার্কা বলে, "তবে তো সে ঘটনা এই তিতিকাকারই বটে! এখানে যখন-তখন কুজ্ঝটিকা। এলেই হোল। ধীবরেরা দিগ্‌ভ্রান্ত হামেশাই হোত। এখন কম্পাস

রাখে। ঐ ব্রাহ্মণের মেজাজই বটে এই তিতিকাকার। শান্ত আছে তো আছে। যা খুশী করুন। আদরে আদরে ভরিয়ে দিন। কিন্তু তিতিকাকার ঝড়, সে প্রলয়। তিন ফুটের উঁচু ঢেউ, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস—কী নেই ?……

"……আরও এক কথা। আপনাদের এপিক মহাভারতের আরম্ভ ধীবর কন্যার অণ্ড নিয়ে–হ্যাঁ, আসলে ভ্রূণ মানেই তো ডিম। এদেশে ইন্‌কা পুরাণের কাহিনীতে অণ্ড ভেসেছিলো এই তিতিকাকায়।"

(মনে মনে বললুম ঠিকই মিলে যাচ্ছে। আমাদের মহাভারতও শুরু হলো উপরিচর বসুর কৃপায় মাছের অণ্ড থেকেই বটে !)

মধু উদ্‌গ্রীব। "আমি যেটুকু জানি, ভাসাভাসা।" তা হোক্। তবু মার্কা বলে ভাল। বলতে লাগল, "ভগবান সূর্যের কৃপায় তিতিকাকার এক দ্বীপে দুটি ডিম জন্মায়। একটি ফেটে বার হোল মাঙ্কো কাপাক ; অন্যটি ফেটে বার হোল মামা ওকল্লো। সেই দ্বীপেই তারা বড়ো হয়ে যখন তার তীর ভূমিতে এল সূর্যের নাম নিয়ে গড়ে তুলল বিশাল ভীরাকোচার মন্দির। সে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও বোলিভিয়া অংশে ট্যুরিষ্টকে দেখান হয়। তিয়াহুয়ানাকো। তিয়াহুয়ানাকোর বয়স খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী।"

ভেবে দেখি, আমাদের দেশে তখন কনিষ্ক এসেছেন দেশ জয় করতে। —জয় করতে এসে বৌদ্ধ ধর্ম তাঁকেই জয় করে নিল। ভারতের জনতাও তাঁকে ধার্মিক, সৎ সম্রাট বলে মহামান্যও দিল। তিনি বা তাঁর সন্তানরা আর তাঁদের দেশে ফিরে যাননি। যেমন বাবুর বাদশা আর তাঁর সন্তানেরা।

আমাদের চালক শ্রীমৎ ঠমানন্দ দুর্বাসা এক এক বোতল মদ এনে দিল। মার্কা বল্‌ল—"ভিনোব্লাঙ্কো ! বাঃ, খেয়ে নিন। সোজা আঙ্গুরের রস। মাদক নয়। চাঙ্গা হয়ে যাবেন।"

—"কিন্তু কফি !" …আমি বোতলটা নিতে নিতে আর্তনাদ করি।

হেসে ফেলে মার্কা, আমাদের ঠমানন্দ'ও হাসতে থাকে। সে-ই আমাদের একটা মোটেলে নিয়ে গিয়ে ঘর ঠিক করে দিল। ছোটো ছোট খুপরি ঘর। কিন্তু পরিচ্ছন্ন। সঙ্গে গরম শাওয়ার বাথ। আর মধুর ভাষায় খাস্তা মচমচে তোয়ালে।

দুপুরে খাইনি। মুখ-হাত ধুয়ে ভাল করে খাওয়া গেল। সে কী খাওয়া। ফাঁসীর খাওয়া। ট্রাউট মাছের জন্য তিতিকাকা প্রসিদ্ধ। যদি বলি শোল আর রুইয়ের মিক্‌শ্চার, ব্যাখ্যাটা ততটাই সঠিক হবে, দাড়িতে তেঁতুল-চিনি মাখিয়ে চুষলে আমের মতো বলায় ব্যাখ্যা যতটা সঠিক।—ও ব্যাখ্যা করব না। সেরা মাছ, সাহেব মাছ ; কেবল হ্যাট-টাই পরে না।

ওরা জীয়ন্ত ট্রাউট বড়ো চৌবাচ্চায় ধরে রাখে। আমাদের প্রত্যেকের পাতে আস্ত আধসেরী জলপাইয়ের তেলে ভর্জিত ট্রাউট চীজ-ঢেলে পরিবেশন করল ঠিকই। কিন্তু পাতে পড়ার পরই সেই মাছ যে কোথায় উধাও হয়ে গেলো মালুম হোল না। নিমেষে অন্তর্হিত! অথচ জানি মাছেদের—পাখা যাও ছিল, কাটা পড়েছিল।

এখানে খবর পেলাম, সকালে পিউনোর জন্য সন্থ এয়ার পোর্ট খোলা হয়েছে জুলিয়াকায়। সকাল ন'টায় প্লেন আছে। তিনটি সীট হবে। ঐ টিকিটেই হবে। আরেকুইপার রেজার্ভেশন এরাই ক্যানসেল করে দিল। নিশ্চিন্ত।

গাড়ি নিয়ে দন্ত-রুচি-কৌমুদী ঠমাস হাজির। হাতে আবার তিন বোতল ভিনো ব্ল্যাঙ্কো। ঠম্ নৌকো ঠিক করেছে। বালসা; কিন্তু মোটর লাগানো, যদিও মোটর না লাগিয়েও চলবে বলেছে। পালও আছে। সূর্যাস্ত হতে হতে সাতটা। এখনও তিন-চার ঘণ্টা দিব্যি ঘোরা যাবে।......য়ুরোষদের দ্বীপেও নিয়ে যাবে। তেমন আনন্দ আমার বিয়ের দিনেও হয়নি। তোফা খবর।

তিতিকাকা

আমার যেন তর সইছে না তিতিকাকা হ্রদ প্রদক্ষিণ করার। জানি, প্রদক্ষিণ মানে ৩২০৫ বর্গ মাইলের চক্কর। জানি ত্রিশ মাইল পূবে গেলেই নিষিদ্ধ এলাকা;—অন্য-দেশ,—বোলিভিয়া। তবু দুর্নিবার টান। লেক তিতিকাকার ওপর ঘুরে বেড়াবো!

সত্যিই কিন্তু 'বেড়াবার' কিছু নেই। 'জল শুধু জল'! দেখে দেখে চিত্ত বিকল হবারই জো। কিন্তু সব বস্তুরই ভাবমূর্তি একটি আছে। তার ব্যঞ্জনা ব্যক্তি বিশেষের কাছে পরমার্থও হতে পারে। শালগ্রাম তো পাথরের নুড়ি। নুড়ি হিসেবে নিগ্রোর টেবিলে পেপার-ওয়েটরূপে ব্যবহৃত হতেও দেখেছি। কিন্তু ভাব মূর্তিতে শালগ্রাম তো জীবন-মরণের প্রশ্নও হয়ে যায়। তমাল গাছ দেখে চৈতন্য দেবের ভাবাবেশ হোতো। আমার ভাব-ভাবনায় তিতিকাকা যেন দ্বিতীয় মানস সরোবর। পঁচিশটি নদী জল ঢালছে তিতি-কাকায়, একটি নদী (তেসাগুয়াদেবো) জল বা'র করে নিয়ে যাচ্ছে। আর যার নির্গত জলের মাপ আয়াত জলের ৫% মাত্র। তবে তো এ জল বেড়ে ফেঁপে একসা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা' হয় না। বৈজ্ঞানিকের বিচারে তীব্র সূর্যতাপ এবং প্রবল বায়ুবেগ মিলে বাষ্পিত তিতিকাকার জলকে আকাশ পথে চলে যেতে হয়।

তবুও মাঝে মাঝে কথা ওঠে তিতিকাকা শুখিয়ে যাচ্ছে। যায়ও। প্রতি দশ-বারো বছরের আবর্তনে এই জল কমছে-বাড়ছে। এজন্য কেউ চিন্তা করে না। হ্রদটা সাধারণ ভাবে মোটামুটি ৩২৮ ফুট গভীর; তবে সব চেয়ে গভীর অংশ ৯০০ ফুট পেরিয়ে যায়। বড় বড় জাহাজও চলে।

আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর নিয়ে কী দরকার? তিনখানা জাহাজ এপার ওপার করছে। আড়াআড়িভাবে পঞ্চাশ মাইল; লম্বায় ১২০ মাইল। আমাদের হাতে এ হ্রদ পার করার সময় নেই। কাজেই বালসায় চড়া-ই সাব্যস্ত হোল। বেজায় ঠাণ্ডা।

মাসটা অগষ্ট। এখানে গরম কাল বলতে অঘ্রাণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন! কাজেই এখন এখানে শীত।

বাংলা কথায় 'বালসা' বলতে,—বেতের নৌকা।—তবে এক ধরনের বেত, নাম তোতোরো। তগর, নৌকো-ও ওই এক ধরনের। পুরোনো পৃথিবীর দলিলে এধরনটার ছবি পাওয়া গেছে মিশরের ছবিতে। যেন একটা চন্দ্রবিন্দু, একদিকের শিং তুলে ভাসছে। এই ধরনের বালসা গড়েই তো নরওয়েজিয়ান নাবিক হায়ার্দাল প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তেমন সোনা রংয়ের বালসা এ হ্রদে আকছার। জলটা স্বাদে 'খারা'। জলটা সোডা, চুণ, ম্যাগনেসিয়ার দখলে। তবু মাছ বেশ।

আমাদের বালসার নামটা ভালো—'কোরি কাঞ্চা' অর্থাৎ ভাস্কর, সূর্যদেব।

এই বাল্সা-জীবী কৃষ্টি একটি প্রাচীন কৃষ্টি। এদের একটা সুবিখ্যাত সুনির্দিষ্ট পৃথক কৌম—বলে, আয়মারা। এদিককার মানুষ, সমাজের প্রাচীনতম প্রতিনিধি। এরচেয়ে পুরোনো, সম্পূর্ণ নয়, এক মনোহর বনচর কৌম আছে। তাদের দেখা অতর্কিতে পরে পেলাম।—বলবো। সে এক বিদ্যা-সুন্দরী বিচিত্র ঘটনা। কিন্তু যাদের আয়মারা বলা হয় তারা দেখতে নধর, সুন্দর, প্রসন্ন। জীবনরসকে ভোগ করে। মনে হয় এমন স্বচ্ছন্দচারিণী মেয়েরাই যুগে যুগে নাগকন্যা নামে পরিচিত। কেমন যেন একটা তান্ত্রিক পরিমণ্ডল। বড়ই ভাল লাগছে। কষ্ট, অর্থব্যয়, পরিশ্রম সার্থক!

বিশ্বাস করতে পারছি না, তিতিকাকায় এসেছি। জলটা কি ঠাণ্ডা! মাঝিটার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মার্কা হাসছে। ব্যাপার কি? বুঝছি আমাদের নিয়ে কথা। কিন্তু এত হাসির কি হোল?

"কি বলছে ঐ আম্রো জান? তোমরা ভারতবর্ষের লোক। শুনে বলছে যে, তোমরাই প্রথম সূর্য তৈরী করে আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছিলে। তাই তো পেরু পেলো কোরিকাঞ্চা', আর পরম পিতা কোরিকাঞ্চাই দিল তিতিকাকায় সূর্য-দ্বীপ।"

—"সেটা আবার কোথায়?"

..."তিতিকাকা কথাটার মানে 'পুমার পাহাড়'। পেরুর মানসে পুমা এবং কণ্ডোর খুব পবিত্র পশু এবং পাখি। কণ্ডোর, আকাশের প্রতীক, স্পেসের—দেবী, শক্তি। পুমা, পাহাড়ের প্রতীক,—বীর্যের, পৌরুষের, স্থিতির।—ও বলছে, তোমাদের সত্যিই সূর্য-দ্বীপে নিয়ে যাওয়া উচিত। তোমরা সূর্যেরও আগে। যাবে নাকি? ও বলছে সাহায্য করবে।"

—"কিন্তু তুমি হাসছিলে কেন?"

—"ওকে হাসি বলে বুঝি? ও হোলো প্রাণের উচ্ছলতা।"—

"বেশ তো, চলো না সেই দ্বীপে।"

"—সে যে অনেক দূর। একটা আধটা তো নয়,—প্রায় চল্লিশের ওপর দ্বীপ। আমাজোনের পচা জলের ভ্যাপ্সানিতে যেমনই মানুষের খাদ্যের, রোদের অভাব,—

তিতিকাকার হাড়-ভাঙ্গানো শীত সত্ত্বেও কিন্তু, কেবল মানুষ, খাদ্য, চাষ—কর্মব্যস্ত জীবনের অর্কেষ্ট্রায় সরগরম।—প্রত্যেকটি দ্বীপ মানুষে ভর্তি। আইল-দ্য-সোল (সূর্য-দ্বীপ) তো রীতিমত গিসগিস করছে। কোনো কোনো দ্বীপ পাবে যেখানে মেয়েদের দেহ বলে লজ্জার কিছু নেই। পুরুষরাও ও বিষয়ে উদাসীন।"

—"কী উপজীবিকা এদের?"

"কেন?—চাষ—জলে, ডাঙ্গায়। মাছের ক্যানিং ফ্যাক্টরি। বালসার কাজ। বেতের কাজ। হাত-তাঁতে বোনা তুলো-পশমের চিরাচরিত কাজ। কাজের অভাব?"

—"গেলে হোতো। কিন্তু বোলিভিয়ান পুলিসের হাতে পড়তে চাই না।"—মনে মনে ভয়, ঠিক সময়ে ফিরতে হবে।

বালসার বোটটায় এতক্ষণে মোটর চালিয়ে দিল। আশ্চর্য গড়ন নৌকোগুলোর। আগাগোড়া তোতোরো ঘাস-বেত, বেত-ঘাস জাতীয় হাল্কা মজবুত নরম বেত। কষে আঁটকরে বাঁধা। রাশি রাশি বেত বেঁধে ভেলার মতো ভাসালেও ভেতরে যথেষ্ট পরিসর। ছাদ আছে, ঘর আছে। এক একটা বালসা বোট নজর রেখে সাবধানে ব্যবহার করলে বিশ-ত্রিশ বছর যায়; তবে মেরামৎ জারি রাখতে হয়।

একটি গ্রামে লাগলো নৌকো। এদিকে জলটা প্রায় সোঁতার মতো। নামবার জো নেই। তলতলে কাদা এবং মোক্ষম ঠাণ্ডা, একটা-দু'টো ব্যাঙ লাফিয়ে জলে পড়লো—যেন এক-একটা কচ্ছপ। এক-একটা ব্যাঙ প্রায় বারো-চৌদ্দ ইঞ্চি,—শুধু গায়ে গতরেই। (মানে ঠ্যাং-হাত না মেপে) তিতিকাকার ব্যাঙ, তেল্‌মাতোবাইউস্‌। এগ্রামের বড়ো ব্যবসা এই ব্যাঙ জাপানে চালান দেওয়া। এর ঠ্যাংগুলোই শুধু চালান দেয়। এ ব্যাঙের ছাল চালান যায় ফিলিপিনে, সিংগাপুরে। বাকী মাংসটা এরা খায়। আর খায়, অতি উপাদেয় মাংস জঙ্গলের বাঁদর। হরিণ, খরগোশ, কাপিরারা, লামাও এরা খায়। কিন্তু বাঁদরের মাংসই রাজা-মাংস।

ওরা বন্দুক ব্যবহার করেই না বলতে গেলে। লম্বা চোঙের মধ্যে বিষকাঠি পুরে ফুঁ দিয়ে মারে। মোক্ষম টিপ। লাগলেই নির্ঘাৎ পাঁচে পাঁচ মিলে যাবে। অথচ পাশের পশুটা জানবে না,—ক্যা বাৎ হো গয়া।

নামতে হোলো। গ্রাম। শীতের প্রকোপ, তাই পোষাক-আশাক সব ভারী এবং উলের। আশে-পাশে চাষ হয়েছে ভাল। চ্যাটালো মাঠে চাষ। মোষে-টানা লাঙ্গল দেখলাম। শুনলাম, বোলিভিয়া অঞ্চলে ট্রাক্টারও চালায়। কিন্তু বাড়ি ঘর সব তোতোরো-র। নৌকো গড়া, আর মাছ ধরাই এদের জীবিকা। ট্যুরিষ্ট এলে ঘোরায়। তবে আসল ট্যুরিষ্ট আসার জায়গা পিউনোর জাহাজ-ঘাটা। আরও উত্তরে। মেয়েদের বোলার হ্যাটের মতো ফেল্‌টের টুপী। প্রত্যেকে শোয়েটার পরে। সবাই বুনছে: তাঁতে কাপড়, দড়ি-ঝোলানো হাত-তাঁতে (তাঁতই বলবো) তোতোরো-র চিকের মতো, বেতের চেয়ার, ঝুড়ি। ছাদ ঢাকার ছই। খুব ব্যস্ত।

খেতে দিল। গ্রাম্য তোর্তুলা। বেগুনের ঘ্যাট। কাঁকড়া ভাজা। কিছু কাঁচা সব্জী।……ওঃ! কী পরিমাণ চিচ্‌চা এরা খেতে পারে! আমরা শুধু কোকায় মজে আছি। চিচ্‌চা অবধি উঠতে পারছি না।

এবার এলাম একটা দ্বীপে। আয়মারাদের ভীড়। আলু নামক টিউবার (মূল, গেঁটে মূল) এই দ্বীপগুলোরই দান। পৃথিবীর যাবতীয় খানার টেবিলে এই টিউবারটি পৌঁছে দেবার গর্ব এই দ্বীপবাসীরা করতে পারে। বার্লি খায় এরা; খায় কুইনোয়া নামক ঘাসের বীজ। এতো শীতে বিশেষ কিছু হ'তে চায় না। বার্লি-ও (অর্থাৎ যব) পুরো পাকে না। বড়ই শীত। সেই আধা পাকা যব ছেঁচে কাথ জাল দিয়ে ঘন করে সরু-চাকলীর মতো গড়ে খায়।

দ্বীপ দেখছি বাইরে বাইরে। চমৎকার হ্রদটা যেন সাগরের মতো। পূর্ব দিগন্তে জলে-আকাশে মিল। পশ্চিমে তুষার-গিরিশ্রেণীর ওপর সূর্যালোক—সে যেন আলোর বন্যা। রূপোর সমুদ্র। মনে আমার বাজতে থাকে জলতরঙ্গ। গান গাই,—

—'ওঁ সুগন্ধ পন্থাং প্রদিমান্ন এহি
জ্যোতিষ্মধ্যে-হ্যজরন্ন আয়ুঃ।
অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগাদ্
বৈবস্বতং নো অভয়ং কৃণোতু॥'

—এসো এসো, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও, যে পথে যেতে আমার ক্লেশ হবে না। তোমার জ্যোতির মধ্যেই নিহিত আমাদের জরাহীন জীবন লতা। দূরে সরাও; মৃত্যুকে দূরে সরাও। অমৃতের দিকে নিয়ে যাও।

হে বিবস্বান্, আমাদের ভয়হীন করো—ভয়হীন করো।"

আর ভাবি দেব সবিতাকে নিয়ে কতোই তো গান বেদময়। আর সব দেবতার নানা টিপ্‌পনী, নানা ভঙ্গী, নানা নাম। কিন্তু অবিনশ্বর এই দ্যৌ, পৃথিবী, জল, অগ্নির ওপরে আসীন চিরদিনের ঐ 'তপনঃ সবিতা রবিঃ'। আর নক্ষত্র-লোকের চন্দ্রমা। তিতিকাকার জলের রাজহংসগুলি যেন সেই অচ্ছোদের, মানসের, জেনেভার, লুসার্ণের সমগোত্রীয়। মনে হোলো সূর্য এক, জল এক, আকাশ এক, প্রাণ এক। বিশ্বের বৈভব অফুরন্ত। আনন্দের প্রস্রবণ। 'উর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কিলালং পরিশ্রুতং'। উর্ধ্বে, অধে, পার্শ্বে, ঝরণার ধারার মতো প্রবহমানা এই স্বধাধারা। 'প্রাণো বৈ সঃ'! এই অবিনশ্বর রূপ দেখার সৌভাগ্য আমায় দয়া করে দিয়েছ বলেই বারবার তোমায় প্রণাম করি, হে ভাস্কর। পিতৃদেবো ভব। মাতৃদেবো ভব। পিতৃ-পুরুষকে স্মরণ করি।

খুব জোরে তেড়ে শব্দ করে একটা মোটরবোট যেন উল্কার বেগে এসে আছড়ে পড়লো। এক যুবক! আশ্চর্য তার গঠন। বয়স আঠারো-বিশ। রীতিমত আদিবাসী। রং একটু ময়লা।

গলগল করে ঝড়ের বেগে কথা বলতে বলতে মার্কার হাত ধরে টানলো। যেন খেয়ে

এল বরুণের পাশ। যেন মাটি ফেড়ে তমোলোক থেকে প্লুটো, প্রসার্পিনের হাত ধরে টানে ; পাতালে চল।

মার্কা যদি মাঝে মাঝে হেসে গড়িয়ে না পড়তো ভাবতাম,—বলাৎকার। মার্কার লাস্য দেখে আমরা তো অবাক! এদিকে নৌকোর মাঝি আর ঠমাস-ও হাসছে। আমি জলকে গড়াতে দিচ্ছি। মাঝিটা কিন্তু খুব মধ্যস্থতা করল। বাতাস যেন শান্ত হোল। মাঝির কাছে অফুরন্ত চিচ্‌চার সাপ্লাই। বার্লি অর্থাৎ যব চোয়ানো মাল। সঙ্গে ভিড়ে গেছে হতভাগ্য ঠমাস্‌ও। হাতে দু'টি ভাঁড় ধরা। ছেলেটি প্রায় অবিরাম পান করে চলেছে।

সেই প্লুটো অবতারটি ঠাস চৌকো চেহারার। বুকটা তার প্রায় গোলাকার পাঁজরার চারধারে ঢোলকের মতো গড়ে তোলা। আলতিপ্লানো ইণ্ডিয়ানদের অতি সংস্কৃত সংস্করণ। পাক্কা কোয়েচুয়া। পেরুর খানদানী কুলীন জাত। ঠমাসের কাছে শুনলাম, ওরা 'দেবতা'র জাত! এ তল্লাটের বাতাসে অক্সিজেনের যে এতো অভাব, তাতে ওদের বয়েই গেছে! ওদের হার্ট, লাঙ্গস্ স্প্লীন সবই বিশাল আকারের। তাছাড়া ওদের মজ্জার ভেতরে যে হিমগ্লোবিন আছে, তার ফলে ওদের রক্তকণা খুব তাড়াতাড়ি খুব খানিকটা অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। সেই কারণেই এদের বুকের খাঁচাটা বাইসনের বুকের মতো। ভারতে ব্রাহ্মণ দেবতা হাত ধরে টানলেই পেয়ে যায় সত্যবতী, ঘৃতাচী। এখানে এরা সেই ব্রাহ্মণ দেবতা। নারীরা কেউ না বলতে পারে না। বরং সৌভাগ্য মনে করে স্বয়ম্বৃতা হয়।

এই দেবতাকে ওরা প্রচুর চিচ্‌চা নিবেদন করল, দু'টুকরা ব্যাঙ-ভাজাও। বোঝাতে বোঝাতে এই দেবতার হাতে হাতে বরদানের কীর্তি ব্যাখ্যা করে ঠম্। একটু 'আলগা—জিভ' হয়ে পড়েছিল। বাঁকা হাসছিল। কী বলতে যেতেই মাঝি ঠমাসকে দাবড়ে দিল। কিন্তু কে তার পরোয়া করছে? ঠমাস বার বার মধুর চওড়া বুকের দিকে চায় ; মধুর ঠোস্ গড়নের তারিফ করে। বলে,—"ওই কোয়েচুয়ারা এক সিটিংয়ে ছ'-সাত জন মেয়ের ভোঁতা যৌবনে শান চড়িয়ে দিতে পারে,—জানো? আর—ওদের পাল্লায় পড়লে কোনো মেয়ে শান না চড়িয়ে, উজ্জ্বল না হয়ে ফেরে না।" বলেই বিরাট হাসি। জলের ওপর হাসি। একদার বক উড়ে গেল। এক গাদা ব্যাঙ জলে লাফিয়ে পড়ল .... ঠমাস পুনশ্চ চিচ্‌চা ঢেলে নিয়েছে তার হাতের ভাঁড় দু'টোতে। খাচ্ছে, আর মাথাটি নীচু করে সানন্দে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলছে,—"গেল তোমাদের মার্কা। ওদের যে এখন ছাড়া-ছাড়ি হবে, এমন বোধ হয় না।" মধুর দিকে মদের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বল্ল—"ঠগে গেলে ভারত-সন্তান। হাতের হাঁস শেয়ালে নিয়ে গেল। শুধু বুকখানা চওড়া হলেই হয় না। আরও কিছু চাই।......হোঃ হোঃ হোঃ"!!

ওমা! কী বিত্তান্তোরে কী বিত্তান্তো!

মার্কা এসে কুচ্-কুচ্‌কে কি যেন নিবেদন করল। তারপর বড় বড় চোখ করে এই বুড়ো-কে বলতে লাগল—"এরাই পেরুর সত্যিকারের আদিবাসী। তিহুয়ানাকো

এবং সূর্য-দ্বীপ 'আইল্ অ্ সোল্'এর বাসিন্দা খৃষ্টের জন্মের কতো আগে যে, এই কৃষ্ণবর্ণ ইণ্ডিয়ানরা এখানে ছিল 'দেবাঃ ন জানন্তি।' এঁরাই ইন্কা জন্মের সময়ে, ডিম ফেটে রাজা-রাণীর ভূমিষ্ঠ হ'বার কালে দেখাশুনা করেছেন। তিয়াহুয়ানকোর মন্দির ইত্যাদি সব এঁদেরই সংস্কৃতি বহন করছে। পেরু-চিলি-বোলিভিয়া-কোলোম্বিয়া—সেই পানামা অবধি এঁরা 'ব্রাহ্মণস্য ব্রাহ্মণ', 'কুলীনস্য কুলীন'। মেয়েদের ধর্ম, চিরকালের ধর্ম, এঁদের প্রীতির জন্য আত্ম-সমর্পণ। সে এক পরম ক্ষণের পরম ভাগ্য। এ রতি আত্মরতি নয়; দেহরতি নয়; আরতি। সঙ্ অব সঙ্স্।"

ও বোঝাচ্ছে প্রবল বেগে,—এবং কিছু উদ্বেগে।

এবং কিমাশ্চর্যম্, আমিও বেবাক বুঝছি!

—"তা' হোল। তারপর?"

—"ও বলছে, ওর বোটে চড়ে বসলে মিন্টোঁ-মেঁ ও তিয়াহুয়ানাকো আর উরুদের দ্বীপগুলো ঘুরিয়ে আনবে, বিনি পয়সায়। সে তো বেশ হবে। হবে না? চলুন যাই। যাবেন? এটা একটা সুযোগ। আপনি বুঝবেন না এ কী সুযোগ।"

(ও মাগো! তো'র এতো ভক্তি? নর্মবধূ, লাস্যময়ী প্রকৃতি! হে প্রকৃতি, হে সহজিয়া,—তোমায় নমামি।)

"কেন? এতো উদার কেন?" —একটু চোখ মটকে উত্যক্ত করি মেয়েটাকে।

সন্ধ্যার বহু দেরী। প্রহর শেষের রংয়ের আকাশ তখনও রাঙা হয়ে ওঠেনি। অথচ দেখি মার্কার গালে সর্বনাশের রং লেগেছে। আমার প্রশ্নের দিকে না গিয়ে ও খুব ভারী ভারী পায়রা-গলার ব্যাখ্যানা দিতে থাকে,—"ওর বাবার বড়ো ব্যবসা আছে। ওর প্রভাবও এই জলে অখণ্ড। তোমাদের কথা তো বল্লাম। ও খুব রাজী। চল না। বেশ হ'বে। তিতিকাকার এপার ওপার, বেশ হ'বে।"

ওঃ! সে-কী হাসি ঠমাস্ আর সেই মাঝির।

বুঝলাম, খুব খানিক গাল দিল তাদের মার্কা।

বর্ডার পার করার সমস্যার কথা পাড়ি।

বলি,—"সে বাধার কি উপায়?"

কী বুঝল সেই কুলীন স্মরদহন পীড়িত মহা-ব্রাহ্মণ 'পরাশর' কে জানে। শুধু দেখলাম, সে খুব হৈ-হৈ করে উঠল, আর মধুর হাত ধরে টান মারতে লাগল।

নানান রোগের মতো মীনকেতনের ধড়ফড়ানির পাল্লায় পড়লে মানুষের আর জ্ঞানগম্যি থাকে না। কেমন যেন সবই গুলিয়ে যায়।

মার্কা বলল,—হেসে গড়িয়ে বলল—(মাঝি ঠমাসও খুব হাসছে। গাঁয়ের মেয়েদেরও ভীড় জমেছে।)—"ও বলছে, এ জল ওর চৌদ্দ পুরুষের। এখানে ও রাজা, ওরই রাজত্ব, শাসন। ওকে কেউ কিছু বলবে না।"

লক্ষ্য করলাম, মাঝে মাঝেই জল থেকে উঠে আসছে মেয়ে। উদাসীন। আরও

লক্ষ্য ; আরও লক্ষ্য। সেই গায়ানা জঙ্গলের প্রথা। মাথায় চুল থাকলেও অঙ্গের ত্বক্ খুঁটে খুঁটে মসৃণ করা। কোথাও কোন চুল নেই।

'বিধাতৃবসাদ্ উপৈতি'—ভাগ্যে করায় ; ভাগ্যে মেলে। সেই আচম্‌কা ধেয়ে আসা সূর্য সন্তান নারীমেধের তৃপ্তি সাধনে হঠাৎ বরেণ্যং বরদং হলেন। বেশ। আমরা তাঁর নাওয়ে চড়লাম।

এমন কিছু নয় তিওহুয়ানাকো। সূর্য-মন্দির ছিল ; নেই। আছে বেদীটি। তবে তার ওপরে কোন গির্জা হয়নি। মনে মনে আমি খুশী। মনে অবশ্য আমার হয়েছিল যে এই মন্দিরে আসব। কী আশ্চর্য! সত্যিই এলাম। বাজার বলতে সামান্য, যা তা-ও ঘুরলাম। কিন্তু তাড়াতাড়ি। উরুদের ভাসা-দ্বীপে যাব বলে, মোটর বোটে চড়ে বসলাম। বোট যথাস্থানে নামিয়েও দিল। উদ্দেশ্য সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট হবার আগেই ফেরা চাই।

ওমা! আমাদের নামিয়ে দিয়েই মোটর বোট অদৃশ্য—এবং মার্কাও!!

একটু অনুসন্ধান করবো ভেবে, যেই দু'-একজনের কাছে গিয়ে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করি,—ওঃ মেয়েদের সে কী হাসি! ছেলেরা সব কিন্তু সরে পড়েছে। একটি বুড়ী এসে আঙুল দিয়ে দেখায়—ঐ দূরে মোটর বোট! আর দুটি তরুণী দূরে দাঁড়িয়ে সস্মিত লক্ষ্যে আমার ক্যামেরাকে ধন্য করছে। কী প্রচণ্ড শীত। অথচ এরা জল গায়ে। নিরাবরণ। তবু রঙ্গে ডগোমগো।

হায়, হায়! কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তো নয়! এ যে সদ্য সদ্য পরাশর! একালীন সত্যবতীর এ কী মতিগতি! বুড়ীটা কিন্তু মধুকে দু'হাতে ধরে খুব হাসছে। পরিস্থিতি এড়াতে বাজারে গিয়ে দু'টি ভিনো ব্লাঙ্কো নিয়ে বসি। আর ভাবতে থাকি, জীবনের পরম বিস্ময়ের এই দিকটা। ভাবতে থাকি···তিব্বতে শুনতে পাই—লামা সাধুদের কৃতার্থ করার সুযোগ পেলে গ্রাম-বধুরা নিজেদের সৌভাগ্যের বড়াই করেন। কিন্তু এ যে আমাদের পরিচিতা বিপ্লবিনী মার্কা। তার এ কী কায়া—পলট্? এ কী বিভ্রম? এ কী মনোহরণিয়া যতি-পতন? ধন্যবাদ দেই সেই ভস্মীভূত তনুপ্রিয় অতনু দেবতাকে। গাল পাড়ি, যে বৈরাগী তা'কে ভস্ম করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁকে।

"—করেছো একি সন্ন্যাসী!···
হাসিয়া যবে তুলিতে ধনু, প্রণয়ভীরু ষোড়শী
চরণে ধরি করিত মিনতি।
পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি
পরখ ছলে খেলিত যুবতী।
শ্যামল তৃণ শয়নতলে ছড়ায়ে মধু মাধুরী
ঘুমাতে তুমি গভীর আলসে,
ভাঙ্গাতে ঘুম লাজুক বধূ করিত কতো চাতুরী—
নূপুর দু'টি বাজাত আলসে।"—

পুরো একটি ঘণ্টারও বেশী কেটে গেল। মধু একটু উচাটন।

আমি বলি, "মধু! এই সূর্য তপ্ত জলে আকাশে এমনি ঘটনাই তো সত্যিকার নিবেদন। আমরাই দূরে সরে গেছি। প্রকৃতির এই সমারোহ থেকে আমরা চির বিতাড়িত। বেদের মন্ত্রে আছে—এ বোধনের সভায় অভিনন্দনের যোগ্য একটি মাত্র অঞ্জলি,—পুষ্কর স্রজ—পদ্মের মালা। 'গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্কর স্রজৌ।' গর্ভাধানও তো দেবসবিতাকে আহুতি দান। এই সত্য থেকে অপভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি বলেই আমরা মনে-প্রাণে হয়ে পড়েছি যোনিকীট।

ঠিক এমনি একটি ঘটনা যে শক্তি জলে-স্থলে, আকাশে-বরুণে, সূর্যে-পর্বতের সাথে মিলে এতো অনায়াসে ঘটিয়ে দিলে, এর মধ্যে কি তুমি বিশ্বদেবকেই এক অভিনব পূর্ণাহুতি দেবার ইঙ্গিত খুঁজে পাচ্ছো না? বিরাটের সংশ্রবে এসেছো মধু। বিরাট হয়ে যাও। 'আমি দ্যৌ, তুমি পৃথিবী'—এ মন্ত্র তুমিই গেয়েছিলে। স্মরণ করো। গাও। আমি তোমার কণ্ঠে সেদিন তুলে দিয়েছিলাম তোমার বিবাহ-লগ্নে। মনে নেই? গাও। গাও।—'গৃভ্ নামি তে সৌভগত্বায়'।"

বেলাটি এখন রসমদির; পূর্ণ। পশ্চিম আকাশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তুষারে সোনা লেগেছে। "...আকাশের আলো আজ গোধূলির রক্তিম লগনে। বিশ্বের রহস্য লীলা মানুষের উৎসব প্রাঙ্গণে লভিয়াছে আপন প্রকাশ।"—

ছুটে এলো মোটর বোট। ওরা খুশীতে ডগো-মগো। মার্কার চোখ আবেশে জ্বল জ্বল করছে, কিন্তু ধ্বক্ ধ্বক্ করছে না। প্রায় ক্লান্ত পরিতৃপ্ত আবেশে একটু যেন বিহ্বল বিলোল। জয়দেব থাকলে বলতেন, হে শ্রীহরি আমায় নিজ হাতে পরিয়ে দাও শিথিলিত কাঞ্চীদাম।

আশ্চর্য, মার্কা বোট থেকে নেমেই আমার হাত ধরে পাশে এসে বসল। মনে পড়লো ভর্তৃহরি, মনে পড়লো কল্হন। কিন্তু ওতো সংস্কৃত। একালে মনে হওয়া পাপ; মনে করানো আরো পাপ!

তবু আমি খুব স্বর করে গেয়ে উঠি:—

"ওঁ সরস্বতি প্রেদমব সুভগে বাজিনীবতি
যঃ ত্বাং বিশ্বস্য ভূতস্য প্রগায়ামস্যাগ্রতঃ।
যস্যাং ভূতঙ্ সমভবদ্ যস্যাং বিশ্বমিদং জগৎ
তামদ্যগাথাং গাস্যামি যা স্ত্রীণামুত্তমংযশঃ॥'—

চমকে তাকায় মার্কা। কিন্তু সে কোনো প্রশ্ন করার আগেই আবৃত্তি করি:—

—[Let me Sing of the fame sublime of the Eternal She,
The Feminine Spring of all creation,
of the living worlds, the beings, the Universe.
Oh Thou, the Eternal Spirit of the waters and of the Skies,

May the joy be yours for a vigourous prosperous womb;
O Thou, bless this female with
the germinals of Universal Creation.]—

সূর্যের রথের চূড়ায় কনক বরণের আভাস। দূরে কার্ডিলেরার সহস্র বৈদূর্য শিখর মাল্যে ভূষিত যক্ষপুরী ঝলমল করে উঠেছে। সেই সোনা ঢালা আকাশের কান্তির, সেই শান্ত স্বচ্ছ হ্রদ-হৃদয়ে মুঞ্জরিত কনক-কুঞ্চিত তরঙ্গ পুষ্পের কম্পনে, সেই গিরি গরিমার প্রবাল বিভ্রমে বিলোল হয়ে উঠেছে শান্ত তিতিকাকার স্বচ্ছ জল। এমনই ঘন সেই পরম সন্ধিক্ষণের নিগূঢ় নিঃশ্বাস, যেন আমরা সবাই সমস্ত দেহ মন দিয়ে পান করছি সেই রস-আবেশ। জড়িয়ে ধরেছে সায়াহ্নের বহ্নিদীপ্ত ভাস্করের সবল তৃষা-কম্পিত বাহু তপ্ত ধরিত্রীর রসমদাতুর ব্যাকুল বিস্তীর্ণ দেহ গরিমাকে; সুধায় সোনায় ভরে দিয়েছে তার রস সত্তার নিবিড় আলিঙ্গন। জলে, অন্তরীক্ষে, বনানীতে, শস্য-ভরা মাঠে, তুষার ঢালা গিরি চূড়ায় প্রচণ্ড সূর্যের স্তিমিত প্রেম-বিহ্বল নিবেদন যেন আমাদের সত্তাকেও অনুরাগে রঞ্জিত করে দিল। সকলে নির্বাক। মহা-মহিমার সঙ্গে সাক্ষাৎ-কারে নীরব সমাধিই তার যোগ্য অভিনন্দন।

শান্তজল। তখনও ঝলমল করছে রোদ। মোটর চলেছে জল কেটে। শব্দের অনুরণন পাহাড়ে লেগে ফিরে আসছে। মার্কা আমাদের মাঝের ঘোর কাটাবার অছিলায় প্রশ্ন করে, "লাগলো কেমন? আমি গাপ্ হয়ে গেলাম বলে মিথ্যে ভাবনায় পড়োনি তো?"

অতি সাহসিত অথচ অনাবৃত প্রশ্নটিতে কেন যেন ব্যাকুল হয়ে উঠি। উর্বশীর ব্যথায়, ঊষার ব্যথায়, তপতী সূর্যের ব্যথায় ঋগ্বেদের ঋষি ব্যাকুল গাথা রেখে গেছেন। সেই পরমব্যথা আজ আর কারোর 'পরাণ কাঁপায়' না।

মার্কার উজ্জ্বল চোখে চোখ রেখে বলি, "খুব ভাল লাগল। খুব। কতো সূর্য মন্দিরে গিয়ে কতো প্রার্থনা করেছি কতোবার। কিন্তু তাঁর পরম প্রীতির যা যথার্থ নৈবেদ্য কলুষিত মনের প্রভাবে সঙ্কুচিত হয়ে সেই জীবন্ত আনন্দের ভোগ কখনও নিবেদন করিনি। এই আনন্দের ভোগ দেবার সাহস হারিয়ে মানুষ কতোই অনুকল্প রচনা করেছে,—সতীচ্ছদ-দান, শিশ্নচ্ছেদ, এমন কি কুমারী ধর্ষণ, কুমারী বলি, কুমারী বিক্রয় পর্যন্ত। রমণ-হোমের, রমণ নৈবেদ্যের বাজার পর্যন্ত রচনা করেছে। মনে ধরেনি সেই সব হাস্যকর জুগুপ্সিত প্যারডী। এ যা দেখলাম, পেলাম,—ভোগ করলাম.—এ স্বর্গীয়, পার্থিবে অপার্থিব। অনন্দরূপী অমৃত। এই আনন্দ থেকেই জীবভূত সৃষ্টি। শুধু শুনেই এসেছি ভাস্কর সাধনায় নর্মই নিবেদন। আজ তোমার মন-দেহের আনন্দের উল্লাসে, যৌবনের প্লাবনের তীরে দাঁড়িয়ে আমি যেন জীবনদাত্রী অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবী শক্তির স্বয়ং সম্পূর্ণ ছবি-রূপটি প্রত্যক্ষ করলাম। বিলাসের সরলতার আনন্দকে পুণ্য তর্পণ করে তোলে। সব দেখার চরম দেখাই হয়ে গেল মার্কা। সব দেখা যেন শেষ হয়ে গেল। হে পূষণ পুষ্টি দাও।"

মার্কা পাশে এসে একটি হাতে আমায় জড়িয়ে কাঁধে মাথা দিয়ে বলল,—"সেকি হয়? উরুদের ভাসমান দ্বীপগুলো দেখবে না? চল। দেখবে ঐ মানুষটা, তুমি যাকে পরাশর বলছো, তার কী প্রতাপ। দেখবে এই শীতেও অস্তরবির কিরণ মেখে জলে স্নানরতা কত সরলা অনাবৃতা মেয়ে। ছেলেরা সূর্যের ভোগ নয়। এই কিরিকাঞ্চ ভীরাকোচা নগ্না মেয়ের দেহতটেই আছড়াতে ভালোবাসেন।"

"দেখলাম তো। আর নয়। ঔৎসুক্যে ভরা চোখের চাহনি ওদের দেহ নৈবেদ্যে যেন মাছির মতো বসে। ও আমার ভাল লাগে না। পুণ্যকে অশুচি করতে মন কাতর হয়।"

"জানো, এটা ব্যভিচার নয়। এ সত্য। এ তো কুজকোর প্রকিওডরেস্ কাল্লের, বা লীমার ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের নোংরামী নয়। এ আর কিছু…বললে মার্কা।

শুধু বল্লাম,—"বুঝি মার্কা, বুঝি আমি এ সব; তবু এও সত্য যে আমি কৃষ্টির ক্যান্সারে ভুগছি।"

কথা থেমে গেল। জল-পুলিস এসেছে। আমাদের কাগজ পত্র ফিরিয়ে দিল। আমরা দেঁতো হাসি বিনিময় করলাম।

মার্কা মধুকে জিগ্যেস করে, "অতো কী লেখো তুমি?"

গভীর গম্ভীর গলায় মধু বলে,—"কী আলোচনাটা হয়ে গেল বল তো। নোট নিচ্ছিলাম।"

আমি তাচ্ছিল্য করে বললাম, "ওর ঐ এক বাতিক আছে। নোট্‌স্! মিথ্যে আত্মম্ভরিতা পাপ। এ সব অনুভবের কথা। অনির্বচনীয়ের বচন।"

এই ভাসমান দ্বীপগুলোয় কাশ্মীরের মতো প্রচুর চাষবাস হয়। চাষের জন্যই উইলো, পপ্‌লারের ডাল আর শ্যাওলা গুল্ম দিয়ে ক্ষেত তৈরী করা হয়। এমন দ্বীপ, সেও চাষেরই জন্য, দেখেছি মেক্সিকোর সেকালের 'তেক্‌স্ কোকো' নামক বিশাল হ্রদের বর্তমান অবশিষ্ট অংশে। সে'টুকু অবশ্য প্রধানতঃ ট্যুরিষ্টদের দেখানর জন্য। কিন্তু পেরুর এরা প্রাচীন 'উরা' উপজাতি। ইনকারাও এদের ঘাঁটায়নি। মনে করতো, এরা মাছ-ব্যাঙের মতোই জলজীব। এদের শিশুরাও জলে ডুবে মরে না। চব্বিশ ঘণ্টার দশ-বারো ঘণ্টাই এরা জল ভালোবাসে। কাঁচা মাছ বা কাঁচা শামুক যেমন পায় মুখে ফেলে দেয়। এদের তাড়া করলে নীরবে হ্রদের অন্যধারে চলে যায়। কখনও কাউকে কিছু বলে না। বলতে জানে না। শুধু জল ছেড়ে নড়তে চায় না। আর কিছু চায় না। এত যে শীত, উরুরা প্রায় কিছু না পরেই থাকে। এতো যে ঠাণ্ডা জল, জল থেকে ওঠেই না। মেয়ে এবং পুরুষদের মধ্যে পুরুষরাই তবু সুঠাম। বেঁটে, চৌকো, পিপের মতো চেহারা। মেয়েদের 'মেয়ে' বলে বোঝা যায়, এক জোড়া দোদুল্যমান চামড়ার পার্সের দুটি বোতাম দেখে এবং গালের ও মুখের চিক্কণতা দিয়ে। খুব গৌরবের দিনে ঐ ভাণ্ডার দু'টি দেখতে যেন, গাছে লেগে থাকা বক্রী পেঁপে। নারীত্বের গৌরব বা পুরুষের বিক্রম সবই যেন

জলে হেজে গিয়েছে। বেণী ঝোলাবার চেষ্টা করে, কিন্তু পিঠে চুল ছড়ানোই চল কিশোরীদের দেখে কিন্তু ভাল লাগে। আশ্চর্য উরু-রা কেউই বড় হাসে না। কাসাভার ময়দা খেয়ে খেয়ে পেটগুলো ঢোল। এতো ঢোল যে, বেশীর ভাগ মেয়েদেরই 'নিম্ন নাভি'র বদলি 'উচ্ছ্রিত' নাভি। শ্রোণী নেই; 'শ্রোণীভারাদলস গমনা'র কথাই নেই। পুষিয়ে নিয়েছে বিশাল কটীহীন উদরভাণ্ড। তার ভারে অলস গমন বটে। কিন্তু অলস গমনের মিষ্টতা যেন পচে গেছে।

একদল এসে দাঁড়ায়। বোঝা যায় যে, আমাদেরই জন্য বিশেষ করে সেজে এসেছে। নানা 'খেল' দেখায়। কিন্তু দেখলাম, তাদের বাড়ি, গাঁ। বেশীর ভাগই হ্রদের মধ্যেই চুকুইতো উপসাগরের জলায় বাস করে। বড়ো বড়ো কাঠের গুঁড়ি জলে ভাসিয়ে বেঁধে তার ওপরে তোতোরো, শ্যাওলা, উইলো পপলার দিয়ে বাড়ি অর্থাৎ কুঁড়ে গড়ে। বিশাল বিশাল ক্ষেত। তোতোরো, শ্যাওলা, উইলো, পপলার দিয়ে স্তূপ গড়া। চমৎকার সব্জী ফলায়। এখন ব্যাবসাদারেরা এসে 'গোডাউন' গড়েছে। পাইকিরি দরে সব কিনে নেয়। তার বদলে এরা নেয় রঙীন কাপড়, পুঁতি, লোহার যন্ত্রপাতি। বোতলের মদ পেলে এরা সব দিতে পারে, দেয়ও। বিবাহিত জীবন অজ্ঞাত; কিন্তু জোড় খুব শক্ত। যৌন শুচিতা হেসে ওড়ায়। ওটা যেন বদ এবং বোকাদের বাতিক। কিন্তু অর্থনৈতিক খতিয়ানে সত্যিকার 'লুট' চলেছে।

এরা ঘাসের ঘাগরা পরে নাচলো। ঘাঘরা কিন্তু অনাবশ্যক 'লজ্জা' ঢাকার জন্য নয়; অতি-আবশ্যিক দেখলাম, পশুদের মত নাচ-গানের উৎসাহ পুরুষদেরই বেশী। নানান অস্ত্র-শস্ত্রে যারা সজ্জিত তারা বে-কসুর শো-পীস্। আসল উরুদের চিনতে কষ্ট হয় না। সে বন্যতায় সারল্য মণ্ডিত থাকে। সারল্যের বড় কোন মণ্ডনই মণ্ডন নয়।

ঠিকই বলেছিল মার্কা। দেখলাম পরাশরকে মহাখাতির করে মেয়েরা নিয়ে গেল। যখন ফিরে এল ওর সঙ্গে এক ঝুড়ি,—তা'তে কলা, পেঁপে, আনারস, আর টম্যাটো। আমরা সাওয়ার-সপ্ ফাটিয়ে খাই। টক্-টক, মিষ্টি-মিষ্টি স্বাদ। আতার বীজের মত চুষে বীজ ফেলে দিতে হয়। পেঁপে খেলাম। আর পাকা কোকোর জেলি। উরুদের চেয়ে প্রাচীনতর মানুষ দক্ষিণ আমেরিকায় নেই। "ওয়াল্তি প্লানোরা" নামক এক কৌমও খুব পুরোনো। কিন্তু ওদের তারিখ জানা যায়। (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)। উরুরা অনাদিকালের বাসিন্দা।

এই অভিনব যাত্রাটি আমার মনে বহু অভূত-পূর্ব ঘটনার জন্য পরবর্তী স্মৃতি-জীবনে চোখ মেলে চেয়ে থাকবে। তিতিকাকার রূপ, তার বিচিত্র আকাশের অভ্র-স্বচ্ছ প্রতিবিম্ব, তার প্রতিবেশী নিসর্গের কাব্য-সমারোহ এসব একদিকে,—প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব একদিকে, আর ঐ যে চমক ধরিয়ে দিল স্বাধীন-ভর্তৃকা মার্কা এবং সূর্য-সন্তান 'পরাশর'—সব মিলিয়ে এ সত্যই এক সূর্যস্নান। দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞ পাতিং ভগায় ·····।

বেলা বলতে তখনও একঘণ্টা আছে। সওয়া সাতটায় অফিসিয়ালি সূর্যাস্ত। আয়াকুচোর ময়দান আয়কারা নদীর কাছে। তিতিকাকার একটি বড় নদী আয়কারা। আয়াকুচো নামে যে আধুনিক শহর, সেটা বহু দূরে। তারসঙ্গে এ ময়দানের সম্পর্ক কিছুই নেই।

অস্ত যাচ্ছেন সবিতা। দূরে বনানীর পাড় সিল্যুটের ভ্যানডাইক-গ্রে আর সেপিয়ার গভীরে মগ্ন। আকাশে মেঘের ওয়াশ্। তার ফেরে পড়ে সূর্য যেন সোনার থাল একখানা। তার বিদায় অশ্রু সোনা হয়ে ঝরে পড়েছে বিস্তীর্ণ জলের বাটীতে। সে জলেও সোনা, কমলা, সেপিয়া। পাখির দলের পর দল, কেউ আকাশে, কেউ জলের কাছাকাছি উড়ে চলেছে কোথায়, কে জানে, লোকে যে সূর্যাস্ত দেখতে আসে, কেন আসবে না? আধুনিক নগর-জীবন থেকে যে স্বাভাবিক বর্তুল 'স্কাই-লাইন' মুছেই গেছে। আকাশকে বাতিল করে আমরা জীবনকে দূষিত করছি। কথাটা কাব্য নয়। নয়-যে, তা বুঝি এখানে এলে—এই পরিবেশে এলে।

আক্রমণ করল শীত। হঠাৎ যেন ঝপ করে খামচে ধরল শীত, আর লক্ষ লক্ষ তীক্ষ্ণ দাঁতে কুরে কুরে খেতে লাগল হাড়, মজ্জা। কয়েক কাপ কোকো চা গলাধঃকরণ করে আমরা সবাই যখন উঠি-তো-পড়ি করে ছুটলাম, তখনও আয়াকুচো দূরে।

আশ্চর্য লাগলো, বস্তুতঃ একটু ব্যথাই পেলাম, যখন দেখলাম পরম নৈর্বক্তিক অনীহার সঙ্গে, কোট থেকে ঝেড়ে ফেলা হিমের মতো 'পরাশর'-টি তার পড়ে পাওয়া মৎসগন্ধাটিকে ফেলে গেল। মার্কাও সম্পূর্ণ নিরাসক্ত চিত্তে সেদিনের জন্য ছাড়া পাওয়া মাগুর মাছের মতো গৃহস্থ বধূর মাছের কলসীতে ঢুকে গিয়ে অন্য মাছের সঙ্গে মিশ খেয়ে খেলা করতে লাগল।

অনায়াস সারল্যে আমার কোলে মাথা রেখে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মার্কা। মার্কা ক্লান্ত। এ ক্লান্তির শোভা যেন দিনান্তের অস্ত শোভা।

আমি শুধাই,—"আয়াকুচো। হবে না আয়াকুচো?

ঠমাস্ বল্লো,—"আমরা তো আর শহরে ফিরছি না। যাচ্ছি নতুন এয়ারপোর্টে। ঠিক ধরে ফেলবো প্লেন।"

ধরেছিলামও ঠিক। শুধু তুই গড়বড়। এতো তাড়াহুড়োয় এ ধরনের গড়বড় হতে বাধ্য। এক—অন্য এয়ারপোর্টে অর্থাৎ জুলিয়াকায় এসে সেই প্রথম এয়ারপোর্টের

অর্থাৎ আরেকুইপার রিজারভেশন মারা গেছে। দুই,—যে প্লেন ছাড়বে, সে যাচ্ছে লীমায়। সে এক ভীষণ পরিস্থিতি। এয়ারপোর্টের ম্যানেজার তখন বললেন—"এক ঘণ্টার মধ্যে একটা ছোটো ডিপার্টমেণ্টাল প্লেন (তা'র মানে জানি না। এক্কার ঘোড়ার কুলুজী কে চায় ?) যাচ্ছে সোজা হুয়ানকায়ো হয়ে লীমায়। —তা'তে যদি যেতে চাই।"

—"বেশ।"

—"ক'টায় পৌঁছাবে ?"

—"রাত ন'টা তো হ'বেই !"

—"আর ঠাণ্ডা ?"

"জমে যেতে হবে। কিন্তু ভালো হোটেল পাবে। তখন এ ঠাণ্ডা ভুলে যাবে।"

মার্কা মনে করিয়ে দিলো যে, এটা শনিবার। হুয়ান্‌কায়োর রবিবারের বাজারটা দেখা হবে। বক্রীলাভ। হাতে রৈলো পাক্কা চল্লিশ মিনিট।

তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম। দৌড় লাগাও আয়াকুচো। আয়াকুচো নামে একটা শহরও আছে। সেটা আয়াকুচোর ময়দান থেকে নীচে দু'শো কি: মি:। সে শহরটির নাম ছিলো হুয়ামাঙ্গা ; এ নাম বদলে ফিরিঙ্গীরা নাম দেয় সাঙ্গোয়ান দে-লা ফন্তেরা। আয়াকুচোর বিজয় স্মৃতির সম্মানে সেই শহরের বর্তমান নামকরণ হয়েছে আয়াকুচো। কিন্তু ময়দানটি এয়ারপোর্ট আর তিতিকাকার মাঝখানে।

আয়াকুচো বলে যে ময়দানটি সেটা তিন দিকে ভাঁজে ভাঁজে পাহাড়ের মধ্যে। ডিসেম্বর ৮, ১৮২৫ তারিখে বিছানায় শুয়ে বোলিভার। কিন্তু জে: সুক্রে আছেন। বোলিভারের নিজের হাতে গড়া পুত্রবৎ সুক্রে। পেট্রিয়ট সৈন্য পাঁচ হাজার, ফিরিঙ্গীরা ন' হাজার। অর্থাৎ প্রায় ২ : ১ এর মাত্রা। তা'দের কামান এগারো, পেট্রিয়টদের কুল্যে একটি। তবু এ যুদ্ধ চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়ে রইল। পৃথিবীর ইতিহাসে একটা সাম্রাজ্য ধ্বংসকারী যুদ্ধ এত উঁচুতে কোথাও কখনও হয়নি। আমি যেন সেই যুদ্ধের প্রতিটি মিনিট দেখতে পেলাম। দেখলাম ডানধারের পাহাড়ী থেকে চার্জ করে জে: পায়েজের গোচোরা ঘোড়া ছুটিয়ে বল্লমের অভিঘাতেই ফিরিঙ্গী সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে।

আমি যখন বার বার সেই মাটি মাথায় রাখছি, দেখে অবাক হয়ে মার্কা বলছে—"সত্যই তুমি বিপ্লবী। তবে কেন বলে, গান্ধী ছিলেন অহিংসাবাদী ? কেন বলে, ভারতের স্বাধীনতা এসেছে অহিংসার পথে ?"

আমি বলি, "ইতিহাসকে—আমাদের কবি বলেছেন মিথ্যাময়ী।"

গাড়ি চলেছে তীব্র গতিতে। পুরো পথটাই খাঁড়ী। দু'ধারেই প্রচণ্ড পাহাড়। সঙ্গে সঙ্গে বইছে নাম না জানা নদী। ওর গতি তিতিকাকা। খুব চাষ হচ্ছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে। বাতাস শীতল, হাল্কা।

গান্ধীজীর কথা ভাল লাগছে না।

বললাম—"অহিংসাবাদী কে বা কা'রা—ভাবি না। ভাবি, ভারতের স্বাধীনতার কতোটুকু কাগজে সই করা, আর কতোটুকু রক্তে ভেজা। ভাবি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যদি না হোতো, ভারতকে যদি আমার দেশ, আমার হক বলে সবলে ছিনিয়ে নিতে পারা যেতো—"

"যেতো কি ?"—মার্কা সন্দেহ প্রকাশ করে।

"—নিশ্চয় যেতো। কিন্তু কংগ্রেসে তখন বাবুয়ানা সমাজতন্ত্রবাদ। বোর্জোয়া বণিক-তন্ত্রবাদ। সে কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের চোখে রেখে তোষণ নীতির স্বার্থে কিছুতেই সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম নিল না। মসনদে চড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পর পর নানা অঘটন ঘটাল। সবার মধ্যেই গান্ধীর জিদের আঁচ। অহিংসার আঁচড়, শান্তিময় আত্মঘাত। জৈন অনশন সেই আঁচের প্রকোপ একটা বিশাল সংস্থাকে পাগলামিতে ধরলো। ফলে, এখন অনবরত রক্তক্ষয়ে ভারতের নাড়ী শিথিল। জীবনেও যারা ধুলোয় নেমে জীবন দেখল না। সেই সাতমহলার জানালা-বাজীকরীই আজ ভানুমতীর খেল দেখাচ্ছে। মানুষ ভুগছে; তড়পাচ্ছে না। ক্ষয়ে যাচ্ছে; শেষ হচ্ছে না। এইভাবে বেঁচে থাকাটাই যে বৈদেশিক স্বার্থের কাম্য। বড়ো করুণ সে ইতিহাস। এসো, বরং নিসর্গ দেখি। গান গাই। দেশ বেড়াতে এসেছি। বড়ো বড়ো কথায় কি কাজ ? দুঃখ কী জানো ? অহিংসার দেশ, স্বাধীন হ'বার পর যতো রক্তক্ষয় করছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র ইতিহাসেও ভারতে ততো রক্তক্ষয় হয়নি,—ততো হত্যা হয়নি। তবু অহিংস আমরা। জীনভজা, বুদ্ধভজা, দার্শনিকজাত। ক্ষুধা, ভিক্ষা, মানবতার নির্মম দৈন্য আমরা দার্শনিক আরকে ভিজিয়ে দেখি! এর নাম দিয়েছি 'রাম রাজ্য'। ভিজে-আগুন। সোনার পাথর বাটি। চর্খা চাতুরী!"

তখন রাত গভীর নয়। ভিলভিলে পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটি বিমান ঘাঁটী। মাত্র ঘাঁটিটী। এমন ঘোমটা ঢাকা কনে-বৌ ঘাঁটী ভেনেজুয়েলায় পেয়েছি। যা'কে ইংরাজীতে বলে 'ফাংশনিং', 'এফীশিয়েন্ট',—কাজ চলেবল্। কিন্তু আসলে খুব সতর্ক।

ট্যাক্সি নেই। এয়ার পোর্টের ম্যানেজার বললেন,—"আমি ষ্টাফ-কারে শহরে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু শনিবার রাত। শীত তো দেখছেনই। সব হোটেলই বোঝাই। এখানকার রবিবারের হাট না দেখলে বোঝা যায় না, সে কী এক 'ফেনোমেনন্'। আমি কিন্তু আপনাদের ছেড়ে দিয়েই পালাবো।"

হুয়াঙ্কায়ো

অনেকগুলো টেলিফোন খরচ করে স্থান পেলাম হোটেল "রেসিডেন্সিয়াল্ হুয়াঙ্কায়ো অন্ কালে গিরাল্দেজ্।" ষাট সোলেজ প্রতি বেড। কিন্তু এক ঘরে তিন বেড।

এবং ঘররে বাইরে 'বাথরুম' নামক এক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা হলেও শাওয়ার নেই। গরম জল কেবল সিঙ্কে। তবু আমরা বড়ই ক্লান্ত। বিছানার জন্য প্রাণ ব্যাকুল। দেহ তৃষ্ণার্ত।

এমন থাকা, ছেলে-মেয়ে পরিবার নিয়ে একবার আমষ্টার্ডামেও থেকেছি, হোটেল হলেও শেষ মুহূর্তে জোড়া তালি দেওয়া ব্যবস্থা। এমন কিছু অসুবিধা হয় না।

পেরুতে যতো শহর আছে, যতো তল্লাট আছে হুয়াঙ্কায়োর মতো অক্ষত যোনি তল্লাট, আনকোরা ইন্‌কা তল্লাট আর নেই।

কারণটা বুঝিয়ে বলি।

যখন কুজ্‌কোর পথে সব ধ্বংস করতে করতে ফিরিঙ্গীরা এগিয়ে চলেছে, তখন এখানকার হুয়াঙ্কা কৌমেরা দূত পাঠিয়ে জানিয়ে দিল তা'রা ফিরিঙ্গীদের কোন বাধা দেবে না, ত'াদের আনুগত্যই করবে, যদি তা'রা এ নগরে প্রবেশ না করে। পিজারো এ নগর আক্রমণ করেনি। ফলে, সমগ্র পেরুতে এই নগরে ফিরিঙ্গী ছোঁয়াচ লাগেনি। এটি আজও বিশুদ্ধ ইন্‌কা-তম শহর।

তখনকার মতো শুয়ে পড়লাম। কী যে খেয়েছিলাম মনে নেই। তবু বুঝলাম, মধু পা টিপে দিচ্ছে। হাত বদলেছে। পায়ে নরম ছোটো হাত। মার্কাও সেবা করছে। মধু তা'র দেহের সব ভার দিয়ে আমার গা টিপে দিচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়েছি।

রাতে প্রচণ্ড শীত। এখানে নেই সেণ্ট্রাল হীটিং; নেই ইলেক্‌ট্রিক হীটার। মধুতো যা' কিছু পরতে পেরেছে, পরে শুয়েছে। আমি তা' পারিনি। শীত হাড়ে। কিছু বাদে মার্কা আমাদের অবস্থা বুঝে নীচে নেমে গেল, এবং গোটা দুই হীটার জোগাড় করে আনল। ওর মাথায় বুদ্ধি খেলেছিল। ও জানত, এ সময়ে ম্যানেজারের ঘর খালি। ও ম্যানেজারের ঘর এবং লাউঞ্জ থেকে দু'টো হীটারই স্রেফ 'না বলিয়া' উঠিয়ে নিয়ে এসে ঘরে লাগিয়ে দিল। ভাগ্যিস দু'টো প্লাগ ছিল। রাতটাতো ঘুমোলামই, দিনেরও বেশ খানিকটা সময় ঘুমোলাম। মনে পড়ে না বেলা দশটা পেরিয়ে কবে উঠেছি।

আমার প্রাত্যহিক চানের বিষয়ে কি বলেছিল মধু, জানি না। সকালে মার্কা স্নান করাল তিনটে ঘর বাদ দিয়ে এক ইনকা ব্যবসায়ী দম্পতীর ঘরে। তারা প্রতি রবিবারে বাজার করতে আসে। ঘর তা'দের বাঁধা। ন'টার পর ঘর খালি থাকে। তারাই দয়া করে ব্যবস্থা করে দিল। (ভ্রমণের সঙ্গী দু-দশটি পুরুষ হোক; সে তদ্বির বা সেবার ধাত জাত-আলাদা। কিন্তু মেয়েদের তদ্বিরের তুলনা হয়না। ওদের সাহস অদম্য)।

তা'দেরই কাছে শুনলাম, দু'টি গ্রামের কথা—হুয়াল্লা আর জেরোনিমো। হুয়াল্লা কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। পেরুর বস্ত্রশিল্প এখনও বিশ্ববিখ্যাত। এরা সিল্ক জানতো না। এক সিল্ক বাদ দিয়ে হেন কোন তন্তু নেই যা' দিয়ে এরা লিনেন থেকে মসলিন পর্যন্ত অদ্ভুত অদ্ভুত বস্ত্র সৃষ্টি করেনি। সবই হাত-তাঁতে, এবং মাকু ছাড়া। আজও তাই। মাকু জানত না। আমাদের দেশে যেভাবে আমরা আজও কার্পেট, আসন ইত্যাদি ঝুলিয়ে বা টানা

দিয়ে বুনে থাকি। আজও ওরা সেইভাবে করে থাকে। ওদের বোনার মধ্যেই ওরা নানা ডিজাইনও করে। বেশীর ভাগ মাথা থেকে ভেবে বা'র করে; যা'র ফলে, ওদের প্রত্যেক সৃষ্টিই অদ্বিতীয়। সে সব ডিজাইন সংগ্রহ শালায় রেখে দেখানো হয়। আর সেই সবই কেনার আড্ডা হুয়াঙ্কায়ো।

এমনি জেরোনিমো প্রসিদ্ধ রূপো ও তামার কাজের জন্য। আজ রবিবার। আজ বাজার ভরে আছে ঝুড়ি ভরা ভরা নানান কাজে। বেলা এগারোটায় বাজার রমরমা। যদি কুটিরশিল্পের বৃহত্তম প্রদর্শনী জীবনে দেখে থাকি (দেখে সত্যি শেষ করতে পারিনি। শুনলাম, কেউ পারেনা)—সে এই হুয়াঙ্কায়োর বাজার।

পশমের বাজার চোখ ধাঁধানো। আলপাকা, ভিকুনা, লামা ছাড়াও মাত্র সাধারণ মেষ বা অন্যান্য পশমের কত কাজ। কত কাজ পাখির পালকের, রঙ্গীন কাগজের। দেয়ালে ঝোলাবার, সোফায় লাগাবার, বিছানায় পাতবার, মেঝেয় পাতবার—সে নানা-ভাবে নানা তন্তুর বিচিত্র বুনটে বোনা মালের স্তূপ। প্রত্যেক পরিবারের শিল্প-সাধনার ধরন পৃথক। মোম আর ছাপ দিয়ে একরকমের ডিপ্-ডাঈ। দেখবার মত তার ঔজ্জ্বল্য। এরা সোনালী-হলদে, উজ্জ্বল কমলা, কালো আর নানা ধরনের লাল দিয়েই বেশীর ভাগ কাজ সারে। প্রায় সকলেই এখানে বাজারে বসেই কাজ করে যাচ্ছে। যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উলের কাজের বুকে পাখি বা পশু, ইন্‌কা দেব-দেবী বা মন্দিরের নক্সা ফুটিয়ে তুলছে, দেখে মনে হয়, ম্যাজিক দেখছি।

এখান থেকে মাইল দুইয়ের মধ্যে বাজারে ফাঁক নেই। স্তূপ করা জিনিষ। লোকে হাঁকছে, ডাকছে, নাচছে, গাইছে। মদের ছড়াছড়ি। হ্যাটের পট্টিতে হ্যাট. পোঞ্চোর পট্টিতে পোঞ্চো—তেমনি ঘোড়ার সাজ, শুধুই চামড়া, ঘোড়া। পুতুলই হাজার রকমের। বহুলোক পুতুল কিনছে! তৈরী জামা-কাপড় বা মেয়েদের বিশেষ পোষাক, বিয়ের পোষাক, পাদ্রীদের পোষাক। হাজার হাজার লোক যেন হন্যে হয়ে পড়েছে। অথচ এই চলছে প্রতি রবিবার; চলছে আবহমান কাল। চলছে পেরুতে ফিরিঙ্গীরা আসার আগে থেকে।

দিল্লীতে আছে শাহী ইমাম, শাহী মসজিদ, শাহী মিঠাই-ওয়ালা, আতর-ওয়ালা। কিন্তু সে তো অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। এখানে এই মেয়েটির অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহই হয়ত ইন্‌কা কাপাকের রাজকীয় ক্লোকটি তৈরী করেছিল। প্রত্যেকটি শিল্পীরই ঐতিহাসিক ঐতিহ্য।

পাহাড়ী পথ। চড়ছে আর চড়ছে। এক সময় নামতে আরম্ভ করল। এল সব্জী, ফল, মদ, মাংসের বাজার। বন্য মাংসের মধ্যে গোটা গোটা হরিণ, আর্মাডেলো, পর্কুপাইন (অর্থাৎ সজারু), বাঁদর প্রভৃতি সোজা রেফ্রী-জারেটেড ভ্যানের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। মদও তাই, ফলও তাই। সবই যাবে লীমায়।

কাঁচা চামড়ার বাজার থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়ি।

একটা ফাঁকা জায়গায় গোল হয়ে মানুষ বসে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। কী মজা! মার্কা বলে,—"চল ঘোড়াকে চলতে দেখেছ; হাঁটতে দেখেছ কী? দেখ, হাঁটিয়ে ঘোড়ার কারসাজী।"

মাথায়ই ঢোকে না কথা। হাঁটিয়ে ঘোড়া কী? ওয়াকিং হর্স? ঘোড়া যখন চলে, একসঙ্গে একটি সামনের একটি পিছনের পা ফেলে। একসঙ্গে ডায়াগোনাল সামনের পিছনের পা তোলে—আর রাখে। কিন্তু একটি যদি বাঁয়ের পা হয়, তবে অন্যটি ডাইনের পা হবে। একসঙ্গে দু'টিই ডাইন বা দু'টাই বাঁ—অর্থাৎ একবার ডাইনের দিকের দু'-পা আর অন্যবার বাঁয়ের দিকের দু'-পা দিয়ে চলবে না। এখানে রেস চলছে কিন্তু সেই নিষিদ্ধ ভাবের চলনেরই। এত ভারী, উঁচু, শক্তিমান ঘোড়া যে, শরীরের 'মোমেণ্টাম'কে-দুলিয়ে দুলিয়ে একবার ডাইনে ঝুঁকে, একবার বাঁয়ে ঝুঁকে দোলের ছন্দের সহায়তায় এই চলনটিকে অনুশীলিত করেছে। ঠিক সোজা যেতে পারে না। ঈষৎ তির্যক্ গতি। কিন্তু যায়।

আর দেখতে হয় 'বাহ্বাস্ফোট', অহঙ্কার! বাজীধরার আস্ফালন! ঘোড়ার মালিক-গুলোর মাথায় বিশেষ ওমব্রেরো, সাজানো টুপী, আর মন মাতানো পোষাক। মহাভারতে ঘোড়ার চালের নানারকম বর্ণন আছে। এ যেন সবগুলোই দেখলাম। এ সব ঘোড়াই লক্ষ লক্ষ পেসোতে হাত বদল হচ্ছে। মনে রাখতে হবে, এ ব্যাপার শতাব্দী পারেও হত।

সব কারবার নগদে। কিন্তু চুরি-ডাকাতি নেই।

কাছেই আছে কোটো, উনামুলো, পাটান। ট্যুরিষ্টরা যায় প্রাচীন দুর্গ, আর গোল পাথরের গাঁথনী দেখতে। আমরা এখন সত্যিই পরিশ্রান্ত। মন বলছে লীমায় গিয়ে স্যাভয়ের বিছানায় ঘুমোই। যথেষ্ট হয়েছে পাথরের সঙ্গে কথা বলা।

তা' যতই পরিশ্রান্ত হই না কেন, এই খাড়ি দিয়ে নেমে বিখ্যাত মন্তারা উপত্যকায় ঘুরে আসার জন্য ব্যস্ত হ'লাম। একটা গাড়ি,—ট্যাক্সী নয়,—ভ্যান; রাজী হল নিয়ে যেতে একঘণ্টার জন্য।

খুব দেখলাম।

না দেখলে পস্তাতাম।

আমার ভাই একদা আমায় জিগ্যেস করেছিল,—"দাদা, তোমার কি কখনও সমাধি হয়েছে?"

তাকে বলেছিলাম,—'যার হয়, সে কি বলে, হ্যাঁ হয়েছে? হ'লেই বা কি? আর না হ'লেই বা কি? আনন্দই তো সেতু-বন্ধন। 'যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে···।' 'তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'—সে তো 'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থী'। না, তা বলা যায় না। তবে যদি বল—'মন চেয়ে রয়, মনে মনে হেরে মাধুরী'—হ্যাঁ। শোনো।" তাকে বলেছিলাম।

ব্যাপারটি স্বপ্নে। জাগ্রতে স্বপ্নে। হঠাৎ চোখের সামনে এল। অবাক করে দিয়ে মগ্ন করে রাখল। ফিরে এলাম। আহা, এ কী আনন্দ! যেন হঠাৎ আমি এক

বিশাল নদীতীরের সুবিস্তীর্ণ পুলিনব্যাপী আচ্ছন্ন করা নানাবর্ণের ও গন্ধের শস্যরাজির ওপরে আলো বাতাসের লীলাময়তায় অভিভূত হয়ে পড়েছি, আর বলছি :—

"দ্যৌঃ শান্তিরাপঃ শান্তি রোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তি…!!" সেদিন ডুবেছিলুম যেন বহু জীবনের পারে। বহুক্ষণ।…"

সেই পরমাশান্তির সুষমায় মণ্ডিত এই নদী পুলিন। তর তর করে জল বইছে। ওপর থেকে এপার ওপার দেখতে পাচ্ছি। শুধু পাচ্ছি না রাইনের ওপরে দেখা সেই অপূর্ব ইন্দ্রধনুটি। এদেশে ইন্দ্র তাঁর ধনু ফেলে দিয়ে মাটিতে এসে বসেন। এখানকার গান "আজি শরত গগনে, প্রভাত-তপনে, কী জানি পরাণ কী যে চায়।" ঐ শেষ কথা। 'কী জানি, পরাণ কী যে চায়।'—জানি না, জানি না। অন্য কোথা,—অন্য কোথা,—অন্য কোনখানে।

—'এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে-লোকান্তরে,
গ্রহে-সূর্যে, তারকায় নিত্যকাল ধরে—
অণু-পরমাণুদের নৃত্য-কলরোল।"—

যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল বাজার আর বাজার। পোঞ্চো, ঘোড়া, চামড়া, জীবন্ত মুর্গী, লামা, ভেড়া, হাঁস, টার্কি—পোষবার পাখী, কাঠ-বেড়ালী—ওষুধ, দিশী ওষুধ, বিলিতী ড্রাগস্, বেল্টের বলিহারি। জুয়েলারী নামক আসল ও নকলের ঝিলমিলে রাজ্য। শুধু হাড়ের ওপর কাজ-করা ছুরীর বাঁট, ছবির ফ্রেম। বড়ো বড়ো লাউয়ের ওপর ছুরি দিয়ে কাটা নানা রকমের নক্সার কাজ।

বলে, এত কালের বাজার দক্ষিণ আমেরিকায় আর নেই। এত বড় বাজারও দক্ষিণ আমেরিকায় নেই। অন্তহীন বাজার। একদিনে আরম্ভ, আর একদিনেই শেষ।

কিন্তু খেলাম এসে হোটেলে।

এক ঘুমের পর সেই যে বেরুলাম—একেবারে কুজকোয়।

বিদায় কুজকো

ইসাবেলা আতোকোঙ্গা বল্লেন,—"ভালোই করেছিলেন টেলিফোনে খবর দিয়ে। এখানে আপনাদের এই গাইডের অন্তর্ধান নিয়ে রেভারেণ্ড হামফ্রী পুলিসে খবর দেয় আর কি! আমিই আটকে রেখেছি। কেমন ঘুরলেন?"

আমি কিছু বলার আগেই মার্কা ইসাবেলার সঙ্গে বেশ গরমাগরম কথার বান বইয়ে দিলো।

ইসাবেলার হাসি দেখে আমরা নিশ্চিন্ত হই।

মার্কা বলছিলো,—"পেরু পাদ্রীদের দেশ নয়। পেরু পেরুভিয়ানদের রিপাবলিক। মার্কা স্বাধীন জেনানা। ওদের মতো ভণ্ড বুড়োদের অসুবিধা হ'লেই, ওরা আমায় ফেলে যাবে; সুবিধা হলেই তখন নিজের সম্পত্তি বলে দাবি করবে। সে সব হবে না। আমি ঠিক করে এসেছি,—তিতিকাকায় ফিরে যাব। সেখানে উরোদের সঙ্গে জঙ্গলে থাকব। জাহান্নমে যাক পাদ্রী, আর তা'র নিকুচি। (টু হেল উইথ দ্যাট প্রীষ্ট! এণ্ড থিংগ!)"

আমি ধীরে ধীরে বলি, "সেই সূর্য-সন্তান কি তোমায় কিছু বলেছে, মার্কা? কা'র ভরসায় যাবে?"

—"ভরসা? আমার ভরসা আমি। আমি ইনকা। আগুনকে বলি ফুল। পাথরকে বলি মাখন। কিন্তু কথা যখন তুললেন—হ্যাঁ, অবশ্য বলেছে। আমি মিশনারী আছি, মিশনারী থাকব। হ্রদে কাজ করব। দেবশিশু না হয়, অন্ততঃ সূর্য-সন্তানের জন্ম দেব। আমি স্বাধীন ছিলাম। স্বাধীন হ'ব; থাকব। ভণ্ড পাদ্রীর চেয়ে সরল জীবনভোগী হওয়া ভাল···। ঐ তো সারি সারি নিরাবরণ মেয়ে-পুরুষ দেখে এলে। দেখলে যৌন বিকৃতি? আমার ইচ্ছে হোলো, আনন্দ করে এলাম। দেখলে কোন বিকৃতি?···"

বলতে না বলতেই রেঃ হামফ্রী হাজির।

মুখ মলিন। বিধ্বস্ত।

সেই ইয়ানের ব্যাপার নিয়ে অনেক বাগ্‌-বিতণ্ডার পর তাঁর মেয়ে জামাই চলে গেছে লীমায়। হামফ্রীও তা'র অন্য আস্তানায় চলে যেত,—"(বাট আই হ্যাভ টু কলেক্ট মাই অলটার এগো) কিন্তু আমার উত্তরসাধিকাকে সংগ্রহ করতে আসা।"

হামফ্রীর শত অনুরোধ উপেক্ষা করে মার্কা আমাদের হোটেলেই ঘর ভাড়া নেবার চেষ্টা করতে গেলে, আমি হামফ্রীকে এক পাশে নিয়ে গেলাম। আর ইসাবেল নিয়ে গেলো মার্কাকে।

ঈশ্বর কৃপাময়। মার্কা বুঝলো, আমাদের সঙ্গে এক হোটেলে থাকার অর্থ অনর্থ বাধাবে। সে হঠাৎ 'হাওয়া' হয়ে গেল।

আমি হামফ্রীকে বোঝালাম যে কিছুদিন মার্কা একটু একা থাকুক। একা থাকতে থাকতে তা'রপর, অসুবিধা হ'লে নিশ্চয় তার কাছে ফিরে আসবে।—আর না এলেই বা কী? সত্যিই তো হামফ্রী মার্কাকে স্ত্রী বলে দাবী করার মতো তিনি কোনো পাপ-পূর্ণ জীবনের সঙ্গিনী করেননি। দিব্য-দাম্পত্যে (spiritual marriage) দৈহিক সন্নিকর্ষ তো তুচ্ছ। এবং তেমন সাধন-সঙ্গিনী তো আকছার পাওয়াও যেতে পারবে। এখন ওর উদ্দামতা বেড়েছে। ওকে একা থাকতে দিলেই ভাল।

হামফ্রী খানিকক্ষণ আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল। অত্যন্ত হতাশায় যেন ভেঙ্গে পড়ল। বল্ল—"আপনি ভারতের মনীষি, তপস্বী, যোগী। স্ত্রী-সঙ্গিনী না নিয়েই ঘোরেন। সেন্ট্ পল আমাদের ব্যথা জেনেই বলে গিয়েছিলেন, 'ভেতরে ভেতরে পুড়ো না' (Don't burn), তা'র চেয়ে সঙ্গিনীই ভালো। সেন্ট অগাষ্টিনকেও বার বার পড়ে যেতে হয়েছে! আমি……ওকে ছেড়ে …কিন্তু ওর বোঝা উচিত ছিল… "

আরও স্পষ্ট হ'তে বুড়োর বাধছিল। আমি বল্লাম—"ও আপনি ভাববেন না। আপনার যেমন সুনাম, আর আপনাকে মেয়েরা যতো চায়, আপনি কখনও একা হ'বেন না।"

—"ওর কী হোলো এর মধ্যে? বলুন তো মিঃ বাতাশারিয়া। ওকি সত্যিই ইয়ানকে চায়? কী সাংঘাতিক! ইনসেস্ট্।"

—"কিন্তু আপনি যা' করছেন তা'র চেয়ে ইনসেস্ট্ সত্য। বাইবেল তো ইনসেস্‌টেভর্তী। ইনসেস্‌টের চেয়েও বড় পাপ আছে। এটা ইনসেস্ট্ নয়ও।"

—"তবে কে……মধু?"

মধু! আমি হাসতে থাকি। "দৈব দিব্য যা' বলেন, তা'র যদি কোনো অর্থ থাকেও, সেই অর্থে মধু এবং মার্কা ভাই বোন। সে ইনসেস্ট্‌ও হবে স্পিরিচুয়াল ইনসেস্ট্। তা'র ফল অনন্ত নরক। তা' নয়।"

"তবে?",—পাদ্রী বলতে লাগল—"আমি যে ওর চোখের ভাষা পড়লাম। ও আমায় 'হেট' করে। ও জেনেছে, আমি জরাগ্রস্ত। ও ইতিমধ্যে জেনেছে যৌবন কি! নিশ্চয়। সে জ্বালা ওর চোখে আমি দেখেছি। কী হোলো তবে? কী হোলো? আর কে?"

আমার চোখে ভাসে তিতিকাকার বুকে কালো বিন্দুর মতো একটি মোটর বোট।

হঠাৎ ইসাবেলা এসে বল্লো,—"রেভারেণ্ড, মিসেস্ হামফ্রীকে রাখা গেল না। তিনি পিউনো বা আয়াকুচো—যে কোনো প্লেন পান চলে গেলেন। এখনও যদি এয়ার পোর্টে যান—"

হামফ্রী বাক্যটিকে শেষ করতে না দিয়ে নড়বড় করতে করতে নেমে গেলেন।

সেই অপসৃয়মান মূর্তিমান দুর্ভাগ্যকে আমি দেখতে লাগলাম, যেন টমাস হার্ডির অলিখিত কোনো ট্রাজেডির বিড়ম্বিত আত্মা।

আমি ইসাবেলাকে ধন্যবাদ দিলাম, আর দিলাম একটি পার্শ্বেল। আমার সামনেই ও সে'টি খুলে বল্লো,—"এ যে অনেক, অনেক! ও! নো!! নো!!!"

বল্লাম,—"বেশ, যা' ইচ্ছে ফেরৎ দিন।"

—"কোনটা দিই। বাচ্চাদের জন্য সুন্দর টুপী, বোনা টুপী। এ ফেরৎ দিই কোন্ অধিকারে? এই গ্লাভ্‌স্ জোড়া নিশ্চয়ই আমার স্বামীর।…তা'র বড়ো ভালো লাগবে।"

—"তবে আপনার ষ্টোলটা ফেরৎ দিন।"

আসল আলপাকার ষ্টোলটি গালে চেপে বল্লেন ডঃ ইসাবেলা, আতোকোঙ্গা, চোখ বুঁজে বল্লেন—"না, এটি আমি দেব না, দেব না, বাবা! এটি রৈলো তোমার স্মৃতি।" (লক্ষ্য করলাম মধু-র সুরে উনি আমায় 'বাবা' বলে কাছের ক'রে নিলেন)।

"এটি তুমি ফেরৎ চেও না। প্লীজ!"—বলেই জলভরা চোখে খিলখিল করে হাসতে লাগলো। নাকের গুলি দুটো গোলাপী, ফুলে ফুলে উঠছে।

কুজকো এয়ার পোর্টে পরদিন খুবই আশা করেছিলাম ইসাবেলাকে দেখবো। তৃতীয় ডাক হবার পর চেকিং করে ঢুকে গেলাম। প্লেনের সিঁড়ির কাছে, কী জানি কেন দাঁড়িয়ে রইলাম।

একজন অফিসারের সঙ্গে আসছেন ইসাবেলা এবং হুইল চেয়ারে মিষ্টার আতো-কোঙ্গা।

মিঃ আতোকোঙ্গা বল্লেন,—"সময় নেই। আপনার গালটা আমায় ছুঁতে দিন।"

আমিও ভদ্রলোকের গাল ঠোঁট দিয়ে ছুঁলাম।

বিদায় লীমা

লীমার এ্যরাইভাল লাউঞ্জের মুখেই ছবির প্রিন্টেড বাণ্ডল্ নিয়ে রোদ্রীগেজ বুড়ো দাঁড়িয়ে।—"ওঃ! পুড়ে গেছো। রোগা হয়ে গেছো। তোমায় কি গোচোরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল?"

আমি বলি—"কীট্শ্ তো পড়োনি। নৈলে বলতাম, 'লা-বেলে-ডেম্-সাঁ-মের্সি' ধরে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কি জান? ফেরৎ পাঠিয়ে দিল! ডিফেকটিভ্ কনসাইন্মেণ্ট।"

জোর্জ এঙ্গেলেস্ তা'র ক্রাইস্লারের দরজাটি খুলে দাঁড়িয়ে, চোখে চোখে নমস্কার জানালো।

গাড়ির মধ্যে এসেই রোদ্রীগেজ বল্‌ল—"কেমন লাগলো মিসেস্ আতোকোঙ্গাকে?"

আমি রোদ্রীগেজের হাত চেপে ধরি।

মধু বলে,—"গ্রেট্। ওকে বলি, মহিলা। নিউ ইয়র্কের ষ্ট্যাচু অব লিবার্টির চেয়ে লম্বা, ভিয়েৎনামের চেয়ে জীবন্ত। ওঃ, গ্রেট মহিলা! রীয়লী!"

রোদ্রীগেজ বল্‌ল—"আমি খুশী। ও ফোন করেছিল। ও বলে, বৃদ্ধ আমায় যাদু করেছে। আমি ভাবছি, ইনকুইজিশনে রিপোর্ট করি। ক্যাথলিক সমাজে যাদু করা ক্রাইম,—জানো তো?"……

তা'রপর গলার স্বর পালটে বলে—"শোনো, তোমরা কাল বিশ্রাম নাও। কাল

সোমবার। সব ম্যুজিয়ম বন্ধ। কিন্তু 'ভোরে তাগ্‌লে' প্যালেসটা দেখবে। আর বাজারটা ঘুরবে। বলেছিলে যে, জিনিষ কিনবে। ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমায় অবশ্য কিছু কমিশন দেবে। টেন পার্সেন্ট। কাজেই তুমি যতো কিনবে, ততো আমার লাভ।"

আমি বলি—"আজ বিকেল বিশ্রাম। রাতে শো। সকালে বাজার হাট। বিকেলে তোমায় ছেড়ে দেবো, যা' ইচ্ছে করো আমাদের নিয়ে।"

"কি ইচ্ছে করছে ?"

"জোর্জের গাড়ি নিয়ে দু'শো-তিন শো কিঃ মিঃ এই শহর আর আশ-পাশ বন্‌-বন্‌ করে ঘুরি।"

হঠাৎ ক্লান্তিতে শরীর ও মন ভেরে এলো। ঘরে গিয়েই এক ঘুম। উঠেছি, তখন বেলা দু'টো। খুব ভাল করে স্নান করে এতো দিনে পরিষ্কার জামা-প্যাণ্ট পরে যেন নতুন মানুষ হলাম।

ঘরেই আনিয়ে নিলাম যা'কে বলে, হাই কফি। বেরিয়ে পড়লাম পথে। মধুকে বললাম—"চল যে দিকে হয়। কিছু টাকা খরচ করার সখ চেপেছে।"

"চলুন। কিন্তু মাথায় নাচছে তিতিকাকা, মার্কা, ইসাবেলা। স্যর,—আপনি বরাবর বলে এসেছেন,—ঈশ্বরের চেয়ে নিসর্গ প্রত্যক্ষ, নিসর্গের চেয়ে মানুষ প্রত্যক্ষ।"
"ঈশ্বরকে দেখতে গেলে, মানুষের মধ্য দিয়ে দেখতে হয়। ঈশ্বরকে পে'তে হ'লে, মানুষের মধ্য দিয়ে পে'তে হয়। খৃষ্টানরাও তা'ই বলে। গড্‌ থ্রু জীসাস্‌ ক্রাইষ্ট্‌। অবতারবাদও তা'ই বলে। গড্‌ই রাম, রামই গড্‌।

"কিন্তু ওসব তো শুধু বলা। কথা, কথা, কথা! এ যেন স্পষ্ট দেখলাম—মানে, আপনি দেখালেন। জীবন্ত অধ্যাস ; জীবন্ত ধর্মকথা। একি দেশ দেখা, স্যর ? এ যেন ঈশ্বরকে অণুতে, শিলায়, পাথরে, আকাশে, মানুষে, প্রেমে, অনুরাগে দেখা—অনুভবই সমাধি। অনুভবহীন সমাধি,—নিজেকে শূন্য করা। ওর মর্যাদা শূন্য-গর্ভ বাদাম খোলা!"

—"থামো থামো থামো! এ তোমার হোলো কি ? মার্কার বিরহ ?"

"কেন লজ্জা দিচ্ছেন, স্যার ? এ বিরহ আরও বড়। ফিরে যাচ্ছি ত্রিনিদাদ। এই বিশাল অভিজ্ঞতার সমুদ্র ফুরিয়ে যাবে। পড়ে থাকবে তলানি ; আমি আমার স্কুল, সরোজ, তা'র মুর্গীর খাঁচা, আর গাড়ি নিয়ে ছোটা—ছোটা! ব্যাঙ্ক, রুটিন, বাড়ি মেরামৎ, বিয়ের নেমতন্ন রক্ষা। এই যে মানুষ হিসাবে অনুভূতির ঢেউয়ে অবগাহন—এর স্বাদ ফুরিয়ে যাবে। বলছিলেন, কীট্‌স্‌। তারই কথা.—'ও ফর এ লাইফ অব্‌ সেন্‌সেসেন্স্‌, র‍্যাদার্‌ দ্যান্‌ অব্‌ থট্‌স্‌।' (কী করব দর্শন তত্ত্ব নিয়ে ; আমায় দাও জীবন, তার অভিজ্ঞতা, আর তার আঘাত-সংঘাতের অনুভূতি!) এর বিরহ কি কম বিরহ ? মার্কা ? কতই তার যৌবন ? কতই মার্কা এই হতভাগার জীবনে এসেছে, গেছে। এ যে এল, এত চিরকালের ধন। যাবে না—"

—"থামো থামো ; ধীরে। মানুষের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকেই শুধু দেখা যায় না, মধু এই মানুষের মধ্য দিয়েই আবার শয়তানকেও দেখা যায়।—তা জানো ?"

"জানি। মানি না। আপনার আর একটি কথা মনে গেঁথে রাখি। এত পূর্ণতায় প্রেমে ভরা থাকুক চিত্ত যে, আর কিছু থাকার যেন কোন অবকাশই না থাকে। 'পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।'—আপনিই বলেন। মানুষের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে যদি দেখি,—যদি পারি দেখতে ; সব কিছুই ঈশ্বর হয়ে যাবে। কবীরের দোঁহা আছে, 'মৈঁ লালী দেখঃ গয়ে, মৈঁভী হো গয়ে লাল ; জিওঁো দেখেঁ বজার মেঁ, তিওঁো সব ভই লাল।' যা পাপকে পোড়ায় না, তা, আবার পুণ্য কি ? আগুনই যদি হয়, তা'র প্রমাণ সে সব কিছুই পোড়াবে। ঈশ্বরকে দেখতে দেখতে কি শয়তান দেখা যায় ? বিরহ সেই প্রেমের। স্যার, সেই প্রেমই পেয়েছিলাম এই ক'টি দিনে। ফুরিয়ে গেল দিন। আবার সেই প্রত্যহের মিছিল, রুটিনের মরুভূমি।"

একটা লোক পথের ধারে বসে ছবি আঁকছিল। আঁকছিল বলা ভুল হবে। ক্যানভাসের ওপর রংয়ে ভেজা ন্যাকড়া, তুলো, স্পঞ্জ ঘষছিল। তবুও কিন্তু ঝক্‌ঝকে জীবন ফুটে উঠছিল। তারই চারখানা ছবি বহু দর কষাকষি করে নিলাম। দর কষাকষি করা এখানকার কায়দা। আমার ভাল লাগে না। কিন্তু না করলেও মানুষের সঙ্গ পাই না।

এমনি পথের ধারে রুপো গলিয়ে বার করে নেওয়া 'ওর' থেকে 'ইনগট্' বেচছে। ক্রীষ্টালের মত 'কেলাস' তোলা। দেখতে চমকদার। কেনায় পেয়েছে। যেখানে সেখানে দোকানে ঢুকছি। কথা জানি না। খুবই মজা লাগছে।

এর মধ্যে যে পাড়াটায় ঢুকে পড়েছি, সেখানে শুধুই মেয়ে। নানা ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, নানা বয়সের। গলিটায় যেন দিন। প্রচুর আলো। এর মধ্যে খুব সাজানো পরিষ্কার একটা চীনা খাবারের দোকান। আমি ওয়াণ্টন স্যুপ নিলাম। মধু নিল তার প্রিয়—ভাজা মুর্গী। বিকেলের খাওয়া। তারপর দু'জনেই কোকা-চা খেলাম। এতদিনে আমরা যেন ইন্‌কা হয়ে গেছি।

কোকা-চায়ে পেয়েছে। এখন ভাল লাগে। নেশা না লাগলেও চলা-ফেরা, ভাবনার ধারা খুব সংযত ও সংহত হয়। যা-দেখার, যেন বেশী দেখি ; যা-শোনার, যেন বেশী শুনি ; যা-আনন্দের, তাতে যেন বেশী রস পাই।

মধু হাসতে হাসতে, দৌড়ে এসে বলে,—"লোকটা বল্‌ছে, আমি কোন য়ুনিভার্সিটি-গার্ল-এ ইণ্টারেষ্টেড্ কি-না।

"এই এক হয়েছে মধু। য়ুনিভার্সিটিগুলোতে নিশ্চয় মেয়েদের সংস্থা আছে। আছে তা ছাড়াও প্রখ্যাত ক্লাব। এদের একবাক্যে প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ পথে, মীডিয়ায়, টেলিভিসনে, কাব্যে, নাটকে তোলা উচিত। মেয়েদেরই তোলা উচিত প্রতিবাদ এ ধরনের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। এখনও বিদ্যালয়, গির্জা, মায়ের কোল—পৃথিবীর পুণ্যতম

স্থান। এগুলোর অপব্যবহার যতই হো'ক না কেন—যাবৎ এ নামগুলো আছে,—এইভাবে তা'র পবিত্রতা ভাঙ্গিয়ে দেহের ব্যবসায় ছড়ান চলবে না।"

মাঝে মাঝে একটি-দুটি মেয়ে একা যাচ্ছে। লীমায় আজও ভদ্র মেয়েরা 'একা' পথ হাঁটে না। একটি বাচ্চাও নিদেন পক্ষে সঙ্গে থাকবে। কিন্তু এই লীমারই পথে সুন্দরী শ্রেষ্ঠা মানুএলা ঘোড়-সওয়ার হয়ে ঘুরে বেড়িয়ে দুর্গতিবাদী রক্ষণশীল সমাজের গোড়ায় লাঙ্গল ঢুকিয়ে চাড় দিয়েছিলেন। ম্যানুএলার পরে লীমা আর সে লীমা রইল না। অমন ঘোড়ায়ও কেউ চড়তে পারত না, অমন তীর আন্দাজী 'ডেড্-শট'-ও কেউ ছিলনা। বোলিভারের সেনানীদের মধ্যে 'ফেন্সিং'-এও (তলোয়ারের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ) কেউ ম্যানুএলাকে এঁটে উঠতে পারত না। একটা মেয়ে—পেরুর মেয়ে, কীভাবে যে পালটে দিয়ে গেল যুগ! পেরুর ম্যানুএলা ; আর একালে আর্জেন্টিনার এলিজাবেথ পেরন। এরা যেন যুগ-নায়িকা।

হাঁটতে হাঁটতে কখন যে প্লাজা আর্মাসে এসে গেছি, তা বুঝতেও পারিনি। ক্যাথীড্রালে অতি চমৎকার অর্গান বাজছিল। ভেতরে গিয়ে বসলাম। বা'র হয়ে যখন এলাম, তখন শহর আলোয় আলোময়—ঝল্‌মল্ করছে। হঠাৎ রোদ্রীগেজ!

—"জানতাম না তুমি এত চার্চ ভক্ত! তিতিকাকায় মেয়ের ছড়াছড়ি ; বুড়ীরাও ছাড়ে না। কোন পাপ কর্মের হ্যাপা পোয়াচ্ছো না তো?"

—"খুব সুন্দর বাজাচ্ছিলো কিন্তু!"

—"চিনলে না বাজনা! তোমাদের দেশেরইতো—জুভীন মেহেতার সিম্ফনী। এখানে খুব পপুলার। জোর্জ খুব এক্সাইটেড্। গাড়ির খিদমৎ করছে। কাল ও তোমাদের নিয়ে সাদার্ন বীচেজ-এ চক্কর কাটবে। পানামেরিকান হাইওয়েতে যাবে। তার আগে কিন্তু, তোরে তাগ্‌লে এবং কেনা-কাটা।"

তোরে-তাগলের ভেতরে কফি পাওয়া যায়। আরাম করে কফি খাচ্ছি। আর তোরে-তাগ্‌লের গল্প বলছি।

বলছি—সান্ মার্টিন চলে যাবার পর পেরুর ময়দানে তখনও ফিরিঙ্গীরা আছে। তোরে তাগ্‌লে মহা-অভিজাত। মাদ্রীদ-প্রীতি তার অহং-স্ফীত ব্যক্তিত্বের রোমে রোমে। তবু সে রিপাব্‌লিকান। তখন ম্যানুয়েলাকে নিয়ে ভিল্লা মাগদালীনাতে আছেন বোলিভার। মার্ক্ইস্ তোরে তাগ্‌লে পেরুর প্রেসিডেন্ট। তাঁকেই ডিনারে নিমন্ত্রণ করলেন বোলিভার। ডিনারের পর বাড়ি ফেরার সময় তোরে তাগ্‌লে বুঝে নিলেন, এ ছেলে 'অভিজাত-কে-অভিজাত' ; আবার 'জংলী-সে-জংলী'। এ পাক্কা গোচো ; ডানপিটে, গেরিলা, ঢং আর বাহবাস্ফোটের যম। এর জীবিতকালে ফিরিঙ্গীদের নিস্তার নেই। এতো আন্তর্দেশীয় খবর রাখতেন বোলিভার, যে তোরে তাগ্‌লে মানতে বাধ্য হলেন যে এর আমলে দেহের খাঁচায় প্রাণপাখিকে পুষতে হলে অন্ততঃ দু-মুখো সাপ হওয়া চলবে না। এ মানুষটার সহস্র মুখ।

ফিরতি আমন্ত্রণ বোলিভারকে তোরে তাগ্‌লে এই বাড়িতেই দিয়েছিলো। পাছে

লড়ায়ের জন্য চেয়ে বসেন, সেই ভয়ে তোরে তাগলের প্রসিদ্ধ সোনার 'সার্ভিস' প্লেট, বোল, কাপ, কাঁটা-চামচ, ছুরির দলকে-দল সরিয়ে ফেললেন। তবু টেবিলে রইলো এক জগদ্দল বো-ল্, আর পেল্লায় এক জাগ। দু'টিই নিখাদ পেটা সোনার। জাগে পানীয়; বো-লে বরফ।

এখানেই বোলিভার বলে যান যে, জুনীনে ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে তিনি লড়বেন। দক্ষিণ আমেরিকায় ফিরিঙ্গী থাকবে না। য়োরোপেও স্পেনের কাপ্তেনী বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জুনীন তিনি জিতলেন। তার পর শেষ ও সম্পূর্ণ জিত আয়াকুচো। সে সব বিজয়-বার্তা এবং সংশ্লিষ্ট উৎসবের ভূমি—এই তোরে তাগলে্ প্যালেস্।

এই প্যালেসে ম্যানুএলা তাবৎ সমাজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। বিবাহিতা স্ত্রী ন'ন, রক্ষিতা ন'ন (তিনি নিজে কর্ণেল, মাইনে পেতেন। তা' ছাড়া পেরুর সরকারের কাছে থেকে ফ্রীডম-ফাইটারের জল-পানি পেতেন। আর নিজের সম্পত্তিও ছিলো প্রচুর); স্বৈরিনী ন'ন; কারণ পুরুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সম্বন্ধে বিবাহিত জীবনেও তিনি ছিলেন খুবই উদাসীন। ব্যতিক্রম ছিলো শুধু নারী-প্রিয় রোগ জর্জর এই অভূত-পূর্ব কর্মযোগী বোলিভারের বেলায়। হেন রমণী তো কারুকে 'নিমন্ত্রণ' করতে পারতেন না। তাই নিমন্ত্রণ যেত মিলিটারি সেক্রেটারীর নামে; কিন্তু তার পর সবই মানুএলা। তিনি ব্যক্তিত্বে ছিলেন ভুবন বিজয়িনী। গরবিনী। এমন নারী চিত্ত-বিমোহিনীও!

এই প্যালেসের প্রতিটি ঘর সরকারের তরফ থেকে আজও গোছ করে রাখা হয়, শুধু কলোনীয়ল যুগের স্থাপত্যে অভিজাত শৈলীর পরাকাষ্ঠা-নিদর্শন হিসাবে।

এই পরিচয় তোরে-তাগ্‌লে প্যালেসের। বোলিভার বা মানুএলা, বা সেকালের সেই সব নৃত্যের আসর, এ সবই গৌণ। এই ছাঁদেই আর এক প্যালেসে প্রথম সাক্ষাৎ, প্রথম নৃত্য, প্রথম অন্তর্ধান। সে সব কুইতো-র কথা। তবুও তোরে তাগ্‌লে পেরুর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। খুবই বিত্তবান এবং প্রতাপশালী ব্যক্তি। এঁর পরেই পেরুর প্রেসিডেন্ট হয়ত ছিলেন বোলিভার। কিন্তু তিনি সে পদ প্রত্যাখ্যান করলেন। সব কথা বলি।

এলাম এবার শহরের বাইরে, কুটীর শিল্পের 'গ্রামে'। অর্থাৎ সরকারী ব্যবস্থায় আয়োজন করা কুটীরের পর কুটীরে 'একজ্‌হিবিশন্'। সে এক চমক লাগানো সংগ্রহ। সত্যিই অবাক করা। এসব দেখি আর ভাবি, শুধু এই মানুষের কথা। ভাবি, বেদের দেবতাদের মধ্যে বিশ্বকর্মা ত্বষ্ট্রা সোমভুকদের গণ্যপদ পাননি, তিনি হাতের কাজ করতেন বলে; তাঁর কন্যা-কে (রোচনা) নানা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হোলো বাপের শিল্প-কর্মের অনুধ্যায়িনী ছিলেন বলে। ছেলেদের নাম রেখেছিলেন, সন্নিবেশ এবং বিশ্বরূপ। ভাবি, অশ্বীন ভ্রাতৃদ্বয়, বা ধন্বন্তরী 'দেব' পদ মর্যাদা পাননি, হবি সোমের অংশভুক হতে পাননি, মানুষের দুঃখ-ক্লেশ, শান্তির জন্য চিকিৎসাব্রতী হয়েছিলেন বলেই। কিন্তু ভাবি, সোম, হবি, যজ্ঞবলি—এসব জামাই-আদর তাঁরা, দেবতারা পেতেন কোথায় মানুষ এবং তার পরিশ্রম, কলা-কৌশল না

থাকলে ?··· সত্য এ কথা যে, এ বাজারে যজ্ঞ-ভূমির, বা তপোবনের, বা ধ্যান-পূত নদীতীরের গন্ধ নেই ; তবু মনে হয় ঐতরেয় সংহিতার, বা অথর্ববেদের শিল্প প্রশস্তি— "শিল্পানি বো শংসন্তি"······ ইত্যাদি। মানুষকে তা'র সৌন্দর্যবোধ, তার আত্মবোধের প্রকাশ স্পৃহা ঘর ভুলিয়েছে, বিবাগী করেছে, আত্মস্থ করে বাউল করে দিয়েছে। দারিদ্র্যকে সে করেছে জীবনের ভস্ম-লেপ ভূষা, শ্রমকে করছে আত্মরতি, কর্ম-কৌশলকে করছে যজ্ঞদাহ, সৃষ্টির তৃপ্তিকে মনে করেছে নন্দনানন্দ। মানুষই স্রষ্টা। দেবতার কল্পনাও মানুষেরই আরাধনার ফল।

একবার স্পেনের তোলেদো শহরে গেছি। ঘুরে ঘুরে দেখছি এক প্রাচীন জরাজীর্ণ দোতালা, কাঠ-ইঁট-চুন-সুর্খীর এক টলমলে বাড়ি। জীর্ণ হলেও তার অঙ্গন, বারান্দা, সংলগ্ন বাগান, দোতালার মেলা ছাদ সর্বত্রই একটি সুস্পষ্ট রুচির অকৃত্রিম ছন্দের ছাপ। যে মানুষটি এখানে ছিলেন, তাঁর চেহারা, ব্যবহার, কাজ, জীবন-ছন্দ সকলকে অভিভূত করেছে। দারিদ্র্য তাঁকে নীচু করেনি ; পরিশ্রম তাঁকে অসহিষ্ণু করেনি, আর একাকীত্ব তাঁকে বিরক্ত করতে পারেনি। তাঁ'র নিশ্চয়ই কোনো নাম ছিল ; কিন্তু কে গ্রাহ্য করে সে নাম ? যে চিরকালের তার নামই তো অনাদি, অনন্ত, অক্ষয়। লোকে তাঁকে ডাকতো 'গ্রীক' বলে, এল্-গ্রেকো (দোমেনিকে থিওটোকপুলি) শিল্পী। তাঁর আঁকা ছবি নেই এমন শিল্প-সংগ্রহশালা পৃথিবীতে নেই।

দেখেছি নন্দলালের বাসভূমি, বাইজের বাসভূমি, —দেখেছি কাশীর প্রবোধ পাল, শ্যাম পাল, যতীন বিশ্বাসের কর্ম-জীবন ও কর্মস্থল। দেখেছি জয়পুরের মূর্তি মহল্লা, কাশীর ঠঠেরী বাজার, জগৎগঞ্জ, আলাইপুরা, লেহুরিয়াবীর—দেখেছি কাঞ্চী, নাসিক, শ্রীরঙ্গম, তিরিচুড় পল্লীর শিল্প-পল্লী, বয়ন-পল্লী, রত্ন-শান করার পল্লী। কী দারিদ্র্য, কী পরিশ্রম—তবু কী বেপরোয়া স্বচ্ছন্দ প্রাচুর্যে আনন্দিত জীবন।

যারা কাজ করে, তাদের আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কী যে সম্ভার সৃষ্টি করেছে, পাথরে, ধাতুতে গাছের পাতায়, ফলে, পশমে, কার্পাসে, শণে, তোতোরোয়, চামড়ায়, লোহায়, দামী রত্নে, মুক্তায়, সোনায়, রূপায়—এক অন্য জগৎ যেন।

দেখতে দেখতে (এবং কিছু কিনতে কিনতে) —এ কি ? এ কে ? ·····

আমি রোদ্রীগেজের দিকে চাই। রোদ্রীগেজ মিটি মিটি হাসছে। চাই মার্কার দিকে। মার্কাও মিটি মিটি হাসছে—শুধু চোখে। মধু লাফিয়ে এগিয়ে যেতে চায়, বলতে যায় কিছু—।

আমি তার মুখ চেপে ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলি—"তুমি কী জানো, ও আত্মগোপন করছে না ?"

রোদ্রীগেজ সন্দেহ ভঞ্জন করে বললো—"আপনারা কি আয়মারাকে চেনেন না-কি ?"

আমি অনির্দেশ্য অপরিচিতির বেড়া তুলে দিয়ে বলি, "না, চিনি না। কিন্তু মেয়েটি সুন্দর। দাঁড়াও না। একটা ছবি নিই।"

আমরা যা কিনলাম, তা'র দশ পার্সেন্ট রোদ্রীগেজ কীই বা পেলো। কিন্তু খুযু

রোদ্রীগেজ, এই মিলনটি করাবে বলেই এখানে এসেছিলো। গেরিলাদের জগতের বড় কথা—'যোগাযোগ'। বার্তা ও সংবাদ।

রোদ্রীগেজ বল্‌লো, "পিউনোর ছেলেটির ব্যবসা আছে এই বাজারে। এখান থেকে মার্কা শীগ্‌গিরই চলে যা'বে। আর তা'র কাছে গেলে, কোনো মিঞার সাধ্য নেই, ও মেয়েকে ধরে।"

খুব ঘুরলাম সারাদিন। লীমার উপকূল ধরে কোষ্টা ভের্দে, লা হেরাদুরা, কোঙ্কান আরিকা, পুন্তা হের্মোসা, সান বার্তোলো, পুকুসানা, চিলকা—আর শেষ গ্রামে তোত রিতাস। গেলাম প্যান আমেরিকান হাইওয়ে ধরে। ফিরলাম আমার প্রিয় হ প্রিয়তর গ্রামীন পথে। ধূ-ধূ মরুভূমির মাঝে মাঝে সরকার যেখানে যেখানে জল এ দিতে পেরেছে, সেখানে সেখানে ওয়েসিস্। মানুষের অমর প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি, মানুষে উদ্যম। এটাই মানুষ-জীবনের, মানুষ কালের বিশাল মরুভূমির মধ্যে শ্যামল 'ওয়েসিস্'

চল্‌লাম উত্তরে। প্যান আমেরিকান হাইওয়ে ধরে লা পুন্তা, সান্তা রোজা, আঙ্কন্, চাঙেকপোর্তো, চাঙ্কো গ্রাম, চাঙ্কাইল্লো।

জিগ্যেস করলাম—"কতো মাইল হোলো?"

জোর্জ বল্‌লে—"তিনশো চল্লিশ কিলোমিটর!!—আট ঘণ্টায়। ভালোই ঘোরা হোলো।

স্নান সেরে যখন ডিনার শেষ, তখন রোদ্রীগেজ বল্‌লে—"এখন গিয়ে বিশ্রাম নাও। কাল সাতটায় প্লেন। আমি ঠিক এসে যাব।"

এসে গিয়েছিল রোদ্রীগেজ।

এয়ার পোর্টের লাউঞ্জে রোদ্রীগেজকে একটা ভাল পোঙ্কো কিনে দিয়ে আমরা তৃপ্তিতে ভরে গেলাম। জোর্জ তো চওড়া বড়ো কম্ফর্টরটি পেয়ে মহাখুশী।

ভেনেজুয়েলায় বেশ কিছুদিন কাটালাম, পুনশ্চ আমাজোন, নেগ্রো নদী আর মাগদানিলার জলা দেখার জন্য। সে কথা এখন থাকুক।